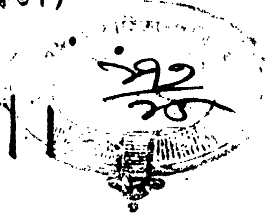
শ্রীহরিঃ

(১৮৬৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৫শ বর্ষ, ১৫শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। | বৈশাখ। | ১৩১৫ সাল, ১৮৩০ শকাব্দা।

মঙ্গলাচরণ।

"সিদ্ধিদাত্রে নমস্তুভ্যং বৃদ্ধিসমৃদ্ধিহেতবে।
অশেষবিঘ্ননাশায় গণেশায় নমো নমঃ॥"

সিদ্ধিদাতা গণপতি! শ্রীপদে করি প্রণতি;
বৃদ্ধি-সমৃদ্ধির মূলাধার!
নাশহে বিঘ্ন অশেষ, বিঘ্নেশ! দেব গণেশ!
নমস্কার চরণে তোমার॥

—×—

'গণেশ' নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিলে—গণেশ-মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিলে, গণেশ-পদে প্রণাম করিলে, সর্ব্বশুভকার্য্যারম্ভে নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধি লাভ অবশ্যম্ভাবী, ইহাই হিন্দু-শাস্ত্রের অমোঘ আশ্বাস; হিন্দুরও ইহাতে চিরবিশ্বাস; ইহাই হিন্দুর মঙ্গলাচরণ। আজ আমাদের হিন্দুধর্ম্মানুরাগী প্রিয়পাঠকমণ্ডলীর অধ্যাত্ম-পরিচারিকা "হিন্দুপত্রিকা"র নববর্ষ প্রবেশে—নবকার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার আশাবেশে—গণেশাগ্র-স্মরণ ও গণেশ-কৃপৈকশরণ এই মঙ্গলাচরণ। অনন্তশক্তি-ভগবানে সিদ্ধি-শক্তিস্বরূপ গণেশরূপের সর্ব্ববিঘ্নহরণ—সিদ্ধি-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি-বরণ—সেই ভক্ত-ভক্তি-উপহৃত-রক্তচন্দনাক্ত রক্তারবিন্দ-পদদ্বন্দ্বে হিন্দুপত্রিকার সভক্তি-আনন্দ-বন্দনাভিনন্দন। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

নববর্ষ-নিবেদন।

ভগবৎকৃপায় "হিন্দু-পত্রিকা" সুদীর্ঘ-চতুর্দ্দশবর্ষকাল ভগবৎ-বাক্য হিন্দুশাস্ত্র, শাস্ত্র-বিহিত হিন্দুধর্ম্ম, ধর্ম্ম-শাসিত হিন্দুসমাজ

ও সমাশ্রিত হিন্দু-সাহিত্য-সেবায় অতিবাহিত করিয়া, অদ্য পঞ্চদশবর্ষে প্রবেশ করিল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ সময়টা বড় কম নয়। দ্বাদশ বর্ষ-পরিমিত এক যুগই সাধারণতঃ দীর্ঘকালরূপে পরিগণিত। ইহার উপর আরও দুটি বৎসরে চতুর্দ্দশ-বৎসর গণিত। বিশেষতঃ চিরভারত-হৃদয়বিহারী ত্রেতাযুগাবতারী ধর্ম্মসংস্থাপনকারী, সাধুসমুদ্ধারী দুষ্কৃতহারী রাবণারি শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস-কালের স্মরণে চতুর্দ্দশ বর্ষের কালপরিমাণটি হিন্দু-হৃদয়ে অতি দীর্ঘ ও দুঃসহ মানে মুদ্রিত। অতএব গত চতুর্দ্দশবর্ষকাল যাঁহার চরণ-কৃপায় এবং যে পাঠক, লেখক, গ্রাহক, অনুগ্রাহকবর্গের সহানুভূতি ও সহায়তার এই সামান্য সাময়িক সন্দর্ভখানি শতবিঘ্ন সত্ত্বেও জীবিত ও স্বকর্ত্তব্য-ব্রতে ব্রতী রহিয়াছে, উপস্থিত পঞ্চদশবর্ষও তাঁহার সেই কৃপায় ও তাঁহাদেরই সেই সহায়তায় এই আরব্ধব্রত আশানুরূপই উদযাপিত হইবে বলিয়া আশা করি।

"হিন্দুপত্রিকা" সংবাদ-পত্রিকা নহে। রাজনৈতিক বা সাময়িক প্রসঙ্গ ইহার মুখ্য বিষয়ীভূত নহে। তবে কখনও আনুষঙ্গিক বা গৌণভাবে মুখ্যবিষয়ের পরিপোষকরূপে উহা আলোচিত হয়। ফলে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গই ইহার মুখ্য প্রচারিত বিষয়। সাধারণতঃ ধর্ম্মকথা ভারতে চিরনিরাপদ—অন্ততঃ চিরজীবী। ধর্ম্মই তাহাকে রক্ষা করেন। "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।" ধর্ম্মকে যে রাখে, ধর্ম্মও তাকে রক্ষা করেন। আবার "ধর্ম্ম এব হতো হন্তি"। ধর্ম্মকে যে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাকে নষ্ট করেন। আর "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" ইহাই ভারতের চিরপরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত বাক্য; হিন্দুরও ইহাতে চিরনির্ভর।

ধর্ম্ম-পত্রিকা "হিন্দুপত্রিকা"র সন্দর্ভ প্রচারে এই নীতিই অবলম্বিত। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া, কর্ম্মযোগের বিস্তৃত পরিধিমণ্ডল-মধ্যে কাজ করাই "হিন্দুপত্রিকা"র মূল মত-নীতি (principle)। আমরা 'মডারেট্' ও বুঝিনা, 'একৃষ্ট্রিমিষ্ট্' ও বুঝিনা; আমরা বুঝি স্বদেশ-বৎসলতা বা "স্বদেশী"। উহা হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান প্রভৃতি ভারতের সকল সম্প্রদায়েরই সাধনের বস্তু।

হিন্দুগণ ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-শাসনের অবিরোধেই দেশের কাজ বা দেশের কাজ করিতে বাধ্য। হিন্দুর চিরারাধ্য দেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাক্য গীতার ১৬শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥"

কর্ম্ম ও অকর্ম্মের বিচার-ব্যবস্থায় শাস্ত্রকেই প্রমাণ মানিয়া এবং শাস্ত্রের বিধি জানিয়া কর্ম্ম করিবে। ইহার অন্যথা হিন্দুর কখনও শুভকর নহে।

সেই শাস্ত্র—সেই শাস্ত্রসার গীতাতেই ১০ম অধ্যায়ে "বিভূতিযোগ" বর্ণনে ভগবান বলিয়াছেন—"নরাণাঞ্চ নরাধিপম্"—অর্থাৎ নরগণের মধ্যে আমাকে 'নরাধিপ' (রাজা) বলিয়া জানিবে। অতএব শাস্ত্রসর্ব্বস্ব হিন্দু রাজাকে মান্য করিতে—রাজবিধি পালন করিতে ধর্ম্মতঃ ও শাস্ত্রতঃ সর্ব্বথা বাধ্য। রাজবিরোধিতা হিন্দুর ধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

স্বধর্মনিষ্ঠ শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রকৃত হিন্দু কখনও রাজবিধি অমান্য করিতে পারেন না।

স্থলবিশেষে 'রাজভক্ত' হইতে না পারিলেও, রাজবিধি-বাধ্য হইতে হিন্দু স্বভাবতঃই বাধ্য। 'ভক্তি' অতি উচ্চ বস্তু। ভক্তি ভালবাসার প্রধান বা উৎকৃষ্টাংশ। 'ভক্তি' শাস্ত্রমতে "পরানুরক্তি"। তাহা শুধু শুধু সেধে সেধে দিবার বস্তু নয়। তাহা সুযোগ্যতার সাধন দ্বারা অর্জ্জন করিয়া নিতে হয়। ঈশ্বর সর্ব্বগুণময়, ন্যায়-দয়াময়, প্রেমানন্দময় অনিন্দ্য সুন্দর, তাই জগতের ভক্তি তাঁর চরণোদ্দেশে ধাবিত। যারা ঈশ্বরকে সুধুই "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" ভাবে দেখে, তারা তাঁহাকে ভয় করে মাত্র; কিন্তু ভক্তি করিবার ভাগ্য ও যোগ্যতা তাহাদের ঘটে না।

রাজভক্তি সম্বন্ধেও বলা যায় যে, রাজার শুধু রুদ্রমূর্ত্তিজনিত ভয় দ্বারা প্রজার রাজবিধিবাধ্যতাই হইতে পারে, খাঁটি রাজভক্তি কিরূপে হইবে? কিন্তু রাজার প্রজাবাৎসল্য, প্রজার সুখ-দুঃখে সহৃদয় সহানুভূতি, অক্ষুণ্ণ ন্যায়পরতা ও সুনীতিরক্ষিত কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি গুণে প্রজার হৃদয়ের পবিত্র রাজভক্তি গোমুখী-মুখ গলিত গঙ্গা-বারিবৎ আপনি রাজার প্রতি উচ্ছলিত হইয়া পড়ে। রাজপক্ষের বলে ও প্রজাপক্ষের ভয়ে যে loyalty জন্মে, তাহা রাজবাধ্যতা মাত্র, রাজভক্তি নহে। প্রেমের উক্ত উৎকৃষ্ট উচ্চপাত্রগামী অংশ উপহার পাইতে হইলে, তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লওয়া চাই, তদুপযুক্ত যোগ্যতা ও সাধনা চাই। যুক্তিতেই ভক্তি আসেনা। ভীতির কাছে প্রীতি ঘেঁষে না। ভৌতিক বলে ভৌতিক দেহ বাধ্য হয়; চিন্ময় হৃদয় বাধ্য নয়।

যে সব রাজপুরুষেরা রাজগুণভূষিত, প্রজার খাঁটি রাজভক্তি তাঁহাদের দ্বারাই আস্বাদিত হইতে পারে, কিন্তু যাঁরা অবিচারী—অত্যাচারী, ঈশ্বর-প্রতিনিধিত্ব-রাজশক্তির অপব্যবহারী ও অবমাননাকারী বলিয়া গণ্য হন, তাঁরা ভৌতিক বলে—প্রজার ভয়ের ফলে—রাজবিধি-বাধ্যতা মাত্র আদায় করিতে পারেন। অতএব হিন্দুশাস্ত্রে প্রজার রাজভক্তি যেরূপ উপদিষ্ট, রাজার প্রজারঞ্জনত্বও তদ্বৎ। "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ"। প্রজারঞ্জন হইতেই রাজত্ব। প্রজারঞ্জন ও রাজভক্তি, এ উভয়ে একযোগে কার্য্য করিলেই রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়; অন্যথা অশান্তি অনিবার্য্য। এই কথাটি রাজা ও প্রজা উভয়েরই বর্ত্তমান সময়ে স্মরণ রাখা উচিত।

বর্ত্তমানে ভারতরাজ্যে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, এ কথা রাজপক্ষ বলিতেছেন; ভারতবাসী প্রজাপক্ষও তাহা একভাবে বুঝিতেছেন। কিন্তু সনাতন ঐশবাক্য হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে কার্য্য হইলেই—অর্থাৎ রাজপুরুষগণ প্রজারঞ্জক ও প্রজাগণ রাজভক্ত হইলেই সব অশান্তি অপসারিত হইবে। বল-নীতিতে বাহ্য অশান্তি কতকটা প্রশমিত হইলেও, প্রীতি-নীতি ভিন্ন আভ্যন্তরীণ অশান্তি যাইবার নয়। এ ভারতে যেখানে প্রীতি-নীতির প্রভাব, সেখানেই অশান্তির অভাব।

ঈশ্বরেচ্ছায় আজ ইংরাজ ভারতের রাজা

সুতরাং ইংরাজকে রাজসম্মান দিতে ও ইংরাজের রাজবিধিবাধ্য থাকিতে হিন্দু বাধ্য। আবার সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিতে হয় যে, যদি কোন ইংরাজ রাজপুরুষ প্রজাপীড়ন করেন, তাঁহার স্বকর্ম্মোচিত ফল ঈশ্বর তাঁহাকে দিবেন। অপিচ, ঈশ্বর রাজার প্রতি বিরোধকারী ও ন্যায়-বিধির অতিচারী প্রজাকেও স্বকর্ম্মোচিত ফল (শান্তি ও অশান্তি) অবশ্য দিবেন। 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' হিন্দুশাস্ত্রের এই উক্তি ভারতে চিরপরীক্ষিত ও স্বতঃস্বীকৃত।

এখন কথা এই যে, ভগবদিচ্ছায় ভারতে আজ হিন্দু প্রজা। অতএব হিন্দুর ধর্ম্ম ও শাস্ত্রসঙ্গত যে প্রজানীতি, তদনুসারেই রাজবিধি-বাধ্য থাকিয়া ও রাজশক্তির প্রতি প্রজার ভক্তি বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া, পারমার্থিক আত্মকার্য্যের সহিত দেশের ও দশের কার্য্যে দুর্লভ মনুষ্যজীবন অতিবাহিত করাই হিন্দুর কর্ত্তব্য। স্বদেশী কর, 'স্বদেশী' ধর ; স্বদেশী বস্ত্র পর, স্বদেশী খাদ্য খাও, স্বদেশী বস্তুই চাও ; এমন ব্যবস্থা কর, যাতে যথাসম্ভব সর্ব্বব্যাপারে—সর্ব্বব্যবহারে স্বদেশী বস্তুই পাও। আর রাজপক্ষ হইতেও উহার উপযোগিতা আদানের জন্য, বৈধ, সংযত ও ধর্ম্মানুগতভাবে, প্রয়োজন মত পরামর্শ দান, প্রার্থনা, প্রতিবাদ, ভ্রমসংশোধন, দোষপ্রদর্শন ইত্যাদি দ্বারা রাজার সহায়তালাভ করাও বাঞ্ছনীয়। রাজভক্তিবিরোধ বা রাজতোষামোদ, উভয়ই এ কর্ত্তব্যের বাধক। হিন্দুপ্রজার এ দুই দোষ হইতেই মুক্ত থাকা যুক্তিযুক্ত। মোটকথা, শান্তিই হিন্দুর সেবনীয়। রাজা-প্রজায় সুপ্রীতি-সম্মিলনই হিন্দুর প্রার্থনীয়।

নিন্দ্য রাজতোষামোদ ও অন্ধ প্রজাপক্ষপাতিতা, এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী নির্দ্দোষ ও নিরাপদ ক্ষেত্রই বর্ত্তমান 'স্বদেশী' সাধনে হিন্দুর ভিত্তিভূমি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই বাঞ্ছনীয়ত্বই হিন্দুর শাস্ত্র-মর্ম্মবিহিত—ধর্ম্মসঙ্গত। স্বদেশসেবারূপ পরম ধর্ম্ম বিষয়ে হিন্দু-সেবিত এই নীতিই হিন্দুপত্রিকার অবলম্বিত মূলমন্ত্রনীতি (principle)। এতদনুসারিণী 'স্বদেশী' সাধনাদ্বারা যেরূপ স্বদেশোন্নয়ন বা স্বায়ত্ত-শাসনাদি লাভ সম্ভব, তাহাই সময়োপযোগী ও স্বাভাবিক। তাহাতেই আমাদের দুঃখ যাইবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে।

ভারতভূমি জগতের অন্নদাত্রী হইলেও, তাহার নিজ সন্তান অন্নাভাবে মরে, এই সব দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ভোগ দূরীকরণার্থেই ভগবদিচ্ছায় স্বদেশী আন্দোলন এ দেশে অবতীর্ণ। কিন্তু ইহা এখনও শিশু। শিশুর অনেক বিঘ্ন বাধা, ভয়। ইহার "পেঁচো পাঁচী"র অভাব নাই। তাই অতি সাবধানে ইহাকে পালন করিতে হইবে। শান্তিভঙ্গ, রাজবিধি অবহেলা, ঔদ্ধত্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, বিদ্বেষ, বিরোধিতা প্রভৃতি দুষ্ট ইহার পবিত্র ধর্ম্মামৃত-প্রোথিত কোমল অঙ্গ স্পর্শও না করে। কোন দুর্নীতি, প্রকৃতি-বিকৃতি এবং তজ্জনিত রাজরোষ বা ঈশ্বরের অসন্তোষ যেন ইহার প্রতিকূলে প্রকটিত ও পতিত না হয়।

হিন্দুর ধর্ম্ম প্রেমের মর্ম্ম। কোনরূপ হীনতা, সংকীর্ণতা, উগ্রতা, অশিষ্টতা ইহাতে

স্থান পায় না। যদি তাহার লেশও থাকে, তাহা অনধিকারপ্রবেশ মাত্র। এই জন্য বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে উত্থিত অনেক বাক্যে ধৃষ্টতাও আমরা আদৌ পছন্দ করিনা। যথা সাধ্য 'স্বদেশী'ই ব্যবহার করিতেই হইবে, এই কথা, এই প্রতিজ্ঞা, এই চেষ্টা; ইহার জন্য বিদেশীবর্জ্জন যাহা অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য, তাহাত স্বতঃই হইবে। তজ্জন্য আবার স্বতন্ত্রভাবে এই বিদ্বেষগন্ধী 'বয়কট্' শব্দটার এত ঘন ঘট-টঙ্কারে হিন্দুর চির-প্রতিষ্ঠ উদারশিষ্টতাকে দুষ্ট করা হইবে কেন? শান্ত, সরল, সংযত—অথচ সুতেজ ও সুদক্ষ ভাবে সকল কর্ম্মই সুসাধিত হয়। অতি ব্যগ্রতায় ও উগ্রতায় কার্য্য নষ্টই হয়। ধীরতা ও মৃদুতারই কার্য্যসাধনী শক্তি বেশি। আমাদের শাস্ত্রও বলেন,—

"মৃদুনি দারুণং হন্তি মৃদুনি হন্ত্যদারুণং।
মৃদুনা সাধ্যতে সর্ব্বং তস্মাত্তীব্রতরং মৃদু॥"

মৃদুদ্বারা কঠোর কোমল হয়, আবার অকঠোরও দৃঢ় হয়। মৃদুদ্বারাই সর্ব্ব কার্য্য সাধিত হয়। অতএব মৃদুই তীব্রতর। হিন্দু এই শাস্ত্রোক্ত পরীক্ষাপূত দার্শনিক সত্যনীতি অবলম্বনেই "স্বদেশী" সাধনে সিদ্ধ হইতে পারিবেন।

জগতে হিন্দুর কেহ শত্রু নাই। হিন্দুর উদার আলিঙ্গন বিশ্ববিস্তৃত। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ বা শ্বেত-পীত-কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণভেদ নাই। একদিন যেমন হইয়াছিল, ভগবৎকৃপায় সেইরূপ আবার হিন্দু স্বীয় শাস্ত্রামৃত-ভাণ্ডারের সুরক্ষিত অতুল সনাতন ধর্ম্মের পারমার্থিক সাধনার সহযোগে ঐহিক-পারমার্থিক সর্ব্ববিধ সমুন্নতি সাধন করিয়া, আবার জগতের সমগ্র মানব জাতিকেই বশীকৃত ও শিষ্যীকৃত করিয়া, আবার পূর্ব্ব গৌরবে সুসম্পন্ন ও ধন্য হইবে। যদি ভগবান করেন, তবে হিন্দু শাস্ত্র ধর্ম্ম সেবার অনুকূলেই এই অনিত্য স্বদেশীসেবার পরিণামে সেই নিত্য স্বদেশী-সেবায় সর্ব্বদেশীকেই কৃতার্থ করিবে।

এই জন্যই সাময়িক 'স্বদেশী' আলোচনাকে গৌণ রাখিয়া, হিন্দু-পক্ষে তাহার মূলসিদ্ধির হেতুভূত শাস্ত্র ও ধর্ম্মালোচনাই আমাদের হিন্দু-পত্রিকার মুখ্য সাহিত্যিক লক্ষ্য। এই নববর্ষেও হিন্দু-পত্রিকা ইহার স্বব্রত সেবনে নিরাপদে অগ্রসর হইবে ভরসা করি এবং তৎসিদ্ধি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগচ্চরণে প্রার্থনা করি।

তস্যৈবাহম্—তবৈবাহম্—ত্বমেবাহম্।

উপাসনার তিনটি ভাব আছে, যথা তস্যৈবাহম্, তবৈবাহম্, ত্বমেবাহম্। "আমি তাঁহার"—এস্থলে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ কিছু দূর; ভগবান ভক্তের সম্মুখে নহেন, তিনি দূরে অবস্থান করিতেছেন। ভক্ত কেবল তাঁহার ঐশী সত্তা উপলব্ধি করিয়া বলিতেছে—আমি তাঁহার। উপাসনায়

এই ভাবই প্রথম ভাব। কিন্তু এই ভাব হৃদয়ে না আসিলে, অন্য কোন ভাব আসিবার সম্ভাবনা নাই। "আমি তাঁহার"—অর্থাৎ আহার, বিহার, জাগরণে, স্বপ্নে আমি ভগবানের আজ্ঞানুবর্ত্তী; যাহা ভগবান করাইতেছেন, তাহাই করিতেছি। তিনি হাসান—হাসি, তিনি কাঁদান ত কাঁদি,। নিদ্রা হইতে উঠিলাম, কাহার আদেশে?—ভগবানের আদেশে। দৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, কাহার আদেশে? ভগবানের আদেশে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, হয়, হস্তী, রথ, গৃহ, উদ্যান, সকলই ভগবানের অনুগ্রহে। তিনি এই বিশ্বের ঈশ্বর, এবং আমি তাঁহার। আমি তাঁহার, এবং আমার যাহা কিছু, সকলই তাঁহার। ভগবানে এইরূপ আত্মসমর্পনই ধর্ম্মের প্রথম অবস্থা। এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলে জীব কৃতার্থ হয়। হে মানব, এই অবস্থা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা কর। বিশ্বাসকর, ভগবানই জগতের অধীশ্বর বা মালিক, এবং তুমি তাঁহারই।

উপাসনায় এ ভাবটিই কিন্তু স্থায়ী নহে। উপাস্য-উপাসকের পার্থক্য ক্রমে কমিতে থাকে। 'আমি তাঁহার' শুধু এভাবে মাত্র হৃদয় অধিক দিন সন্তুষ্ট থাকে না। তাঁহাকে সম্মুখে চাই। প্রিয় বস্তু দূরে থাকিলে মন সন্তুষ্ট হয় না। তাঁহাকে নিকটে পাওয়া চাই। 'তবৈবাহম্'—'আমি তোমার'—এস্থলে ভক্ত ভক্তিমার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। প্রিয়তমকে নিকটে পাইয়াছেন। ভক্ত এখন তাই ভগবানকে আর "তিনি" না বলিয়া "তুমি" সম্বোধন করিতেছেন। ভগবানের সহিত ভেদ ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। তিনি অধিকতর নিকটে, অধিকতর প্রিয়, সর্ব্বদা কাছে কাছে; এভাব অতি ঘনিষ্ট ভাব; কিন্তু এভাব অধিকার করা নিতান্ত সহজ নহে। অনেকের মুখে এই ভাবের কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু সে কেবল মুখের কথা। জীবন্ত বিশ্বাস থাকিলেই, জীব ও ভগবানের মধ্যে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা কমিয়া আসে। যখন অস্থি-মজ্জায় "আমি তাঁহার" "আমি তাহার" এই ভাব সঞ্চারিত হয়, যখন প্রতি রোমকূপে "আমি তাঁহার" "আমি তাঁহার" এই ভাবের উপলব্ধি হয়, তখন "আমি তাঁহার" এই ভাব "আমি তোমার" এই ভাবে পরিণত হয়।

"ত্বমেবাহম্," "সোঽহং," "অহং ব্রহ্মাস্মি" 'তৎত্বম্ অসি,' অর্থাৎ—'তুমিই আমি,' 'তিনি আমি,' 'আমি ব্রহ্ম' 'তুমিই তিনি'—বেদের এই সমুদায় 'মহাবাক্য' দ্বারাই তৃতীয় ভাব বর্ণিত হয়। এই ভাবে—যিনি সম্মুখে ছিলেন, তাঁহার সহিত এখন অভেদ-মিলন হইয়াছে; উপাস্য-উপসকে কোন ভেদ নাই; এই হইল ভক্তিমার্গসম্মত অদ্বৈত ভাব। দুয়ে মিলিয়া এক হওয়াই দ্বৈতাদ্বৈত-রহস্য-সমাধান। ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত "মধুর ভাবের" পরম পরিণাম। এই স্থলেই জ্ঞানের সমাপ্তি, ও সাধনের সিদ্ধি হইয়াছে; উপাসক চরম স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছেন।

কৈলাস

এই কি কৈলাসপুরী—
কৈলাস ইহারি নাম ?
এই কি সে শিবালয়—
এই সেই পুণ্যধাম ?
ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠধাম
সোণার কৈলাস এই ?
মহাদেব ভোলানাথ
সহ দুর্গা জ্যোতির্ম্ময়ী,
থাকেন কি এইখানে ?
কিন্তু এ যে স্বর্ণপুরী!
লোকে বলে—সর্ব্বত্যাগী
মহাযোগী ত্রিপুরারি!
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী পুরী
মণিমুক্তা-বিমণ্ডিত ;
উজ্জ্বল কিরণে যার
তিনলোক আলোকিত!
স্ফটিক-নির্ম্মিত শুভ্র
সরোবরে সুনির্ম্মল—
মন্দ গন্ধবহ-ভরে
নাচে জল অবিরল!
সুস্বচ্ছ সলিল মাঝে
ফুটিয়াছে শতদল,
কুমুদ কহ্লার কত ;
আকুল মধুপদল—
গুন্ গুন্ গুন্ স্বরে
করিতেছে মধুপান ;
বসে শ্যামতরু-ডালে
পাখীরা গাইছে গান!
মালতী-মল্লিকা-বেলা!
পুঞ্জ পুঞ্জে হাসি হাসি—
ফুটিয়াছে- ফুটিতেছে
বিতরি সুরভিরাশি।
ঝরেনা একটী ফুল!
সুখময় এ কৈলাস ;
হেতায় বসন্ত ঋতু
বিরাজিত বারমাস!
চন্দ্র সূর্য্য এক সঙ্গে
সদা এ কৈলাসাকাশে—
উদিয়া রয়েছে যেন
শিবপদ-পূজা-আশে!
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর নাচে,
মুনিগণ করে স্তুতি ;
দিগঙ্গনাগণ হাসে,
অপ্সরা গাইছে গীতি!
ত্রিজগতেশ্বর শিব
মহারাজ-রাজেশ্বর!
তবে কেন লোকে বলে—
সর্ব্বত্যাগী মহেশ্বর ?
থাক্ এ ঐশ্বর্য্য-রাশি,
—কোথা সে জগৎ-পিতা ?
কাঞ্চনবরণী দুর্গা—
কই সে ত্রিলোক-মাতা ?
নাই ত এখানে,—তবে
কোথায়—ঈশান কই ?
কোথায় সে মহাশক্তি
ঈশানী করুণাময়ী ?
—বিল্বমূলে ? কই, কোথা ?
বিল্ব-বৃক্ষ কতদূরে ?
—গিরি-শিরে ? কতক্ষণে
হেরিব সে মহেশ্বরে ?

এইত পর্ব্বত চূড়া,
এইত সে বৃক্ষতল;
ঐ ত যোগেশ বসে
ধ্যানযোগে অবিচল!

জগন্মাতা মহাদেবী
ঐ ত বামেতে বসে!
ধবল জলদে যেন
স্থির সৌদামিনী হাসে!

না নড়ে একটী অঙ্গ,
না নড়ে একটী কেশ,
রয়েছেন ধ্যানমগ্ন
মহাযোগী পরমেশ!

গলায় হাড়ের মালা,
পরিধানে বাঘাম্বর,
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-মাখা,
জটাজুট শিরোপর।

জটায় জাহ্নবীমাতা
বহিছেন কলস্বরে;
পাশেতে নগেন্দ্রবালা
গৈরিক—রুদ্রাক্ষ পরে!

সাজিয়া যোগিনী বেশে
মাও আজি কি কারণ
রত্নভূষা দূরে ফেলে
মহাধ্যানে নিমগন?

যথার্থ যোগিনী মাতা,
মহাদেব আশুতোষ,
যথার্থই সর্ব্বত্যাগী;
অল্পতেই পরিতোষ!

ত্যাগের আদর্শ দেব;
মনপ্রাণ তৃপ্ত হল;

মরি মরি কিবা দৃশ্য!
হৃদয় জুড়ায়ে গেল!

আজিকে চরণে তব
হে শিব! প্রণমি আমি!
প্রণমি তোমারে মাতঃ!
কৈলাস! তোমারে নমি।

কি দৃশ্য দেখিনু আজি—
ধন্য মোর এ জীবন!
জুড়া'ল সকল জ্বালা,
জুড়াইল এ নয়ন!

ধন্য বিল্ববৃক্ষতল,
ধন্য হে কৈলাসভূমি!
ধন্য লতা-পাতা তোরা,
ধন্য আমি অভাগিনী!

শিব-দুর্গা একাসনে—
কি দেখিনু মরি মরি!
এসেছি কোথায় আজি—
এই কি কৈলাসপুরী? *

---

* একটি অল্পবয়স্কা—একমাত্র-শিশু-পুত্রশোকাতুরা এবং তজ্জনিত উদাসচিত্ততা-ফলে ধর্ম্মভাব-বিভোরা কোন বন্ধু-কন্যা স্বীয় ভাব-ধ্যান-স্বপ্নে শিবধাম "কৈলাস" দর্শন করিয়া এই কবিতাটি লিখিয়াছেন। আমাদের কাছে একটু মিষ্ট লাগাতে 'হিন্দু-পত্রিকা' পত্র-পৃষ্ঠে ইহা পাঠকগণকেও উপহার দিলাম। অস্মদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার এই অবনত অবস্থায় একটু আস্বাদনযোগ্য নারী-কবিত্বেরও উৎসাহ-প্রদান সাহিত্যসেবার এক অবশ্যকর্ত্তব্যাংশ মনে করি। এই নবীনা নারী-কবির অন্যান্য ধর্ম্মবিষয়িণী মনোনীত রচনাও সময় সময় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

(হিঃ সঃ)

খড়্গবিষাণ সূত্র।

(সূত্রনিপাত।)

সূত্রনিপাত একটি প্রাচীন ও সারবৎ বৌদ্ধ শাস্ত্র। তাহার মধ্যে এই 'খড়্গবিষাণ' সূত্র নিবদ্ধ আছে। অর্থকথাকার বুদ্ধ ঘোষ বলেন—এই সকল গাথার প্রত্যেকটি এক এক জন 'প্রত্যেক বুদ্ধ' কর্তৃক গীত হইয়াছিল। যাহারা নির্ব্বাণ-মার্গের পারগামী, কিন্তু যাহাদের লোকশিক্ষা ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা 'প্রত্যেক বুদ্ধ'।* বৌদ্ধমত অনুসারে 'বুদ্ধ' কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়া থাকেন এবং প্রত্যেক বুদ্ধেরা বৈশ্যকুলেও উৎপন্ন হইতে পারেন। বুদ্ধেরা কেবল (ভারতের) মধ্যদেশেই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। "শাক্যসিংহ জাতিভেদের মাথায় বজ্র প্রহার করিয়া গিয়াছেন" ইত্যাদি মতাবলম্বন করিয়া যাঁহারা উৎফুল্ল হন, তাঁহাদের ইহা চিন্তা করা উচিত। বস্তুতঃ হিন্দু, বৌদ্ধ, সকলেই জাতিভেদকে সনাতন প্রথা বলিয়া মনে করিয়া গিয়াছেন। আগামী বুদ্ধ মৈত্রেয় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইবেন, ইহা বৌদ্ধ শাস্ত্রের স্পষ্ট মত।

তবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময় জাতিভেদের বর্ত্তমানের ন্যায় সংকীর্ণ অস্বাভাবিক অবস্থা ছিল না। তখন (এবং এখনও) সকল বর্ণের নির্ব্বাণ-মার্গে গমন করায় অধিকার আর্য্য মত ও বৌদ্ধমত উভয়েই ছিল, তাহা অনেকের ধারণায় আসে না। শূদ্র জাতির প্রতি বিদ্বেষমূলক ব্যবস্থা প্রায়ই অপ্রাচীন কালে উদ্ভাবিত হয়, কিন্তু "বেদ শুনিলে কর্ণে সীসক ঢালিয়া দিবে" ইত্যাদি বিধি যে কোনও কালে কার্য্যতঃ অনুসৃত হইত, তাহার প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ তাহার বিপরীতই হইত, তাহা মহাভারতাদির বিধি হইতে জানা যায়।

যাহা হউক, এই খড়্গবিষাণ সূত্রে যে নির্ব্বাণ-নীতি আছে, তাহা এবং ইহার ভাষা—ইহার প্রাচীনতা ও বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে। ঐ সমস্ত নীতির প্রকৃত তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। উহা বৌদ্ধের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। ইহাতে সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া সার্ব্বাগ্রে নির্ব্বাণ-সাধন করিবার বিধি আছে। লোকসংগ্রহে ব্যাপৃত পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা চিন্তা করিতেন না যে, সিদ্ধার্থের ন্যায় উত্তমাধিকারীকেও ছয় বৎসর সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কঠোর সাধন করিতে হইয়াছিল। সূত্রনিপাতের "পধান সুত্তে" আছে—

লোহিতে সুস্সমানে পিত্তং সেম্হং
সুস্সতি।*
মংসেসু খীযমানেসু ভিয্যো চিত্তং পসীদতি।
ভিয্যো সতি চ পঞ্ঞা চ সমাধি চ তিট্ঠতি॥

অর্থাৎ বীর্য্য সহকারে সাধন করিতে করিতে রক্ত, পিত্ত, শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে, তবে চিত্ত প্রসন্ন (নির্ম্মল) হয় ও স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও সমাধি উপস্থিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা লোকসংগ্রহের দিকেই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া বড় বড়

---

* বুদ্ধা সযং বুজ্ঝিত্বা পরে চ বোধেন্তি পচ্চেক বুদ্ধা সযং বুজ্ঝিত্বা ন পরে বোধেন্তি। সুত্তনিপাত অট্ঠকথা।

বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন এবং কথায় উচ্চ উচ্চ উপদেশ দিতেন; কিন্তু কার্য্যে বড় কিছু করিতেন না। বৌদ্ধধর্ম্মের নেতারা সমাধিসিদ্ধ হইতেন না। College এর Principal হইতেন। নাগার্জ্জুন প্রভৃতি তাদৃশই ছিলেন।

অর্থকথাচার্য্য অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষের পদ অনেকাংশে আমাদের শঙ্করাচার্য্যের ন্যায়। তাঁহার ব্যাখ্যা হইতেই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত বৌদ্ধশাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে। মেধা, ব্যাখ্যা—কুশলতা প্রভৃতিতে বুদ্ধঘোষ শঙ্করাপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন। কিন্তু তাঁহার লেখা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি প্রচলিত কুসংস্কার-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া নির্ব্বাণধর্ম্মের অনেক তত্ত্বকথা ধরিতে পারেন নাই। সেই সব কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া ভারত হইতে অপসৃত হয়।

বুদ্ধঘোষের গ্রন্থসমূহ পাঠে ভারতের তৎকালীন অবস্থা এবং বৌদ্ধ সমাজের দোষ-গুণ সকল উত্তমরূপে জানা যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণ্যে প্রধানতঃ 'বত্থু' (ধর্ম্মপদের ব্যাখ্যায় প্রায় ৩০০ বত্থু আছে) বা গল্পের দ্বারা প্রচারিত হইত। সুশীলতা, সাধুতা প্রভৃতি সদ্গুণে ঐ সকল 'বত্থু' জগতে শ্রেষ্ঠ। আরব্য উপন্যাস * এবং আমাদের প্রচলিত সমস্ত গল্পের মূলস্বরূপ ঐ সকল 'বত্থুতে' পাওয়া যায়। বত্থু সকলের নীতি উত্তম হইলেও, উহারা দার্শনিক গাম্ভীর্য্যশূন্য এবং সম্প্রদায়ান্ধতা ও কুসংস্কার-দোষ-দুষ্ট।

যেমন ব্রাহ্মণ-নির্ম্মিত শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ-ভোজন ও ব্রাহ্মণকে দান করা মহাফল, বৌদ্ধ ভিক্ষু-কৃত গল্পেও ভিক্ষুভোজন ও ভিক্ষুকে দান করার প্রাধান্য দেখান উদ্দেশ্য। এমন কি, ঐ প্রকার দানের ফলে ইহ-জন্মে অনেকে বীর্য্যাদি সাধন ব্যতিরেকেও একবারে আর্হত্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া অনেক স্থলে উদাহৃত হইয়াছে।

কেহ শুইয়া শুইয়া, কেহ মাথা মুণ্ডন করিতে করিতে, কেহ এক কথা শুনিয়া, কেহবা একটী লক্ষণ দেখিয়া একবারে আর্হত্য লাভ ও তৎসহ ভূ-আকাশ মার্গে গমনাদি সিদ্ধি লাভ করিলেন, ইহা বত্থু-সমূহে বহু বহু স্থলে বিবৃত হইয়াছে। কঠোর সাধন-সাধ্য নির্ব্বাণ ধর্ম্ম ঐরূপ অনুপযুক্ত হেতুসম্ভূত বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে, নির্ব্বাণধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত ও বৌদ্ধগণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া হীন চারিত্র্য প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধের অধঃপতনের ইহা মুখ্য হেতু।

বুদ্ধঘোষ অনেক প্রাচীন অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন অর্হতের উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন; তিনি মনে করিতেন, প্রাচীন কালে জ্যৈষ্ঠ মাসে পক্কাম্রের ন্যায় অর্হৎ সুলভ ছিল; কিন্তু তাঁহার গ্রন্থসমূহে কোন সমসাময়িক অর্হতের উদাহরণ দেখি নাই। বৌদ্ধ গল্পানুসারে হিমালয়ে যুগন্ধর পর্ব্বতে নন্দি-মূল গুহা অর্হৎদের জমাতের স্থান। ঐ গুহার সম্মুখে ৭০ যোজন বিস্তীর্ণ মনঃ-শিলাময় চত্বর আছে। তথায় কোটি কোটি

* আরব্য উপন্যাসের বকপক্ষী বৌদ্ধদের হস্তিলিঙ্গ। তিন ফকিরের গল্প বৌদ্ধের লোমকজাতক।

অর্হতের সন্নিপাত হয়। সাধারণ বিহারের ন্যায় তথায়ও প্রত্যেক বুদ্ধেরা কেহ চীবর সেলাই করিতেছেন, কেহ চীবরে রং লাগাইতেছেন, ইত্যাদিরূপ চিত্র পাওয়া যায়। কোন কোন অর্হৎ সমাপত্তি (সপ্তাহ বা তদধিক কালব্যাপী নিরোধ ধ্যান) হইতে উঠিয়া নরলোকে কাহার বাড়ী ভিক্ষা লইয়া দাতাকে কৃতার্থ করিবেন, তাহা দেখিতেছেন। সমাপত্তি হইতে উত্থিত অর্হৎকে ভিক্ষা দিলে, সেই দিনই দাতার সম্পদ্ লাভ হয়, ইহা বৌদ্ধদের বিশ্বাস। বহু বহু বস্তুতে এবম্প্রকার গল্প আছে।

খড়্গবিষাণসুত্রেরও প্রত্যেক গাথায় ঐরূপ বস্তু আছে। বস্তুসমূহের সবই বারাণসীরাজ (একাধিক) ব্রহ্মদত্তকে অবলম্বন করিয়া রচিত। উহারা অবশ্য বহু পরে রচিত এবং কিছু স্থূল গোছের। অনেক স্থলে ঐ সকল বস্তুর সহিত মিলাইতে যাইয়া বুদ্ধঘোষকে কষ্টকল্পনা করিতে হইয়াছে ও স্পষ্টার্থ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য আমরা সর্ব্বস্থলে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারি নাই। মূলের পদাবলী বিপর্য্যস্ত হইবে বলিয়া সংস্কৃতানুবাদে ছন্দ রক্ষা করা হয় নাই।

সব্বেসু ভূতেসু নিধায় দণ্ডং অবিহেঠয়ং অঞ্ঞতরম্পি তেসং।
ন পুত্তমিচ্ছেয্য কুতো সহায়ং একো চরে খগ্গবিসাণকপ্পো॥১

সর্ব্বেষু ভূতেষু নিধায় দণ্ডং অবিহেঠয়ন্ অন্যতরমপি তেষাং।
ন পুত্রমিচ্ছেৎ কুতঃ সহায়ং একশ্চরেৎ খড়্গবিষাণকল্পঃ॥

১। সমস্ত প্রাণীর প্রতি দণ্ডদান ত্যাগ করিয়া তাহাদের একটি মাত্রকেও পীড়া দিবে না। আত্মজ শিষ্যাদি এবং সহায়ও প্রার্থনা করিবেনা। পরন্তু খড়্গবিষাণের ন্যায় (গণ্ডারের ন্যায়) একাকী বিচরণ করিবে।

সংসগ্গজাতস্স ভবন্তি স্নেহা স্নেহান্বয়ং দুক্খমিদং পহোতি।
আদীনবং স্নেহজাং পেক্খমানো একোচরে খগ্গবিসাণকপ্পো॥২

জাতসংসর্গস্য ভবন্তি স্নেহাঃ স্নেহান্বয়ং দুঃখমিদং প্রভবতি।
আদীনবং স্নেহজং পশ্যমানঃ একশ্চরেৎ খড়্গবিষাণকল্পঃ॥

২। সংসর্গ হইতে স্নেহ উৎপন্ন হয়, দুঃখ সমূহ স্নেহকে অনুসরণ করিয়া উৎপন্ন হয়। স্নেহতে এই দোষ দেখিয়া খড়্গবিষাণের (গণ্ডারের) ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো হাপেতি অত্থং পটিবদ্ধচিত্তো।
এতং ভয়ং সন্থবে পেক্খমানো একোচরে**॥৩

মিত্রে সুহৃদি অনুকম্পমানঃ জহাতি অর্থং প্রতিবদ্ধচিত্তঃ।
এতং ভয়ং সংস্তবে পশ্যমানঃ একশ্চরেৎ* *॥

৩। মিত্র সুহৃদের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ তাহাতে সংলগ্নচিত্ত হইয়া লোকে পরমার্থ হারায়। সংস্তব বা ঘনিষ্টতায় এই ভয় দেখিয়া খড়্গবিষাণের—। **

বংসো বিসালোব যথা বিসত্তো পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্খা।
বংসকলীরোব অসজ্জমানো একো—॥৪

বংশো বিশালো যথা বিসত্তো পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্খা।

বংশকরীর ইব অসজ্জন্ একঃ—॥

৪। বিশাল বাঁশঝাড়ে বংশ সকল যেমন পরস্পর (ডাল পালা দ্বারা) সংযুক্ত হইয়া থাকে, পুত্র দারাতে আসক্তি ও সেইরূপ। বংশাঙ্কুর যেমন কাহারও সহিত সংসক্ত হয় না সেইরূপ খড়্গ—।

মিগো অরঞ্ঞে যথাপি বদ্ধো যেনিচ্ছকং গচ্ছতি গোচরায়।

বিঞ্ঞূ নরো সেরিতং পেক্খমানো একো—॥৫

মৃগঃ অরণ্যে যথা অবদ্ধো যেনেষ্টং গচ্ছতি গোচরায়।

বিজ্ঞঃ পরঃ স্বৈরিতাং পশ্যমানঃ একঃ—॥

৫। অরণ্যে অবদ্ধ মৃগ যেমন যথেচ্ছ-স্থানে চরিতে যায় সেইরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্য উত্তম রূপে বুঝিয়া খড়্গ—।

আমন্তনা হোতি সহায় মজ্ঝে বাসে ঠানে গমনে চারিকায়।

অনভিজ্ঝিতং সেরিতং পেক্খমানো একো—॥৬

আমন্ত্রণা ভবতি সহায়মধ্যে বাসে স্থানে গমনে চারিকায়াং।

অনভিধ্যাতং স্বৈরিতাং পশ্যমানঃ একঃ—।

৬। সঙ্গীদের মধ্যে থাকিলে বাসে (থাকিবার স্থানে), স্থানে (ধর্ম্ম সভাদিতে), গমন করিতে করিতে ও দেশ ভ্রমণে আমন্ত্রণা (পরস্পরের মধ্যে বৃথা আলাপ ও বার্থ কার্য্যে প্রবর্ত্তনা) হয়। অতএব (সাধারণের) অনভিধ্যাত বা অপ্রার্থিত যে স্বাতন্ত্র্য-সুখ তাহা বুঝিয়া খড়্গ—।

খিড্ডা রতি হোতি সহায়মজ্ঝে পুত্তেসু চ বিপুলং হোতি পেমং।

পিয়বিপ্পযোগং বিজিগুচ্ছমানো একো—॥৭

ক্রীড়া রতিঃ ভবতি সহায়মধ্যে পুত্রেষু চ বিপুলং ভবতি প্রেম।

প্রিয়বিপ্রযোগং বিজিগুপ্সমানঃ একঃ—।

৭। বান্ধবদের মধ্যে থাকিলে ক্রীড়া রাগ এবং পুত্র শিষ্যাদিতে বিপুল প্রেম উৎপন্ন হয়। (আর তৎফলীভূত অবশ্যম্ভাবী) প্রিয়বিপ্রয়োগের দুঃখদায়কতা বুঝিয়া খড়্গ—।

চাতুদ্দিসো অপ্পটিঘো চ হোতি সন্তুস্সমানো ইতরীতরেন।

পরিস্সযানং সহিতা অছম্ভী একো—৮॥

চাতুর্দ্দিশঃ অপ্রতিঘো ভবতি সন্তোষশীলঃ ইতরেতরেণ।

পরিশ্রয়ানাং সহনাদকম্পী একঃ—॥

চাতুর্দ্দিশ (চারিদিকে সুখবিহারী বা সর্ব্বদিকে মৈত্র্যাদি ভাবনাশীল) পুরুষের সর্ব্বদিক্ অপ্রতিঘ (নির্ভয়ত্ব হেতু অবাধ) হয়। যথা লাভে সন্তুষ্ট, রাগাদি পরিশ্রয়ের (শ্বাপদের) সহনহেতু (অভিভবহেতু) অকম্পী (ভয়াদিজনিত চাঞ্চল্যরহিত) খড়্গ—।

দুস্সঙ্গহা পব্বজিতাপি একে অথো গহট্ঠা ঘরমাবসন্তা।

অপ্পোস্সুক্কো পরপুত্তেসু হুত্বা একো—॥৯

দুঃসংগ্রহাঃ প্রব্রাজিতা অপ্যেকে অথো গৃহস্থা গৃহমাবসন্তঃ।

অল্পোৎসুকঃ পরপুত্রেষু ভূত্বা একঃ—॥

৯। প্রব্রাজিতগণের কেহ কেহ দুঃসঙ্গ্রহ (অসন্তোষ যুক্ত বা ক্রোধ), গৃহবাসী গৃহস্থেরা ও তথাবিধ। পরপুত্র সকলে (শিষ্যাদিতে) অল্পোৎসুক (বিরক্ত) হইয়া খড়্গ—।

ওরোপয়িত্বা গিহিব্যঞ্জনানি সংসীন পত্তো, যথা কোবিল্হারো।
ছেত্বান বীরো গিহিবন্ধনানি একো—॥
অবরোপয়িত্বা গৃহিব্যঞ্জনানি সংশীর্ণপত্রো যথা কোবিদারঃ।
ছিত্বা বীরো গৃহিবন্ধনানি একঃ—॥

১০। গলিত পত্র কোবিদারের (রক্ত-কাঞ্চন) ন্যায় গৃহীর লক্ষণ সকল অপসারিত করিবে। গৃহীর বন্ধন সকল ছেদন করিয়া খড়্গ—।

সচে লভেথ নিপকং সহায়ং সদ্ধিং চরং সাধু-বিহারি ধীরং।
অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সয়ানি চরেথ তেনত্ত-মনো সতিমা—॥১১
নোচে লভেথ নিপকং সহায়ং সদ্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং।
রাজাব রট্ঠং বিজিতং পহায় একো চরে—॥১২
চেল্লভেত নিপকং স সহায়কং সাধু বিহারি ধীরং সমং চরন্।
তেনাভিভূয় বৈ সর্ব্বান্ পরিশ্রয়ান্ চরেদাত্তমনা হি স্মৃতিমান্—॥
নো লভেত নিপকং সহচরং সহায়ং চেত্ সাধু বিহারি ধীরং—।
রাজেব প্রহায় বিজিত রাষ্ট্রং একশ্চরেৎ খড়্গ-বিষাণকল্পঃ—॥

১১। ১২। প্রজ্ঞাসম্পন্ন সাধুচর্য্যাশীল সহায় লাভ করিলে তাহার সহিত বিচরণ করিয়া সমস্ত পরিশ্রয় বা রাগ দ্বেষাদি অভিভূত করিয়া স্মৃতিমান্ ও তুষ্টমনা হইবে। আর তাদৃশ সহচারী সহায় না পাইলে রাজা যেমন বিজিত রাজ্য ত্যাগ করেন সেইরূপ খড়্গ বিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।

অদ্ধাপস সাম্ সহায়সম্পদং সেট্ঠা সমা সেবিতব্বা সহায়া।
এতে অলদ্ধা অনবজ্জভোজী একো—॥১৩
অদ্ধা প্রশংসামঃ সহায় সম্পদং শ্রেষ্ঠাঃ সমাঃ সেবিতব্যাঃ সহায়াঃ।
এতান্ অলব্ধা অনবদ্যভোজী একঃ—।

১৩। সম্যক্শীল সম্পন্ন সহায়কে (সঙ্গীকে) খুব প্রশংসা করি। আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বা সমতুল্য সঙ্গীর সঙ্গ করা উচিত। তাহা না পাইলে অনবদ্যভোজী (সুন্দর অসুন্দর আহারে নির্ব্বিকার) হইয়া খড়্গ—।

দিস্বা সুবণ্ণস্স পভস্সরানি কম্মার পুত্তেন সুনিট্ঠিতানি।
সঙ্ঘট্টমানানি দুবে ভুজস্মিং একো—॥ ৪
দৃষ্ট্বা সুবর্ণস্য প্রভাস্বরানি কর্ম্মার পুত্রেন সুনিষ্ঠিতানি।
সঙ্ঘট্টমানানি দুবে ভুজস্মিং কো—॥

১৪। সুবর্ণ নির্ম্মিত প্রভাস্বর বলয় সকল যাহা কর্ম্মার পুত্রের দ্বারা সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাদিগকে হস্তদ্বয়ে সঙ্ঘট্টন করিতে দেখিয়া—*

* এই গাথার নাম সুবর্ণ-বলয় গাথা। ইহার বস্তু বা গল্প এইরূপ—কোন বারাণসী-রাজ গ্রীষ্ম কালে দিবা শয়ন করিয়াছিলেন, নিকটে এক দাসী চন্দন ঘর্ষণ করিতেছিল তাহার এক বাহুতে এক অপর দুই সুবর্ণ-বলয় ছিল। যে বাহুতে দুই বলয় ছিল তাহাদের পরস্পর সঙ্ঘট্টন দেখিয়া রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "গণবাসে ঘট্টনা এক বাসে অঘট্টনা"। এক সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা দেবী রাজাকে বীজন করিতেছিলেন। তিনি রাজাকে দাসীতে প্রতিবদ্ধচিত্ত দেখিয়া রাণীকে উঠাইয়া বদ্ধ চন্দন

এবং দুতিয়েন সহাম্মস্স বাচাভিলাপো অভিসজ্জনাবা।
এতং ভয়ং আয়তিং পেক্খমানো একো—১৫
এবং দ্বিতীয়েন সহ মমাস্ত বাচাভিলাপো-হ্‌ভিসঙ্গো বা।
ব্রতং ভয়ং আয়তিকং পশ্যমানঃ একঃ—॥

১৫। দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করিলে আমার বাক্যালাপ ও অভিসঙ্গ (স্নেহঘনিষ্ঠতা) হইবে এই ভাবী ভয় দেখিয়া খড়্গা—।

কামাহি চিত্রা মধুরা মনোরমা বিরূপরূপেন মথেন্তি চিত্তং।
আদীনবং কামগুণেসু দিস্বা একো ॥ ৬
কামাহি চিত্রা মধুরা মনোরমা বিরূপরূপেন মথয়ন্তি চিত্তং।
আদীনবং কামগুণেষু দৃষ্ট্বা একশ্চরেৎ—॥

১৬। কাম্য বিষয় চিত্র (নানা প্রকার) মধুর (সাধারণের পক্ষে) ও মনোরম, অনেক রূপে তাহারা চিত্তকে মথন করে। কামগুণে এই দোষ দেখিয়া খড়্গা—।

ঈতি চ গণ্ডো চ উপদ্দবো চ রোগো চ সল্লঞ্চ ভয়ঞ্চমেতং।
এতং ভয়ং কামগুণেসু দিস্বা একো চরে—॥ ৭
ঈতিশ্চ গণ্ডশ্চ উপদ্রবশ্চ রোগশ্চ শল্যঞ্চ ভয়শ্চ মে এতৎ।
এতং ভয়ং কামগুণেষু দৃষ্ট্বা একশ্চরেৎ—॥

১৭। ঈতি (আগন্তুক বিঘ্ন), গণ্ড (অন্তরায়), উপদ্রব, রোগ, শল্য † ও ভয়—এই সকল কামগুণের দোষ দেখিয়া খড়্গা—।

সীতঞ্চ উণ্হঞ্চ খুদং পিপাসং বাতাতপে ডংসসিরিংসপে চ।
সব্বানি পেতানি অভিসংভবিত্বা একো-চরে—॥ ৮
শীতঞ্চ উষ্ণঞ্চ ক্ষুধং পিপাসাং বাতাতপৌ দংশসরীসৃপান্ চ।
সর্ব্বাণ্যপ্যেতানি অভিসম্ভূয় চ একশ্চরেৎ—॥

১৮। শীত ও উষ্ণ, ক্ষুধা ও পিপাসা, বাত ও আতপ, দংশ ও সরীসৃপ এই সকল অভিভব করিয়া খড়্গা—।

নাগো ব যূথানি বিবজ্জয়িত্বা সঞ্জাতখন্ধো পদুমী উলারো।
যথাভিরন্তং বিহরে অরঞ্ঞে একোচরে—॥ ৯
নাগ ইব যূথানি বর্জ্জয়িত্বা সঞ্জাতস্কন্ধঃ পদ্মী উদারঃ।
যথাভিরন্তং বিহরেৎ অরণ্যে একশ্চরেৎ—॥

ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন তাঁহার বহু অলঙ্কারের ঘট্টনা দেখিয়া রাজা আরও উত্তম রূপে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ান হইয়াই বিপশ্যনা প্রজ্ঞা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। তিনিই এই গাথা বলিয়াছিলেন।

যাহা দীর্ঘকাল নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা লাভ করাও দুষ্কর তাদৃশ বিষয় এইরূপ অসঙ্গত উপায়ে হঠাৎ লাভ হয়, এই ভ্রান্তি বৌদ্ধমতে প্রবেশ করিয়া লোকদের নিরুদ্যমও মূঢ় করিয়াছিল। লৌহের অনুরূপ কিন্তু তালপত্র নির্ম্মিত অসি দিয়া যুদ্ধ করিতে যাইলে যেরূপ ফল হয় ইহাও তদ্রূপ।

সাংখ্যের কুমারী কঙ্কনের ন্যায় হইতে এই সুবর্ণ বলয় গাথার ভাব গৃহীত হইয়াছে। পালিতে 'দুবে' শব্দ বলয়ের বিশেষণ হইবে।

† গণ্ড ও শল্য। বুদ্ধঘোষ বলেন গণ্ড বা ফোঁড়া যেমন অশুচি পূয়াদিস্রাবে দুঃখ দেয় এবং শল্য বিদ্ধ হইয়া অন্তরে দুঃখ দেয় ও তাহা যেমন দুনির্হার্য্য কামগুণও সেইরূপ।

১৯। যেমন সঞ্জাত স্কন্ধ (বিপুলাবয়ব), পদ্মী (পদ্মবংশীয়), উদার (মহান্), নাগ যূথ ত্যাগ করিয়া যথাকাম অরণ্যে বিহার করে, সেইরূপ খড়্গা—।

অট্‌ঠান তং সঙ্গণিকা রতস্‌স যং ফস্‌সয়ে সাময়িকং বিমুত্তিং।
আদিচ্চ বন্ধুস্‌স বচো নিসম্ম একোচরে—॥২০
অস্থানং তৎ সঙ্গণিকা রতস্য যৎ স্পর্শয়েৎ সাময়িকাং বিমুক্তিং।
আদিত্যবন্ধো র্বচো নিশম্য একশ্চরেৎ—॥

২০। সঙ্গরত ব্যক্তির যেরূপ কোন কারণ হয় না, যে কারণে সে সাময়িক বিমুক্তি (বুদ্ধ ঘোষের মতে লোকীয় সমাপত্তি) অধিগত হইতে পারে। আদিত্য-বন্ধুর (বুদ্ধের) বচন মনন করিয়া খড়্গা—।

দিট্‌ঠি বিসুকানি উপাতিবত্তো পত্তো নিয়ামং পটিলদ্ধ মগ্‌গো।
উপ্পন্নঞাণোম্‌হি অনঞ্ঞনেয়্যো একোচরে—॥২১
দৃষ্টিবিরুদ্ধানি উপাতিবৃত্তঃ প্রাপ্তো নিয়ামং প্রতিলব্ধমার্গঃ।
উৎপন্নজ্ঞানোঽস্মি অনন্যজ্ঞেয়ঃ একশ্চরেৎ—॥

২১। মিথ্যা দৃষ্টিরূপ বিরুদ্ধভাব আমি প্রজ্ঞার দ্বারা অতিক্রমণ করিয়াছি, নিয়াম (সম্বোধ্যঙ্গ আচরণে নিয়ত ভাব) প্রাপ্ত হইয়াছি, মার্গ লাভ করিয়াছি, উৎপন্ন জ্ঞান এবং অনন্যজ্ঞেয় বা পণ্ডিতবেদনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছি এইরূপ ভাব অধিগত করিয়া খড়্গা—।

নিল্লোলুপো নিক্কুহো নিপ্পিপাসো নিম্মক্‌খো নিদ্ধন্ত কসাবমোহো।
নিরাসো সব্বলোকে ভবিত্বা একোচরে—॥২২
নির্লোলুপঃ নিষ্কুহনঃ নিষ্পিপাসঃ নির্ম্রক্ষঃ নিষ্ক্রান্তঃ কষায়মোহঃ।
নিরাশঃ সর্ব্বলোকান্ অভিভূয় একশ্চরেৎ—॥

২২। নির্লোলুপ, নিষ্কুহন (দম্ভশূন্য) অপিপাস, নির্ম্রক্ষ (ম্রক্ষ—পরগুণবিনাশ), কষায় (রাগ) ও মোহের অতীত ও নিরাশ—এবম্বিধ ভিক্ষু সর্ব্বলোক অভিভূত করিয়া খড়্গা—।

পাপং সহায়ং পরিবজ্জয়েথ অনত্থদস্‌সিং বিসমে নিবিট্‌ঠং।
সয়ং ন সেবে পসুতং পমত্তং একোচরে—॥২৩
পাপং সহায়ং পরিবর্জ্জয়েত অনর্থদর্শিনং বিষমে নিবিষ্টং।
স্বয়ং ন সেবেত প্রসক্তং প্রমত্তং একশ্চরেৎ—॥

২৩। অনর্থদর্শী, বিষমে (অসাধুতায়) নিবিষ্ট, পাপ, সঙ্গীকে পরিবর্জ্জন করিবে। স্বয়ং (স্বেচ্ছায়) প্রসক্ত (রাগী) ও প্রমত্ত ব্যক্তির সেবা করিবে না। খড়্গা—।

বহুস্সুতং ধম্মধরং ভজেথ মিত্তং উলারং পটিভানবন্তং।
অঞ্ঞায় অত্থানি বিনেয্য কঙ্খং একোচরে—॥২৪
বহুশ্রুতং ধর্ম্মধরং ভজেত মিত্রং উদারং প্রতিভানবন্তম্।
আজ্ঞায় অর্থান্ বিনীয় কাঙ্ক্ষাং একশ্চরেৎ—॥

২৪। বহুশ্রুত, ধর্ম্মধর, উদার, প্রতিভাণযুক্ত (শাস্ত্র, শাস্ত্রার্থ ও নির্ব্বাণ মার্গের বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন) মিত্রকে ভজনা করিবে। অর্থ সমূহ বিজ্ঞাত হইয়া ও আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া খড়্গা—।

খিড্ডং রতিং কামসুখঞ্চ লোকে অনলংকরিত্বা অনপেক্খমানো।

বিভূসনট্ঠানা বিরতো সচ্চবাদী একো-
চরে—॥২৫

ক্রীড়াং রতিং কামসুখঞ্চ লোকে অনলং-
করিত্বা অপশ্যমানঃ।
বিভূষণস্থানাৎ বিরতঃ সত্যবাদী একশ্চরেৎ—

২৫। ক্রীড়া, রতি ও কামসুখকে অলং
বা নিঃসার রূপে জানিয়া তাহা অদর্শন
পূর্বক ও বিভূষণ স্থান হইতে বিরত হইয়া
খড়্গা—।

পুত্তঞ্চ দারং পিতরঞ্চ মাতরং ধনানি ধঞ্ঞা-
ঞ্ঞানি চ বন্ধনানি।
হিত্বান কামানি যথোধিকানি একো-
চরে—॥২৬

পুত্রঞ্চ দারান্ পিতরঞ্চ মাতরং ধনানি ধান্যানি
চ বান্ধবানি।
ভিত্ত্বা কামান্ যথাবধিকান্ একশ্চরেৎ—॥

২৬। পুত্র, দারা, পিতা, মাতা, ধন
ধান্য এই সব বন্ধন এবং অবধি পর্য্যন্ত
সমস্ত কামকে ভেদ করিয়া খড়্গা—।

সঙ্গো এসো পরিত্তমেত্থ সোখ্যং অপ্পস্সাদো
দুক্খ মেত্থ ভিয্যো।
গলহো এসো ইতি ঞত্বা মুতিমা একো-
চরে—॥২৭

সঙ্গ এব পরিচ্ছিন্নমত্র সৌখ্যং অল্পস্বাদঃ দুঃখ-
মত্র ভূয়ঃ।
গড়ু এব ইতি জ্ঞাত্বা মতিমান্ একশ্চরেৎ—॥

২৭। ইহলোকে সঙ্গ, অল্পস্বাদ, সুখ
পরিচ্ছিন্ন, দুঃখ অধিক ঐ সমস্তকে মতিমান্
নিগড় রূপে জানিয়া খড়্গা—।

সন্দালয়িত্বান সংযোজনানি জালং ভেত্বা
সলিলম্বুচারী।
অগ্গীব দড্ঢং অনিবত্তমানো একোচরে—॥২৮

সন্দীর্য্য সংযোজনানি জালং ভিত্ত্বা সলিল
ইবাম্বুচারী।
অগ্নিরিব দগ্ধং অনিবর্ত্তমানঃ একশ্চরেৎ—।

২৮। সংযোজন বা বন্ধন সকল বিদা-
রণ করিয়া সলিলে মৎসের ন্যায় জালভেদ
করিয়া, দগ্ধ বস্তুতে অগ্নি যেরূপ প্রত্যা-
বর্ত্তন করেন, সেইরূপ (ত্যক্ত বিষয়ে সম্যক্
নিস্পৃহ হইয়া, খড়্গা—।

ওক্খিত্তচক্খু ন চ পাদলোলো গুত্তিন্দ্রিয়ো
রক্খিতমানসানো।
অনবস্সুতো অপরিডয্হমানো একো-
চরে—॥২৯

অবক্ষিপ্তচক্ষুর্ন চ পাদলোলঃ গুপ্তেন্দ্রিয়ঃ
রক্ষিতমানসঃ।
অনস্রাস্রুতঃ অপরিদহ্যমানঃ একশ্চরেৎ—॥

২৯। অবক্ষিপ্ত চক্ষু (ভিক্ষুদের ভূমিতে
দৃষ্টি রাখিয়া গমন করা বিধি), পাদলোল
(অযুক্ত ভ্রমণশীল) না হইয়া, গুপ্তেন্দ্রিয়,
দান্তমানস, অস্রাস্রবশূন্য (বিষয় প্রবৃত্তি
রহিত) কামপরিদাহাদিশূন্য খড়্গা—।

ওহারয়িত্বা গিহি ব্যঞ্জনানি সঞ্ছন্নপত্তো যথা
পারিচ্ছত্তো।
কাসায়বত্থো অভিনিক্খমিত্বা একোচরে—॥৩০

অবহৃত্য গৃহিব্যঞ্জনানি সংছন্ন (সংশীর্ণ)
পত্র যথা পরিছত্রঃ।
কাষায় বস্ত্রঃ অভিনিক্রম্য চ একশ্চরেৎ—॥

৩০। পলিত পত্র ‡ পারিজাতের (পালতে
মাদার) ন্যায় গৃহীর লক্ষণ সকল ত্যাগ

‡ বুদ্ধঘোষ 'সংছন্ন পত্র' পাঠ গ্রহণ
করিয়া কষ্ট কল্পনার দ্বারা অর্থসঙ্গতি করিয়া-
ছেন। ১০ম গাথায় "সংশীর্ণ পত্র" শব্দ
ঠিক এখানে খাটে।

করিয়া কষায়বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া খড়্গা—।

রসেসু গেধং অকরং অলোলো অনঞ্ঞপোসী সপদানচারী।
কুলে কুলে অপ্পটিবদ্ধচিত্তো একোচরে—॥৩১

রসেষু গৃধ্নুত্বমকুর্ব্বন্ অলোলঃ অনন্যপোষী অনুপূর্ব্বচারী।
কুলে কুলে অপ্রতিবদ্ধচিত্ত একশ্চরেৎ—॥

৩১। মধুরাদি রসে গৃধ্নুতা ত্যাগ করিয়া এবং অলোল (রসরাগ শূন্য) অনন্যপোষী (পোষ্য বিরহিত) অনুপূর্ব্বচারী (যে গৃহে সৎকার প্রাপ্তি হয় আর যথায় তাহা হয় না তাহার ভেদ না করিয়া সর্ব্বত্র সমভাগে ভিক্ষার্থ গমনকারী) অপরিচিত ও পরিচিত সর্ব্বকুলে অলগ্নচিত্ত হইয়া খড়্গা—

পহায় পঞ্চাবরণানি চেতসো উপক্কিলেসে ব্যপনুজ্জ সব্বে।
অনিস্সিতো ছেত্বা স্নেহদোসং একোচরে—॥৩২

পহায় পঞ্চাবরণানি চেতসঃ উপক্লেশান্ ব্যপনুদ্য সর্ব্বান্।
অনিঃশ্রিতঃ ছিত্বা স্নেহদোষং একশ্চরেৎ—॥

৩২। পঞ্চ চিত্তাবরণ (আবরণ বা নীবরণ—কাম, ছন্দ, স্ত্যান মিদ্ধ ইত্যাদি) ত্যাগ করিয়া উপক্লেশ (চিত্তের লোভাদি মালিন্য) সকল অপনোদন করিয়া অনিঃশ্রিত (মিথ্যা দৃষ্টিরূপ নিশ্রয়ের অতীত) হইয়া ও রাগদ্বেষ ছিন্ন করিয়া খড়্গা—।

বিপিট্ঠিকত্বান সুখঞ্চ দুক্খং পুব্বেব চ সোমনস্স দোমনস্সং।
লদ্ধানুপেক্খং সমথং বিশুদ্ধং একোচরে—॥৩৩

বিপৃষ্ঠীকৃত্য সুখঞ্চ দুঃখং পূর্ব্বমেব সৌমনস্যং দৌর্ম্মনস্যং।
লব্ধোপেক্ষাং শমতাং বিশুদ্ধিং একশ্চরেৎ—॥

৩৩। সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্ম্মনস্য পশ্চাৎ করিয়া উপেক্ষা, শমতা ও বিশুদ্ধি লাভ করিয়া খড়্গা—।

আরদ্ধবীরিয়ো পরমত্থ পত্তিয়া অলীনচিত্তো অকুসীতবুত্তি।
দল্হনিক্কমো থাম বলুপপন্নো একোচরে—॥৩৪

আরব্ধবীর্য্য পরমার্থপ্রাপ্তৌ অলীনচিত্তঃ অকুসীদবৃত্তিঃ।
দৃঢ়নিষ্ক্রমঃ স্থামবলোপপন্নঃ একশ্চরেৎ—॥

৩৪। পরমার্থ বা নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য আরব্ধবীর্য্য, অলীনচিত্ত (বীর্য্যের অন্তরায় শূন্য) অকুসীদবৃত্তি (শয়নাসনাদিতে শুদ্ধাচার সম্পন্ন), দৃঢ় পরাক্রম (নির্ব্বাণমার্গ গমনে), স্থাম (সত্ব) ও বলযুক্ত (ভিক্ষু) খড়্গা—।

পটিসল্লানং ঝান মরিঞ্চমানো ধম্মেসু নিচ্চং অনুধম্মচারী।
আদীনবং সম্মসিতা ভবেসু একোচরে—॥৩৫

প্রবিবিক্ততাং ধ্যানঞ্চ অরিচ্যমান ধর্ম্মেষু নিত্যং অনুধর্ম্মচারী।
আদীনবং সংমৃষ্ট ভবেষু একশ্চরেৎ—॥

৩৫। বিবিক্ত-সেবিতা ও ধ্যানকে না ছাড়িয়া ধর্ম্মের (লোকোত্তর ধর্ম্মের) অনুরূপ আচরণকারী (ভিক্ষু) ভবের (জন্ম পরম্পরার) দোষ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া খড়্গা—।

তণ্হক্খয়ং পত্থয়ং অপ্পমত্তো অনেলমূগো সুতবা সতিমা।
সঙ্খত ধম্মো নিয়তো পধান বা একোচরে—॥৩৬

তৃষ্ণাক্ষয়ং প্রার্থয়ন্ অপ্রমত্তঃ অনেড়মুকঃ শ্রুতবান্ স্মৃতিমান্।
সংখ্যাতধর্ম্মঃ নিয়তঃ বীর্য্যবান্ একশ্চরেৎ—॥

৩৬। তৃষ্ণাক্ষয়, প্রার্থনা পূর্ব্বক, অপ্রমত্ত, বুদ্ধিমান্, শ্রুতবান্, স্মৃতিমান্, সংখ্যাতধর্ম্ম (যিনি উপপরীক্ষা বা বিশেষরূপ বিচার বিশেষের দ্বারা পরম ধর্ম্ম জানিয়াছেন), নিয়ত, বীর্য্যবান্, ভিক্ষু খড়্গা—।

সিহো ব সদ্দেসু অসন্তসন্তো বাতোব জালম্‌হি অসজ্জমানো।
পদুমং ব তোয়েন অলিম্পমানো একোচরে—॥৩৭

সিংহইব শব্দেষু অসন্ত্রসন্ বাতইব জালে অসজন্।
পদ্মংইব তোয়েন অলিম্পমানঃ একশ্চরেৎ—॥

৩৭। সিংহ যেমন শব্দ সমূহে অসন্ত্রস্ত, বায়ু যেমন জাল লগ্ন হয় না, পদ্ম যেমন জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, ভিক্ষু সেইরূপ খড়্গা—॥৩৭

সীহো যথা দাঠবলী পসয্‌হ রাজা মিগানং অভিভুয্যচারী।
সেবেথ পন্তানি সেনাসনানি একোচরে—॥৩৮

সিংহো যথা দাঢ়াবলী প্রসহ্য রাজা মৃগাণাং অভিভবকারী।
সেবেত প্রান্তানি শয়নাসনানি একশ্চরেৎ—॥

৩৮। বল পূর্ব্বক মৃগ সমূহের অভিভবকারী, দংষ্ট্রাবলী, সিংহের ন্যায় বিবিক্ত শয়নাসন সেবী হইয়া খড়্গা—।

মেত্তং উপেক্‌খং করুণং বিমুত্তিং আসেবমানো মুদিতঞ্চ কালে।
সব্বেন লোকেন অবিরুজ্ঝমানো একোচরে—॥৩৯

মৈত্রীং উপেক্ষাং করুণাং বিমুক্তিং আসেবমানঃ মুদিতাঞ্চ কালে।
সর্ব্বেন লোকেন অবিরুধ্যমানঃ একশ্চরেৎ—॥

৩৯। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা রূপ বিমুক্তি যথাকালে আসেবন করিতে করিতে সর্ব্বলোকের দ্বারা অবিরুধ্যমান্ হইয়া খড়্গা—।

রাগং চ দোসঞ্চ পহায় মোহং সন্দালয়িত্বা সঞ্‌ঞোজনানি।
অসন্তসং জীবিত সংখয়ম্‌হি একোচরে—॥৪০

রাগঞ্চ দ্বেষঞ্চ প্রহায় মোহং সন্দীর্য্য সংযোজনানি।
অসন্ত্রসন্ জীবিত সংক্ষয়ে হি একশ্চরেৎ—॥

৪০। রাগ, দ্বেষ ও মোহ ত্যাগ করিয়া সংযমন (বন্ধন) সমূহ ভেদ করিয়া প্রাণাত্যয়েও সন্ত্রস্ত না হইয়া খড়্গা—।

ভজন্তি সেবন্তি চকারনত্থা নিকারণা দুল্লভা অজ্জমিত্তা।
অত্তট্‌ঠ পঞ্‌ঞা অসুচিমনুস্‌সা একোচরে—॥৪১

ভজন্তে সেবন্তে অর্থকারণায় নিকারণানি দুর্ল্লভা অদ্যমিত্রাণি।
আত্মার্থপ্রজ্ঞাঃ (দৃষ্টার্থপ্রজ্ঞাঃ) অশুচিমনুষ্যাঃ একশ্চরেৎ—॥

৪১। অর্থের কারণেই সকলে ভজনা ও সেবা করে। নিষ্কারণ উপকারকারী আর্য্যমিত্র দুর্লভ। অশুচি (অনার্য্যজুষ্ট কায়িক মানস ও বাচিক কর্ম্মকারী) মনুষ্যেরা দৃষ্ট (লৌকিক) বিষয়ের প্রজ্ঞা সম্পন্ন (ইহা জানিয়া ভিক্ষু) খড়্গা বিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবেন।

শ্রীহরিহরানন্দ আরণ্য।

শিক্ষা।

শিক্ষা মানবজীবনের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে। শিক্ষার অতুল তুলিকাস্পর্শে মানবের হৃদয়ফলকে জ্ঞানের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়। রেখাহীন বর্ণরাগশূন্য মলিন ফলকতলে, চিত্রকরের কৌশলশতসম্পাদিততুলিকাসম্পাত যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ বা প্রদান করে, তাহা যেমন জগতের এক অভিলষিত সামগ্রী শিক্ষার পরিপাকও তদ্রূপ বিশ্বের আশ্বাসপ্রদ পদার্থ। শিক্ষার করুণাজলে মরুক্ষেত্রে পূতস্রোতস্বতীর আবির্ভাব হয়, শিক্ষার বিমল আলোকে অন্ধতমোময় দেশে প্রকাশের রাজ্য বিস্তৃত হয়, শিক্ষার ইন্দ্রজাল মন্ত্রে জগৎ বিমুগ্ধ বিস্মিত হয়, শিক্ষার সঞ্জীবন সুধারসে বিনষ্টবিপ্লুষ্ট দেশ, জাতি, সম্প্রদায় ও ব্যক্তি নবজীবন লাভ করিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সত্য তত্ত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া নবপ্রণোদনার অধিকারী হয়। শিক্ষা জীবনোদ্যানের গন্ধরাজী যূথিকা, অজ্ঞ জড়তার রাজ্যে বিদ্যুন্ময়ী মহাশক্তি, জীবনে রসায়ন, মরণে অমোঘ ঔষধ।

জগতের ইতিহাস ভূয়ঃ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে, শিক্ষা জগতের শক্তিকেন্দ্র। যে সমস্ত দেশ ও জাতি শিক্ষার চরণসেবার অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, তাহারাই জগতে শক্তিশালী রূপে প্রখ্যাত হইয়াছে। আজ যে পদভরে পৃথ্বীতল প্রকম্পিত করিয়া পাশ্চাত্যজাতি জগতের বক্ষে বিচরণ করিতেছে, ইহার মূলে শিক্ষা। আজ যে জ্ঞান-বিজ্ঞান গরিমামণ্ডিত জাপান জগতে পূজিত ইহার মূলেও শিক্ষা। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মহনীয় জাপানসম্রাটের সেই মহীয়সী বাণী—("It is intended that henceforth education shall be so diffused that there may be not a village with ignorant family, or a family with an ignorant man" অর্থাৎ অতঃপর এইরূপ শিক্ষাবিস্তার আমাদের অভিপ্রেত, যাহাতে একটী গ্রামও অজ্ঞ পরিবার যুক্ত এবং একটী পরিবারও অজ্ঞমানবযুক্ত থাকিবে না।) জাপানের বর্ত্তমান দয়ের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়াছিল। মিশরের প্রাচীন পিরামিড্ শিক্ষার মহিমা প্রচার করিয়াছিল। গ্রীস্ ও রোমের প্রাচীন গৌরব শিক্ষারই পরিচয় প্রদান করে। ভারতেও বৈদিক যুগের এবং তৎ পরবর্ত্তিকালের শিক্ষাসেবার পরিচয় অমূল্য দর্শন গণিতশিল্প সাহিত্যাদি। পৌরাণিক যুগের একজন ভারতীয় রাজা সগর্ব্বে বলিয়াছেন "আমার রাজ্যে অবেদবিৎ নাই।"

শিক্ষা ও সমৃদ্ধি পরস্পরের সহচরী। একের বিদ্যমানতায় অন্যের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। ভারতে সুসমৃদ্ধ বৌদ্ধযুগে নালন্দা তক্ষশিলা প্রভৃতি বিদ্যাকেন্দ্রের সাহায্যে ভূয়সী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এক নালন্দাতেই দশসহস্র ছাত্রের বিদ্যাদানের ব্যবস্থা ছিল। শাঙ্করযুগেও ভারতের সর্ব্বত্র শিক্ষার ভূয়ঃ প্রচার সংঘটিত হইয়াছিল। যখন নবসন্ন্যাসী শঙ্কর দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ বেদবিদ্যাবিশারদ মণ্ডনমিশ্রের ভবনের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিক

মণ্ডনভবনের যে পরিচয় উপস্থিত হয় তাহা এই—"স্বতঃ প্রমাণং পরতঃ প্রমাণং শুকাঙ্গনা যত্র গিরং গিরন্তি, শিষ্যোপশিষ্যোপসেব্যমানং জানীহি তন্মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ।" যেখানে (সর্ব্বক্ষণ বিদ্যালোচনা শ্রবণ করিয়া) শুকাঙ্গনাগণ বেদ (জ্ঞান) স্বতঃ প্রমাণ অথবা পরতঃ প্রমাণ, এই বিষয়ে কথা বলিতেছে, যে স্থান শিষ্য প্রশিষ্যাদি দ্বারা অধ্যুষিত, তাহাই পণ্ডিতপ্রকাণ্ড মণ্ডনমিশ্রের আলয় বলিয়া জানিবে। জ্ঞানচর্চ্চার উচ্চতম অধিকারের নিদর্শন এখানে পরিস্ফুট। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্য অর্থাৎ ঐ জ্ঞান প্রকৃত, উহাতে ভ্রম বিদ্যমান নাই, এরূপে অবধারণ করা ঐ জ্ঞানেরই কার্য্য কিম্বা কারণান্তর দ্বারা উক্ত উৎপন্ন জ্ঞানের যথার্থতা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় এই বিচার দর্শন শাস্ত্রের উচ্চাধিকারীর অধিগম্য, কেবলমাত্র অক্ষর পাঠকের এ চর্চ্চার অধিকার নাই। এতাদৃশ গুরুতর বিষয় মণ্ডনের বিদ্যামণ্ডপে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হওয়ায় শুকরমণীরও এই মহার্ঘ তত্ত্ব আয়ত্ত হইয়াছিল। হায়! "তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ"। কোথায় বেদগীতিমুখরিত ভারতীয় গৃহস্থের গৃহ, আর কোথায় নিরক্ষর বর্ব্বর সন্তানের বিহার ভূমি, রোগশোকের লীলাস্থলী ভারতের বিষাদমূর্ত্তি জীর্ণ পল্লী। শিক্ষার অপ্রচারে সমৃদ্ধিরও অদর্শন ঘটিয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে শিক্ষা গ্রহণ অবশ্যকরণীয় ছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই উচ্চবর্ণত্রয়ের শিক্ষা অবশ্যকরণীয়া ছিল, শূদ্র বা সেবক সম্প্রদায়ের জন্য গুরুগৃহ অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলনা, তাহারা উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণের নিকট মৌখিক উপদেশ (সময়ে সময়ে) প্রাপ্ত হইত। বর্ত্তমান যুগে বহুব্যক্তি এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, প্রাচীন ভারতে বহুবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত (করপর্ব্বগণনীয়) থাকিলেও জনসাধারণের শিক্ষাদানে দৈন্য পরিলক্ষিত হইত। এই অসত্যের বিশেষ প্রচার সুসঙ্গত মনে হয় না। যাঁহারা উক্ত মতবাদের আবিষ্কর্ত্তা, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ বহু দর্শন সঞ্চয় করিতে সক্ষম হন নাই। ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামক জাতিত্রয়ের উপনয়নের ব্যবস্থা ছিল। এই উপনয়ন সূত্রধারণ, সামাজিক পান ভোজন, বাদ্যতোদ্যোদ্যম, নৃত্য সংগীত, কলকলহলহলায় পর্য্যবসিত নহে। বেদাধ্যয়ন অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সরলমতি শুদ্ধস্বভাব বালক সংযম ও সাধনা গ্রহণের আশায় বিদিততত্ত্ব চরিত্রবান্ আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইতেছে, আচার্য্য তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর সাধনার সঙ্গে বিশ্বোদ্ভূতির মূল তত্ত্ব স্বরূপ সাবিত্রী শিক্ষা দিয়া সুদীর্ঘ বেদাধ্যয়নকালের শুভারম্ভের সূচনা করিতেছেন। বালক ব্রহ্মচারী নবজীবন লাভের বাহ্য চিহ্ন স্বরূপ যজ্ঞসূত্র গ্রহণে কৃতার্থ হইতেছে। এই ব্যাপার উপনয়ন। উপনীত ব্রহ্মচারী অনল্পকাল গুরুগৃহে নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া জগতের উপযোগী হইলে তখন অধ্যয়ন পরিসমাপ্তি ও ব্রতত্যাগসূচক সমাবর্ত্তনসংস্কার অনুষ্ঠিত হইত। এই সমাবর্ত্তন ব্রহ্মচর্য্যসমাপ্তি

পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের নামান্তর। সমাবৃত্ত ব্যক্তির গৃহস্থধর্ম্মোপযোগিবিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে অধিকার সংসাধিত হয়। উপনয়নগ্রহণে ত্রিবর্ণান্তর্গত ব্যক্তিগণ বাধ্য ছিলেন, সুতরাং এরূপ নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে যে প্রাচীন ভারতে সেবক সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সকল মানবই শিক্ষা লাভ করিতে একান্ত বাধ্য ছিলেন।

উপনয়নের সহিত অধ্যয়নের বা শিক্ষার সম্পর্ক নাই এরূপ বিশ্বাস যাঁহাদের হৃদয় কলুষিত করিয়াছে, তাঁহারা শ্রবণ করুন বেদবাণী মেঘমন্দ্রে ঘোষণা করিতেছেন, "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত তমধ্যাপয়ীত একাদশে রাজন্যং দ্বাদশে বৈশ্য মিতি"। অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ব্রাহ্মণসন্তানের উপনয়ন হইবে, সে গুরু কর্ত্তৃক অধ্যাপিত হইবে। একাদশ বর্ষ সময়ে ক্ষত্রিয় সন্তান এবং দ্বাদশবর্ষ কালে বৈশ্য উপনীত হইবে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যও উপনীত হইয়া যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করিবে। গৃহ্যসূত্রে দৃষ্ট হয় "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ একাদশে ক্ষত্রিয়ং দ্বাদশে বৈশ্যমিতি"। অষ্টবর্ষ ব্রাহ্মণ, একাদশবর্ষ ক্ষত্রিয় ও দ্বাদশবর্ষ বৈশ্যের উপনয়ন সংস্কার করিবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন "গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্। গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাদ্দ্বিদ্বাদশে বিশঃ"। গর্ভাষ্টম অর্থাৎ গর্ভ হইতে গণনায় অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন বিহিত অথবা জন্মাবধি অষ্টমবর্ষে কর্ত্তব্য, ক্ষত্রিয়ের গর্ভৈকাদশবর্ষ, বৈশ্যের গর্ভদ্বাদশবর্ষে উপনয়নের বিধান। এই উপনীত ব্রহ্মচারী কোন্ শিক্ষা গ্রহণ করিবে। মহর্ষি মনু বলিতেছেন, "উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ। আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেবচ॥" উপনয়নের গুরু প্রথমে শৌচ শিক্ষা দিবেন, শৌচ দেহশুদ্ধিকারক আরোগ্যদায়ক ও মনঃশুদ্ধি সম্পাদক। শৌচ দ্বিবিধ—"শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্।" মৃত্তিকা জলাদিদ্বারা দেহকে ক্লেদকর্দ্দমাদিশূন্য করা বাহ্য শৌচ। মনের কলুষিত প্রবৃত্তি সমূহের সৎশিক্ষা সদালোচনা ও সদনুষ্ঠান দ্বারা দূরীকরণ এবং সংশোধন আন্তর শৌচ। এই উভয়বিধ শৌচ সর্ব্বোন্নতির মূল স্থান। দেহ ও মন অপবিত্র হইলে কোনও বিষয়ের উন্নতি সুসম্ভাবিত নহে, সুতরাং সর্ব্বপ্রথম শৌচ শিক্ষার প্রয়োজন। শৌচের পরে সদাচার, অগ্নিকার্য্য অর্থাৎ সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে হোম ক্রিয়া সম্পাদন ও সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা দিবেন। শুধু কি তাই? "উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েৎ দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ।" আচার্য্য উপনয়নের পর শিষ্যকে কল্পসূত্র অর্থাৎ যজ্ঞবিদ্যা ও রহস্য বা উপনিষৎ সহিত সমগ্র বেদ অধ্যায়ন করাইবেন।

বেদ সমগ্র জগতের জ্ঞানরাশি। সাঙ্গ বেদবিদ্যায় সকল বিদ্যাই অন্তর্ভুক্ত হয়। শিক্ষায় বিজ্ঞানানুমত স্বরশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা জন্মে, কল্পসূত্রে দেশ কুলপরম্পরাগত আচার ও যজ্ঞকর্ম্মাদির পদ্ধতি প্রথা ব্যবহারাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়, ব্যাকরণে ও নিরুক্তে শব্দ শাস্ত্রের সুগভীর রহস্য সমূহ লিপিবদ্ধ আছে, ছন্দঃশাস্ত্র পাঠে কবিতার (পদ্যের) কৌশল ও স্মৃতিশক্তির সুশৃঙ্খলতা

সংসাধিত হয়। জ্যোতির্বিদ্যাও বেদাঙ্গ-বিদ্যা। যজ্ঞবিদ্যায় ক্ষেত্রতত্ত্ব বা জ্যামিতি শাস্ত্র অন্তর্নিহিত শুদ্ধগণিত ও ভূগোল-শাস্ত্র জ্যোতির্বিদ্যায় অন্তর্নিবিষ্ট। যজ্ঞবিদ্যায় পূর্ত্ত, স্থাপত্যাদি বিদ্যা এবং চিত্রবিদ্যা বর্ণবিদ্যা ও ললিতকলাবিদ্যা বিদ্যমান। সামগীতিতে সঙ্গীতশাস্ত্র অন্তর্ভূত। উপনিষদে অনাবিল ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদাদি উপবেদ সমূহ জীবজগতের অবশ্যজ্ঞাতব্য ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়নিকরের শিক্ষা দেয়। এই সাঙ্গবেদাধ্যায়ী ব্যক্তি কি অজ্ঞ অশিক্ষিত স্বার্থপরতাদীক্ষিত মূর্খ সন্তান? এই অধ্যয়নের অধিকারী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য। শাস্ত্র "অধীয়ীরন্ ত্রয়োবর্ণাঃ।" অধ্যাপক ব্রাহ্মণ "প্রব্রূয়াদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ।" ব্রাহ্মণ প্রবক্তা বা অধ্যাপক, ক্ষত্রিয়বর্ণ বা বৈশ্যবর্ণ অধ্যাপকতা করিবেন না, কারণ তাঁহারা অপর গুরুতর কার্য্যে অভিনিবিষ্ট। এ নিয়ম সাধারণ, বৈদিক-যুগে এই প্রথার ব্যভিচার বহুস্থলে দৃষ্ট হইত। রাজা অশ্বপতির নিকট বহু ঋষি-তনয় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, ইলুষ কবষ শূদ্র হইলেও বেদসূক্ত রচনা করিয়াছিলেন, নারীকুলেও শিক্ষার প্রচার অল্প ছিল না, তবে তাঁহাদের শিক্ষার অবশ্যবাধ্যতা ছিল না, না শিখিলেও দূষণীয় হইত না। তথাপি অপালা, ঘোষা, বিশ্ববারা, বাগ্দেবী, গার্গী প্রভৃতি অসংখ্য রমণীরা বেদবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। শূদ্রজাতি শিক্ষা করিতে বাধ্য ছিল না, কিন্তু যোগ্যতানুসারে তাহারাও বেদচর্চ্চা এমন কি ঋষির অধিকার করিতে পারিত। সে সময়ে কি শিক্ষার দারিদ্র্য দৃষ্ট হইত?

যাহারা অজ্ঞতার অধিকারে থাকিয়া আপত্তি করেন, যে শিক্ষা না করিলে ভারতীয় সমাজে দোষী হইতে হইত—এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না, অতএব উপনয়ন বা অধ্যয়নের বিধানের দ্বারা উহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রমিত হয় না, তাঁহাদের জন্য আর্য্যশাস্ত্র বলেন যাহাদের উপনয়ন হয় নাই, অথচ উপনয়নের কাল (মুখ্য ও গৌণ) অতীত হইয়াছে, তাহারা 'ব্রাত্য' নামে অভিহিত হইবে। ভারতীয় আর্য্য-সমাজে ব্রাত্যগণ অব্যবহার্য্য রূপে পরিগণিত হইত। ব্রাত্যের যাজন করিলে পতিত হইতে হইত, ব্রাত্যের সহিত যৌনসম্বন্ধ (বিবাহাদি) স্থাপন করা দূষণীয় ছিল। এমন কি কোনও কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা বলিয়াছেন, ব্রাত্যগণ সম্ভাষণ স্পর্শনাদিরও অযোগ্য হইত। ব্রাত্যেরা সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইত। সমাজের এই সুকঠোর শাসন দণ্ড ব্রাত্যের অভ্যুদয়ের মস্তকচূর্ণ করিত কেন? সে অশিক্ষিততাকে মহাপাপ বলিয়া বিশ্বাস করে নাই, সে অধ্যয়নের জন্য আচার্য্যগৃহে উপনীত হয় নাই, সে শিক্ষাবিধান অমান্য করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয়ে আপনার অজ্ঞতাকে বর্দ্ধিত করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছে, সেইজন্য। যে সকল দেশে সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইয়াছে ও হইতেছে, সে সমস্ত স্থলে বিধানের অতিক্রমকারী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন, কিন্তু প্রাচীন ভারতের এই সামাজিকদণ্ড তদপেক্ষায় অধিকতর ভীষণ। রাজশক্তির

নিকট অবমানিত লাঞ্ছিত তিরস্কৃত ধিক্কৃত ব্যক্তিও সমাজের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইতে পারেন। কিন্তু সমাজশক্তির নিষ্ঠুর ন্যায়-দণ্ডাঘাতে যিনি পীড়িত, তাঁহার স্থান জগতে দুর্ল্লভ, তাঁহার আশ্রয় দুইটী, এক সমাজের কৃপাবল ক্ষমা, অন্য আত্মহত্যা। ভারতের সর্ব্ববিধ শাসন-কার্য্যই প্রাচীন কালে রাজশক্তির সহায়তায় সমাজশক্তির দ্বারা সংসাধিত হইত। পঞ্চায়ৎ প্রথার ন্যায় 'কুল', 'শ্রেণী' প্রভৃতির হস্তে তখন বিচার ও শাসনভার অর্পিত ছিল, তদ্দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি না হইলে ধর্ম্মাধিকরণাধিষ্ঠিত রাজা ও সভাসদবর্গ (সভাসদগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাজার সব অবস্থাবধারণে অধিকার বিধান সিদ্ধ ছিল না) তাহার প্রতীকার করিতেন। যদি কেহ অনুতপ্ত হইয়া সমাজের কৃপাপ্রার্থী হয়, তাহার প্রতি ব্যবস্থা ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক উপনয়ন গ্রহণ করিয়া যথাবিহিত শিক্ষালাভ করা। অধ্যয়ন না করিলে দণ্ডভোগ করিয়া অধ্যয়ন করাই প্রতীকার ছিল। যে কোনও মতে অধ্যয়ন করাই চাই, নচেৎ সমাজের সর্ব্বসম্বন্ধ সহানুভূতিশূন্য হইয়া অসহায় অবস্থান করিতে হইত। এ দেশেও কি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না?

শিক্ষার বিধান করিয়াই প্রাচীন ভারতীয়গণ নিরস্ত হন নাই, শিক্ষা বিধানের প্রয়োগভারও তাঁহারা (রাজশক্তির সহায়তায়) গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক বা শিক্ষক রাজদত্ত বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া সমাগত শিষ্যগণকে অন্ন ও জ্ঞান দান করিতেন। এই অধ্যাপনের নাম ছিল ব্রহ্মযজ্ঞ। এ যজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বিনা ব্যয়ে আশ্রয় ও আহার্য্য এবং বিদ্যাদানের এরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে দ্বিতীয় দৃষ্ট হইবে না। এই সুপবিত্র মহাযজ্ঞ ভারতেরই গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হইত, আজ আমরা বিকৃত শিক্ষা লাভ করিয়া বলি, দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না! ভারতের ইতিহাসের একটী শব্দের প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ ভিক্ষা করি। শব্দটী 'কুলপতি', কুলপতি কাহাকে বলে? ভারতীয় ইতিবৃত্ত শাস্ত্র বলে, যিনি দশ সহস্র শিষ্যকে অন্ন ও আশ্রয় দান-সহকারে অধ্যাপনা করেন, তিনি কুলপতি। শৌনক, বশিষ্ঠাদি মহর্ষিরা কুলপতি ছিলেন। এইরূপ বহুসংখ্যক কুলপতির পদরেণু এই ভারতের জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদের অমর কীর্ত্তির পুণ্য কথা ভারতবাসিগৃহস্থের কাণে কাণে নীরব ভাষায় ঘোষণা করিতেছে। এখনও এ দেশে অনেক বিত্তবিভবহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান সেই মহাযজ্ঞের উদ্দেশে নিজের সমৃদ্ধিশূন্য পরিবার ও জীবন উৎসর্গ করিয়া প্রাচীন গৌরবের বিলুপ্ত স্মৃতির পুনর্জ্জাগরণ প্রার্থনা করিতেছে।

আজ ভারতে প্রতি শতে ৮৯ জন নিরক্ষর লোক অধঃপতনের গভীরতা ঘোষণা করিতেছে। ব্রিটিশ ভারতে বিদ্যালয়ে গমনের উপযুক্ত ব্যক্তি সংখ্যা তিনকোটির উপর, কিন্তু ব্রিটিশরাজ ও দেশীয় জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় ৬৯ লক্ষের অধিক লোকের শিক্ষার (বেং

কিঞ্চিৎ) ব্যবস্থা করা যায় নাই। সমগ্র বঙ্গে (বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা) সার্দ্ধ সপ্তকোটী নর নারীর মধ্যে সপ্তদশ লক্ষ মাত্র শিক্ষা-লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। এ সংখ্যা অত্যল্প মাত্র ইহাতে সংশয় নাই। প্রতি সহস্রে ভারতে ১৭এর অনধিক অক্ষর পরিচয় সম্পন্ন ব্যক্তি বিদ্যমান আছেন। সমগ্র ভারতবাসীর ও শাসক-সম্প্রদায়ের ইহা অল্প কলঙ্কের পরিচায়ক নহে। শিক্ষার জন্য শিক্ষায় কর্তৃপক্ষ যথোচিত ব্যয় বিধানও করেন নাই। দেশের রাজস্ব-সমষ্টির সপ্ততি ভাগ মাত্র ২৩ কোটী ভারতবাসীর জন্য (ব্রিটিশ ভারতবর্ষের জন সমূহের জন্য) ব্যয়িত হয় মাত্র। সুসভ্য দেশসমূহের শিক্ষা-ব্যয়ের তুলনায় ইহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। নিম্ন শিক্ষার ব্যয় জন্য প্রতি বর্ষে প্রতি লোকের জন্য ইংলণ্ড প্রাশিয়ায় তিন টাকা বার আনা, ফ্রান্সে তিন টাকা এগার আনা। অষ্ট্রীয়ায় এক টাকা চৌদ্দ আনা, ইটালীতে এক টাকা তিন আনা, রুশিয়ায় আট আনা, জাপানে এগার আনা, আর ভারতে (ব্রিটিশ ভারতে) এক আনা মাত্র। উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ও ইহাপেক্ষা অধিকতর নহে। এ তালিকা কি কলঙ্কের কালিমায় আপূর্ণ নয়? ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার মহার্ঘতা ও অল্পতা থাকিলেও, বরোদা, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে দেশীয় রাজ-গণের যত্নে অল্পব্যয়ে এমন কি সুবিধানু-সারে বিনা ব্যয়েও সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে নিয়মিত শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ গৌরব ব্রিটনের নহে অতীত গৌরব-খনি ভারতেরই।

বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে। শুকবৎ অক্ষরাভ্যাস শিক্ষা নহে। যদ্দ্বারা মানব নিজের ইহজীবনে কর্ত্তব্যসেবাজনিত সুবিমল আনন্দ ও অবশেষে ত্রিতাপ চির-তপ্তজীবনের সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহাই যথার্থ শিক্ষা। মানব হৃদয়ের পূতিগন্ধ বিদূরিত হইয়া যাহাতে সেখানে নন্দনের সৌরভসম্ভার সমুপস্থিত হয়, সেই শিক্ষাই প্রকৃতোপ-যোগিনী। যে শিক্ষা হৃদয়হীন চরিত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন সংযমশূন্য নৃশংস কপট অধ্যাপক প্রস্তুত করে, সে শিক্ষা নরকাগ্নিতে ভস্মী-ভূত হউক্। যে শিক্ষা মানব প্রস্তুত করেনা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দানব গঠন করে, সে শিক্ষায় পাদস্পর্শ করাও পাপ। চরিত্রবল ব্যতীত কি ব্যক্তি কি জাতি কখনও জগতে স্থায়ী গৌরবের অধিকারী হইতে পারেনা। দস্যুবল ভীতিজনক বটে, কিন্তু ভক্তিকণিকা সংগ্রহের অধিকারও তাহার নাই। জ্ঞানবল চরিত্রবল ভীতি উৎপাদন করেনা, প্রেমে স্নেহে বিশ্বের বিশ্বাসও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। আজ যে পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ভারতের দীন সন্তানগণ লালায়িত, সে শিক্ষা লাভ করিতে ত্রিংশদ্বর্ষ কালই পর্য্যাপ্ত। জাপান সমগ্র জগতে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ-রূপে দেদীপ্যমান। কিন্তু ভারতের স্নিগ্ধ শান্ত তপোবনে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত, যে শিক্ষা সে দিন মহামনা বোধিসত্ত্ব বোধিদ্রুমমূলে লাভ করিয়া সমস্ত বিশ্বের উদ্দেশে রাখিয়া গিয়াছেন, সে শিক্ষা

ত্রিংশবর্ষ কেন, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ বর্ষেও লব্ধ হয় কি না, সন্দেহস্থল। পাশ্চাত্য দেশের একজন মহামনীষী বলিয়াছেন, যদ্দ্বারা দেহ ও মনের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ সংসাধিত হয়, তাহাই সত্য শিক্ষা। বর্ত্তমান শিক্ষার সহিত মানসিক উৎকর্ষের সম্বন্ধ অতি সামান্য, সুতরাং ইহা যে অসম্পূর্ণ, তাহাতে আপত্তি করিবার কথা আছে কি? আবার পক্ষান্তরে, ভারতীয় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর যথাবিহিত অনুশীলন না হওয়ায়, মানসিক শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করায়, শারীর-উৎকর্ষের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করায়, বৌদ্ধ যুগ হইতেই ভারতে বর্ত্তমান তিমির-ময়যুগের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। "যা লোকদ্বয়সাধিনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।" যাহা লোকদ্বয়েই (ইহলোক ও পরলোকে) হিতসাধন করে, সেই চতুরতাই যথার্থ চতুরতা। দুরদৃষ্ট ক্রমে সেরূপ চতুরতা ভারতবর্ষ হইতে বহুদিন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আবার সেই শিক্ষার সেবা ব্যতীত এদেশের মঙ্গল-সম্ভাবনা নাই।

একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, আর একজন অধীতবেদ সমাবৃত্ত ব্যক্তি, কে শিক্ষিত? আমরা বলিব, বিশ্ববিদ্যালয় নানা বিষয় শিক্ষা দিয়াছে, কিন্তু মানুষ করিতে চেষ্টা করে নাই। মনুষ্যত্বের বিকাশ-সংস্কার তাহার লক্ষ্য ছিল না। অপর দিকে, সমাবৃত্ত ব্যক্তি অল্প হইতে গণিত বা জড়বিজ্ঞানের তথ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষা লাভ করিলেও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষক তাঁহাকে চরিত্রতেজোদৃপ্ত পূত-হৃদয় ব্রহ্মচারী হইতে শিক্ষা দেওয়াই প্রধান লক্ষ্য মনে করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত কি জাতির, কি ব্যক্তির—চরিত্র সুদৃঢ় হয় না। চরিত্রবল ব্যতীত কখনও কোনও মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করা যায় না। সহস্র সুশিক্ষিত ব্যক্তিও হীনচরিত্রতাবশতঃ মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অকৃতকার্য্য হন, ইহার দৃষ্টান্ত দুর্ল্লভ নয়। ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্যে মহাবীর্য্য লাভ করিয়া জগতের সর্ব্বত্র অভয় প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরের মঙ্গলময় বিধানের অনুবর্ত্তন করা প্রত্যেক মানবের প্রকৃত কর্ত্তব্য। অধিকাংশ অকৃতকার্য্যতার মূলে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব জাজ্বল্যমান। আবার গৃহে ব্রহ্মচর্য্যের মহাশিক্ষার প্রবর্ত্তন ব্যতীত জাতির অভ্যুদয়ের প্রত্যাশা করা ধৃষ্টতা মাত্র।

আজ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনের সুমুহূর্ত্ত সমুপস্থিত। এ মাহেন্দ্র যোগ পরিত্যাগ করিলে পরিণামে পরিতপ্ত হইতে হইবেই। প্রাচ্যের প্রাণ আর পাশ্চাত্যের দেহ, প্রাচ্যের মনঃ-শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের বহিঃ-শিক্ষা, প্রাচ্যের অন্তর্জগতের আধিপত্য ও পাশ্চাত্যের বহির্জ্জগতের প্রভুত্ব একত্রিত হইলে জগতে এক অজেয় অমেয় শক্তি আবির্ভূত হইবে। সমগ্র জগৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সে মহাশক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিবে ও ভক্তিভরে তাহার পদে প্রণত হইতে বাধ্য হইবে। জগতের অতি মাত্র ক্ষুদ্র রেণুকণাও অনর্থক নহে; যাহার যতক্ষণ উপযোগিতা আছে, তাহার ততক্ষণ জীবন আছে। এই অতি প্রাচীন

জরাজীর্ণ (বহু বিপ্লবের পরেও) জাতি অদ্যাপি ধরাবক্ষে বিদ্যমান, ইহাতে স্রষ্টার গভীর অভিসন্ধি অনুমিত হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার সমন্বয় জগতের মঙ্গলের জন্য একান্ত আবশ্যক। সুমহান্ বিধাতা সেই শুভ সমন্বয়ের জন্য পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষই মনোনীত করিয়াছেন। এই মহৎ কার্য্য ভারতীয় আর্য্যসন্তানকেই সাধন করিতে হইবে। ভারতের ধর্ম্ম ও চরিত্রমূলক শিক্ষা, প্রতীচ্যের কর্ম্ম ও বহির্জ্জগৎপ্রধান শিক্ষা, এই বিশাল বিশ্বের দুই প্রশস্ত পথ—দুই মহাস্রোত একত্র সম্মিলিত করিয়া মহাতীর্থের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় আর্য্যসন্তানকেই করিতে হইবে। এই কার্য্য সাধনের জন্য বিধাতার বিধানে ভারতের সহিত পাশ্চাত্য জাতির সংস্রব সংঘটিত হইয়াছে। ভারতসন্তান! ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্যপ্রদ শিক্ষা গ্রহণ কর; পাশ্চাত্যের কর্ম্মপ্রধান শিক্ষার সহিত ভারতের ধর্ম্মপ্রধান শিক্ষা মিলাইয়া, জগতের প্রতি গৃহে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সেই মহাশিক্ষার প্রচার কর; জড়ে চেতনা প্রদান কর; বিশ্ববিধাতার মঙ্গলময় অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত কর—তোমার পূর্ব্বপুরুষের ঋণ পরিশোধ কর। ওঁ শান্তিঃ।

তীর্থপদাশ্রিতস্য

কস্যচিৎ—প্রবোধানন্দস্য।

"গো-ব্রাহ্মণ"

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-
হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায়
নমো নমঃ॥"

গো-ব্রাহ্মণমূর্ত্ত বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম। এই গো-ব্রাহ্মণমূর্ত্তিই জগতের হিতকারিণী, পৃথিবীপালনকর্ত্রী; এই কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে ব্রহ্মণ্যদেব সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত আছেন।

প্রকৃতপক্ষে গো-ব্রাহ্মণই জগদ্ধিতমূর্ত্তি। গো-ব্রাহ্মণই জগৎকে রক্ষা করিয়া থাকেন। গো-ব্রাহ্মণ হইতে বিষ্ণুমূর্ত্তি যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ('যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' ইতি শ্রুতেঃ)। যজ্ঞে অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা, ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সহকারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের প্রয়োজন হয়। যজ্ঞে হবিঃ ও সমিধের যথেষ্ট সদ্ভাবে মনোযোগ দিতে হয়। কেননা দেবতাগণের উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহারা প্রচুর বর্ষণ করেন। জগদ্ধাত্রী বর্ষণাধিষ্ঠাত্রী-বিশ্বশক্তি দেবী অন্নপূর্ণা বসুন্ধরাকে প্রভূত শস্যশালিনী করিয়া জীবের জীবন অন্ন বিতরণ করেন। এইরূপ শস্যলাভে (বলশালী জাতির সমধিক সুবিধা থাকিলেও) ধরামণ্ডলে সৌভাগ্যবান্ জীবমাত্রই তাঁহাদের অন্নময় কোষের পরিপুষ্টি সাধন বশতঃ মহৎ মহৎ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সমাধা করিয়া থাকেন।

গো-ব্রাহ্মণের অভাব হইলে, দেশ রসশূন্য ও মরুময় হইয়া যায়। জাতির স্বাধীনতা-মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া যায় ও সমাজ হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। জাতীয়বিগ্রহের যোগ্য

ব্রাহ্মণই মস্তিষ্ক; গো তাহার হৃদয়। দেহ ধারণ করিতে হইলে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের যেরূপ প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ জাতি ও দেশকে সুব্যবস্থা প্রদান করিতে হইলে গো ও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ভারতে আজ কেন এত হাহাকার উঠিয়াছে? শস্য-বহুল ভারত নামক বর্ষের তৃতীয়াংশ অধিবাসী আজ কেন অর্দ্ধাশনে কালাতিপাত করে; তাহাদের দৈন্য-দুর্ভাগ্য প্রচার করিতেছে? পশু-সম্পত্তি রক্ষায় ভারতবাসীর ঔদাসীন্য ও জড়তাই ইহার কারণ।

জীবসৃষ্টিতে পশুসৃষ্টি এক অপূর্ব্ব রহস্য-ময়। পশুজগৎ সৃষ্ট না হইলে মানব-সৃষ্টি অসম্পূর্ণ থাকিত। পশুজগৎ মানব-জগৎকে বিবিধ প্রকারে রক্ষা করিতেছে। ঐ যে পশুটি,—সুরভি যাহাদের আদি-মাতা, কামধেনুরূপে মুনি-মহর্ষিরা যাহা-দিগকে পালন করিয়া থাকেন, যজ্ঞ ও ওজঃ-সম্পাদক হবিঃ 'আজ্য' যাহারা প্রদান করিয়া থাকে, সমগ্র জীবকে প্রতিপালন করিবার জন্য ধরাকে যাহারা শস্যশালিতো-পযোগিনী করিয়া দেয়; কৃষীবল, কৃষাণ, কৃষক আদি জাতি ও শব্দ যাহারা প্রতি-পালন করিতেছে, তাহাদেরই নাম গাভী। পশুজাতির মধ্যে উহাঁরা সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধসত্ত্ব-প্রকৃতিক। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কোন সময়ে ইহাদের পালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগতের হিত প্রয়োজনেই উহাদের জন্ম হইয়াছে। উহারা প্রচুর পরিমাণে সুমধুর রস প্রদান করিয়া মানবকে সম্বর্দ্ধিত করিতেছে। ঐ রস হইতে যজ্ঞনিষ্পাদক হবিঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং ঐ রস মানব দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলে, পর্জ্জন্যদেব প্রচুর বর্ষণে ধরাকে শস্যশালিনী করিয়া তাহাদের পরিপুষ্টিসাধন সংঘটন করেন।

জীবের মধ্যে পশুভাবের বিদ্যমানতা স্বাভাবিক। সকল জীবের মধ্যে পশুভাব ও দেবভাব, এই দুইটি ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানবজাতির মধ্যে পশুধর্ম্মী প্রভূত দৃষ্ট হইলেও, দেবধর্ম্মী মানবও বিরল নহে। পশুজাতির মধ্যেও বহুপরিমাণে পশু বা হিংস্রপ্রকৃতিক দৃষ্ট হইলেও, দেবধর্ম্মীও আছে। এই গোজাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেবধর্ম্ম দৃষ্ট হয় বলিয়া উহাকে ধর্ম্মের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। এই জন্যই ভারতীয় আর্য্যগণ গোজাতিকে পরম সমা-দরে গ্রহণ করেন ও তাহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। ভাগ-বতকার বলিয়াছেন,

"ধর্ম্মঃ পদৈকেন চরন্ বিচ্ছায়ামু-
পলভ্য গাং।
পৃচ্ছতি সাশ্রুবদনাং বিবৎসামিব
মাতরং।"

"নিজগ্রাহৌজসাবীরঃ কলিং দিগ্বি-
জয়ে কচিৎ।
নৃপলিঙ্গধরং শূদ্রং ঘ্নন্তং গোমিথুনং
পদা।"

"কস্য হেতোর্নিজগ্রাহ কলিং দিগ্বি-
জয়ে নৃপঃ।
নৃদেবচিহ্নধৃক্ শূদ্রঃ কোঽসৌ গাং
পদা অহন্।"

"মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্যকালে একদা ধর্ম্ম বৃষরূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, পৃথিবী পয়স্বিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিবৎসা গাভীর ন্যায় হতপ্রভা ও অশ্রুমুখী হইয়া রোদন করিতেছেন। ধর্ম্মদেব পৃথিবীদেবীর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পৃথ্বীদেবী শূদ্র রাজা কর্ত্তৃক উপভুক্তা হইবেন, লোকে যাগযজ্ঞ করিবে না, দেবতাদিগের যজ্ঞাংশ লোপ পাইবে, কালপ্রভাবে ইন্দ্রদেব যথাকালে আর বর্ষণ করিবেন না ও লোকসমূহের যথেষ্ট কষ্ট সমুপস্থিত হইবে, বাগ্দেবী সদাচারবিহীন ব্রাহ্মণকুল আশ্রয় করিবেন (অর্থাৎ কৃতবিদ্যগণ আচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন না) আচারসম্পন্ন উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য হীনবর্ণের অধীনতা স্বীকার করিবেন, ঘোর ও ভয়ঙ্কর স্বভাব কলি রাজন্যবর্গকে আচ্ছন্ন করিবে ও এই অজ্ঞানতাই তাঁহাদের উচ্ছেদের কারণ হইবে, প্রজাগণ নিষেধ ও উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যথেচ্ছা পান, ভোজন, শয়ন, অবস্থিতি ও সংসর্গ করিবে, এই সমস্ত ভাবিয়া পৃথ্বীদেবী অত্যন্ত শোকাকুলা ও ম্রিয়মাণা হইয়া থাকিবেন,—ধর্ম্মদেব এইরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীদেবী তাঁহার বিশীর্ণতার কারণ ধর্ম্মদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্! আমার দুঃখের কারণ সমস্তই অবগত আছেন, জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হয় বলিয়া বলিতেছি, অধুনা কলির আগমনে সদ্গুণসমূহ লোকসকলকে পরিত্যাগ করিতেছে। প্রাচীনকালের আদর্শ মানবসমাজ-অধ্যুষিতা ভারতমাতার সন্তানেরা, সত্য, শৌচ, দয়া, দান, ক্ষমা, সন্তোষ, সরলতা, শম, ইন্দ্রিয়দমন, স্বধর্ম্ম-প্রতিপালন, তপস্যা, সমদৃষ্টিতা, তিতিক্ষা, লাভে উপেক্ষা, শাস্ত্রচর্চ্চা, আত্মজ্ঞান, বৈরাগ্য, আত্মদমন, বীরতা, ইন্দ্রিয়বল, বল, কর্ত্তব্যবিবেচনা, স্বাধীনতা, কার্য্যনৈপুণ্য, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, মৃদুচিত্ততা, বুদ্ধি, প্রতিভা, বিনয়, সৎস্বভাব, মনের পটুতা, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দক্ষতা, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্ষিপ্রকারিতা, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, পূজ্যতা, নিরহঙ্কারিতা, ব্রাহ্মণদিগের হিতৈষিতা, শরণাগত প্রভৃতি গুণ—যাহা সাধুবর্গকে আশ্রয় করিয়া বাস করে, এই সমস্ত গুণ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রজাবর্গের এই দুরবস্থা দেখিয়া পাপমূর্ত্তি কলি ঘোরভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

পৃথ্বীদেবীর গাভীমূর্ত্তি পরিগ্রহ হইতে মহর্ষির একটি অভিপ্রায় আভাষে বুঝিতে পারা যায়। তিনি যেমন মানব ও পশুকে ক্রোড়ে করিয়া বিবিধ রস, ফল-মূল, শস্য প্রভৃতি দানে পরিপুষ্ট করিতেছেন, তেমনি তাঁহারই যেন গর্ভজাত কন্যা গাভী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সুমধুর রস, আজ্য, শাস্ত্রোৎপত্তিসহায়তা, বাহনকার্য্যকুশলতার পরিচয় প্রভৃতি প্রদানে মানবসমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সম্পাদন করতঃ মহতী ধাত্রী পৃথ্বীদেবীর বৈষ্ণবী প্রকৃতি অনুকরণ করিতেছেন।

গো-জাতি মানবসমাজকে বিশেষরূপেই পরিপুষ্ট করে। ইহারাই মানবের ব্যক্তিগত বল ও জাতিগত বল, উভয়ই এ পর্য্যন্ত

সংরক্ষিত করিয়া আসিতেছে। যে দেশে গাভী সকল বিশেষ হৃষ্ট-পুষ্ট, মৃণালধবল বৃষভ সকল সর্ব্বদা আনন্দে যে দেশে বিচরণ করে, তাহাদের পরিতৃপ্তিকর আহারের জন্য যে দেশে বহু গোচারণের ময়দান বিদ্যমান, যাহাদের প্রতি অত্যাচার নিবারণার্থে যে দেশের মানবসমাজ আইন বিধান করিয়াছেন, সে দেশ যে সুখসমৃদ্ধিতে সতত পরিপূর্ণ, সে দেশে যে কখনও স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তমিত হয় না, সে দেশ যে সর্ব্বদা আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

ধেনুবল জাতি মাত্রের সুখ-সমৃদ্ধি সূচনা করে। ধেনুবলের শ্রী ও অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ আছে। যে জাতি বহু ধেনুবলসম্পন্ন, সে জাতি যে সমধিক-বলশালী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে বিরাট রাজার জগদ্বিখ্যাত গো গৃহই বহু বিস্তৃত, পরিপূর্ণ ও শ্রীসম্পন্ন ছিল। তাঁহাদের এই গোবল অপহরণ করিবার জন্য পৃথ্বী-প্রখ্যাত কৌরববীরগণ বহু চেষ্টা করিলেও, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হ'ন নাই।

অধিক কি, বংশমর্য্যাদাসূচক 'গোত্র' শব্দও প্রাচীন মহর্ষিদিগের গোসম্পত্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা তাঁহাদের গোসম্পত্তি যেখানে রক্ষা করিতেন, তাহাই 'গোত্র' সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। পরে এই 'গোত্র' শব্দই 'গোষ্ঠ'কে আর না বুঝাইয়া বিশেষ বিশেষ মুনির পরিচয়-বিধায়ক হইয়াছে। এইরূপে 'বিশ্বামিত্র গোত্র' ,ভরদ্বাজ গোত্র' শাণ্ডিল্য গোত্র' ইত্যাদি প্রাচীনকালে তাঁহাদিগের পশু সমৃদ্ধি বা গো-সম্পত্তি সূচনা করিত। বিবাহ-যজ্ঞ প্রভৃতি মাঙ্গল্য অনুষ্ঠানে তখন রাজাগণ সহস্র সহস্র ধেনুদান করিতেন। তখন ভারতে ধেনুসম্পত্তি এত বহুল ছিল যে, ধেনুর মূল্য কয়েক কাহন কড়ি মাত্র ছিল। ধেনুসম্পত্তির এরূপ বহুলতা ও এরূপ সুলভতা আর কোন দেশে কদাপি দৃষ্ট হয় নাই। তখন গোসম্পত্তিই গৃহস্থের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সূচনা করিত।

যে দেশে পশুসম্পত্তি এরূপ প্রচুর ছিল, সে দেশ আজ গাভীশূন্য হইতে বসিয়াছে! দেশে হৃষ্টা পুষ্টা, দুগ্ধবতী গাভী আর দৃষ্ট হয় না। অনাহারে তাহারা অস্থি-চর্ম্ম-সার হইতেছে। গোচারণের মাঠ আর দৃষ্ট হয় না। তাহারা আজ বিধর্ম্ম-বিধানে দারুণ কর্ষণ-যন্ত্রণায় ও আহার অভাবে সর্ব্বদা রোরুদ্যমানা। প্রচুর আহার্য্য প্রভৃত পরিমাণ সঞ্চিত না থাকিলে কিরূপে সে পোষ্য-বর্গকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইবে? অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে অসুর-ধর্ম্মী আগন্তুকগণ ও বিধর্ম্মীগণ প্রাচীন কালের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতবর্ষে প্রতিদিন পঞ্চ সহস্র নিপাত করিতেছে ও তাহাদের মাংসে নিজেদের উদরপূর্ত্তি করিতেছে। হায়! যে দেশে গোজাতির এতদূর হীনাবস্থা ও দুঃখ-কষ্ট, সে দেশ কিরূপে সুখ-সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে? সে দেশ যে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও তাহার অধিবাসিগণ পরাধীন, দুঃখী, দুর্ব্বল, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও ব্যাধিক্লিষ্ট হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? যাহারা মাতার ন্যায় প্রচুর দুগ্ধরূপে আমাদিগের বল ও ওজঃ

বৃদ্ধি করে, যাহাদিগের স্নিগ্ধ মধুর স্তন্যরস হইতে হোমবলসম্পাদক ও দেবভোগ্য আজ্য প্রস্তুত হয়, যাহারা মানবকে অন্ন যোগাইয়া পরিপুষ্ট করিবার জন্য কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায় পরমকল্যাণদাত্রী মহনীয়া ধাত্রী, সেই গাভীগণ প্রতিদিন পঞ্চ সহস্র সংখ্যায় কম্পিত কলেবরে সাশ্রু নয়নে বধ্যভূমিতে গোখাদকের উদর পূর্ণ করিবার জন্য প্রত্যহ উপস্থিত হইতেছে! প্রতিদিন যে এইরূপে জাতীয় সুখ-সমৃদ্ধির উপকরণগুলিকে ভারতে বহুসংখ্যক নরনারী বলিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের উদর পূর্ত্তি করিতেছে ও এইরূপে ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মীগণের সুখ, সমৃদ্ধি, বল, জাতীয় বল, স্বাধীনতা, সৌভাগ্যশ্রী এবং আধ্যাত্মিক জগতের ধর্ম্মোপকরণ সমস্ত সদ্গুণরাশি পরোক্ষে ও ধীরে ধীরে অপহরণ করিতেছে, সে বিষয় আমরা দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। এই উৎকৃষ্ট পশুধন অভাবে আমরা এতদূর আধ্যাত্মিক তেজোভ্রষ্ট, হীনবল ও নীচমনা হইয়া পড়িয়াছি যে, জাতীয় অভ্যুদয়সূচী এই পঞ্চ সহস্র জীবের গভীর আর্ত্তনাদ আমাদের মর্ম্মস্থানসমূহ স্পর্শ করিতেও অসমর্থ হয় ও পঞ্চসহস্র অক্ষিযুগলের অবিরল অশ্রুপাত আমাদিগের এক বিন্দু অশ্রু-আসার আকর্ষণ করিতেও সমর্থ নহে! সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করিয়া গ্রামের কিম্বা নগরের প্রান্তভাগে বসিয়া থাক, দেখিতে পাইবে যে, অসুরসহায় ঘোর ভয়ঙ্করমূর্ত্তি অহিন্দুগণ সেই সেই গ্রাম ও নগরের জাতীয়-সম্পৎ অপহরণ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। অভ্যুদয়শ্রীকামী ভারতীয় আর্য্যগণ উহাদের কঙ্কালসার দেহ, নিদারুণ মর্ম্মপীড়াজনিত অশ্রুপ্রবাহ, ও সুগভীর আর্ত্তনাদ কেহ অনুভব করিয়াছেন কি? অনুভব করিয়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিয়াছেন কি? আপনারা বুঝেন নাই কি—যে জাতীয়বলবিবর্দ্ধক পশুসম্পৎ অপহৃত হইলে জাতির অভ্যুদয়-আশা একেবারে সুদূরপরাহত হইবে। জাতীয়-সম্পৎ রক্ষা, করিতে হইলে, বলবীর্য্য-সৌভাগ্যশ্রীসম্পন্ন করিয়া এই অধঃপতিত জাতিকে অভ্যুদিত করিতে হইলে, এই পশুসম্পত্তি রক্ষা করিতেই হইবে। তাহা না হইলে শুদ্ধসত্ত্বধর্ম্মী এই পশুজাতির অমোঘ অভিসম্পাতে জাতীয় অভ্যুদয়ের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ ও নিরর্থক হইবে। সুতরাং গোসম্পত্তি যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার উপায় করিতেই হইবে। যাহারা হিন্দু জাতি বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা, গোজাতি যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার উপায় বিধান করুন। যে হিন্দুগণ গোপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না, যাহা তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল, সেই হিন্দুগণ এখন পরাধীনতার পেষণে জাতীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইয়া, গোজাতির অবনতি ও দুর্গতি সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেছেন ও তাহা সহ্য করিতেছেন। গোগ্রাস দিবার সময় অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, এখনও বোধ হয় সে মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন—

"সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥"

ঐ দেখ, নিত্যকর্ম্মসেবী ব্রাহ্মণগণ "অয়ি সর্ব্বকল্যাণদাত্রি! পবিত্রমূর্ত্তি! পুণ্যরাশি! ত্রৈলোক্যজননী সুরভিকন্যাগণ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই প্রদত্ত তৃণকবল গ্রহণ করুন" এই বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে গাভীসকলকে আহার প্রদান করিতেছেন। আবার সেই কল্যাণমূর্ত্তিকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতেছেন।—

"পঞ্চভূতে শিবে পুণ্যে পবিত্রে সূর্য্যসম্ভবে।
প্রতীচ্ছেমং ময়া দত্তং সৌরভেয়ি নমোঽস্তুতে॥
নমোগোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমোব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥"

অয়ি পুণ্য পবিত্র মূর্ত্তি! অয়ি পঞ্চভূত-কল্যাণদাত্রি! অয়ি সূর্য্যসম্ভবা সৌরভেয়ী-গণ! আপনাদিগকে প্রণাম। আপনারা আমার প্রদত্ত এই বলি গ্রহণ করুন। গোগণকে প্রণাম; তাঁহারাই শ্রীমূর্ত্তি, তাঁহারাই স্বর্গের সুরভিকন্যা, তাঁহারাই ব্রহ্মসন্ততি, তাঁহারাই পবিত্রমূর্ত্তি। তাঁহা-দিগকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

পাশ্চাত্যালোকালোকিত কৃতবিদ্যগণ হয়ত ভাবিতে পারেন, গরুকে প্রণাম নিতান্ত হাস্যজনক। কিন্তু তাহা নহে। অনুষ্ঠানমার্গাবলম্বী যোগারূঢ় সাধকদিগের মুখে শুনা যায় যে, ভাবমাত্রই শক্তিযুক্ত হইলে, তাহারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। শক্তি-শালী ভাবমাত্রকে আবার মন্ত্র দ্বারা সুসংস্কৃত করা হয়। উহাকে আবার ঋষি, দেবতা, ও বিনিয়োগ নির্ব্বাচিত করিয়া চৈতন্য-যুক্ত করা হয়। কাজে কাজেই ভাবসমূহ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। প্রতিমা ভাবের প্রতিফলন। সুতরাং প্রতিমাপূজায় ভাবে-রই—শক্তিরই পূজা করা হইয়া থাকে,—চৈতন্যেরও পূজা করা হইয়া থাকে।

মন্ত্রে গাভীকে 'সুরভিকন্যা' বলা হই-য়াছে। সূর্য্যসম্ভবা বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম-সুতা বলা হইয়াছে। যেমন প্রজাপালক ও লোকানুরঞ্জক রাজাগণ অষ্টলোকপালের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন, তদ্রূপ সর্ব্বলোক-হিতদাত্রী মহতী গাভীগণ ঐ সমস্ত দেব-তার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবিধ প্রকারে মনুষ্যবর্গের হিতসাধন করিতেছেন। সুরভি স্বর্গের ধেনু, কামদুঘা। এই সুরভিকন্যা নন্দিনীই বশিষ্ট-আশ্রমে পালিতা হইয়া রাজা রঘুর কামনা পরিপূর্ণ করেন। শুনিতে পাই, কামদুঘা গাভী ভারতে তখন প্রচুর ছিল। এখন আর কামদুঘা গাভী দৃষ্ট হয় না। গোরুকে আহার প্রদান, গোরুকে প্রণাম আর্য্যদের নিত্য-কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। গৃহস্থ পরিবার-বর্গ যাহার দুগ্ধপানে পরিপুষ্ট হইত, যাহা-দিগের নিকট হইতে ঘৃত, দুগ্ধ প্রাপ্ত হইয়া আর্য্যগণ, যজ্ঞভূমি সুমধুর সামগীতে সুসজ্জিত করিতেন, তাঁহারা এখন গোগণের দিকে ফিরিয়াও চান না! দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে, গাভী সকল পল্লী ও গ্রাম সমূহ হইতে ক্রীত ও নীত, নগরপথে চালিত ও মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া গোখাদকদিগের আহার্য্যার্থে অপেক্ষা করিতেছে। হায় হায়! মাতৃমূর্ত্তি এই সমস্ত গোগণকে রক্ষা করিতে কি কেহ নাই? ইহাদের রক্ষা করিবার কি উপায় নাই?

উপায়।

আমাদের মনে হয়, প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি নগরে হিন্দু-ধর্ম্মানুরাগী ভদ্র মহোদয়গণ দশজনে মিলিয়া গোরক্ষার জন্য সম্মিলিত হউন। তাঁহারা তাঁহাদের পল্লীর প্রত্যেক গৃহস্থ অভিভাবকের নাম ও গাভী-সংখ্যা তালিকা ভুক্ত করুন। গরুগুলির মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী, দুগ্ধবতী, বৎস হিসাবে পার্থক্য রাখুন। কতগুলি জন্মিল, কতগুলি মরিল, কোন্ রোগে মরিল, কোন্ গরুর কখন কোন্ রোগ হইল, ইহার হিসাব রাখুন। গোরক্ষার্থে যত্নবান হইয়া যাঁহারা সমবেত হইবেন, তাঁহারা গোচিকিৎসার কিছু অভিজ্ঞানও অর্জ্জন করিবেন। আধুনিক হিসাব অনুসারে কিছু পড়াশুনা করিবেন। অধুনা গোজাতির প্রতি ঔদাসীন্য বশতঃ তাহাদের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব সমধিক হইয়াছে। কয়েকটি নূতন প্রকার রোগও দেখা দিয়াছে। সে সমস্ত রোগের নাম ও তাহাদের চিকিৎসাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানদায়ক সকল প্রকার পুস্তকাদি পাঠে যত্নবান থাকিবেন। গো-রক্ষা সমিতির পারিষদ্‌বর্গ গো-জাতির রোগ সমূহের পরিচয় ও তাহাদের চিকিৎসা বিধান তত্ত্ব পুস্তিকা প্রচার দ্বারা বা মৌখিক উপদেশদ্বারা গোপালককে অভিজ্ঞাত করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থের সহিত সমিতি পরিচয় রাখিবেন। গৃহস্থের পরিবারবর্গের যে কেহ মধ্যে মধ্যে সমিতিতে যাইয়া তাঁহাদের পশু-সম্পত্তির কুশলাকুশল বার্ত্তা প্রদান করিবেন কিম্বা সমিতির কোন পারিষদ্ (গৃহস্থের সংবাদ দিবার যেখানে অসুবিধা থাকিবে) গৃহস্থের আলয়ে গিয়া তাঁহার পশুসম্পত্তির তত্ত্ব লইবেন। সমিতি স্বয়ং গোচারণের জন্য ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিবেন। যাহাতে তাঁহাদের পল্লীর সমস্ত গোধনগুলি সুখে বিচরণ ও আহার করিতে পারে, এরূপ ভাবে একটি কি একাধিক গোষ্ঠ নির্ব্বাচন করিবেন। সমিতি স্বয়ং কতকগুলি গোধন পোষণ করিবেন। যে সমস্ত গৃহস্থ অর্থকৃচ্ছ্রবশতঃ তাঁহাদের গো-সম্পত্তি রক্ষা করিতে অসমর্থ হইবেন, তাঁহারা অপর কাহারও নিকট গো-ধনগুলি বিক্রয় না করিয়া সমিতির নিকটই বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন। কৃষকদিগের গো-সম্পত্তি ভিন্ন সমস্ত সম্পন্ন ও সাধারণ গৃহস্থ ইচ্ছা করিলে গোষ্ঠে তাঁহাদের গরু সকল প্রেরণ করিতে পারিবেন। এইরূপে প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে গো ধন রক্ষার্থে পল্লীর দয়ালু অধিবাসিগণ সমবেত হইবেন ও পল্লীর কোন গরু দুষ্ট লোকের হস্তে পড়িয়া বা বিক্রীত হইয়া কোনরূপ নিগ্রহ ভোগ না করে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন ও সবিশেষ প্রযত্ন করিবেন। অর্থসংগ্রহ সম্বন্ধে ইহাই বলা যাইতে পারে,—এই মহৎ কার্য্যে ঐকান্তিক ও পবিত্র ইচ্ছা থাকিলে, অর্থসংগ্রহোপায় আপনা আপনিই সমিতি স্থির করিতে পারিবেন।

এইরূপে যদি দয়ার্দ্রহৃদয় মহোদয়গণ দেশের পশুসম্পত্তি রক্ষার্থে যত্নবান হ'ন, তাহা হইলে ভারতের দুর্দ্দিন চলিয়া যাইয়া আবার সুদিন ফিরিয়া আসিবে। ভারতের অধিবাসিগণ আবার প্রচুর দুগ্ধ-ঘৃত পান করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিয়া রোগমুক্ত হইবেন; আবার দেবতাগণ হব্যবাহন-মুখে তাঁহাদের যজ্ঞাংশ লাভ করিয়া প্রচুর বর্ষণ করিবেন ও গো-মূর্ত্তি পৃথ্বীদেবী শস্যশালিনী হইয়া প্রজাবর্গের আহারস্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিবেন।*

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

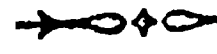
---

* কতকগুলি ব্যক্তির আহার সম্বন্ধে অনেকে ব্যাকুল হইতে পারেন; কিন্তু তজ্জন্য চিন্তিত হওয়া অনাবশ্যক। কেননা সমুদ্র-পার ও দূর দূরান্তর হইতে তাঁহাদের আহার্য্য আসিবার বাধা নাই। ('ব্রাহ্মণ' বিষয় বারান্তরে আলোচ্য)।

শ্রীহরিঃ

১৮৬৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।).

হিন্দু-পত্রিকা।



১৫শ বর্ষ, ১৫শ খণ্ড, ২য় সংখ্যা। } জ্যৈষ্ঠ। ১৩১৫ সাল, ১৮৩০ শকাব্দা।

খৃষ্টধর্ম্ম ও আর্যদর্শন।

খৃষ্টান উপাসক বলেন যে, অনুগ্রহ (mercy.) ও ন্যায়পরায়ণতা (justice) একাধার (ঈশ্বর) হইতে একসঙ্গে এক সময় প্রকাশ পায় না। তাই নাকি করুণার মূর্ত্তি শ্রীশ্রীপ্রভুযীশুর আবির্ভাব! শ্রীশ্রীপ্রভু যীশু মানুষকে অনুগ্রহ করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন। এ বেশ সিদ্ধান্ত। কিন্তু পাপের মূর্ত্তি মারের (সেটানের) আবির্ভাব কেন হইল? এ প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাস্য, শ্রীশ্রীপ্রভু যীশু আসিলেন কোথা হইতে? উত্তরে হয় বল নিত্য, না হয় বল ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্রেই কুমারী মেরীর গর্ভে সৃষ্ট হইলেন। যদি বল, তাঁহারা উভয়ে নিত্য, তাহা হইলে ঐ মতের ঈশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্বের বাধ হয়; যেহেতু নিত্য বস্তু স্বয়ংই, কোন শক্তি বা কর্ত্তার অধীন নহেন; তাই খৃষ্টান্ ধর্ম্মগ্রন্থে শ্রীশ্রীপ্রভু যীশুর জন্ম স্বীকার আছে। আর যদি বল, সেটানও তাঁহার ঈশ্বরের [illegible] সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে ঈশ্বর সেটান সৃষ্টি করিয়া মানুষকে তাহার দ্বারা প্রকারান্তরে পাপ করাইতেছন না কি? যদি তিনি সেটান সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে মানুষ পাপ কার্য্য করিত কি? আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঐ সেটান আপনা আপনি আছে, একথাও খৃষ্টধর্ম্ম পুস্তকের মতে বলিতে পার না, কারণ তাহা হইলে ঐ মতের সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃত্বের অপলাপ হয়। সেইজন্য খৃষ্টধর্ম্মে বলে,—মানুষকে পরীক্ষা করিবার জন্য সেটানের উৎপত্তি! একথাও যুক্ত নহে, যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তিনিত জানিতেনই যে সেটানের প্রলোভনে

মানুষ পাপকর্ম্ম করিবেই; তবে জানিয়া আবার পরীক্ষা কেন? অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই পরীক্ষা করে। তাহা হইলে খৃষ্টধর্ম্মের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু এই বিশ্বের মূল কারণ (সকল আস্তিকের ঈশ্বর) একই, এবং তিনি বিভু ও সর্ব্বজ্ঞ। এখন বাইবেলই মীমাংসা করুন, সেটানের উৎপত্তি কেন? উক্ত মতে "এক সঙ্গে (ঈশ্বরের) অনুগ্রহ ও ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পায় না" বলিয়া, করুণার অবতার প্রভু যীশু আসিয়াছিলেন। এক্ষণে হে যীশুভক্ত! তুমি অকপট হৃদয়ে ন্যায়-যুক্তি আশ্রয় করিয়া বল দেখি যে, ঐ করুণা বা অনুগ্রহের (প্রভু যীশু) ও পাপের (সেটানের) অবতারদ্বয় কেমন করিয়া তাঁহা (ঈশ্বর—একাধার) হইতে এ মর লোকে অবতীর্ণ হইলেন? সতের (কারণে যাহা আছে, তাহারই) উৎপত্তি হয়; অসতের (কারণে যাহা নাই, তাহার) কখনও উৎপত্তি দেখা যায় না। "না সতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (গীতা) (From nothing comes out nothing.) আর্য দর্শনশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এক বাক্যে এই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার ও প্রমাণ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আর তর্কযুক্তি অপ্রয়োজন। ফলকথা, সৃষ্টির মূল-কারণে (আস্তিকের ঈশ্বর ও নাস্তিকের জড়া শক্তি প্রকৃতিতে ও তাহার কার্য্যে) ঐ করুণার, পাপের, পুণ্যের ও ন্যায়পরায়ণতার (mercy, justice, virtuc and vice) প্রাগ্ভাব বিদ্যমান ছিল, আছে বা ভবিষ্যতে থাকিবে, তাই এই মরলোকে প্রকাশ হইয়াছে, প্রমাণ হইতেছে নাকি? এখন বিচারবান্ চিন্তাশীল ব্যক্তি ও খৃষ্টভক্ত মাত্রেই বুঝুন, "ঈশ্বর হইতে একত্রে একসময়ে অনুগ্রহ এবং ন্যায়-বিচার প্রকাশ পাইতে পারে না," এই সিদ্ধান্তে খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী উপনীত হইয়া, পাপের বোঝাও (সেটানকেও) তাঁহার উপরে চাপাইয়াছেন *। এই সকল গোলমেলে (conflicting) বিষয়ের মীমাংসা বা সৎসিদ্ধান্তে

* ঐ সেটানের ব্যক্তিত্ব (personality) স্বীকার করিলে স্রষ্টার (ঈশ্বরের) উক্ত দোষ হয় (পাপের প্রাগ্ভাব আসে) বলিয়া বর্ত্তমান খৃষ্টানগণ বলেন যে, "সেটান (মার) বলিয়া কোন ব্যক্তি নাই, মনের কুপ্রবৃত্তিই ঐ সেটান। তাঁহারা আরও বলেন যে, ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা ও জ্ঞান (হিতাহিতজ্ঞান) দিয়াছেন; এই স্বাধীন ইচ্ছা ও হিতাহিত জ্ঞান দ্বারা মানব ভাল-মন্দ বিচার করিয়া কার্য্য করিলে আর ঐ সেটানের (মনের কুপ্রবৃত্তির) প্রলোভনে পড়িতে হয় না"। এ বেশ যুক্তি, কিন্তু তাঁহাদের ঈশ্বর কি দয়াময় ও সর্ব্বজ্ঞ নহেন? নিশ্চয়ই তিনি দয়াময় ও সর্ব্বজ্ঞ; অতএব দুর্ব্বল মানুষকে স্বাধীনতা ও ঐ জ্ঞান দিয়া ছাড়িয়া দিলেই দুর্ব্বল মানুষ সেটানের (মনের কুপ্রবৃত্তির) অধীন হইয়া পাপকার্য্য করিবেই। বর্ত্তমান খৃষ্টানগণের ঐ যুক্তিতে ঈশ্বরের দয়া ও সর্ব্বজ্ঞত্ব-শক্তির অপলাপ হইতেছে না কি? অর্থাৎ কোথায় কাহার দয়াময় পিতা দুর্ব্বল পুত্রকে স্বাধীনতা দিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন করান? সকল পিতাই পুত্র সম্যক্ ঐ জ্ঞানবলে বলীয়ান্ নাহওয়া পর্য্যন্ত সাবধানে রক্ষা, পালন ও শাসন করেন না কি? এমন কি, পশুপক্ষীও দুর্ব্বল শিশুদের সম্বন্ধে রক্ষা ও পালন করিয়া থাকে, স্বাধীনতা দেয় কি?

উপনীত হইতে হইলে, আর্যদর্শন (সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত) আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অর্থাৎ এই সৃষ্টির সর্ব্ববাদী-(আস্তিক ও নাস্তিকগণ) সম্মত. মূলকারণ (অনাদি অনন্ত পূর্ণশক্তিসমষ্টি), যাঁহাকে আর্য-দার্শনিক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও পুরুষ, মায়া ও ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে অনাদি জীব অভিব্যক্ত হইয়া নিজ নিজ কৃত অনাদি কর্ম্ম হইতে ইহলোকে বা পরলোকে পাপ ও পুণ্যফল ভোগকরে। সাধকের উপাসনাও কর্ম্ম, ঐ কর্ম্ম হইতে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ হয়, আবার এই উপাসনার বিপরীত কর্ম্ম (পাপানুষ্ঠান) দ্বারা মানুষ নিগ্রহ (নরকাদি) ভোগ করে। সকল জীবের নিজকৃত শুভাশুভ কর্ম্মই সুখ-দুঃখাদির হেতু হয়। ঈশ্বর কাহারও প্রতি ন্যায় বা অন্যায় বিচার, অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করেন না। নিজকৃত পুণ্য-কর্ম্ম-বলেই জীব তাঁহার অনুগ্রহ আকর্ষণ করে। শ্রীশ্রীভগবান্ মহর্ষি কপিলের উপদিষ্ট ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও পুরুষ যোগে (এই প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনই সর্ব্ব আস্তিক ঈশ্বরবাদীর সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রভাবে) পরিদৃশ্যমান বিশ্ব আবির্ভূত হইয়াছে। এই পুরুষ-প্রকৃতি-মিলন হইতেই শ্রীশ্রীভগবান্ রামচন্দ্র, শ্রীশ্রীভগবান্ বুদ্ধ, শ্রীশ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীশ্রীভগবান মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য, শ্রী শ্রী প্রভুযীশুখৃষ্ট, শ্রী শ্রীহজরৎ মহম্মদ, শ্রীশ্রীমহাত্মা গুরুনানক, শ্রীশ্রীগুরু গোবিন্দসিংহ প্রভৃতি মহাপুরুষ বা অবতারগণ আবির্ভাব ও লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। মার (সেটান) ও দানবগণও ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অভিব্যক্ত ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। এই বিশ্বে কোন বস্তুই ("বাস বা অবস্থিতি আছে যাহার, তাহাই বস্তু")

ঈশ্বরের ত কথাই নাই ; তিনি পরমকরুণানিধান ও সর্ব্বজ্ঞ ; জানিতেনইত যে, এই স্বাধীনতা হইতে মানব মহাপাপ-পঙ্কে নিপতিত হইবে। তাহা জানিয়া মানবজাতিকে পাপাসক্ত করা হইতেছে না কি ? অতএব বর্ত্তমান খৃষ্টানগণই বলুন, ঐ সিদ্ধান্তে ঈশ্বরকে পরমদয়াল ও সর্ব্বজ্ঞ ("God is merciful and omniscient") বলিতে পারা যায় কি ? জানিয়া শুনিয়া কোন্ পিতা অনুপযুক্ত দুর্ব্বল পুত্রকে স্বাধীনতা ও ঐ ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়া পাপানলে পড়িতে দেন ? এই সকল গোলমেলে বিষয় আর্যদর্শন-শাস্ত্রোক্ত প্রণালী দ্বারা সুন্দর ভাবে মীমাংসা করা হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম-পুস্তকে যে ঐরূপ (Conflicting) (গোলমেলে) সিদ্ধান্ত আছে, তাহার হেতু "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও অবতারবাদ" গ্রন্থে ১৫ প্রস্তাবে মীমাংসা করা হইয়াছে। অর্থাৎ দেশকালপাত্রভেদে (ব্যক্তিগত গুণ-কর্ম্মানুসারে) ঐ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত প্রচার করা হইয়াছে। আর্যশাস্ত্রেও ঐরূপ নানা মত (দেশকাল-পাত্রগত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণকর্ম্মানুসারে) আছে। এতএব খৃষ্টধর্ম্মের আদি বক্তা পুরুষ ঐ সকল মত প্রকাশ করিয়া যথাযথ কার্য্যই করিয়াছেন। সুতরাং ঐ খৃষ্টধর্ম্মপুস্তক বাইবেল্ ও কোরাণাদিও সত্য এবং "আগম" ("Regulation") পদবাচ্য। তবে যদি বল যে, ঐ খৃষ্ট-মতাদির প্রতিবাদ করা হইল কেন ? উত্তর—মানবের শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের (উচ্চ জ্ঞানের—অর্থাৎ আর্যদর্শন—সাংখ্য ও বেদান্ত এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উজ্জ্বল জ্ঞানালোকের (The end of wisdom.) সহিত তুলনায় উহা সদোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাই এ প্রতিবাদ।

আদৌ ছিল না, হঠাৎ সৃষ্ট হইল, এরূপ নহে; সত্তেরই (যাহা কারণে আছে, তাহারই) অভিব্যক্তি হয়। কালে এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইতে একবার বিকাশ (কার্য্যাবস্থা) হইতেছে, আবার কালে লয় (নাশ—কারণপ্রবেশ—অব্যক্তাবস্থা) হইতেছে। ইহার নাম সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সংশয় সকলের কেমন উচ্ছেদ হয়, স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। আর খৃষ্টধর্ম্ম-পুস্তকের ঐ সংশয় থাকিবে না। প্রাগুক্ত প্রাকৃতিক লয়-বিকাশ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অতীত কালে পূর্ব্বোক্ত কত মহাপুরুষ বা অবতার কতবার অভিব্যক্ত ও লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে কতবার হইবেন, তাহা কে বলিতে পারে? এ দার্শনিক মতে এই জগতের মত কত জগৎ (যাহা চলিয়া যায়, থাকে না, তাহাই জগৎ—গম্‌ধাতু নিপাতনে সিদ্ধ) ভূত কালে চলিয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও কত যাইবে, তাহা কে জানে? এইরূপ কোটি কোটি জগৎ ছিল, আছে ও ভবিষ্যতে হইবে, বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীসাংখ্য-প্রকাশ ব্রহ্মচারী।
(কাপিলাশ্রম।)

অষ্টকর্ম্ম ও পঞ্চবর্গ।

প্রাচীন ভারতের রাজনীতিশাস্ত্র যাঁহারা নিপুণ নয়নে অবলোকন করিয়াছেন, "অষ্টকর্ম্ম ও পঞ্চবর্গ" তাঁহাদের প্রায় সকলেরই লোচনভবনের আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার মধ্যে রাজজীবনের সমুজ্জ্বল অংশ—কীর্ত্তিজ্যোতিঃ প্রদীপ্তভাগ অষ্টকর্ম্মের অত্যন্ত আত্মীয়। পঞ্চবর্গ-বিধান অপরিহার্য্য হইলেও, তাহাতে স্বভাবানুমত মানব-ধর্ম্মের প্রসার সংসাধিত হয় না; সুতরাং তাহার প্রভাব রাজজীবনে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত প্রবল নহে। ইহা কেবল রাষ্ট্রশাসনে রাজশক্তির প্রধান আলম্বন মেরুদণ্ড।

অষ্টকর্ম্ম সম্বন্ধে ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়—

"আদানে চ বিসর্গে চ তথা প্রৈষ-নিষেধয়োঃ। পঞ্চমে চার্থবচনে ব্যবহারস্য বেক্ষণে, দণ্ডশুদ্ধ্যোঃ সদাযুক্তস্তেনাষ্টগতিকো নৃপঃ।"

অর্থাৎ রাজা অষ্টকর্ম্মা; অষ্টকর্ম্ম এই, যথা—আদান, বিসর্গ, প্রৈষ, নিষেধ, অর্থবচন, ব্যবহারেক্ষণ, দণ্ড, শুদ্ধি।

আদান অর্থ করশুল্কাদির গ্রহণ; প্রজাকুলের নিকট হইতে দৈনিক, মাসিক ও বার্ষিক, যথাসম্ভব বিহিত কর গ্রহণ ও নৌকাভরণ স্থানে, বাণিজ্যক্ষেত্রে, দ্রব্যোৎপত্তি-প্রদেশে ও অন্যত্র যথোপযুক্ত বিহিত শুল্কস্বীকারের নাম আদান।

বিসর্গ—অর্থাৎ যথোপযুক্ত পাত্রে সদুদ্দেশ্যে অর্থাদিদান। (১) এই দান বেতন,

(১) প্রাচীন ভারতে করশুল্কাদি-লভ্য অর্থ রাজসেবায়ই ব্যয়িত হইত না। গ্রহণ অপেক্ষা দানের পরিমাণ অনেক সময় অধিক হইত। রঘুবংশের মহাকবি

পুরস্কার ও রাষ্ট্র-মঙ্গলকর কার্য্যার্থেই প্রায়শঃ বিহিত ছিল।

প্রাচীন ব্যাখ্যাতা মহাত্মা মেধাতিথি ভট্ট বলিয়াছেন "প্রৈষ দুষ্টত্যাগঃ" দুষ্ট-ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা—অর্থাৎ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা প্রৈষ। বঙ্গীয় পণ্ডিতচূড়ামণি বারেন্দ্র বংশাবতংশ কুল্লুক ভট্ট মহোদয় বলিয়াছেন—"প্রৈষোহমাত্যা-দীনাং দৃষ্টাদৃষ্টানুষ্ঠানেষু," পারজ্ঞাত প্রয়োজন ও অদৃষ্টার্থ বিষয়ে অমাত্যাদির প্রতি অনুমতি দান, রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য তত্তদাবকৃত পুরুষের প্রতি অনুজ্ঞা প্রচারই প্রকৃত পক্ষে প্রৈষ শব্দের অর্থ। মহামতি মেধাতিথির ব্যাখ্যা দোষস্পর্শবর্জ্জিত নহে; দুষ্টত্যাগ দণ্ডপ্রকরণের অন্তর্নিবিষ্ট, সুতরাং অষ্টকর্ম্মের মধ্যে প্রৈষ যদি দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে সপ্তকর্ম্ম গণনা সংসাধিত হয়। প্রৈষ শব্দের অনুজ্ঞা অর্থ সুপ্রসিদ্ধ। অনুজ্ঞা-প্রচার বহুবিধ। সাধারণতঃ দুই ভাগে ইহার বিভাগ হইতে পারে। কোনও আদেশ ব্যক্তিগত, কোনও আদেশ সার্ব্বজনিক। ব্যক্তিগত আদেশ লেখ্য ও মুদ্রা এবং দূতাদিদ্বারা প্রচারিত হইত। সার্ব্বজনিক আদেশ, যাহার প্রয়োগক্ষেত্র দেশের সমস্ত ব্যক্তি, সেইরূপ আদেশ করিঘণ্টা (হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আজ্ঞাপ্রচারক দীর্ঘঘণ্টাধ্বনি যোগে, তারস্বরে রাজাজ্ঞা ঘোষণা করিতেন,) ও পটহধ্বনি দ্বারাই প্রায়শঃ ঘোষিত হইত। মহাভারতের উপাখ্যানক্ষেত্রে বিরাটপুরে জয়োৎসব ঘোষণার জন্য "ঘণ্টাবান্ মানবঃ ক্ষিপ্রং মত্তবারণসংশ্রিতঃ" হইয়া রাজবর্ত্মে গমন করিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

নিষেধ—অকর্ত্তব্য উপদেশ। কার্য্যের অনুষ্ঠানের উপদেশ প্রৈষ, আর অকরণের—বিরতির উপদেশ নিষেধ। মেধাতিথির মতে যে সকল ব্যক্তি 'অর্থাধিকৃত' অর্থাৎ যাহারা অর্থ সংগ্রহস্থানে তৎকার্য্যের ভার-প্রাপ্ত, তাহাদের অসৎ প্রবৃত্তি নিরোধের ব্যবস্থা করা। অর্থসংগ্রাহক (কলেক্টর) ও দ্রব্যসংগ্রাহক (যাহারা খনিস্থানে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাজসদনে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়াছে) কর্ম্মচারী সহজেই স্বকরগত অর্থ-দ্রব্য অপহরণ করিতে পারে। সুতরাং সে সকল স্থানে এমন সুব্যবস্থার প্রয়োজন, যদ্দ্বারা তাহারা ঐ পাপ-প্রবৃত্তিকে পদাঘাতে দূরে বিতাড়িত করিয়া কর্ত্তব্যের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। যোগ্য-বৃত্তি ব্যবস্থা ও যোগ্যতম ব্যক্তির নিয়োগ এবং পরীক্ষা-প্রথা প্রধানতঃ এই কর্ম্মের প্রধান সাধন ছিল। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—"শুচীন্ আকরকর্ম্মান্তে"। ঐ স্থানে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ করিতে হইবে।

অর্থবচন—অর্থাৎ সন্দিগ্ধ বিষয়ে রাজ-বাক্যানুমতে ব্যবস্থাকরণ। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সন্দেহ হয় রাজা প্রধান পুরুষগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সুব্যবস্থা করিবেন,

---

ভারতের অমরকীর্ত্তি কালিদাস লিখিয়াছেন, "প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিম-গ্রহীৎ সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবিঃ।" প্রজাদলের মঙ্গলার্থেই গৃহীত কর ব্যয়িত হইত।

ইহাই অর্থবচন। এই অর্থবচন রাষ্ট্রের ধর্ম্ম ও লৌকিক বিষয়ে সর্ব্বত্রই প্রযুক্ত হইতে পারিত। এই কার্য্য রাজা স্বয়ং গবেষণা পূর্ব্বক সম্পাদন করিতেন, ব্যবহারের ন্যায় পক্ষবিশেষের আবেদন বা দূতগণের অনুসন্ধান এখানে আবশ্যক হইত না।

ব্যবহারাবেক্ষণ—বিচারকার্য্য সম্পাদন। যেখানে ন্যায় ও ধর্ম্ম অন্যায় ও অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হয়, যেখানে ব্যক্তিগত অধিকার ও শান্তি অপরের দ্বারা বিনষ্ট হইবার সূচনা হয় যেখানে ছল সত্যের অবমাননা করে, অত্যাচারের উদ্ধত দণ্ড দুর্ব্বলের বক্ষে পতিত হয়, সেখানে প্রতীকার ও সংস্কার আবিষ্কারের জন্য ব্যবহার দর্শন প্রয়োজন। কোনও স্থানে অন্যায়ের প্রতীকার, কোনও স্থানে সত্যের আবিষ্কার, কোনও স্থানে দোষের অপনয়ন ও গুণের আধানরূপ সংস্কার সাধন। ব্যবহারের কারণ উৎপাদন রাজা বা রাজপুরুষ স্বয়ং করিবেন না। আপনা হইতে সংঘটিত হইলে, তাহার বিচার করিবেন। ব্যবহার শব্দের অর্থনির্ব্বচনে ব্যবহারবিদের উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

"বি নানার্থেঽব সন্দেহে হরণং হারউচ্যতে।
নানাসন্দেহ হরণাৎ ব্যবহার ইতি স্মৃতঃ।"

'' ব্যবহারতত্ত্বজ্ঞ পরমর্ষি বলিয়াছেন, বি অর্থ নানা, অব অর্থ সন্দেহ, হার অর্থ হরণ, সুতরাং ব্যবহার অর্থ—নানা সন্দেহ হরণ, বাদি-প্রতিবাদীর বর্ণনা প্রমাণাদি অবগত হইলে, সত্যতত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে বিবিধ সংশয় নিরসন সংঘটিত হয়, সুতরাংই ব্যবহারে নানা সন্দেহ হরণ সংসাধিত হয়।

দণ্ড—অপরাধীর দমনার্থে যাহা অনুষ্ঠিত হয়। দণ্ড সামান্যতঃ দ্বিবিধ, শারীর দণ্ড ও ধনদণ্ড। শারীরদণ্ড অপরাধানুসারে ও অপরাধীর বয়ঃশক্ত্যনুসারে তাড়নাদি বধ পর্য্যন্ত। ধনদণ্ড অপরাধানুরূপ ও অপরাধির সামর্থ্যানুগত ভাবে কাকিনী (এক কড়া কড়ি) হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বস্বাপহরণ পর্য্যন্ত। অবস্থাবিশেষে 'ধিগ্-দণ্ড'—অর্থাৎ ভ্রমকৃত স্বল্প দোষস্থলে যদি অপরাধীর পশ্চাত্তাপ জন্মে, তবে তিরস্কার পূর্ব্বক সাবধান করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অপরাধবিশেষে অবস্থা-ভেদে বন্ধনাগার-প্রবেশ অর্থাৎ জেলে দেওয়া এবং বধদণ্ডের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাসন-দণ্ড ব্যবস্থাপিত হইত।

শুদ্ধি—সংশোধন, স্থলভেদে অপরাধবিশেষে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্তরূপ কষ্টকর সংযমসাধন উপবাসাদি ব্রত, অশক্ত পক্ষে গো-দান—ধনদানাদির কর্ত্তব্যতা ব্যবস্থা ছিল। এই শাস্ত্রীয় শুদ্ধি ও সামাজিক শাসন দ্বারা এবং ধর্ম্মোপদেশ—নীতিশিক্ষাদিদ্বারা পথভ্রষ্ট ব্যক্তির চরিত্রোন্নয়নই শুদ্ধি শব্দবাচ্য। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, অস্মদ্দেশে রাজা দেশের রক্ষক বা শাসকমাত্র ছিলেন না। ধর্ম্ম ও নৈতিকপবিত্রতা রাজছত্রের শীতলছায়ায় আত্মরক্ষা করিয়া, বৃদ্ধি, শুদ্ধি ও সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইত।

এই অষ্টকর্ম্ম, শাস্ত্র ও নীতিসম্মতমার্গে

বিচরণ করিয়া যিনি আমরণ সাধন করিতে পারেন, তাঁহার আগমনোদ্দেশে স্বর্গের অর্গল আপনা আপনি অদৃশ্য হয়। ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন—"অষ্টকর্ম্মা দিবং যাতি রাজা শক্রাভিরর্চ্চিতঃ।" অষ্টকর্ম্মা রাজা শক্রগণের দ্বারায় পুজিত হইয়া স্বর্গে গমন করেন।

অষ্টকর্ম্ম বলিতে কেহ কেহ বুঝেন, অকৃতারম্ভ, কৃতানুষ্ঠান, অনুষ্ঠিত-বিশেষণ, কর্ম্মফলসংগ্রহ, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড।

অকৃতারম্ভ—অর্থাৎ যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই, অথচ অত্যন্ত আবশ্যকীয়, সে গুলির আরম্ভ সাধন।

কৃতানুষ্ঠান—যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতেও উহার উপযোগিতা আছে, সেই সকল কার্য্য ইদানীং ও পরবর্ত্তী সময়ে সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা করা।

অনুষ্ঠিত-বিশেষণ—যে সমুদয় ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের অংশবিশেষের উপযোগী সংস্কার বা বিশেষত্ব নিষ্পাদন, অর্থাৎ প্রচলিত কার্য্য বা বিধানের অংশবিশেষের সাময়িক পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন সাধন।

কর্ম্মফলসংগ্রহ—অর্থাৎ পূর্ব্বকৃতকর্ম্মসমূহের ফলাফল চিন্তা। এই চিন্তাদ্বারা নূতন উপযোগিতার আবিষ্কার হয়; হেয় বর্জ্জন পূর্ব্বক উপাদেয় গ্রহণের নবশিক্ষা এই চিন্তার প্রসাদ-সম্ভূত।

সাম—মধুর বচন; যেখানে সহজে কৃতকার্য্যতায় অধীশ্বর হওয়া সম্ভব নয়, সেখানে মধুর সম্ভাষণ, মনস্তুষ্টিকর স্তুতিবাক্যাদির প্রয়োগরূপ সাম স্বার্থসিদ্ধির প্রশস্ত রাজবর্ত্ম আবিষ্কার করে।

দান—স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তী, অশ্ব, যান, ভূমি প্রভৃতি প্রদান দ্বারা আত্মরক্ষা ও স্বকার্য্যোদ্ধার।

ভেদ—শক্রপক্ষীয় জনগণের মধ্যে গৃহবিবাদ বা মতবৈষম্য উৎপাদন।

দণ্ড—অন্য উপায় অর্থাৎ সাম-দান-ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় সমবেত ও পৃথগ ভূতরূপে প্রয়োগ করিয়াও যদি দুর্দ্দিন-রজনীর অবসান দর্শন অসম্ভব হয়, তখন সর্ব্বপ্রাণে সমবেত বল প্রয়োগ করিবে। "দণ্ডস্ত্বগতিকা গতিঃ" দণ্ড অগতির গতি। উপায়ান্তর-সম্ভাবনায় দণ্ডের বিধান সঙ্গত নহে। প্রকাশ্য বল-পরীক্ষায় অন্তরায় অনেক; বিজয় বা কার্য্যসিদ্ধি অনিশ্চিত; সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংশয়স্থান; এমত ক্ষেত্রে সমস্ত সাধন ব্যর্থ হইলেই চরম-চিকিৎসার বিধান।

অপরে কেহ কেহ মনে করেন, বণিক্-পথ, সেতুবন্ধন, দুর্গনির্ম্মাণ, দুর্গসংস্কার, খনিখনন, সৈন্যনিবেশ, হস্তিবন্ধন, বনচ্ছেদন, এই অষ্টকর্ম্ম।

বণিক্পথ—বাণিজ্যবিধান; বাণিজ্য-বিধান রাজশক্তির পৃষ্ঠবলভরে সংপূর্ণ হয়।

সেতুবন্ধন—খাল্ কাটান ও পুল এবং বাঁধ বাঁধা। ব্যবহারশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—

"সেতুস্তু দ্বিবিধো জ্ঞেয়ঃ খেয়োবন্ধস্তথৈবচ।
তোয়প্রবর্ত্তনাৎ খেয়ঃ বন্ধঃ স্যাৎ তন্নিবর্ত্তনাৎ।"[2]

সেতু দ্বিবিধ। এক প্রকার সেতু খেয়—জল প্রবর্ত্তনের উদ্দেশে ইহা নির্ম্মিত হয়। অন্যবিধ সেতু বন্ধ, তোয়নির্জ্জন ইহার উদ্দেশ্য। অধুনা এই সেতুকে বাঁধ কহে। খেয় সেতু দ্বিবিধ—এক প্রকার যেখানে জল-সঞ্চারের ব্যবস্থা নাই, সেখানে পয়ঃপ্রবাহ প্রচলনের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত খাল্। অপর, যেখানে জল-প্রবাহ-প্রচলন প্রয়োজনীয়, অথচ গমনাগমনের জন্য তরণী-ব্যবস্থা অপেক্ষা কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত সেতু অধিকতর সুবিধাজনক নয়, সে স্থানে জল প্রবর্ত্তনে বাধা না দিয়া গমনাগমনের সৌকর্য্যসম্পাদন জন্য লৌহ-সেতু বা দারু-সেতু রচিত হইত।

দুর্গ-করণ—দুর্গনির্ম্মাণ। (১) দুর্গ নানাবিধ, ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, অব্দুর্গ, বার্ক্ষ-দুর্গ, নৃদুর্গ, গিরিদুর্গ। ধন্বদুর্গ—মরুবেষ্টিত চতুর্দ্দিকে পঞ্চ যোজন জলশূন্য স্থান। মহীদুর্গ—গবাক্ষ-সৈন্য-সংস্থিতি-গৃহাদিসম্পন্ন পাষাণ-ইষ্টকাদিরচিত সুদৃঢ় প্রাকার। অব্দুর্গ—চতুর্দ্দিকে অগাধ জলসম্পন্ন পরিখা। বার্ক্ষদুর্গ—চতুর্দ্দিকে যোজনব্যাপী তরু-গুল্ম-কণ্টকাদিপূর্ণ অরণ্য প্রদেশ। নৃদুর্গ—চতুর্দ্দিকে সংস্থাপিত সঙ্কেতসম্পন্ন উদ্যতাস্ত্র সৈন্যসমূহ। গিরিদুর্গ— দুরারোহ পর্ব্বত-পৃষ্ঠ, একমাত্র সঙ্কটসঙ্কুল পন্থা ব্যতীত যেখানে গমনের উপায়ান্তর নাই, সেখানে নদী-প্রস্রবণ-কূপাদি জলাশয়ের প্রয়োজন। বহু শস্যক্ষেত্ররাজি সেখানে বিরাজিত। এই গিরিদুর্গ—প্রাচীনেরা—বিশেষতঃ ভারতীয় হিন্দুরা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ মনে করিতেন। ঐতিহাসিকযুগের রাজস্থানের দুর্গরাজি তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

দুর্গসংস্কার—জীর্ণ দুর্গের নবীকরণ, অংশ-বিশেষের সময়োপযোগি পরিবর্ত্তনাদি সাধন।

খনিখনন—স্বর্ণ-রৌপ্যাদির (আকর স্থান হইতে) উদ্ধার করণ।

হস্তিবন্ধন—হাতীধরা; পুরাকালে সমরে হস্তীর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক যুগেও সেলিম্, এবং শক্কজঙ প্রভৃতিকে হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছে।

হস্তী অধুনা ভারবাহী জীবে পরিণত হইয়াছে; স্থান বিশেষে বিলাসের উপকরণও বটে। হস্তী পুরাতন যুগের মূল্যবান সম্বল।

সৈন্যনিবেশন—সৈন্যসংস্থাপন। রক্ষা-কেন্দ্রসমূহে যথোচিতভাবে উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য রক্ষার বিধান করা।

বনচ্ছেদন—পুরাতন পাদপ ছেদন করিয়া কাষ্ঠ-শিল্পে নিয়োগ করা, নব বৃক্ষ রোপণ, বনচ্ছেদনপূর্ব্বক স্থানে স্থানে শস্যাদি উৎপাদন ও গ্রামসংস্থাপনের চেষ্টা প্রভৃতি এই কার্য্যের অন্তর্গত। এই সমস্ত কার্য্যের সহিত রাজশক্তির পুষ্টি, পরিপাক ও প্রসর বিশেষভাবে সম্বদ্ধ।

পঞ্চবর্গ সংক্ষেপে বলিতে হইলে—অনুসন্ধান বিভাগ পঞ্চবর্গ। কাপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতিব্যঞ্জন, তাপসব্যঞ্জন, বৈদেহিক-ব্যঞ্জন, এই পঞ্চ প্রকার চরবর্গই পঞ্চবর্গ।

কাপটিক লক্ষণ—

"পরমর্ম্মজ্ঞঃ প্রগল্‌ভশ্ছাত্রঃ কপট-
ব্যবহারিত্বাৎ কাপটিকঃ।"

---

(১) "ধন্বদুর্গং মহীদুর্গং অব্দুর্গং বার্ক্ষ-
মেরবা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গঞ্চ সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরং।"
(মনুসংহিতা।)

অপরের মর্ম্মরহস্য অবগত হইতে সক্ষম প্রগল্ভ ছাত্র কাপটিক। কাপটিকের কার্য্য—

'তং মন্ত্র্যর্থিনং অর্থমানাভ্যাম্ গৃহ্য রহসি রাজা ব্রূয়াৎ যস্য দুর্বৃত্তং পশ্যসি তৎ তদানীমেব ময়ি বক্তব্যম্।'

কাপটিককে রাজা অর্থ ও সম্মান দ্বারা হস্তগত করিয়া গোপনে বলিবেন, যেখানে যাহার অন্যায় কার্য্য দেখিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ আমার গোচর করিবে।

উদাস্থিত—যাহারা সন্যাস গ্রহণ করিয়া পুনরায় সংসারী হইয়াছে, তাহাদের সংসার-সুখস্পৃহা হয় ও তজ্জন্য অর্থাকাঙ্ক্ষা থাকায়, রাজা তাহাদিগকে গোপনে বহু অর্থ ও শস্যসম্পন্ন ভূমি দান করিয়া মঠ স্থাপন করিবেন; তাহারা রাজ্যের অপরাধ-অপকর্ম্মের সমাচার রাজার গোচর করিবে।

গৃহপতিব্যঞ্জন—বিত্তহীন কৃষক—রাজনির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ও ভূমি ভোগ করিয়া কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারা সমাজের সম্মুখীন হইয়া গোপনে রাজকার্য্য সম্পাদন করিবে।

তাপসব্যঞ্জন—কৃত্রিম তাপস বহু কৃত্রিম শিষ্যযুক্ত হইয়া রাজদত্ত গোপনীয়বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। শিষ্যগণ তাপসের অলৌকিক শক্তি প্রচার করিবে; প্রকাশ্য ভাবে তাপস মাসান্তে বা পক্ষান্তে ভোজন করিবে। অলৌকিক শক্তি শ্রবণে চোরগণ—অপরাধিগণ অলক্ষ্যে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইবে। তাপস লোকের মনোভাব বলিতে পারিবেন। অন্যদিকে কৌশলে রাজকার্য্য সম্পন্ন হইবে; তাপসের কবলে আপনা হইতেই অপরাধী কবলিত হইবে।

বৈদেহিকব্যঞ্জন—কৃত্রিম বণিক্। বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রকাশ্যভাবে রত থাকিয়া, স্বয়ং ও অনুচরবর্গ দ্বারা দোষ সন্ধান করিয়া, তৎসংবাদ গোপনে রাজগোচরে উপস্থিত করা ইহার কার্য্য। রাজসম্বন্ধ ও রাজপ্রসাদ গোপনে রাখিয়া, রাজকার্য্য সাধনের জন্য এই সম্প্রদায় (পঞ্চবর্গ) গঠিত হয়। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ভাব, প্রজার মতিগতি, রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান-চেষ্টা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য ও প্রজাগণের পারস্পরিক অপচয় চেষ্টার ও চৌর্য্য, হত্যা, লুণ্ঠনাদির প্রকৃত অপরাধি-সংগ্রহের উপায়—এই পঞ্চবর্গ বা অনুসন্ধান-বিভাগের হস্তে সমর্পিত হইত।

সংসারে সার সত্যের সমাবেশ মাত্রই ব্যবহারশাস্ত্র নহে। মানব কখনও মানবীয় ভাবের বহির্ভূত নহেন। যেখানে মানব আছে, সমাজ আছে, রাষ্ট্র আছে, সেখানে শত্রু-মিত্র, যোগ্যাযোগ্য, দণ্ডন মণ্ডন, তিরস্কার-পুরস্কার, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্য, তস্কর, দাতা, সকলই আছে। হিন্দুর গৌরবরবি যখন মধ্যাহ্ন-গগনে সমুপাস্থিত হইয়া সমুজ্জ্বল মরীচিমালায় বিশ্ব আলোকিত করিতেছিল, যখন হিন্দুর শৌর্য্য-বীর্য্য-গাম্ভীর্য্য জগতের অপরিচিত ছিল না, যে দিন তপোবনের পবিত্র হব্য-গন্ধ বহন করিয়া গন্ধবহ দিগ্‌দিগন্তে বিধাবিত হইতেছিল, যখন সাম-গীতির সুমধুর ঝঙ্কারে বিশ্ব ভক্তিভরে রোমাঞ্চিত—পুলকিত হইতেছিল, যখন জগতের বিস্ময়-বিস্ফারিত

দৃষ্টি ভারতের দিকে পতিত হইয়াছিল, সেদিন ভারতে যেমন অষ্টকর্ম্ম ছিল, তেমন পাপবর্গও ছিল। এ শিক্ষায় সমস্ত সংসার ভারতের পদাঙ্ক অনুবর্ত্তন করিয়াছে; সমস্ত জগৎ ভারতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে, ইহা নিঃসংকোচে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

শ্রী——

(যশোহর।)

উপায় কি

উপায় কি? অধুনা অস্মদ্দেশে লোকের অন্তরে বাহিরে নিরন্তর এই প্রশ্ন—উপায় কি? প্রকৃতি বিকৃতিময়ী, জল-বায়ু অস্বাস্থ্যকর, বিবিধ বিকট ব্যাধি-বীজের আকর; ভূমি সারশস্য-বিরলা, গাভী অদুগ্ধবহুলা, নদ-নদী ক্ষীণপয়স্বতী, তরু-লতা দীনফলবতী; খাদ্যের আস্বাদ বিকৃত, ঔষধির বীর্য্য ব্যাহত। দুর্ভিক্ষের চিরসঞ্চার; দুর্ম্মূল্যতার দিন দিনই প্রবল প্রসার। এক্ষণে উপায় কি?

জীবন দীর্ঘায়ুহীন, দেহ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ, হৃদয় দীন, বুদ্ধি মলিন, জ্ঞান অবিদ্যায় বিলীন! শক্তি সঙ্কুচিত, ভক্তি বাহত, মুক্তি দুরাশার্ণবের প্রকল্পিত পরপারগত! হায়! উপায় কি?

আমাদের কর্ম্মদোষে—ভাগ্যবশে—প্রজার পরমাশ্রয় ও প্রশান্তিনিলয় রাজা আজ বিরক্ত—আরক্তনেত্র। রাজ্য অনিবার্য্য অশান্তি-ক্ষেত্র। কখনও পালকগণ প্রচণ্ড দণ্ডধর; কোথাও শান্তি-রক্ষক শান্তিভক্ষণতৎপর! আইন দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর। প্রজাপুঞ্জ অসন্তুষ্ট, অনৈক্যদুষ্ট। এক মাতৃভূমির সন্তান হিন্দু মুসলমান আজ পরস্পর সৌভ্রাত্র-ভ্রষ্ট। এক হিন্দুধর্ম্মী "ভদ্র"-নমঃশূদ্রেও চিরপ্রতিষ্ঠ ভাবনিষ্ঠা আজ বিপ্লব-বিনষ্ট। এক 'শিক্ষিত' ও 'সভ্য' আখ্যাভিমানী দলের মধ্যেও বিরোধ-বিদ্বেষ, দলাদলি-চলাচলি আজ নির্লজ্জ ও বিস্পষ্ট! আজ ঘরে পরে, ঘরে ঘরে, অন্তরে অন্তরে অশান্তির প্রকটমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট!. এক্ষণে উপায় কি?

বাণিজ্য প্রায় বিনষ্ট, শিল্পও স্বল্পাবশিষ্ট, কৃষি অনুন্নত বা অবনত; কেবল বুঝি দাস্যবৃত্তিই আজ আমাদের পক্ষে বিশ্ববিস্তৃত! তারপর, ভিক্ষাটি অবশ্য নিদানের বিধান এবং দেশেও ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন প্রবর্দ্ধমান; কিন্তু দুর্দ্দম দুর্ভিক্ষের নির্দ্দয় আক্রমণে যে বিধানেরও তিরোধান অসম্ভব নয়। কেবল রাজবিধানটি হলেই এখন হয়। "মুষ্টিভিক্ষায় গুষ্টি পোষা"র দিন আর নাই। ভিক্ষা-মুষ্টির জন্য ছটাকা-মণের মোটা চাউল হতে 'ছটাক' দিতেও বা কটা লোকে কবার পারে? অক্ষম আতুর ভিন্ন সক্ষম পেশাদারী ভিখারীর সংখ্যাই অত্যধিক। এ দিকে রপ্তানীর বাহুল্যে, পাট চাষের প্রাবল্যে ও অতিবৃষ্টি—অনা-

প্রভৃতি ঈতির ফলে নিত্য দুর্ভিক্ষসৃষ্টি, তায় আবার দানের পূর্ব্বোক্ত পাত্রদুষ্টি, কাজেই আজ মুষ্টি-ভিক্ষাশ্রয়ও বিড়ম্বিত; "ভিক্ষায়াং নৈবনৈব চ" বাক্যটি প্রকৃষ্ট প্রমাণিত। অধুনা দেশে উপজীবিকার

সকল উপলক্ষ্য-পথই সঙ্কট কণ্টকিত। ঘোর জীবন-সংগ্রামে আজ ভারত সতত সংক্ষুব্ধ ও অবসাদিত! হায়! জীবনোপায়েরইবা উপায় কি?

রোগ, শোক, অকাল-মৃত্যু, দৌর্ব্বল্য, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, দাসত্ব, অপমান, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অকর্ম্ম, ভীরুতা, কাপুরুষতা, পরমুখাপেক্ষিতা, আলস্য, ঔদাস্য, জাড্য, অদার্ঢ্য, অনৈক্য, অলক্ষ্য, আত্মবিচ্ছেদ, বন্ধুভেদ প্রভৃতি যত কিছু দুঃখ, দুর্ভাগ্য ও দুর্লক্ষণ সম্ভব, সমস্তই আজ ভারতে পূর্ণমাত্রায় পরিণত ও পরিব্যাপ্ত। তার উপরে আবার রাজ-রোষ। বুঝি বিশ্বরাজেরই অসন্তোষ! নচেৎ কি এ দুর্দ্দশা ঘটে? তাই ত বলি, উপায় কি? আজ এই বিষাদ-বিমর্ষ ভারতবর্ষের দিগ্‌দিগন্তে—আদি মধ্যান্তে সরবে—নীরবে নিরন্তর ঐ প্রশ্ন—উপায় কি? ভারতে জাতীয় দেহের হৃদ্‌-ফুস্‌ফুসে—প্রতি নিমেষে—প্রতি নিশ্বাসে বহিতেছে—উপায় কি? ভারত-প্রকৃতির মনের কথা—ভারত-বায়ু প্রতি উচ্ছ্বাসে কহিতেছে—উপায় কি? আজ অঙ্গে-বঙ্গে কলিঙ্গে, দ্রাবিড়-ত্রৈলঙ্গে—ভারতের প্রতি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে—ভারতসিন্ধুর প্রতি তরঙ্গ-ভঙ্গে—ভারতমাতার প্রাণের ব্যথা—ঐ কথা—ঐ প্রশ্ন—অহরহ ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইতেছে—উপায় কি? হায়! উপায় কি?

ভারতভুবনব্যাপী এই মহাপ্রশ্নের এক কথায় সংক্ষিপ্ত সদুত্তর দিতে হইলে, কেবল শ্রদ্ধাভরে—দৃঢ়স্বরে ঊর্দ্ধদেশে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে বলিতে হয়,—উপায় কেবল ও পায়! অন্যথা অনুপায়। উপায় কেবল কৃপাময়ের কৃপায়; নতুবা নিরুপায়!

তবে কি পুরুষকার কিছু নাই? আমাদের কর্ত্তব্য কিছু নাই? এ অপায়ের উপায় বিধানে অস্মদীয় স্বকীয় কোন সাধনানুষ্ঠান নাই? আছে বৈ কি। তাহাই উপায়ের উপায়। ভগবৎ-কৃপা-কর্ষণের উপায়ের ইঙ্গিতও ভগবৎকথিত শাস্ত্রেই সুব্যক্ত। অবশ্য, ভগবৎ কৃপাবর্ষণে কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। ভগবানের কেহই দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। গীতায় ভগবদুক্তি—

"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।"

অর্থাৎ—

সম আমি সর্ব্বভূতময়।
কেহ মম দ্বেষ্য প্রিয় নয়।

অবশ্য, পক্ষপাতিত্ব দোষ যেখানে নিত্য-মোহমুগ্ধ মর্ত্ত্য মানবেও নিন্দনীয়, সেখানে সেই মানবের চিরআরাধ্য সাধুসাধনসাধ্য "শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ" অনিন্দ্য সুন্দর শ্রীভগবানে তাহা একান্ত অসম্ভব। তবে ঈশ্বরের কোপ বা কৃপা, নিগ্রহ-অনুগ্রহ, দণ্ড-পুরস্কার প্রভৃতি ভেদ নিদান দ্বন্দ্ব-বিধান সমূহের রহস্য-সমাধান কি? অপায় নিবারণের অমোঘ উপায় ঈশ্বরানুকূল্য লাভের উপায় কি? উপায়ের উপায় কি? পূর্ব্বোক্ত গীতোক্তি শ্লোকের দ্বিতীয় চরণেই সে রহস্যাবরণ উন্মুক্ত।—

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌॥"

অর্থাৎ—

ভক্তিতে আমাকে ভজেন যাঁরা,
আমি সে সবাতে, আমাতে তাঁরা।

'ভক্তজনেরই ভক্তিসাধ্য ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হয়। সেই সর্ব্বমঙ্গলালয়ের সংস্পর্শে সুখ ভিন্ন দুঃখের অস্তিত্ব নাই।

গীতা বলেন—

"সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।"

ভক্তিযোগে আনন্দময় পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের শুভ সংস্পর্শে ভক্তের হৃদয়ে পরম প্রেমানন্দের উদয় হয়। নিরানন্দ চিরতরে তিরোহিত হয়। অতএব নিরানন্দের নিদান অশুভ-অশান্তি, নিগ্রহ কুগ্রহ প্রভৃতি অপায় সমূহের সংঘটন ভক্তজীবনে সম্ভাবিত নয়। তবে কিনা, অবশ্যভোগ্য 'প্রারব্ধ-কর্ম্ম ফল' সমূহ বাহ্যতঃ অশুভ হইলেও, ভক্ত তাহা 'ভগবদিচ্ছা" জ্ঞানে অকাতরে—"শুভ"বৎ সম-সমাদরে গ্রহণ করেন। এমন কি, সর্ব্বঅশুভের সমষ্টি-স্বরূপ মরণকেও তিনি সেই নিত্যামৃত নিকেতন মরণহরণ অভয় চরণের শরণ-বলে আনন্দে আলিঙ্গন করিতে প্রতিক্ষণ প্রস্তুত থাকেন। ফলে তিনি সেই ভক্ত কবির ভক্তি উক্তিময়ী অধ্যাত্মশক্তি-বাণীর প্রতিধ্বনিতে বলিতে পারেন,—

"যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে,
নিয়ত লোলুপ মম মন-মধুকরে,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তাহার তুমি শরণি নিশ্চিত।
অবহেলে তোমায় করিয়ে অতিক্রম,
আনন্দে যাইব—যথা সেই প্রিয়তম॥"

ভগবান অপক্ষপাতী বটেন, কিন্তু ভগবদ্-ভক্তিরই স্বভাব-শক্তি এই যে, তিনি ভক্তকে সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া, ভগবানের "ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করেন। সুতরাং মঙ্গলময়ের সংযোগ প্রভাবে অমঙ্গলের অভাব স্বভাবতঃই সংসিদ্ধ হয়। ফলে এই তত্ত্বেই ভগবানের অপক্ষপাতিত্ব ও ভক্তির সর্ব্বশুভদাতৃত্ব যুগপৎ সত্য-সুপ্রমাণিত। ভগবানের অপক্ষপাতিতায় নিরপেক্ষতায় "শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী" ভক্তির এই সর্ব্বশুভবর্ষিণী শক্তি স্বীকার না করিলে, ভগবদ্গীতোক্তির বাক্য-বিরোধ ও অনবস্থা-দোষ ঘটে। আর শঙ্কর-শ্রীধর-প্রমুখ তত্ত্বদর্শী মহামনীষী ভাষ্য-টীকাকারগণের সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারে এ রহস্যের ইহাই মীমাংসা ঘটে। তবে কি না, পরমার্থ-তত্ত্বের স্পষ্ট প্রতীতি নিয়তই পাণ্ডিত্য নিরপেক্ষ;—পরন্তু সাধন-সাপেক্ষ।

যাহা হউক, এতাবতা বুঝা যাইতেছে যে, প্রবন্ধ প্রারম্ভ বর্ণিত অস্মদ্দেশীয় আধুনিক অপত্তিবিশেষপ্রায় প্রবল অপায়-সমূহের প্রতীকারের উপায় কেবল কৃপাময় পরমেশ্বরের কৃপায় নির্ভর করিতেছে এবং আমাদের অনুকূলে সেই কৃপা-শক্তি লাভের উপায় একমাত্র ভগবদ্ভক্তি-ভজনে নির্ভর করিতেছে।

ভক্তির লক্ষণ-নির্দ্দেশে শাস্ত্র বলেন,—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা॥"

অর্থাৎ—

ক্লেশবিনাশিনী, শুভবিধায়িনী,
মুক্তি-লঘুকরী-শক্তি।
সদা সুদুর্লভা, ঘনানন্দরূপা,
শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তি॥

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ ক্লেশ শাস্ত্রনির্দিষ্ট।

জগতের সর্ব্ববিধ ক্লেশই মূলতঃ এই ত্রিবিধ ক্লেশেরই অন্তর্ভূত। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এই ত্রিবিধ ক্লেশের লক্ষণানুসারে বিচার করিলে, বুঝা যাইবে যে, অস্মদ্দেশে, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি রোগাদি জন্য যে দৈহিক বিবিধ ক্লেশ, তাহাই আধিভৌতিক। আর অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব প্রাতিকূল্য-নিবন্ধন দুর্ভিক্ষাদি ও প্রাকৃতিক ভোগ্যদ্রব্য-দৌর্লভ্যাদিরূপ যে ক্লেশসমূহ, তাহাই আধিদৈবিক; এবং স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যাদির পতনজনিত দরিদ্রতা ও পরমুখাপেক্ষিতার ফল চিত্তদৈন্য ও রাজরোষাদি জন্য,—উদ্বেগ, অশান্তি, ভীতি, অপ্রীতি প্রভৃতি আত্মবিষাদ-বিধায়ক দুঃসহ ক্লেশনিবহই আধ্যাত্মিক ক্লেশ। অতএব দেখুন, অপৌরুষেয় আপ্ত উক্তি শাস্ত্র-যুক্তিতেই জানা যাইতেছে যে, আমাদের উক্ত যাবদীয় ক্লেশ-পরম্পরা ভগবদ্ভক্তির একমাত্র "ক্লেশঘ্নী" শক্তিতেই নিশ্চিত নিবার্য্য।

তারপর, আবার সুধু কষ্ট যাওয়াই যথেষ্ট নয়, সুখ বা শুভও চাই। শুদ্ধ সুখাত্মকত্বই শুভত্ব। কিন্তু তারও ভাবনা নাই; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি 'শুভদা'। 'ক্লেশঘ্নী' আমাদের রোগ, দুর্ভিক্ষ, দৈন্য, দৌর্মণ্য, রাজভীতি দুষ্কৃতি প্রভৃতি ক্লেশরাশি নিঃশেষ করিবেন এবং 'শুভদা' আমাদের স্বাস্থ্য, সুভিক্ষ, সম্পৎ, সাবল্য, রাজপ্রীতি ও সুকৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশুভ বিধান করিবেন। যদি তর্ক ধরা যায়,—যে, যিনি ক্লেশঘ্নী, তিনি ত স্বভাবতই শুভদা; তবে আবার স্বতন্ত্রভাবে "শুভদা" বলা বাগ্‌বাহুল্য নয় কি? কিন্তু তা নয়। 'অর্থবাদ' ভিন্ন তত্ত্বলক্ষণনির্দ্দেশে শাস্ত্রে বাগ্‌বাহুল্য স্বতই অসম্ভব। বাস্তবিক অদুঃখবিপরীত উপরেও আবার সুখসম্পন্নতারূপ একটি অবস্থা আছে। মনে করুন, আমার ঘরে আজ অন্নাভাব বা অনাটন নাই, ইহা আমার বৈষয়িক অক্লেশজনিত সাধারণ শান্তি মাত্র; কিন্তু ইহার উপর যদি আজ অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত বৈধ অর্থলাভ ঘটে, অথবা কোন কুটুম্বালয় হইতে বিবিধ উপাদেয় সুখসেব্য ভোগ্যদ্রব্য-সম্ভার উপহার আসিয়া যোটে, তবে সেই সাধারণ অনভাবের উপরেও এই সদ্ভাব যদ্রূপ, 'ক্লেশঘ্নী'র কার্য্যকারিতার পরেও "শুভদা"র কার্য্য তদ্রূপ। আমার মনে আজ কোন অসুখ নাই, এই সাধারণ মানসিক শান্তির উপরে সহসা এক অপূর্ব্ব শুভ-সংবাদ লাভে আবার অতিরিক্ত সুখোদয় যেমন, ক্লেশলয়ের উপরেও শুভোদয় তেমন। অতএব বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র ভগবদ্ভক্তি-সাধনা দ্বারাই তাহার অক্লেশদাতৃত্বে আমরা এই অশেষ ক্লেশরাশি হইতে মুক্তি পাইয়া জগতে মানুষ বলিয়া গণ্য হইব, এবং অপিচ তাহার শুভদাতৃত্বে বিবিধ বাঞ্ছনীয় শুভ অভ্যুদয়ে সুসম্পন্ন ও ধন্য হইব। ইহাই আমাদের আশা, ভরসা, বল; ইহ পরকালের সম্বল। এ দুর্দ্দিনে ভগবদ্ভক্তিভজনই আমাদের জাতীয় সিদ্ধির সাধন, জাতীয় কলঙ্কের শোধন, জাতীয় নিদ্রার বোধন! ভগবদ্ভক্তিই আমাদের জাতীয় মুক্তি-তীর্থের সুপ্রশস্ত সরণি; এ বিকট সঙ্কট-সাগরে অভয়-তরণী। ইহাই আমাদের

অত্র প্রবন্ধ শীর্ষক 'উপায় কি'—প্রশ্নের একমাত্র উত্তর। ইহাই আমাদের উপায়।

ভগবদ্ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশে 'ক্লেশঘ্নী' ও 'শুভদা'—এই দুই বিশেষণই বক্ষ্যমাণ বিষয়ের মুখ্য প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যীভূত বলিয়া একটু বিশেষ ভাবে আলোচিত হইল। 'মোক্ষলঘুতাকৃৎ' 'সুদুর্লভা' 'সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা' ও 'শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী' প্রভৃতি বিশেষণের গৌণপ্রাসঙ্গিকতা সংক্ষেপে আলোচ্য। ভক্তিভাবানন্দ মোক্ষানন্দকেও পরাস্ত করে। শাস্ত্র বলেন—

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা।
বিলুণ্ঠতি চরণাব্জে মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ।"

অর্থাৎ—

মুক্তিদাতা শ্রীমুকুন্দে পূর্ণানন্দাভক্তি যার,
মোক্ষমহারাজ্যলক্ষ্মী লোটে পাদপদ্মে তার।

কি ছার মিছার অসার অনিত্য ঐহিক 'স্বরাজ্য' কামনা! ভগবদ্ভক্তি লাভ হইলে,—স্বয়ং মোক্ষ-সাম্রাজ্যলক্ষ্মী যেন "আমাকে লও—আমাকে লও" বলিয়া ভক্তের পায়ে লুটাইয়া সাধেন! ফলে ভক্তের অলভ্য কিছুই নাই। যিনি বহুজন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যপুঞ্জ ফলে—শুভ সাধন-বলে "সুদুর্লভা" ভক্তিরূপ পরম ধন লাভ করিয়াছেন, তিনিই সেই "সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা"—অর্থাৎ পূর্ণপ্রেমানন্দরূপা ভক্তির "শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী" শক্তিতে স্বীয় কৃষ্ণরসাবিষ্ট হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আকৃষ্ট ও সন্নিবিষ্ট করিয়া, মানবাত্মার চরম ও পরম ইষ্টসিদ্ধিতে ধন্য ধন্য—কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন।

অতএব এ হেন ভক্তি-ভজনেই আমাদের একণে একান্ত প্রয়োজন। ভক্তিভজনের শক্তিতেই এই ভারতবর্ষ একদিন সর্ব্বজগতে সর্ব্বোন্নতির আদর্শ ছিল। হায়! সেই ভক্তিভজনের আনুকূল্য-অভাবে অধর্ম্ম-শক্তির প্রাতিকূল্য-প্রভাবেই এ দেশের আজ এই দশা! ভক্তি-সাধনেই ভারতের সর্ব্বোন্নতি-বীজ নিহিত; সুতরাং ইহার পুনরুন্নয়ন-প্রয়োজনে সেই ভক্তি-নিষ্ঠারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিহিত। ভারত-তত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ হিন্দুর মনে ইহাতে এক বিন্দুও সন্দেহ নাই যে, ভক্ত্যবনতিই ভারতের শক্ত্যবনতির হেতুভূত, এবং তাহাতেই আজ ভারতময় এত অশান্তি-অপায়; তাই ভগবদ্ভক্তি-ভজনের দীক্ষা-সাপেক্ষ ধর্ম্মশিক্ষা-সাধনই একণে একমাত্র উপায়।

উত্থান-পতন প্রকৃতির সনাতন নিয়ম। জীব-জগৎ ও জড়জগৎ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র এ নিয়মের অব্যর্থ পরাক্রম। কবি-প্রবাদ—

"ওঠে যারা পড়ে তারা, পড়ে যারা—ওঠে।
ওঠা-পড়া—বাঁচা-মরা চক্রবৎ ছোটে॥"

"উঠব মোরা—উঠব মোরা বিধির আদেশ-বাণী"—আমাদের এই 'স্বদেশী' কবি-কথা খেয়াল-কল্পনা নয়, দুরাশার কুহক-স্বপ্ন নয়; ইহা বাস্তবিক 'বিধির আদেশ' বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে; নচেৎ যে দেশের 'কুম্ভকর্ণী ঘুম' কত শত বর্ষের শত শত পদাঘাত গদাঘাতেও ভাঙ্গে নাই, আজ সহসা 'স্বদেশী' মন্ত্রের মোহন-মুরলী-তানে সে দেশ জাগিয়া উঠিয়া—কাজে লাগিয়া গিয়াছে! ইহা 'বিধির আদেশ' নয় ত কি? দৈববল ভিন্ন কি এমন মৃতদেহে প্রাণ আসে? এ মরা গাঙ্গে জোয়ারে জাগে? এমন শুষ্ক ডালকে ফুল ফোটে?

চিরনিদ্রিত জেগে ওঠে? 'বিধির আদেশ' বৈ কি। ঐশী দৈবী প্রেরণাতেই এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন-প্রবর্ত্তনা। তাই 'স্বদেশী'* কবি-লেখনীর উদ্দীপনী আশা-বাণী—

"পতিত হয়েছি—আবার উঠিব।
অচল রয়েছি—আবার ছুটিব॥
ঘুমায়ে পড়েছি—অবশ্য জাগিব।
অকর্ম্মণ্য—পুনঃ স্বকর্ম্মে লাগিব॥
মরেছি—মর্‌ছি, মরেও বাঁচিব।
খেদে পড়ে আছি, আনন্দে নাচিব॥
ডুবেছি যদিও, আবার ভাসিব।
আঁখি-নীরে ভাসি, আবার হাসিব॥
শক্তিহীন, পুনঃ সেবিব শক্তি।
ভক্তিহীন, পুনঃ লভিব ভক্তি॥"

ইহা দুরাশার দুঃস্বপ্ন নয়। সম্ভাবনার সত্য সমাশ্বাস। দৈব ব্যগ্রতার জাগ্রত বিশ্বাস। কিন্তু শুধু বিশ্বাসেই সিদ্ধি নাই; সুযোগ্য সাধন চাই। দৈবী প্রেরণায় বিশ্বাস ও আশ্বাস পাইয়াছি বটে, এখন পুরুষকারের প্রবল প্রয়োজন এবং মূলতঃ ভগবদ্-ভক্তি-শক্তিতেই চাই তাহার নিয়োজন। সিদ্ধিকামী সাধক কখনও এ তত্ত্ব ভুলিবেন না। শুধু দৈবে চলিবেনা। শুধু পুরুষকারেও আশানুরূপ ফল ফলিবে না। উভয়েরই যুগপৎ আবশ্যকতা। আমাদেরই প্রাচীন প্রবচন—"দুর্গাও বল, গাড়ীও ঠেল।" আগে আমরা সময় সময় 'দুর্গা দুর্গা' বলিতাম, কিন্তু গাড়ী ঠেলিতে উঠি নাই। এখন এই স্বদেশী আন্দোলনে কটিবন্ধন করিয়া, গাড়ী ঠেলিতে চলিতেছি, কিন্তু "দুর্গা"নাম ভুলিতেছি! পুরুষকার-প্রয়োগে কতকটা প্রোৎসাহী হইতেছি, কিন্তু তাহাতে ভগবদ্‌ভক্তিরূপ দৈবীশক্তিনিয়োগে উদাসীন রহিতেছি! ইহাতেই দোষ ঘটিতেছে। সাধনে বিবিধ বিঘ্ন-বাধা আসিয়া যুটিতেছে। একেই স্বভাবতঃ "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"—শুভ সাধনে বিস্তর বিঘ্ন নিশ্চিত, তাতে আবার সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন ভগবদ্ভক্তিভজনও উপেক্ষিত, এ অবস্থায় সিদ্ধি কাজেই সুদূর-প্রস্থিত। যদি পুরুষকারেরই প্রাধান্য ধর, তাহা হইলেও ভগবদ্ভক্তিভজনই সর্ব্বপ্রধান পুরুষকার। সে পুরুষকার ভিন্ন বাজে পুরুষকার—অর্থাৎ শুধু ঐহিক ও দৈহিক পুরুষকার ভারতে কখনও সিদ্ধিপ্রদ হয় নাই। মোট কথা, ভগবদ্‌ভক্তিই আমাদের অব্যর্থ সাধন-শক্তি। ধর্ম্মবলই আমাদের মর্ম্ম-বল। ইহার পরিণতিই আমাদের কর্ম্মযোগসিদ্ধির অমৃত-ফল। অতএব ইহাই আমাদের সর্ব্বঅপায় বিলোপ-বিধানের সর্ব্বপ্রধান উপায়।

"যতো কৃষ্ণ স্ততো ধর্ম্মঃ
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

অর্থাৎ—

যাহে কৃষ্ণ, তাহে ধর্ম্ম হয়।
যাহে ধর্ম্ম, তাহাতেই জয়॥

আমাদের এই জীবন-সংগ্রামে বা ভাগ্য-সংগ্রামে কিম্বা 'শিল্প-সংগ্রামেই' বলুন, ফলে যে কোন সংগ্রামে বা প্রতিযোগিতাতেই ধর্ম্ম ভিন্ন এ 'কর্ম্মভূমি' ভারতের জয় লাভ অসম্ভব, অস্বাভাবিক ও অনৈতিহাসিক। ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন মানবাত্মার অতুল্য সম্পত্তি ধর্ম্মধন লাভ হয় না। আবার "শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী" ভগবদ্ভক্তি ভিন্ন ভগবৎ কৃপালাভ

হয় না। "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা" প্রভৃতি গীতা-বাক্য-ব্যাখ্যায় পূর্ব্বেই তাহা বুঝাইয়াছি। ফলকথা, সিদ্ধিলাভ বা জয়ের জন্য ধর্ম্ম চাই। ধর্ম্মোন্নতির জন্য ভগবৎকৃপা চাই। ভগবৎকৃপালাভের জন্য ভক্তি-ভজন চাই। মূলতঃ ঈশ্বরপরায়ণতা ব্যতীত এই ধর্ম্মসর্ব্বস্ব ভারতবর্ষে সর্ব্বসাধনই মরুভূমে বারিবর্ষণবৎ ব্যর্থতায় বিলীন হয়।

ভগবানের চিরচরণাশ্রিত এই ভারতে ভগবদাসক্তিরূপা মহাশক্তি বা ভাগবতধর্ম্ম স্বল্পমাত্রও পাইলে আর ভাবনা কি—ভয় কি? ভগবান স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন,—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।"

অর্থাৎ—

এ ধর্ম্মের স্বল্প সাধনায়
মহাভয় হতে ত্রাণ পায়।

সমস্ত আপৎ-বিপদে বিপদভঞ্জন মধুসূদনই ভক্ত ভারতের চির অনন্য আশ্রয়। "বিপত্তৌ মধুসূদনঃ"—"সঙ্কটে মধুসূদনং" প্রভৃতি অভয় আপ্তবাক্য-বলই ভারতের চির সম্বল। ভগবচ্চিত্ত ভক্তের সর্ব্বদুঃখ-দুর্গতি, কুগ্রহ-নিগ্রহাদি ভগবদনুগ্রহলেশে শীঘ্রই নিঃশেষ হয়। ভক্ত অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশদান-উপলক্ষ্যে কৃপা-নিধান ভগবান জগৎকে জানাইয়াছেন,—

"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গানি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥"

অর্থাৎ—

আমাতে সঁপিলে চিত্ত, আমারি প্রসাদে নিত্য,
সর্ব্বদুঃখে তরিবে ত্বরিত।
কিন্তু অহঙ্কারে যদি, নাহি শুন এ সুবিধি,
নাশপ্রাপ্ত হইবে নিশ্চিত॥

আহা কি সুন্দর! এমন মনোহর ও মোহহর আশাবাণী বিতরণ ও সদয় সতর্কীকরণ সর্ব্বশক্তিমান করুণানিধান শ্রীভগবানের শ্রীমুখেই শোভা পায়! এ মহোপদেশ না মানিলে আমাদের বিপদ অপরিহার্য্য—বিনাশ অনিবার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত গীতা-বাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে "অহঙ্কারাৎ" শব্দটি বলিয়াছেন, তাহার একটু বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। অহম্—কৃ+ঘঞ=অহঙ্কার। আমি করি, এই যে বোধ—তাহা আমিত্ব। যাহা আমিত্ব বা অহংবুদ্ধি সৃষ্টি করে, তাহাই অহঙ্কার। উহাই একটু স্থূলত্ব গ্রহণ করিয়া রিপুরূপে মদ বা গর্ব্ব হইয়া দাঁড়ায়। ফলকথা, ঈশ্বর-নিরপেক্ষ আত্মকর্তৃত্ব নির্ভর ভাবই ভগবদুক্ত ঐ "অহঙ্কার" পদের লক্ষ্য। ভগবন্নির্ভরতার অন্তর্ভূত ভাবে যে যথাযথ পুরুষকার-পরায়ণ হয়, ভগবৎপ্রসাদ-সহায় তায় সেই কৃতকার্য্যতা পায়, তাহারই দুঃখ দুর্গতি দূরে যায়। অন্যথা ভগবদুক্ত ভগবদ্ভক্তির আবশ্যকতার উপদেশ না মানিয়া যে নিজ নিরঙ্কুশ অহঙ্কারের সারথ্যে চালিত হয়, তাহারই দুঃখের যথার্থ পূর্ণ ফল বিনাশ বা ব্যর্থ-জীবনত্ব ঘটে।

আমরা অধুনা নাস্তিক্য-প্রবণ জড়-বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য কর্ম্মবাদের অহঙ্কার-বিকৃত শিক্ষামোহে মজিয়া, ভগবানকে ভুলিয়া, অহং-কর্তৃত্বকেই সকলের উপর তুলিয়া ধরিতেছি।

"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"
(গীতা)

অর্থাৎ—

অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা

মনে ভাবে "আমি কর্ত্তা"!

বর্ত্তমানে আমরা আমাদের জাতীয় জীবন-মরণ-সমস্যা-সঙ্কটপূর্ণ এই গুরুতম "স্বদেশী আন্দোলন" ব্যাপারেও যেন ভগবানকে বাদ দিয়াই ঐরূপ অহঙ্কার-দুষ্ট কর্ম্মযোগ-সাধনার বিস্তারেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু ঐটাই মস্ত ভুল। ঐ ভুলের দোষেই কাজে গোল ঘটিতেছে; যত বিঘ্ন-বিপত্তি আসিয়া যুটিতেছে। ভারতব্যাপী এই অভূতপূর্ব্ব 'স্বদেশী ভাব' নিঃসন্দেহ ঈশ্বর-প্রেরিত, বিশ্বাস করি বুটে, কিন্তু ইহার সাধন-যোগে বা পুরুষকার-প্রয়োগে সেই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-নির্ভরতায় ও ভক্তি-ভজনশীলতায় আমাদের লক্ষ্য নাই।

ভগবন্নিষ্ঠা-নিরপেক্ষ উদ্ধত অহঙ্কার ভারতে সর্ব্বশুভসাধনেই চির দুর্ব্বল ও নিত্য নিষ্ফল। আমাদের তত্ত্বদর্শী সিদ্ধর্ষিগণ শাস্ত্রে ভারতবর্ষকে 'কর্ম্মভূমি' ও অন্যান্য বর্ষ (দেশ) 'ভোগভূমি' বলিয়াছেন। এই 'কর্ম্মভূমি' পদের 'কর্ম্ম' পাশ্চাত্য ভাবের ঐহিক ভোগোদ্দিষ্ট কর্ম্ম (work) নহে। ইহা জনন-মরণ-হরণ মোক্ষ-কারণ নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগ-সাধন। সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা গীতায় এই কর্ম্মযোগই উপদিষ্ট। এই কর্ম্ম সকামতায় আরব্ধ হইলেও, নিষ্কামতায় পরিণত হইয়া মুক্তিপ্রদ হয়। ভারতবর্ষ এই কর্ম্মযোগের জগন্মান্য ধন্য পুণ্যক্ষেত্র।

"ধন্যোঽহি বৈ ভারতভূমিভাগঃ।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতঃ॥"

অর্থাৎ—

ধন্য এ ভারত ভবে পুণ্যভূমি হয়।
স্বর্গ-অপবর্গ-মার্গ-স্বরূপ নিশ্চয়॥

অপবর্গ রূপ মহামোক্ষ একমাত্র ভারতেরই অনন্যসাধারণ দেব-দুর্লভ সম্পত্তি। ভোগভূমির কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই মুক্তিতত্ত্ব নাই। পাশ্চাত্য "salvation" কেবল পাপ হইতে মুক্তি মাত্র। ভারতের এই মুক্তি—পাপ-পুণ্য উভয় হইতেই মুক্তি। হিন্দু-শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান-পক্ষে পাপকে লৌহ-শৃঙ্খল ও পুণ্যকে স্বর্ণ-শৃঙ্খল বলিয়াছেন। ফলে সকামতায় উভয়ই বন্ধন এবং এই উভয় হইতে মোচনই যথার্থ মুক্তি। পুণ্যের ফল ত স্বর্গ মাত্র। কিন্তু হিন্দুর অপবর্গ-ফল ব্রহ্মানন্দের তুলনায় স্বর্গ-সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর! ভারতীয় মোক্ষানন্দ বা ব্রহ্মানন্দের আদর্শ-সত্ত্ব—সেই যোগীশ্বর মহেশ্বর শিবের শিবতত্ত্ব। তাই ভারতীয় মুক্ত পুরুষের আত্মানুভূতি—

"ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন পাপং ন পুণ্যং ন সৌখ্যং ন দুঃখং।
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

অর্থাৎ—

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-চতুর্ব্বর্গাতীত
চিদানন্দরূপ আমি শিব সুনিশ্চিত।
পাপ-পুণ্য—সুখ-দুঃখ-সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত
চিদানন্দরূপ আমি শিব সুনিশ্চিত।

ইহার উপরেও আছে! শিবত্ব বা হরত্বের উপরেও আছে! হরেরও সেব্য হরিভজন। পরাভক্তি বা অহৈতুক প্রেম তাহার সাধন। অথচ তত্ত্বতঃ হরি-হর একাত্ম—অভেদত্ব।

কেবল সাধকের হিতার্থেই ভাব-ভেদে নাম-রূপের ভেদমাত্র। পরমার্থতঃ ভেদ-বোধ শাস্ত্রমতে 'অপরাধদায়ক—নরক-বিধায়ক। ইহার তত্ত্ব-রহস্য এই যে,—

"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ,
পাশমুক্তো ভবেচ্ছিবঃ।"

অর্থাৎ—

বন্ধনে আবদ্ধ জীব।
বন্ধন-বিমুক্ত শিব॥

আন্তরিক সর্ব্বত্যাগী ভবভোগ-বিরাগী মায়াবন্ধন-বিরহিত স্বরূপাবস্থিত মুক্তপুরুষ না হইতে পারিলে, সর্ব্বাত্মসমর্পণে ভগবৎ-সেবাধিকারী প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না। যে বিষয়বাসনাধীন—মায়ার শাসনাধীন, সে কিরূপে প্রেমময়ের পূর্ণ-প্রেমাধীন সেবক হইবে? তাই সাধকগণের হিতার্থ—এই অধিকারের পূর্ণাদর্শ-প্রদর্শনার্থ কৃপাময় হরিই সর্ব্বত্যাগী—মহাপ্রেমযোগী হররূপী! এই জন্যেই ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ তাঁহার পিতা ভেদ-বোধবিকৃত-চিত্ত হরোপাসক হিরণ্যকশিপুকে প্রবোধ দিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই কবি-গীতি-প্রতিধ্বনি—

"হরি—
আপন প্রেমে আপনি মজে,
গায় হরিনাম হর সেজে!"

ইহাই হিন্দুশাস্ত্রোক্ত হরি-হর-ভেদাভেদ-রহস্য। ফলে এ রহস্য-তত্ত্বরস সাধকগণেরই আধ্যাত্মিক আস্বাদ্য।

অতএব দেখুন, হিন্দুর সাধনোন্নতি-অধিকার কতদূর! সাধারণ নর-জীবত্বে তাহার আরম্ভ, অসাধারণ সুর-শিবত্বে তাহার শেষ। তাহাও সাধনেরই শেষ; কিন্তু সিদ্ধির সেবানন্দ——প্রেমানন্দ—মহাভাবানন্দ——অনন্ত—অশেষ!

জীবের এ হেন চরম ও পরম পরিণামের পূর্ণাধিকারী হিন্দুর এই অধিবাস-ভূমি পূর্ণধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে কি ভাগবত-ধর্ম্মহীন কোনও সাধন সিদ্ধ হইতে পারে? যদি বল, ধর্ম্ম-সাধন না হইতে পারে, কর্ম্ম-সাধনও কি হইবে না? ভারতের এই বর্ত্তমান 'স্বদেশী' আন্দোলন ত সাধারণতঃ কর্ম্মসাধনই বটে। কিন্তু আমরা তা মনে করিনা। বর্ত্তমানে এই ধর্ম্মাবনতিগ্রস্ত দুরবস্থ ভারতবর্ষে এই 'স্বদেশী' আন্দোলনই দেশ-কাল-পাত্রানুসারে পুনঃ ধর্ম্মসংস্থাপন ও ভারতোন্নয়নের ভগবৎ-প্রেরিত সময়োপযোগী সুপ্রশস্ত সদুপায়। ইহাকে মুখ্য ধর্ম্মলক্ষ্যশূন্য করিলে, ইহা শিরশূন্য শরীরবৎ অকর্ম্মণ্য হইবে।

তারপর, যদি 'স্বদেশী' সাধনকে শুদ্ধ কর্ম্মযোগই বল, তাতেই বা কি? হিন্দু-ভারতের সর্ব্বকর্ম্মই যে ধর্ম্মমর্ম্মময়। হিন্দুর উঠিতে—বসিতে--খাইতে--শুইতে--হাঁচিতে-হাঁইতুলিতে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম! হিমালয়-কন্দরে মহাযোগীর তপশ্চর্য্যা হইতে হিন্দুর অন্তঃপুর-প্রাঙ্গনে বালিকার "পুকুর-পূজা" পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম। ঐহিক-পারমার্থিক উভয়বিধ কর্ম্মেই ধর্ম্মের কেবল গৌণ-মুখ্য ভেদ মাত্র। ফলিতার্থে হিন্দুর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম পরস্পরাপেক্ষিত—ওতঃপ্রোত-বিজড়িত। ধর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম শাসিত এবং কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্ম পালিত। অতএব এই 'স্বদেশী' আন্দোলনের কর্ম্মযোগ-সাধনে যথেষ্ট ধর্ম্মযোগ ভিন্ন অভীষ্ট সিদ্ধির আশা নাই। পরন্তু ধর্ম্মৈকলক্ষ্য

সিদ্ধিশক্তিশূন্য ও বিবিধ বিঘ্ন-বাধা-বিপ্লবে বিপন্ন হইবারই কথা। কতকটা হইতেছেও তাই। তবে যেটুকু সাফল্য দেখা যাইতেছে, তাহা আংশিক ধর্ম্ম-সংযোগেরই ফল। অতএব পূর্ণ ফল-লাভের প্রয়োজনে পূর্ণ বা প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম-সংযোগেরই আয়োজন আবশ্যক। বেদের সার উপদেশ—"ধর্ম্মং চর ধর্ম্মং চর। ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং জীবানাং মধু।" ধর্ম্মই একমাত্র আচরিতব্য। ধর্ম্মই সর্ব্বজীবের মধুসম সুখ-সেব্য। মানবের এই মধু ভাগবতধর্ম্ম। তৎ-শূন্য যে কোন বিষয়কর্ম্মই বিষ, বিস্বাদ,তিক্ত; তাই সাধুগণ মধুশূন্য বিষবৎ বিষয়ে বিরক্ত। তাঁহাদের কাছে ঐরূপ বিষয় 'য়'-শূন্য, সুধু 'বিষ' বলিয়াই গণ্য। অতএব এই 'স্বদেশী' আন্দোলনরূপ জাতীয় বিরাট বিষয় কর্ম্মে ধর্ম্মকেই কেন্দ্র করিয়া, ইহ-পরলোক বেড়িয়া ইহার পরিধি-মণ্ডল কল্পনা পূর্ব্বক—বীর-বীর্য্যে—অথচ ধৈর্য্যে গাম্ভীর্য্যে কার্য্যে লাগিতে হইবে। কর্ম্মের উদ্যম ও ধর্ম্মের সংযম, উভয়ই আমাদের এই সাধন-পথে—অর্থাৎ জাতীয় মুক্তি-তীর্থ-যাত্রার দীর্ঘ পথে আগে পাছে থাকিয়া, আমাদিগকে পরিচালিত ও পরিরক্ষিত করিবে।

পরম প্রামাণ্য তন্ত্রশাস্ত্রে শ্রীসদাশিব শ্রীপার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—

"যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়সমশ্নুতে।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মৈতদ্বয়ং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥"

অর্থাৎ—

যে উপায়ে হে দেবেশি! জন লভে মঙ্গল,
তাহাই কার্য্যরে জান, এই ধর্ম্ম সনাতন।

'উপায় কি' প্রশ্নের উত্তর এ স্থলে শিব-বাক্যেই পরিষ্কার জানা যাইতেছে। যে উপায় অবলম্বন করিলে লোকের অশুভ ক্ষয় ও শুভোদয় হয়, তাহাই যথার্থ উপায়, তাহাই মানবের অবশ্য সাধনীয়। শাস্ত্র, যুক্তি, সাধুবাক্য, ঐতিহাসিক উদাহরণ, ইত্যাদি সমস্ত প্রমাণ দ্বারাই প্রতীতি হয় যে, একমাত্র ধর্ম্মই ক্লেশ-বিনাশক ও শুভ-বিধায়ক। পূর্ণধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্মের মূলী-ভূতা শক্তি যে ভগবদ্ভক্তি, তিনিই ক্লেশঘ্নী ও শুভদা, তাহা পূর্ব্বেই শাস্ত্রোক্তি-বিচারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব বর্ত্তমান 'স্বদেশী' আন্দোলনের শুভাশী হইয়া, স্বদেশী বর্ত্তমান অপায়রাশি নাশিবার জন্য এক মাত্র ভগবদ্ভক্তিমূলক ভাগবতধর্ম্মই আমাদের উপায়।

আমাদের "একে তিন—তিনে এক" তত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—আমাদের এই তিন কর্ত্তাই স্ব স্ব শাস্ত্রে ঐ এক উপায়ই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিন্দুর ইহাতে আর মাথা নাড়িবার যো নাই। ব্রহ্মার শাস্ত্র বেদ, বিষ্ণুর শাস্ত্র গীতা ও মহেশ্বরের শাস্ত্র তন্ত্র, এই তিন মূল প্রামাণ্য শাস্ত্রের উক্তিই যুক্তিযোগে আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইলাম যে, ভগবদ্ভক্তিমূলক ভাগবত-ধর্ম্মই আমাদের সকল অপায় নাশের উপায়-বিধায়ক ও সকল শুভ সাধনার সিদ্ধিপ্রদায়ক। তদ্ভিন্ন আমাদের সমস্ত পুরুষকারই ভস্মে ঘৃতাহুতি-দান—মরুভূমে বারি-বিন্দু-বিধান।

আজ আমরা অনেকেই শাস্ত্র-শাসন না জানিয়া ও না মানিয়া, যথেচ্ছাচারী হইয়া নিজ নিজ আসুরী শক্তির গর্ব্বেই

স্বাবলম্বন (selfhelp) ধরিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছি। ভাগবতধর্মের প্রয়োজন ভুলিয়া, শাস্ত্রোক্তি হেলিয়া, অহঙ্কারসর্ব্বস্ব পুরুষকারকেই পরিচালক করিলে, শ্রেয়োলাভ দূরের কথা, আমরা পূর্ব্বোক্ত সেই শ্রীকৃষ্ণোক্তি "বিনঙ্ক্ষ্যসি" বাক্যেরই বিষয়ীভূত হইব। শাস্ত্র-শাসনভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচারে-হিন্দুর কোন সিদ্ধিই সম্ভাব্য নয়, কোন সুখই লভ্য নয়, কোন সদ্গতিই প্রাপ্য নয়। গীতার ১৬শ অধ্যায়ে ভগবান ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন,—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥"

অর্থাৎ—

শাস্ত্রবিধি অবহেলি স্বেচ্ছাচারে যার রতি,
না পায় সে জন হায়! সিদ্ধি-সুখ-শুভগতি;
শাস্ত্রই স্বীকার্য্য তব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবহারে;
শাস্ত্রমর্ম্ম জেনে কর্ম্ম করিবে তদনুসারে।

অধুনা আমাদের একমাত্র জাতীয় সাধন এই স্বদেশী আন্দোলনকে—'স্বদেশী' বেশে ভগবদিচ্ছাই এদেশে অবতীর্ণ জানিয়া, সংযম, সারল্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, শান্তি, ক্ষান্তি ও ঐকান্তিকতা প্রভৃতি সাত্ত্বিক পূজোপহারে ইহাকে তুষ্ট এবং ভাগবতধর্ম্মামৃত-মিশ্রিত কর্ম্মযোগ-ভোগ-প্রদানে ইহাকে পুষ্ট রাখিতে হইবে। কিন্তু অধর্ম্ম, অসত্য, ঔদ্ধত্য, উচ্ছৃঙ্খলত্ব, অসংযম, অনুদ্যম, রোষ, অসন্তোষ, ভীতি, অপ্রীতি, বিরোধ, বিদ্বেষ প্রভৃতি রাজস-তামস দুর্ভাবসমূহের অশুভ সংশ্রব-প্রভাবে ইহা ব্যভিচারিত, বিপ্লব-বিকৃত, অনর্থ-নিদান ও ব্যর্থপরিণাম হইয়া যাইবে। মোটকথা, আমরা এই 'স্বদেশী' লইয়া বিষম পরীক্ষায় পড়িয়াছি। ইহাকে ছাড়িলে আমাদের সর্ব্বস্ব যায়, অথচ নানা বিঘ্ন-বিপ্লবে বজায় রাখাও দায়। এই 'স্বদেশী'ই এখন আমাদের ধ্যান, জ্ঞান, মান, প্রাণ। 'স্বদেশী'ই আমাদের বিশ্ব—'স্বদেশী'ই সর্ব্বস্ব। 'স্বদেশী'র নাশেই আমাদের সর্ব্বনাশ। এ হেন 'স্বদেশী'র সংরক্ষা ও সাফল্যের জন্য ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মযোগই একমাত্র উপায়।

ধর্ম্মের হননে বা রক্ষণে আমরা তদ্বৎ ফলই আবার ধর্ম্মকর্ত্তৃক প্রতিপ্রাপ্ত হই। শাস্ত্রে আছে,—

"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।"

অর্থাৎ—

ধর্ম্মকে যে নাশে, ধর্ম্ম নাশেন তাহাকে।
রাখেন তাহাকে ধর্ম্ম, ধর্ম্মকে যে রাখে॥

এই 'স্বদেশী' সাধনে যদি ধর্ম্মকে আমরা বজায় রাখিতে পারি, তবে ধর্ম্মও আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন; আর যদি ইহাতে আমরা ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া ফেলি, তবে ধর্ম্মও এতদ্দ্বারাই আমাদিগকে নষ্ট করিবেন। কর্ম্ম-সিদ্ধি দূরে থাক্, ধর্ম্মশূন্য সাধনই আমাদের নিধনের হেতুভূত হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই ধর্ম্ম সুধু সাধারণ সমাজ-শাসন-সূচক নীতিমূলক স্থূল ধর্ম্ম নহে; ইহা (আবার বলি) ভগবদ্ভক্তি-তত্ত্বমূলক ভাগবতধর্ম্ম। সুনীতি-সুকৃতি সমস্তই ইহারই অন্তর্ভূত। এই ধর্ম্মই আমাদের সাধনের একমাত্র সহায়,—সিদ্ধির অমোঘ উপায়।

অতএব 'স্বদেশী' সাধনোপলক্ষে-ধর্ম্মকেই জাঁকাইয়া তোল। চারিদিকে আবার উদ্দীপ্ত আগ্রহে ধর্ম্মসভা, হরিসভা, সংকীর্ত্তন-সমাজ প্রভৃতি খোল। অবিশুদ্ধ—ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বিদেশী বস্ত্র ছাড়; স্বধর্ম্মসঙ্গত সুপবিত্র বস্ত্র ধর। পূজা-অর্চ্চনা কর। দান-ধ্যান ধর। সদাচার—শৌচাচার—শিক্ষা-দীক্ষা লও। হিন্দু! 'স্বধর্ম্মে' স্বদেশী হও। ভগবচ্চরণাশ্রয়-রূপ নিত্যধামই হিন্দুর প্রকৃত স্বদেশ। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" (গীতা)। এ সংসার ত দুদিনের প্রবাসের বিদেশ মাত্র। স্বধর্ম্ম-সহযোগে এই 'স্বদেশী' সাধিয়া, সেই নিত্য স্বদেশের যোগ্য হও। অতএব 'স্বদেশী'র সঙ্গে সঙ্গে—অঙ্গে অঙ্গে স্বধর্ম্মপ্রসঙ্গ রাখ। স্বদেশ ও স্বধর্ম্মে—ভগবদ্ভজন-মর্ম্মে মজিয়া থাক। কবি-বাণীর প্রতিধ্বনিতে বলি—

"'স্বদেশী'-সেবন-পবন-প্রবাহ-
　　প্রমোদ-রঙ্গেতে।
ভাস স্বধর্ম্ম সরিতে পরেশ-
　　প্রেম-তরঙ্গেতে॥"

সর্ব্বান্তরে নিরন্তর ভগবানকে ডাক। তাঁরি চরণ ধরিয়া থাক। সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা ধর্ম্মেই মতি রাখ। এ ঘোর 'স্বদেশী'-সঙ্কটে স্বধর্ম্মই সহায়। পল্লী-সমিতি, জেলা-সমিতি, প্রাদেশিক ও মহাসমিতি, সর্ব্বসভার দেশে ধর্ম্ম চর্চ্চার নির্দ্ধারণ (resolution) কর। জাতীয় বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রবর্ত্তন কর। তীর্থস্থল, দেবালয় প্রভৃতির সংস্করণ ও সমুন্নয়নে যত্নবান হও। পাড়ায় পাড়ায় খোল-করতাল বক্তৃতা ছুটুক। ভগবৎকীর্ত্তনে, শ্রবণে, স্তবনে, জপনে আবার দেশ মাতিয়া উঠুক। আবার 'স্বদেশী' ভাবসহযোগে গ্রামে নগরে নব আয়োজনে—নবোন্নয়নে রামায়ণ, চণ্ডী, ঢপ, পাঁচালী, পুরাণপাঠ, কথকতা, কীর্ত্তন নর্ত্তন লাগাও। বিবিধ আকারে—বিবিধ প্রকারে 'স্বদেশী' কর্ম্মযোগের সঙ্গে সঙ্গে আবার ভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে ভাগবতধর্ম্ম জাগাও। তাহারি শুভফলে—দৈববলে আমাদের সাধের 'স্বদেশী' নির্ব্বিঘ্নে ফুটিবে। স্বদেশী কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য অবাধে উঠিবে। ধন-ধান্য-আয়ু আরোগ্য,—শান্তি-সৌভাগ্য আবার আসিবে। আমাদের দুঃখিনী স্বদেশ-জননীর মলিন মুখ আবার হাসিবে। অতএব 'স্বদেশী' সাধনে ভাগবতধর্ম্মরূপ ভারতের স্বধর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান সহায়। এই স্বধর্ম্মই 'স্বদেশী'র সুসিদ্ধি-বিকাশে ও স্বদেশের সমস্ত বিঘ্ন-বিপত্তি-অপার-অশান্তি বিনাশে অব্যর্থ ও অদ্বিতীয় উপায়।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

হরি-সংকীর্ত্তন।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

হরিনাম—হরিনাম—হরিনাম সার।
নাই নাই নাই গতি কলিকালে আর॥

হরিসংকীর্ত্তনই কলির এক মাত্র সহজ, সরল ও সফল সাধন। আর সব সাধন

পক্ষে প্রায় অসাধ্য। তাই দয়াময় শাস্ত্র কলির জন্য খালি হরিনাম ব্যবস্থা করিয়াছেন।" বেদভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন, গোলোকের গুপ্তনিধি, ভক্তের সর্ব্বস্ব-ধন সেই হরিনাম দয়াল গৌরহরি দুহাতে জগতে বিলাইয়াছেন। শুধু হিন্দু নয়; আচণ্ডাল-ম্লেচ্ছ-যবনে পর্য্যন্ত হরিনাম দীক্ষা দিয়াছেন।

"জীবের কি কথা, তরু-গুল্ম-লতা
তরান করুণা করি।
ঘৃণিত কুকুর, দয়ার ঠাকুর
তারেও বলান হরি॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ "ঝারিখণ্ডের" বন-পথে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে বনের গাছ-পালা-লতা-পাতা পর্য্যন্ত হরিনাম-তরঙ্গে কাঁপাইয়া নাচাইয়া মাতাইয়াছিলেন! আবার শ্রীপুরীধামে শ্রীগৌরহরি নিজভক্ত একদল শ্রীক্ষেত্রযাত্রীর সহযাত্রী গৌরকৃপার্থী বাঙ্গালা দেশের এক কুকুরকে পর্য্যন্ত শ্রীমুখের 'নারিকেল'-প্রসাদ খাওয়াইতে খাওয়াইতে 'হরি' বলাইয়াছিলেন! টীয়া-ময়নাকে লোকে 'হরি' বলায় বটে, কিন্তু কুকুরকে আমাদের সেই বাঙ্গালী—কাঙ্গালের ঠাকুরটিই 'হরি' বলাইয়াছেন! যাঁরা সেই সময় সেইখানে উপস্থিত-থাকিয়া, কুকুরের মুখে স্পষ্ট 'হরি' শব্দ স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, তাঁরাই স্বরচিত গ্রন্থে স্বহস্তে তা সবিস্তারে লিখে গিয়াছেন। ইহাকে যদি বিভূতি (miracale) বলেন, তাতেও আপত্তি নাই। আর অবিশ্বাস করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। শ্রীগৌরহরি জাতি-বিচার না করিয়া সকল মানুষকেই [illegible] দিয়াছেন, শুধু [illegible] বিশ্বাস করিলেই যথেষ্ট। ফলে কঠিন সাধনে অক্ষম কলির লোকের নিস্তারের জন্যই তাঁর হরিনাম-বিস্তার। তৎকর্ত্তৃকই শাস্ত্র-খনির গর্ভস্থ কলির হরি-কীর্ত্তন-বিধিরূপ অমূল্য নিধি প্রদর্শন ও প্রচার; তাই গৌরহরি কলিযুগ-পাবনাবতার। শাস্ত্র বলেন—

"কৃতে যুগে তপস্তায়াং,
ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং,
কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

অর্থাৎ—

সত্যে তরে তপস্যায়,
ত্রেতায় যজ্ঞ-ক্রিয়ায়।
দ্বাপরেতে সেবার্চ্চনে,
কলিতে 'হরি'-কীর্ত্তনে॥

'তপ্' ধাতুর অর্থই কষ্টকরা। সত্যযুগের তপস্যা কলির ক্ষীণজীবী খেলার পুতুলগুলির পক্ষে একান্ত অসাধ্য। তাই শাস্ত্রমতে কলিতে সামান্য দৈহিক কষ্টকর উপবাসই প্রধান তপস্যা। কারণ কলিতে "অন্নগতাঃপ্রাণাঃ"। তা এ তপস্যাটিও এখন প্রায় 'একাদশী' ও 'অমাবস্যা-পূর্ণিমার নিশিপালনেই' নিঃশেষিত। তাও অনেকের একাদশীতে 'আটাদশীর' ঘটা! পূর্ণিমাদিতেও ভাতের প্রতিনিধির পূর্ণ আয়োজন! এই ত কলির তপস্যার দশা। আর ত্রেতার যাগ-যজ্ঞই বা কোথায়? আধসের গব্য ঘৃত টাকায়, তাতেও ভেজালের আশঙ্কা। যজ্ঞের অন্যান্য আনুষঙ্গিক দুর্লভ উপকরণাদির উল্লেখও অনাবশ্যক। রোগে বাগে আমাদের মুষ্টি-মেধ-যজ্ঞে একটা [illegible]

দুষ্কর হইয়াছে। বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়ার যোগ্য পুরোহিতও এখন রহিত প্রায়। তারপরে দ্বাপরের পূজার্চ্চনইবা এখন বিশেষ কি আছে? এখন পেট-পূজাই দুঃসাধ্য; কাজেই ধর্ম্মোৎসব-পূজাদি প্রায় অসাধ্য। অর্থের অনাটন, দ্রব্যের অশুদ্ধি, আচারের অভাব, আয়োজনের অপূর্ণতা, শরীরের অপটুতা, অবসরের অল্পতা ইত্যাদি কলিতে পূজাদি সাধনের বাধক। কেবল সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডমূলক হিন্দুধর্ম্ম বজায় রাখিতেই যা কিছু পূজার্চ্চনাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ফলিতার্থে কলিতে প্রকৃত পারমার্থিক পূজার্চ্চন লুপ্তপ্রায়। তবে ব্যক্তিগত ভাবে যা কোথাও কিঞ্চিৎ আছে; তদ্ভিন্ন সধারণতঃ সমস্তই কাম্য বা নৈমিত্তিক! সুতরাং ভববন্ধন-বিমোচনের মুখ্য লক্ষ্যীভূত পূজা-পার্ব্বণ প্রায় লক্ষিত হয় না।

ফলকথা, কলিতে হরিনাম-সংকীর্ত্তনই দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী অতি সহজ পারমার্থিক সাধন। কোন হাঙ্গাম নাই। সিকি পয়সাও খরচ নাই। তুলসীদাস ঠিক বলেছেন—

"রাম কহনে কুচ্ দাম না খরচে,
গির্ ন যায় গাঁঠরিয়া।"

তা ছাড়া, কোনরূপ সংযম-শৌচবিধান, উপবাস, উপকরণ-উপাদানের আয়োজন, কিছু দরকার নাই। যখন তখন, যেখানে সেখানে, যেমন তেমন ভাবে এ সাধন চলে।

"ন দেশ-নিয়মস্তত্র না কাল-নিয়মস্তথা।
উচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধো ন শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনে॥"

অর্থাৎ—

স্থান-কাল-শুচি-অশুচি-আচার,
হরিনামে নাই কিছুরি বিচার।

আবার আরো সুবিধা, ইহাতে গুরু-দীক্ষা, পুরশ্চরণাদিরও একান্ত অবশ্যকর্ত্তব্যতা নাই। ইহা সেই ষোড়শ-নামাত্মক "তারক মন্ত্র" প্রচারক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীমুখের আশ্বাস-বাণী।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু কহে—এই সে তারক মহামন্ত্র।
ইহা জপ কর সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
অনুক্ষণ লহ, ইথে বিধি নাহি আর॥
দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥"*
(শ্রীচৈতন্যভাগবত।)

হরিভজনের পরিপূর্ণতম আদর্শ অবতার শ্রীগৌরহরির এই অমৃতময়ী আশ্বাসবাণীতে যার বিশ্বাস না হয়, তার তবে আর কবে কি হইবে? এ দিকে নিশ্বাসকেও ত বিশ্বাস নাই।

"নিশ্বাসে নহি বিশ্বাসো কদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি।
সাধনীয়মতো বাল্যাৎ হরের্নামৈব কেবলম্॥"

অর্থাৎ—

নিশ্বাসে বিশ্বাস নেই—কবে আর ব'বেনাক।
তাই বলি বাল্য হতে হরিনাম নিতে থাক॥

---

* সমাজ-প্রতিষ্ঠা ও সাধননিষ্ঠা বজায় রাখিতে গৃহাশ্রমে কুলমন্ত্র ও গুরু-করণাদির প্রকৃষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, সন্দেহ নাই। তবে যদি ঘটনাচক্রে কাহারও ভাগ্যে না ঘটে, তবে তাহারও নিরাশ হওয়ার কারণ নাই। স্বেচ্ছা-সাধিত 'তারক মন্ত্র' হরি-নামেই সকলেরই পরিণাম রক্ষা হইবে।— সকল অকূলন কূলাইবে। মহাপ্রভুর "অপেক্ষা না করে" বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য; কিন্তু গুরুকরণ-নিষেধক নহে। বলা বাহুল্য,

আমাদের বাল্য দূরগত, যৌবনও গত, বার্দ্ধক্য আগত ; এখনও হরিনাম-সাধনকেই সঙ্গত ভাবিয়া তদ্গত হইতে পারিলাম না! বৃদ্ধকালটাও যে বাজে চিন্তায় বাজে খরচ হইতে চলিল। সেই চিন্তামণির চিন্তা ছলে আর চিন্তা কি ছিল? হায়!—

"বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত-
স্তরুণ স্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ,
হরিপদপঙ্কে কোঽপি ন লগ্নঃ॥"

সোঝা গ্রাম্যভাষায় মর্ম্ম এই—

বাল্য কাটে খেলার চোঁটে,
বৌ নিয়ে যৌবন টোটে ;
বুড়োকালে ভাবনা মোটে,
হরিভজন হয়না মোটে!

সংসারের এই দশা! এমন সুলভ হরি-ভজনের দুর্লভ মানবজন্মটা নেহাৎ "মাঠে মারা যাওয়া" বড়ই আপ্‌সোসের বিষয়। আর এমন সহজে—শুধু 'হ' আর 'র'এ 'ই-কার' দিয়ে—দু-আখরেই 'আখের' বজায় না রাখা বেজায় বোকামি, সন্দেহ কি? আহা! সংসার-সাগরের এমন অভয় তরী, ভবরোগের এমন অব্যর্থ বড়ী, সিদ্ধির এমন সহজ মন্ত্র, শান্তির এমন আশ্চর্য্য যন্ত্র, মুক্তিতীর্থের এমন সোঝা পথ, আর গোলোকধামের এমন 'আলোক-রথ' আমরা যদি পেয়েও না পাই, হেলায় হারাই, তবে আমাদের মত হতভাগা আর কে আছে?

হবেই ত যেতে,
উঠেছিও পথে,
মাথায় আছে বোঝা,
পথও আছে সোঝা ;
তবু ঘুরে মরে যে,
তার মত মূর্খ কে?

আমরা নাকি মহামূর্খ, তাই এমন হারাগত রথ, এমন সরল সংক্ষিপ্ত সুপথ ছেড়ে আপন দোষে দুঃখ পাই ; অথচ যাওয়াই যে চাই, সেটি না-জানা নাই!

হরি-কীর্ত্তন কলির সাধনের বড় মজার সোঝা কল। কল থাকিতে যে "হাতে-হেতেরে" খেটে মরে, সে মিছা সময় হরে, বৃথা শক্তিক্ষয় করে। "হাতে হেতেরে" করিয়া তোলা এখন আর সময় ও শক্তিতে কুলায় না। কাজেই কল চাই। কলিতে হইতেছেও তাই। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কল বসিয়াছে। অল্প সময়ে বহু শ্রমসাধ্য বহু কার্য্য সম্পাদনই কলের ফল। কলের কাজ—ছ মাসের পথ ছ দণ্ডে যাওয়া, সুদূরের সংবাদ মুহূর্ত্তে পাওয়া, বহু ব্যবহার্য্য বস্তু অল্পকালে ও অল্পায়াসে প্রস্তুত হওয়া, ইত্যাদি। তাই কলির সকল ব্যাপারই আজ কলে কলে ছাওয়া।

তাই ভগবৎকৃপায় কলির সাধনরাজ্যেও কল আসিয়াছে। শান্তিধামেরও রেল বসিয়াছে। গৌরহরির প্রেমের তারে "লাইন ক্লিয়ারের" খবর ছুটিয়াছে। নামের টিকিট থাকিলে আর রাখিয়ে

গৌরলীলায় ভক্তগণের সবারই গুরুকরণ হইয়াছিল। স্বয়ং জগদ্গুরু গৌরাঙ্গও লোক-শিক্ষার্থ নিজ গুরুকরণ ও মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"ভক্তবেশে ভবে এসে গৌরভগবান—
আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখান।"
(লেখক।)

দেওয়ার ভয় নাই। একেবারে 'মরণ' ইষ্টেশন ছাড়িয়ে সেই অভয়চরণ-ধামে অবতরণ চাই। আহা! সেই যে আমাদের চিরানন্দবিরাম-নিকেতন ভাই!

তবে চটপট্ টিকিট্ লও, প্রস্তুত হও! মনটা গুছিয়ে বাঁধা চাই। ঘন্টা পড়ার আর দেরি নাই! এ কলের গাড়ী না চাপিলে, হেঁটে খেটে আর কত জন্মে যাবে ভাই?

কলির মজাই কৃষ্ণভজা; তাও আবার এমন সোজা! কেবল 'হরি' বলে ডাকা! তাই ঐ একগুণেই কলির সকল দোষ ঢাকা! শ্রীমদ্ভাগবতে কলিভয়-কাতর রাজা পরীক্ষিৎকে আশ্বাস দিতে মুক্ত ভক্ত শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

"কলেৰ্দোষনিধে রাজনস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেনৈব মুক্তবন্ধো পরং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ—

হে রাজন্!
দোষসিন্ধু কলি—এক মহাগুণ তার,
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মুক্তি লভি কৃষ্ণ পায়।

বলিয়াছি ত, কলির ঐ এক গুণেই সকল দোষ কাটিয়াছে; তবে যে জন সে গুণের ফল পাইবার পথে না চলে, তার অদৃষ্টে কলির সেই দোষরাশির অনিষ্টফলই অবশ্য ফলে। যদি শুধু 'হরি'নামটি করিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধির সুবিধা হয়, তাতেও আলস্য ঔদাস্য অবহেলা করা দুর্ভাগ্যজনিত দুর্ব্বুদ্ধির ফল বৈ আর কি? যদি বল—বিশ্বাস হয়না যে। তা আগে নাইবা হইল। নামে সহজ বিশ্বাসের সৌভাগ্য সবারি সম্ভবে কি? আমাদের এমন কি জন্ম-জন্মান্তরের জোর কপাল যে, 'নাম-নামী অভেদতত্ত্ব' জানিয়া—সহজ বিশ্বাসে নামের আশ্বাসে নির্ভর করিব? কিন্তু অন্ততঃ পরীক্ষা স্বরূপেও নাম নিয়া দেখিলেইবা ক্ষতি কি? স্বয়ং শাস্ত্র তাতেও কিছু লাভের আশা দিয়াছেন। এমন কি, হাসি-তামাসায় 'হরি' বলিলেও, কিছু না কিছু লাভ আছে। তাহার শক্তিও নামকারীর কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের কাজ করে। শাস্ত্র বলেন,—

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

অর্থাৎ—

সঙ্কেতে কি পরিহাসে, স্তোভে বা হেলায়—
হরিনাম নিলেই অশেষ পাপ যায়।

এ কথায়ও আবার সেই কথা—বিশ্বাস হয় না। তাবার সেই উত্তর—নাইবা হইল; পরীক্ষা স্বরূপই কর। কোন হাঙ্গাম ত নাই। পেষাদারী বুদ্ধিতেই কর। অর্থাৎ নাম নিলে যদি কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, তবে নেওয়াই চতুরের কাজ; কারণ যদি কিছু লাভ থাকে, তবে এমন অনায়াস-প্রাপ্যতায় সুযোগ ছাড় কেন? যেখানে চিরকাল এ ভারতের বিশ্ববিখ্যাত বড় বড় লোক হরিনামের উপকারিতার কথাটা বলিয়া গিয়াছেন; জ্ঞান-প্রেম-পবিত্রতার পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীবের দুঃখে কেঁদে কেঁদে সর্ব্বজনে সেধে সেধে এই হরিনাম দিয়া গিয়াছেন, সেখানে না হয় একবার কিছু দিন পরীক্ষা করেই দেখিনা। ভাল না লাগে বা বিশ্বাস না জাগে, কি, কোন উপকার বোধ না পাই, ছেড়ে দিতে ত বাধা নাই। ছেড়ে দিলে ত কেউ তেড়ে ধরিবে না, কোন 'কৈফিয়ৎ' তলবও করিবে

না; তবে আর আপত্তি কি? 'সাঁতার না শিখে আর জলে পা দিবনা' এ কথাটা যেমন, আগে বিশ্বাস না হলে আর হরি বলিব না, এটাও প্রায় তদ্বৎ। কবে বিশ্বাস হবে, তবে নাম লব, এটা বাস্তবিক দুরাশা—দুর্ব্বুদ্ধির ভাষা—দুরদৃষ্টের তামাসা মাত্র। বিশ্বাস হতে হতে এ দিকে যদি নিশ্বাস ফুরিয়ে যায়! তখন অন্তকালে আর কি হবে? হয় ত রসনা অবশ হবে; 'হরি' বলার শক্তিই রবে না। হয় ত শ্রবণ বধির হবে; বন্ধুগণে 'হরি' বলিলেও শুনা যাবেনা। হয়ত অনেক আগেই অজ্ঞান হতে হবে; তখন শ্রবণ কীর্ত্তন দূরে থাক্, হরি-স্মরণও হবে না!

"হেলায় খেলায় বেলা গেল,
আঁধার নিয়ে সন্ধ্যা এল,
চোখের দিঠি অন্ধ হল,
পন্থা গেল হারায়ে।
'হচ্ছে হবে, কচ্ছি করি'—
ঐ খেদে যে এখন মরি;
আনতে লবণ (হরি হরি)
পান্তা গেল ফুরায়ে।"

অতএব জীবন-কালেই পাপীর জীবন—পতিতপাবন নামের সেবন চাই। আর তাতে অসুবিধাও কিছুই নাই। সকল কাজে—সকল ব্যাপারের মাঝেই ভগবানের নামোচ্চারণ—নামস্মরণ অবাধেই চলিতে পারে। করিয়া দেখিলেই ক্রমে সহজ হইয়া যায়। নামই যেন নিজ সেবা সুলভ করিয়া লন। ভারতের ইহা চিরপরীক্ষিতসত্য।

কাজে না লাগিয়া, দূরে থাকিয়া, ইহাকে কেবল তর্কের বিষয় করিয়া রাখিয়া জীবন কাটাইলে আর কি হইবে?

"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ—তর্কে বহু দূর।
অভ্যাসে বিশ্বাস লভে যে জন চতুর॥"

ভগবন্নামাভ্যাসে অনায়াসেই আশা পূরে; অতএব এই দুর্লভ মানবজন্মের এমন সুলভ সাফল্য হেলায় হারাইয়া, যদি পুনর্জন্মে আবার নীচে নামিতে হয়, তবে তার চেয়ে গুরুতর ক্ষতি আর কি হইতে পারে? গীতায় ভগবান স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ভগবদ্বিমুখ নরাধমকে তিনি সিংহ-ব্যাঘ্র-সর্পাদি তির্য্যগ্‌যোনিতেই অজস্র নিক্ষেপ করেন, যথা—

"ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।"

তাই বলি সুধু হরিনাম করিলে যদি অন্ততঃ সেই "হাতের পাঁচটা" ও বজায় থাকে, অর্থাৎ ফিরে জন্মে আবার মানুষই হইতে পারি, তবে অন্ততঃ সে আশায়ও হরিনামের একটু যোগাড় রাখা উচিত। হরিনামের স্বল্প পুঁজি থাকিলেও, হরিভজনাধিকারের এই মানবজন্ম পুনঃপ্রাপ্তির আশা থাকে। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলেছেন,—'লোকে নিদানপক্ষে যেন সেইটুকু ভগবানকে ডাকে, যাতে "দুকুড়ী সাতের খেলা"টা থাকে!' বলা বাহুল্য, এই সাধনের জন্ম—সাধের জন্ম—নরজন্ম বজায় থাকাই 'দুকুড়ী সাতের খেলা' রাখা। স্বর্গ, মোক্ষ, ব্রহ্মানন্দ—প্রেমানন্দ প্রভৃতি 'ছকা-পঞ্জা-ব্যোম্' না হউক্, অন্ততঃ "দুকুড়ী সাত"টা রউক্।

খেলার খেলা রাখিতে কত হিসাব-হুঁসিয়ারী লাগে, কিন্তু এ ভবের খেলায় সুধু হরিনাম ধরিয়া থাকিলেই নিশ্চিন্ত। নাম-নির্ভর-শক্তি নিজেই সব করিয়া কর্ম্মিয়া দিবেন; সাধককে সব জানিয়ে শুনিয়ে

বানিয়ে নিবেন! তবে আর চিন্তা কি? বিশ্বাসেরই বা অপেক্ষা কি? ভক্তিরই বা ভাবনা কি? হরিনাম ধরে থাকিলে, পরিণামে সবই হবে, সবই পাওয়া যাবে। এ জন্মে না হয়, জন্মান্তরে হবে। উপরে চড়ায় একটু দেরি থাকিলেও, নীচে পড়ার ভয় আর রবে না।

তবে ভাই! কলের যুগ এই কলিযুগে হরিনাম-কলেই মানবজন্মের পরিণামফল উৎপাদনের উদ্যোগ কর। এ কলে আত্মসমর্পণ করিলে সকল শুভার্থই সিদ্ধ হবে। যা যা করিতে হবে, ধরিতে হবে, ছাড়িতে হবে, বেড়িতে হবে; নিতে হবে, দিতে হবে; চেতে হবে, পেতে হবে; অর্থাৎ ঠিক যেমনটি হতে হবে, নাম-কলে তা ক্রমাভ্যাসে—অনায়াসে আপনি হবে। যেমন চাউলের কলে ধানগুলি ঢেলে দিয়েই অবসর; তারপর কলের ক্রিয়ায় ভানা-কোটা-বাছা-ছাঁটা সব ঠিক হয়ে, যথাপথে চিটে—গুঁড়া—তুষ—কুঁড়া সব বেরিয়ে যাবে, পরিষ্কার চাউলগুলি প্রস্তুত পাবে; সেইরূপ এই অমিতশক্তি আধ্যাত্মিক এঞ্জিনে চালিত হরিনাম-কলে আপনাকে ফেলে দাও, অর্থাৎ মনোপ্রাণ ঢেলে দাও; ঐহিক, পারত্রিক,—বৈষয়িক, পারমার্থিক, সর্ব্বার্থেই সাধনশক্তি ও ভগবদ্‌ভক্তিযোগে সহজেই পূর্ণমানবত্ব প্রাপ্তির উপায় হবে।

"যেমি হবার তেমি হবে,
যেটি পাবার—সেইটি পাবে,
আর কিছুনা কর্‌তে হবে,
কেবল হরিবোল!
আপ্‌নি হরি নিবেন ভার,
কি ভয় ভাবনা আর?
তোমার কেবল নামটি সার,
হরি হরি বোল!"

আবার সেই অবিশ্বাস—সেই সন্দেহ। অনেকেই ত ঐ নাম লয়, কত লোকেইত "হরি হরি" কয়, হরিনাম জপে, হরিনামের মালা টেপে, হরিসংকীর্ত্তন করে, "হরি" শব্দ স্মরে, কিন্তু কৈ, তার কটা লোকের সাধনশক্তি, ভগবদ্‌ভক্তি, পবিত্র সত্ত্ব বা প্রকৃত মানবত্ব-লক্ষণ লক্ষিত হয়? বরং তাদের অনেকে হয়ত অনাচারী, পরদারী, পরানিষ্টকারী, অহঙ্কারী, ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, হিংসুক, মিথ্যুক ইত্যাদিও দৃষ্ট হয়! এর মানে কি? এ রহস্যের ভেদ কি? যদি নামে সব হয়, তবে আবার নাম করিয়াও অনেকের সাধারণ চরিত্রটাও অশুদ্ধ রয়, এ সত্যটা যে বিষম সমস্যাময়!

বাস্তবিক ইহা কথা মিথ্যা নয়, বিষয়টি সত্যই আপাত-সমস্যাময়! তবে কি শাস্ত্র, যুক্তি, সাধু উক্তি, সমস্তই অযথা?—কেবল কথার কথা? কিন্তু বাস্তবিক তা নয়; এ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরটিও শাস্ত্র-ভাণ্ডারেই পাওয়া যায়। শাস্ত্রালোচনার অভাবেই আমাদের এই সব সংশয়-বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে যেমন "নাম-মাহাত্ম্য" সুসংবাদ আছে, তেমনি "নামাপরাধ" নামে একটি ভয়ানক বস্তুরও উল্লেখ আছে। প্রবন্ধ-প্রবৃদ্ধির অনিচ্ছায় আমরা উহার প্রয়োজনানুরূপ বিস্তৃত আলোচনা বারান্তরের জন্য স্থগিত রাখিয়া, এবার সংক্ষেপে মোটামুটি এই মাত্র নিবেদন করিতেছি যে, ঐ নামাপরাধে সাধারণতঃ অনেক নামধারীই অপরাধী, সেই জন্য নামের ফলের ওরূপ বিস্ময়কর ব্যাঘাত ঘটে।

শুধু ভক্তি-বিরহিত ভাবান্তরিত (যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) নামকরাকে শাস্ত্রে "নামাভাস" বলা হইয়াছে। উহা ঠিক নাম নহে, নামের আভাস মাত্র। আর নামাভাসকারীর দশবিধ চরিত্র-দোষ ও দুর্ব্বুদ্ধি-দোষ (বারান্তরে সবিস্তার আলোচ্য) "নামাপরাধ" শব্দবাচ্য। ঐ নামাপরাধই নামের ফলনাশক।

প্রকৃত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহার আভাসেই—অর্থাৎ অরুণোদয়েই যেমন অন্ধকার দূর হইতে থাকে, আর হিংস্র জন্তু ও চোরাদি নিশাচরেরাও লুকাইতে থাকে, তদ্রূপ প্রকৃত নাম—অর্থাৎ ভক্তিযুক্ত নাম উদয়ের পূর্ব্বে তাহার আভাসেও ক্রমে মায়ান্ধকার ও পূর্ব্বাভ্যস্ত পাপবিকারসমূহ বিদূরিত হইতে থাকে। ক্রমে নামকারী নিষ্পাপ, মায়ামুক্ত ও ভক্ত হইয়া নাম-নামীর অভেদতত্ত্ব-রসাস্বাদ পাইয়া, যথার্থ নামানন্দে কৃতার্থ হইতে পারেন; কিন্তু এই পরীক্ষিত প্রণালীর প্রবল পরিপন্থীই নামাপরাধ।

অতএব নামকারিগণের মধ্যে অনেককে যে আপাততঃ নামের ফলে বঞ্চিত ও নানা দুশ্চরিত-দোষে নানা দুর্ভোগে লাঞ্ছিত হইতে দেখা যায়, তাহার একমাত্র হেতুই নামাপরাধ। সাধকের যে অপরাধ নামের ফলের বাধক, তাহাই নামাপরাধ। দুশ্চরিত্র নামকারীগণের সকল দোষই উহার অন্তর্ভুক্ত; "নামাপরাধ"রূপ দশশাখাসমন্বিত বিশাল বিষবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ফলমাত্র।

আর নিরপরাধ নামকরণ "নামাভাস" হইলেও, তাহার ফল হাতে হাতে, তাহাতে "বাকির কারবার" নাই! কবি ঠিক গাইয়াছেন,—

"(নামে) নাই বাকির দায়, নগদ বিকায়,
হাতে হাতে ফলে ফল।
মন! একবার—
হরি বল, হরি বল, হরি বল॥"

নামাপরাধশূন্য নামসাধন "নামাভাস" হইলেও, তাহাতে পাপ-তাপ, রোগ-শোক, মায়া-মোহ এড়াইয়া, কলির জীব বিষয়-বাসনা-বিমুক্ত ও ভক্ত হইয়া, পরিণামে প্রকৃত হরিনামের উদয়ে হরিপ্রেমানন্দে চিরচরিতার্থ হয়। এইভাবে—সুলভ নাম-সাধনেরই প্রভাবে চরমে পরমার্থ লাভে—তাহার দুর্লভ মানবজন্ম সার্থক হয়।

আবার, নামাপরাধীরও নিরাশ হইবার কারণ নাই। ঐ নামেই তাঁহার নিরপরাধিতার আশা। ভূপতিতের ভূ-অবলম্বনই পুনরুত্থানের ভরসা।

"ভূমৌস্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং হরে॥"
অর্থাৎ—
ক্ষিতি-পতিতের পুনরুত্থানে আলম্ব ক্ষিতি।
তোমাতে অপরাধীর—হরি হে! তুমিই গতি॥

নামের কাছে অপরাধী হওয়াই নামাপরাধ। নাম-নামী অভিন্ন; সুতরাং নামেতে অপরাধী হওয়াই হরিতে অপরাধী হওয়া, এবং ভূপতিতের ভূমির ন্যায় নামাপরাধীরও নামী হরি বা হরিনামই সার। নামাপরাধীর নাম ছাড়িলে আর উদ্ধারের উপায় হয় নাই; বরং নিরন্তর নাম নিতে নিতেই কৃত নামাপরাধে দণ্ডের খণ্ডন—

পরন্তু পরমার্থ-সম্পদ লাভ হয়। শাস্ত্র স্পষ্টই তাহা বলিয়াছেন।—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

অর্থাৎ—

নামাপরাধিগণের নামেতেই পাপ যায়।
অবিশ্রান্ত নামে পরিণামে পরমার্থ পায়॥

ভগবন্নামমাহাত্ম্যসূচক বিস্তর অমূল্য বাণী মণি-মাল্য হিন্দুর অতুল্য ভক্তিশাস্ত্রের নিভৃত বক্ষে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। অধিক উদ্ধৃতি বাহুল্য মাত্র। ফলকথা, ভক্ত-প্রিয়তম ভগবানের নামই সাধনশাস্ত্রার্থের সারতম পরম পদার্থ। দুগ্ধে যেমন ননী, পুষ্পে যেমন গন্ধ, রত্নে যেমন প্রভা, রসে যেমন মাধুর্য্য, গীতে যেমন মূর্চ্ছনা, দেহে যেমন প্রাণ, তেমনি সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের শক্তি-কেন্দ্রস্বরূপ শ্রীভগবানের নাম!

এই সারাৎসারতম ধনই কলির সাধন-সম্বল। বলিয়াছি ত, কলিতে জীবের শক্তি সামান্য, সময় কম, অথচ বাধা-বিঘ্ন বেশি, কাজেই এ অবস্থায় শুদ্ধ সারটুকু বেছে নেওয়াই ব্যবস্থা।

"অনেকশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং,
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যম্,
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥"

অর্থাৎ—

বহু শাস্ত্র, জানিবার বিষয়ও বিস্তর,
কাল কিন্তু স্বল্প, তাহে বিঘ্ন বহুতর;
অতএব সার যাহা, তাই নিতে হয়;
হংস যথা জল হতে দুগ্ধ চুষে লয়।

সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বাদিমূল চারি বেদ; তার শাখার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। তাহার ষড়ঙ্গ, গৃহ্যসূত্রাদি কত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তারপর বেদ-শিরোভাগ বিপুল বেদান্ত শাস্ত্রে প্রধান দশ উপনিষৎ; তাহার শাখাদিরূপ অপ্রধান আরও অনেক উপনিষৎ। মূল ষড় দর্শন; উপদর্শন বিস্তর। মূল স্মৃতি-সংহিতা বিশখানি, আর শাখা-স্মৃতি, উপস্মৃতি, নবস্মৃতি কত শত খানি। মুখ্য তন্ত্র বা আগম শাস্ত্র চৌষট্টি; গৌণ তন্ত্র শত সহস্র! মূল পুরাণ আঠারখানি, কিন্তু উপপুরাণ যে কত, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। বুঝুন একবার কি ব্যাপার! তারপর এই সমস্ত শাস্ত্রের আবার বিবিধ ও বহুবিধ ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী, বৃত্তি, পঞ্জী, কারিকা ইত্যাদি ইত্যাদি সমেত সে যে কি অপার জ্ঞান পারাবার,—কি বিপুলবিস্তার তত্ত্বরত্নভাণ্ডার, তাহা কল্পনা করিতেও ক্ষুদ্র মানবের ক্ষীণ ধারণাশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে! ইহারি মধ্যে সারাৎসারতম—পরাৎপরতম—প্রিয়াৎপ্রিয়তম—শ্রীহরিনাম!

সর্ব্বশাস্ত্র মূল, সর্ব্বতত্ত্ব বীজ, সর্ব্বধর্ম্ম-মর্ম্ম, সর্ব্বসাধন-প্রাণ, সর্ব্বজগৎত্রাণ, সর্ব্বগুণময়, সর্ব্বজ্ঞানাশ্রয়, সর্ব্বশক্তিসার, সর্ব্বরসাধার—সর্ব্বানন্দধাম—এই শ্রীহরিনাম!

এ হেন হরিনাম অহৈতুক ভক্তগণ কোন স্বার্থবশে সেবা করেন না। ঐহিক সুখের জন্য নয়, স্বর্গের জন্য নয়, মোক্ষের জন্য নয়, ফলে চতুর্ব্বর্গ ফলের জন্যই নয়, কেবল হরিনামের জন্যই হরিনাম সেবা করেন।

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে।
ন স্বর্গে নাপবর্গে, যদাসিত নিরন্তং কাময়ে
নাম তে হি॥"

অর্থাৎ—

না চাই ধর্ম্ম, না চাই অর্থ, বিষয়-বিলাসে বাসনা নাই;
স্বর্গে মোক্ষে নাহিক স্বার্থ, হৃদয়ে তোমার—নামটি চাই।

নাম-ভক্তের এই উক্তি নিষ্কাম নামাসক্তিরই প্রকৃষ্ট পরিচয়। হরিনামেই তিনি হরিকে দেখেন; তাই প্রেমভরে—পরমাদরে হরিনামই হৃদয়ে রাখেন। হরিনামের বলবিনিময়ে কোন ফল ইচ্ছা করেন না। 'হরিনাম' তাঁর কৃপণের ধন।

"বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্য্যাণি পুনঃ পুনঃ।
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু মে॥"

অর্থাৎ—

বিচিন্তিয়া, বিবেচিয়া, বিচারিয়া পুনঃ পুনঃ,
ভাবিমু ত্বন্নাম মম হউক্ কৃপণ-ধন।

কৃপণের টাকাই প্রিয়। টাকার বিনিময়ে—অর্থাৎ টাকা ভাঙ্গাইয়া সে কোন বিষয়ভোগ চায়না। টাকা রাখে, টাকা দেখে, টাকা নাড়ে চাড়ে, টাকা তোলে পাড়ে; কিন্তু একটি টাকাও তার ঘরের বাহির হয় না; কারণ টাকার বিরহ তার সয়না। সে কেবল টাকার জন্যই টাকা ভজে। রূপচাঁদের সেই "অখণ্ডমণ্ডলাকারং" রূপেই সে মজে। কৃপণই ধনের যথার্থ অহৈতুক উপাসক। ভক্তেরও হরিনাম-ভজন তদ্বৎ। তাহার মূলেও কিছুমাত্র ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। থাক্ অন্য ফল, পরম ফল প্রাণরক্ষার বিনিময়েও সে 'নাম' ছাড়িতে চায় না। অনিত্য প্রাণ যায় যাক্, কিন্তু প্রাণাধিক নিত্যধন ভগবন্নাম বজায় থাকুক। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ বারবার প্রাণ ত্যজিতে প্রস্তুত, কিন্তু একবারও 'প্রাণাৎ প্রিয়তম' হরিনাম ত্যজিতে একান্তই অপ্রস্তুত। আমাদের কলির প্রহ্লাদ হরিনামসর্ব্বস্ব হরিদাস ঠাকুর কাজীর প্রাণান্তক প্রহারেও একান্ত ভাবোচ্ছ্বাসভরে বলিয়াছিলেন—

"খণ্ড খণ্ড এই দেহ—যায় যদি প্রাণ,
তথাপি না বদনে ছাড়িব হরিনাম।"

ধন্য হরিনাম ভক্তি! ধন্য হরিদাস! আর আমরাও ধন্য যে—হরিদাসের পদরজঃপূত দেশই আমদের স্বদেশ। ইহাকেই বলে প্রকৃত 'নামে প্রেম'! আহা! এ হেন অহৈতুক প্রেমে আবার প্রতিদানের স্থল কোথা?

"ভাল বাসবে বলে তোমায় ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই—তোমা বৈ আর জানিনে॥"

অহৈতুক প্রেম কোন প্রতিদান চায়না। সেখানে কোন দোকানদারী—বেণেগিরি স্থান পায় না। হরিনামকে যে হরিভক্ত ভালবাসে, সে স্বভাবেরই প্রভাবে। ফলে না চাহিলেও তাঁর কিছুরি অভাব থাকে না। কেননা, নিরপরাধ নিষ্কাম প্রেমিক নামসাধকের সর্ব্বার্থসিদ্ধি স্বতঃকরতলগত। পদতলগত বলিলেও বোধ হয় বাগাড়ম্বর হয় না। যেখানে নির্নামাপরাধে হেলায় হরিনামেও মুক্তি, সেখানে ভক্তিতে নাম নিলে নাজানি কি!

"দংষ্ট্রীদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি, কিংপুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্!"

অর্থাৎ—

শূকরের দন্তাহত ম্লেচ্ছ বার বার
'হারাম! হারাম!' বলি পাইল নিস্তার;

"ভক্তিভাবে তবে যেবা 'রাম' নাম লয়,
তার সে সাধন-ফল কিনা জানি হয় !

ভক্তিশূন্য—শুধু নিরপরাধ নামেই (নামাভাসেই) ত পাপ-তাপ যায়, মুক্তি পর্য্যন্ত হয়।

"নাম্নস্তু যাদৃশী শক্তির্পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎকর্ত্তুং নশক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥

অর্থাৎ—

হরির নামের শক্তি যত পাপ হরে,
পাপীর নাহিক শক্তি তত পাপ করে।

অতএব পাপ সম্বন্ধে নির্ভাবনা। তারপর মুক্তির কথা ত ম্লেচ্ছের 'হারাম' উক্তির ফল-বর্ণনেই বলিয়াছি। তার পরের পরিণাম হরিনাম ফল পরাভক্তি—প্রেমানন্দ—মহাভাবানন্দ! তাহাই অনন্ত মহামাধুর্য্যসিন্ধুসত্ব—বৈষ্ণবশাস্ত্রসিদ্ধান্তে তাহাই বিশ্বপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াৎপ্রিয়তম শ্রীরাধাতত্ত্ব!

দাস শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' এই তত্ত্বামৃত, যথা—
"প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥"

অতএব দেখুন, হরিনাম-সাধনার পরম পরিণামফল হরি-প্রাণপ্রিয়া রাধাতত্ত্বে গিয়া পৌঁছিয়াছে! রাধা আবার কৃষ্ণ ছাড়া নন; সুতরাং রাধা-কৃষ্ণের যুগলমিলনধাম—এই হরিনাম!

প্রাচীন প্রামাণ্য ভক্তিগ্রন্থ "শ্রীবৃন্দাবনমাহাত্ম্য" বলেন,—
'হকারে বিদাতে রাধা রিকারে মাধবঃ স্মরম্'।

অর্থাৎ—

হকারে শ্রীমতীরাধা, রিকারে মাধব।
(হরিনামে যুগল-মিলন-মহোৎসব!)

হরিনাম মহিমার ইহাই সীমা। অনন্ত হরিনাম-তত্ত্বের ইহাই বুঝি অন্ত! ইহাই বুঝি পরম—চরম—চূড়ান্ত!

মানুষের তেমন ভাষা নাই, ভাষার তেমন শব্দ নাই, শব্দে তেমন অর্থ নাই, অর্থে তেমন পরমার্থবোধিনী শক্তি নাই, যদ্দ্বারা হরিনামতত্ত্ব পূর্ণ বর্ণিত হইতে পারে।

"হরিনামতত্ত্ব পারাবার—
বর্ণিবারে হারে বর্ণকার!"

তবে আর কি? ইহার উপর আর কথা কি? আর কাহারইত হতাশ হওয়ার হেতু নাই। কৃপানিধানের এহেন নাম সবারি যে নিদানের বিধান। আহা! এমন নামেও কি হেলা করিতে আছে? অবিশ্বাস করিয়া, সন্দেহ করিয়া, ইতস্ততঃ করিয়া, "আজ না কাল" করিয়া, উদ্ধারের আশার ও চরিতার্থতার চিরভরসার এই একমাত্র অব্যর্থ অবলম্ব গ্রহণেও কি বিলম্ব করিতে আছে? দিনের দিন শেষের সে দিন আগত প্রায়; এখনও কি আর দীননাথের দীনতারণ নামের শরণ গ্রহণে দিন গত করিতে হয়?

আর ভবের ভয় কি? আর পাপের ভয় কি? নীচজন্ম বা নরকেরইবা ভয় কি? আবার বলি, বারবার বলি, হরিনাম যে ভবতারণ, হরিনাম যে পাপীর জীবন—পতিতপাবন! হরিনামই যে মরণহরণ—শমনদমন! আর মুক্তির চিন্তা কি?

ভক্তির ভাবনা কি? প্রেমানন্দের সন্দেহ কি? বলিয়াছি ত, হরিনামের আভাস-ফলই মুক্তির কারণ। হরিনামই ভক্তি-ভবন! হরিনামেই অজস্র প্রেম-প্রস্রবণ!

তাই বলি ভাই! হরিবল, হরিবল। অনেক 'আবোল তাবোল' বাজে বোল বলিয়াছ, এখন একবার 'হরিবোল' বল। জিহ্বার আলস্য ছেড়ে, মনে মুখে ঐক্য করে, একবার হরি বল ভাই! হরি বল। কিছু ভার-বোঝা ত নয়, বল্লেই ত হয়। বিশ্বব্যাপী হরি যে ভক্তের তরে দয়া করে' দুটি-আখরময়! ঐ দু আখরই ভবের সম্বল। দু আখরেই জয় সকল।

"বহুজন্ম-তপে যায় জনম-মরণ,
দু আখরে কলিতে এ দুয়েরি হরণ!
সেই দু-আখর শুধু 'হরি'নামধ্বনি,
বিলাইলা বঙ্গে এসে গৌরগুণমণি।
এক গৌররূপে আর এক হরিবোলে,
আদরে বসিল বঙ্গ বসুধার কোলে।
সে বঙ্গের কোলে বসি বঙ্গসুতগণ!
জাগাও শ্রীহরিধ্বনি—জাগাও ভুবন॥"

তাই বলি ভাই বাঙ্গালি! আজ তোমার এই 'স্বদেশী' আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সেই আসল স্বদেশের কুশলপ্রসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে হরি বল। এই ভবের মাঝে, সকল কাজে, সকল সাজে—হরি বল ভাই! হরি বল। 'স্বদেশী' কর, স্বদেশ-স্বজাতি-স্বধর্ম্ম সেবা ধর, সর্ব্বকর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মে হরি স্মর ভাই! হরি স্মর। দেশের কাজ কর, পরোপকার কর, দীনের সেবা কর, বীরের পূজা কর, বলবীর্য্য বাড়াও, ভীরুতা—জড়তা তাড়াও, কৃষি-শিল্পের উন্নতি কর, ব্যবসায়-বাণিজ্য ধর, সংসারধর্ম্ম কর, পোষ্যবর্গ পাল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে 'হরি হরি বোল' বল।

ভগবানে মতি রাখ, যথাসাধ্য সর্ব্বসৎ-কর্ম্মে লাগ, সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে সতত সঞ্চরিয়ে থাক, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে 'হরি হরি' বলে ডাক।

নামে জীবন্ত আশা, অগাধ বিশ্বাস, অসীম নির্ভর, অনন্ত বল ও অফুরন্ত আনন্দ পাবে। এমন বস্তু কি আর আছে ভবে? বল ভাই! হরি বল তবে। 'হরি' বল্লে হরির দয়া হবে, 'হরি' বল্লে হরির চরণ পাবে। আহা! নাম-নামী অভেদ-ভাবে হরি ভজ 'হরি হরি' রবে। ভাইরে! বল হরি বল তবে। এমন বিশ্ব-বোধন হরি-রবে কে আর ঘুমায়ে রবে? বল 'হরিবোল' বল সবে।

ভাই! নিশ্চয় জানিও, এমন একদিন আসিবে, যে দিন জগতের সর্ব্বদেশী, সর্ব্বধর্ম্মী, সর্ব্বজাতি—সমস্বরে—ভক্তি-ভরে—'মায়া-মোহ পরিহরি', প্রেমানন্দে প্রাণ ভরি, সবাই বলিবে "হরিবোল হরি"! ইচ্ছাময় হরির পরম ইচ্ছা পূর্ণ করি—স্বয়ং বিশ্বনাথ হররূপী হরির সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে বিশ্ব বলিবে হরিবোল হরি!

শ্রীশরদিন্দু মিত্র

৫ম বর্ষ। আষাঢ় ও শ্রাবণ। ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

১৮৩০, ১৩১৫।

গ্রাহক মহাশয়গণ!

☞ বর্ত্তমান বর্ষের দেয় মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮৩০।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাকমাশুল ১॥০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য।৵০

☞ পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য অবশ্য স্বীয় স্বীয় গ্রাহক-নম্বর দিবেন।

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৫শ বর্ষ, ১৫শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। আষাঢ়। ১৩১৫ সাল, ১৮৩০ শকাব্দা।

দিব্য-প্রমাণ।

প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্য্য-ধর্ম্মাধিকরণে (লৌকিক প্রমাণ ব্যতীত) দিব্য-প্রমাণ আদৃত ছিল। জীর্ণ মঞ্জুষার অভ্যন্তরে কীটদষ্টপত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে এতদ্বিষয়ের যে তথ্য লিখিত আছে, তাহা স্বল্পকাল হইল, ভারতীয় বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট অদ্য আমরা সেই পুরাতনী কথা লইয়া উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। যেখানে লোক-প্রসিদ্ধ সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয়ের বা সংশয়-নিরসনের সম্ভাবনা নাই, সেখানে দিব্যপ্রমাণের অবতারণা হইত। লোক-চরিত্রের অসাধারণ পরিবর্ত্তন ও দৈব বিশ্বাস-প্রবণতার শোচনীয় অধঃপতন প্রভৃতি কতিপয় কারণে, বর্ত্তমান জনসমাজে দিব্য-দ্বারা তথ্য-নিরূপণের প্রত্যাশা সুদূরপরাহত বিবেচনায়, অধুনাতন জগৎ দিব্যকে প্রমাণ-শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। ইহার গুণাগুণ সমালোচনার স্বল্প অবকাশও এ স্থানে নাই, অতএব আমরা প্রথমেই দিব্যপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে বাধ্য হইতেছি।

দিব্য কত প্রকার? এই প্রশ্নের প্রতি-বচনে পিতামহ (ব্রহ্মা) বলিয়াছেন,

"ধটোঽগ্নিরুদকংচৈব বিষং কোশস্ত-থৈবচ,
তণ্ডুলাশ্চৈব দিব্যানি সপ্তমস্তপ্ত-মাষকঃ।"

তুলা, অগ্নি, জল, বিষ, কোশ (মন্ত্র-পূত সলিল) তণ্ডুল, তপ্তমাষ, এই সপ্তপ্রকার দিব্য। বিধানশাস্ত্রে ইহাপেক্ষা অধিক সংখ্যক দিব্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাভিযোগে তুলা, জল, অগ্নি, বিষ ব্যবহৃত হইত। সামান্যাপরাধে কোশপান ব্যবস্থাপিত ছিল। তণ্ডুল অল্প চৌর্য্যে প্রযুক্ত হইত।

"চৌর্য্যে তু তণ্ডুলা দেয়াঃ নান্যত্রেতি বিনিশ্চয়ঃ।
মহাচৌর্য্যাভিশঙ্কায়াং তপ্তমাসো বিধীয়তে।"

অল্প চৌর্য্যে তণ্ডুল (অর্থাৎ বর্ত্তমান সমাজে যাহাকে "চা'ল পড়া" বলা হয়, তাহা। ইহার প্রাচীন প্রয়োগ পরে বিবৃত হইবে।) এবং মহাচৌর্য্যে "তপ্তমাস" দিব্যের বিধান ছিল।

দিব্য প্রমাণ অভিযোক্তা এবং অভিযুক্ত, উভয়ের এবং কখনও অন্যতরের উপর নির্দ্দিষ্ট হইত। অবস্থাবিশেষে সর্ব্ববিধ ব্যবহারে (মোকর্দ্দমায়) অন্য প্রমাণ সত্ত্বেও একতর পক্ষের অভ্যন্তাগ্রহে দিব্য অবতারিত হইত।

অধিকারী ব্যবস্থা।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"তুলা স্ত্রী-বালবৃদ্ধান্ধ-পঙ্গু-ব্রাহ্মণ-রোগিণাম্।
অগ্নির্জ্জলং বা শূদ্রস্য যবাঃ সপ্ত বিষস্য চ।"

অর্থাৎ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, ব্রাহ্মণ, রোগী, ইহাদের জন্য (মার্গশীর্ষ, চৈত্র ও বৈশাখ, এই তিন মাসে অন্য দিব্যের প্রাপ্তি সত্ত্বে) "তুলা" প্রযুক্ত হইবে; ক্ষত্রিয়ের জন্য "অগ্নি" দিব্য, বৈশ্যের জন্য "জল" ও শূদ্রের জন্য সপ্তযব পরিমিত "বিষ" ব্যবহার-দিব্য প্রদত্ত হইবে। এতদ্বিষয়ে আচার্য্য পিতামহের গরীয়সী উক্তি,—

"ব্রাহ্মণস্য ধটো দেয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য হুতাশনঃ।
বৈশ্যস্য সলিলং প্রোক্তং বিষং শূদ্রস্য দাপয়েৎ।"

ব্রাহ্মণের "তুলা" ব্যতীত অন্য দিব্য একেবারেই যুক্তি বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে; যেমন কোশপান দিব্য সকল জাতির জন্যই ব্যবস্থাপিত। এই সম্বন্ধে পিতামহ-বচন—

"সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং কোশপানং বিধীয়তে।
সর্ব্বাণ্যেতানি সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণস্য বিষং বিনা।"

সকল বর্ণেরই কোশপান ব্যবস্থা আছে। অপিচ সকল জাতির প্রতি সকল দিব্য প্রদত্ত হইবে, কেবল "বিষ" ব্রাহ্মণকে দিবে না।

যে দিব্যের জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসময়ে সকল জাতিকেই সকল দিব্য দেওয়া যাইতে পারে। অগ্রহায়ণ, চৈত্র ও বৈশাখ, এই তিন মাস সর্ব্বদিব্য-সাধারণ। এই তিন মাসে অন্য দিব্যের প্রাপ্তিসত্ত্বেও ব্রাহ্মণের তুলা, ক্ষত্রিয়ের হুতাশন, বৈশ্যের জল, শূদ্রের বিষ,—ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

ব্যাধিবিশেষাদি অসামান্যকারণে দিব্য প্রদানের যে বিশেষ ব্যবস্থা হইবে, এবিষয়ে ব্যবহারবিৎ আচার্য্যের অনুশাসন উদ্ধৃত হইতেছে—

"কুষ্ঠিনাং বর্জ্জয়েৎ অগ্নিং সলিলং শ্বাসকাসিনাং।
পিত্তশ্লেষ্মবতাং নিত্যং বিষং তু পরিবর্জ্জয়েৎ।
তোয়মগ্নির্বিষং চৈব দাতব্যং বলিনাং নৃণাম্।"

কুষ্ঠ-রোগীর প্রতি অগ্নি, শ্বাসকাশ-রোগীর সম্বন্ধে জল ও পিত্তশ্লেষ্ম-প্রকোপ-বিশিষ্ট মানবের পক্ষে সর্ব্বদা বিষ-দিব্য পরিত্যাগ করিবে। জল, অগ্নি ও বিষ দিব্য বলবান্ অপরাধীর জন্য ব্যবস্থাপিত হইবে।

দিব্যদানের কাল ব্যবস্থা।

"অগ্নেঃ শিশির-হেমন্তৌ বর্ষাচৈব প্রকীর্ত্তিতা।
শরদ্‌গ্রীষ্মেষু সলিলং হেমন্তে শিশিরে বিষম্।"

অগ্নি-দিব্যের সময় শিশির ও বসন্ত ঋতু এবং বর্ষা। শরৎ ও গ্রীষ্মে জল-দিব্য, হেমন্তে ও শিশিরে বিষ-দিব্য প্রদান করিবে।

"ন শীতে তোয়শুদ্ধিঃস্যাৎ নোষ্ণ কালেঽগ্নি-শোধনং।
ন প্রাবৃষি বিষং দদ্যাৎ প্রবাতে ন তুলাং ক্বচিৎ।"

শীতকালে জলদিব্য দিবেনা। উষ্ণকালে অগ্নিদিব্য দিবেনা। বর্ষাকালে বিষদিব্য অনুপযুক্ত। প্রবল-বায়ু প্রবাহসময়ে তুলাদিব্য কখনও বিধিসঙ্গত নহে।

সময়গত অন্যান্য বিশেষত্ব যথা,—

"পূর্ব্বাহ্নেঽগ্নিপরীক্ষা স্যাৎ পূর্ব্বাহ্নে তু ধটো ভবেৎ।
মধ্যাহ্নে তু জলং দেয়ং ধর্ম্মতত্ত্বমভীপ্সতা।
দিবসস্য তু পূর্ব্বাহ্নে কোশপানং বিধীয়তে।
রাত্রৌতু পশ্চিমে যামে বিষং দেয়ং সুশীতলে।"

পূর্ব্বাহ্নে, অগ্নিপরীক্ষা, পূর্ব্বাহ্নে তুলা-পরীক্ষা ও মধ্যাহ্নে জল-পরীক্ষা করিবে। দিনপূর্ব্বাহ্নে কোশ-পরীক্ষা ও রাত্রির শেষযামে বিষ-পরীক্ষা করিবে। অন্যান্য দিব্যের কাল পূর্ব্বাহ্ন। দিব্যের দিবস রবিবার।

দিব্যের অধিকার।

সহস্রপণ মূল্যের ও তদধিক মূল্যের দ্রব্যের অপচয়স্থলে অগ্নি, জল, তুলা ও বিষ-দিব্য ব্যবহৃত হইবে। যে সমস্ত দ্রব্যের অপহরণ পাতিত্যজনক, তাদৃশ দ্রব্য বিষয়ে স্বতন্ত্র নিয়ম, যথা,—সহস্র-পণ মূল্যের দ্রব্যনাশে তুলা; তদর্দ্ধমূল্যের দ্রব্যনাশ হইলে, অগ্নিদিব্য প্রদান করিবে। চুরি ও ডাকাতিতে এই ব্যবস্থা। রাজ-দ্রোহশঙ্কায় ও মহাপাতক-শঙ্কায় (ব্রহ্মহত্যা, ৮০ রতি ও তদধিক সুবর্ণ-হরণ, গুরুপত্নী-গমন, সুরাপান) অগ্নি, তুলা, জল ও বিষ-দিব্য প্রযুক্ত হইবে।

তুলাপ্রয়োগ।

কাষ্ঠনির্ম্মিত সুবৃহৎ তুলাযন্ত্রে এক-পার্শ্বে "অভিযুক্ত" ও অন্যপার্শ্বে ইষ্টক-

মৃত্তিকাদি লইয়া, পরিমাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে নামাইয়া রাখিবে। পরে প্রাড়্বিবাক (বিচারক ব্রাহ্মণ) ঐ তুলা-যন্ত্রকে পতাকাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, ঐ তুলায় নানা দেবতার আবাহন ও অর্চ্চনা করিবেন। তিনি প্রথমে ধর্ম্ম, তৎপরে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের ও অগ্ন্যাদি লোক-পালের আবাহন ও আরাধনা করিবেন। পরে অষ্টবসুর (আবাহনপূর্ব্বক) আরাধনা করিবেন। পরে দ্বাদশাদিত্যের আবাহন ও অর্চ্চনা করিবেন। তদনন্তর একাদশ রুদ্র, ষোড়শমাতৃকা ও দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করিবেন। তৎপরে প্রাড়্বিবাক অষ্টোত্তরশত হোম করিবেন। অনন্তর অভিযোগের বিষয় মন্ত্রের সহিত পত্রে লিখিয়া, অভিযুক্তের মস্তকে ঐ পত্র আরোপ করিবে। তখন প্রাড়্-বিবাক ও অভিযুক্ত, তুলার অভিমন্ত্রণ করিবে। তাহার পর প্রাড়্বিবাক অভিযুক্তকে তুলা-যন্ত্রে উঠাইয়া "পঞ্চ বিনাড়ী" কাল পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবেন। ঐ সময়ে যদি অভিযুক্তের দেহ-ভার পূর্ব্বপরিমিত ইষ্টক-মৃত্তিকাদির অপেক্ষা অধিক হয়, তবে সে ব্যক্তি সেই অপ-কার্য্যে লিপ্ত নহে বলিয়া অবধারণ করিবে। আর যদি পূর্ব্বপরিমাণের ব্যতিক্রম না হয়, অর্থাৎ তুলা সমভাবে অবস্থিত থাকে, অথবা অভিযুক্তব্যক্তি কমিয়া যায়—অর্থাৎ তুলার অপরপার্শ্ব অপেক্ষা অভিযুক্তের পার্শ্ব উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তবে সে দোষী—স্থির করিবে ও তাহাকে তদপরাধানুরূপ দণ্ড প্রদান করিবে। এতদ্বিষয়ে নির্ণয়-বচন এই—

তুলিতো যদি বর্দ্ধেত স শুদ্ধঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
সমো বা হীয়মানো বা ন স শুদ্ধো ভবেন্নরঃ।

ওজনে বাড়িলে সে শুদ্ধ, সম হইলে বা কমিয়া গেলে সে দোষী।

যদি তুলা ভাঙ্গিয়া যায়, বা কক্ষ ছিন্ন হয়, রজ্জু ছিন্ন হয়, বা তুলার কর্কট-ভঙ্গ বা অক্ষভঙ্গ হয়, তাহা হইলেও অভিযুক্তকে প্রকৃত দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। এবিষয়ে আচার্য্যের উক্তি—

"কক্ষচ্ছেদে তুলাভঙ্গে ধট কর্কটয়োঃ তথা।
রজ্জুচ্ছেদেঽক্ষভঙ্গে বা তথৈবাশুদ্ধিমাদিশেৎ।"

"কক্ষ" অর্থ তুলালম্বন শিক্যতল। "কর্কট" অর্থ—শিক্যাধার ঈষদ্বক্র আয়সকীলক। অক্ষ'—পাদস্তম্ভের উপরিভাগস্থ তুলাধারপট্ট। এই গুলির ভেদন ও রজ্জুচ্ছেদনাদি অভি-যুক্তের চিত্তবৈকল্য ও ভীতি বশতঃ হইতে পারে, সুতরাং ইহাদ্বারাও অপরাধের অনুমান চলিতে পারে। ঐরূপ বহু দেবতার অধিষ্ঠান ও অর্চ্চনা-ক্ষেত্র-স্বরূপ তুলায় আরোহণ ও তদ্দ্বারা নির্ণীত শুদ্ধাশুদ্ধিতে বিশ্বাসী হিন্দুসন্তানের অবিশ্বাস করিবার অধিক সম্ভাবনা ছিল না। এদেশে অদ্যাপি দ্রব্য-পরিমাপণের জন্য যে তুলাযন্ত্র (দাঁড়ি-পাল্লা) ব্যবহৃত হয়, এ তুলা তাহারই সুবৃহৎ সংস্করণের রূপ ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

অগ্নিপ্রয়োগ।

তুলা-প্রয়োগে যেরূপ দেবতাদির অর্চ্চনা ও অভিযুক্তের মস্তকে দোষবিবরণ ও মন্ত্র-যুক্ত পত্রারোপণ উক্ত হইয়াছে, অগ্নিদিব্যে

ও অন্য সমস্ত দিব্যপ্রয়োগেই ঐ সকল কার্য্য করিতে হইবে। অভিযুক্তের হস্ততলদ্বয়ে বহুসংখ্যক ব্রীহি (ধান্য) ঘর্ষণ করিবে। অনন্তর ঐ ব্রীহি-ক্ষতযুক্ত করতলে অলক্তক বর্ণের দ্বারা হংসপদাকার চিহ্ন সকল অঙ্কিত করিবে। তাহার পরে ঐ রঞ্জিত করদ্বয় অঞ্জলীবদ্ধ করিয়া, তাহাতে সাতটি অশ্বত্থপত্র পর পর সাজাইয়া রাখিবে। ঐ পত্রযুক্ত হস্ত, সাতটি শুক্লসূত্র দ্বারা জড়াইয়া বাঁধিবে। বহ্নিশুদ্ধির জন্য ৯টি মণ্ডল রচনা করিতে হইবে। ষোড়শ অঙ্গুল পরিমিত মণ্ডল ও মণ্ডলদ্বয়ের অন্তরভাগও তৎপরিমাণ করিতে হইবে। মণ্ডলের দক্ষিণ ভাগে প্রাড়্‌বিবাক বহ্নিপূজা ও হোমাদি সম্পন্ন করিবেন। মণ্ডলসমীপে অভিযুক্তকে লইয়া যাইবেন। পঞ্চাশৎ পলপরিমিত লৌহপিণ্ড অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিয়া জলে নিঃক্ষেপ করিবে, পুনরায় অগ্নিতে দগ্ধ করিবে—এইরূপে তিনবারে প্রতপ্ত অগ্নিবর্ণ লৌহপিণ্ড সন্দংশ (সাঁড়াশী) দ্বারা গ্রহণ করিয়া, প্রাড়্‌বিবাক অভিযুক্তের অঞ্জলিতে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবেন। তখন তিনি নিজেও "অভিযুক্ত" মন্ত্রদ্বারা অগ্নির অভিমন্ত্রণ করিবেন। প্রাড়্‌বিবাক তখন সেই অগ্নিবর্ণ লৌহপিণ্ড অভিযুক্তের অঞ্জলিবদ্ধ করদ্বয়ে নিঃক্ষেপ করিবেন। অভিযুক্ত ঐ লৌহপিণ্ড হস্তে লইয়া, সপ্ত মণ্ডল অতিক্রম করিয়া, অষ্টম মণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক নবম মণ্ডলে উহা ত্যাগ করিবে। পরে করদ্বয় দ্বারা ব্রীহি মর্দ্দন করিবে। যদি অভিযুক্তের হস্ত দগ্ধনা হয়, তবে সে "শুদ্ধ" বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"মুক্তেঽগ্নিং মৃদিতব্রীহিরদগ্ধঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।"

যদি অভিযুক্তের করস্খলিত তপ্ত লৌহপিণ্ডদ্বারা হস্ত ব্যতীত অন্য অঙ্গ দগ্ধ হয়, অথবা যদি অভিযুক্ত পদস্খলিত হইয়া হস্ত ব্যতীত অন্যস্থল দগ্ধ হয়, তবে সে অপরাধী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে না ; তাহাকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

"প্রস্খলন্ অভিশস্তশ্চেৎ স্থানাদন্যত্র দহ্যতে।
অদগ্ধং তং বিদুর্দেবাঃ তস্যভূয়োঽপি দাপয়েৎ।"

স্মৃতিযুগের বহু পূর্ব্বেও অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা অপরাধের সত্যতা নিরূপণ হইত, এ বিষয়ে প্রমাণ ছান্দোগ্য উপনিষৎ। বৈদিকযুগে—ভারতীয় আর্য্যগণের সৌভাগ্যের স্বর্ণযুগে অগ্নিতপ্ত পরশুদ্বারা অভিযুক্তের চৌর্য্য-সংশয়ের নিরসন প্রচলিত ছিল। এ সম্বন্ধে আমরা উপনিষদের উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।—

"পুরুষং সৌম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ স্তেয় মকার্ষীৎ পরশুমস্মৈ তপতেতি,
স যদি তস্য কর্ত্তা ভবতি ততএব অনৃতমাত্মানং কুরুতে সোঽনৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি স দহ্যতেঽথহন্যতে,

অর্থ যদি তস্যাকর্ত্তা ভবতি তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্নাতি স ন দহ্যতে অথ মুচ্যতে।'

সংশয়িত-স্বভাব ব্যক্তিকে রক্ষিপুরুষেরা হাতে ধরিয়া আনয়ন করিতেছে। "এ কি করিয়াছে"? সকলে জিজ্ঞাসা করিতেছে। রাজপুরুষগণ বলিতেছে, "চুরি করিয়াছে," ইহার শুদ্ধি-নির্ণয়ের জন্য পরশু (লৌহ-কুঠার) উত্তপ্ত কর, অগ্নিপরীক্ষায় ইহার শুদ্ধি প্রমাণিত হউক।" পরে পরশু পরিতপ্ত হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা করে গ্রহণ করিবে। সে যদি কুকার্য্যকারী তস্কর হয়, তবে তাহার হস্ত দগ্ধ হইবে। কেননা সে পরশু ও হস্তের মধ্যস্থলে "মিথ্যা" বা "অন্যায়" ভিন্ন অপর কিছু রাখে নাই। সে ব্যক্তি অসত্য দ্বারা হস্ত আবৃত রাখিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারেনা। হস্ত দগ্ধ হইলে, রাজপুরুষগন তাহাকে দোষী মনে করেন, এবং সে চৌর্য্যদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আর যদি সে ব্যক্তি কুকর্ম্মকারী না হয়, তবে সেই সত্যসন্ধ ব্যক্তির হস্ত "সত্য" দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। পরশু ও হস্তের মধ্যে "সত্যধর্ম্ম" অলক্ষ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া, তাহার হস্তকে দাহ হইতে রক্ষা করেন। সে হস্তদ্বারা তপ্ত পরশু গ্রহণ করিয়াও দগ্ধ হয় না; অগত্যা রাজা বা রাজপুরুষগণ তাহাকে শুদ্ধ ও নির্দ্দোষজ্ঞানে মুক্তিদান করেন। অতএব অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে,—প্রায় তিন সহস্র বর্ষেরও পূর্ব্বে রচিত গ্রন্থে এই প্রকার উল্লেখ থাকায়—ইহাকে সদ্যোজাত পদ্ধতি মনে করা যাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা শুদ্ধিনির্ণয়ের আধিপত্য রামায়ণের যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া, তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে যে এ প্রথার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সংঘটিত হইতে ছিল, তাহাতে অবিশ্বাস করা যায় না।

জলপ্রয়োগ।

অভিযুক্তকে জলে নিমজ্জিত করিয়া তাহার শুচিতা বা অশুচিতার অবধারণ এই প্রয়োগের রহস্য। স্বল্পস্রোতা নদী, সাগর, হ্রদ, সরোবর ও তড়াগে জলপ্রয়োগ সম্পন্ন হইবে। তৃণশৈবাল সমাকীর্ণ জলে, মহাকায় মৎস্য, জলৌকা ও সর্প-কুম্ভীরাদিসমাকুল জলে জলপরীক্ষা করিবে না। জলাশয় সমীপে তোরণ (তুলাপ্রয়োগক্ষেত্রেও তোরণ রচনার কথা আছে।) নির্ম্মাণ করিবে। তোরণ-পার্শ্বে প্রাড়্‌বিবাক বরুণ পূজা করিবেন। অগ্নিপ্রয়োগে দেবতার্চ্চনাদি যেরূপ—এখানেও তদ্রূপ করিতে হইবে। তোরণমূল হইতে সুশিক্ষিত ধানুকী মধ্যম চাপ (১) দ্বারা তিনটি শর নিঃক্ষেপ করিবে। তখন একজন বিখ্যাত ধাবক তোরণমূল হইতে মধ্যম-শর-পাত-স্থানে

(১) মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন—
"ক্রূরং ধনুঃ সপ্তশতং মধ্যমং ষট্‌শতং স্মৃতম্।
মন্দং পঞ্চশতং জ্ঞেয়ং এষ জ্ঞেয়ো ধনুর্ব্বিধিঃ।"
একশতসাত অঙ্গুলীপরিমিত ক্রূর ধনু, একশতছয় অঙ্গুলী মধ্যম ধনুর পরিমাণ, একশতপাঁচ অঙ্গুলী মন্দ ধনুঃ। "মধ্যমেনৈব চাপেন প্রক্ষিপেৎ চ শরত্রয়ং" মধ্যমধনুর্দ্বারা তিনটী শর ত্যাগ করিবে। ধনুগুলি বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত। শরতিনটীও বংশনির্ম্মিত।

যাইয়া, শর গ্রহণ করিয়া, সেই স্থানেই দণ্ডায়মান থাকিবে। অপর একজন তোরণমূলে থাকিবে। এইরূপে থাকিলে— প্রাড্‌বিবাক তিনটি করতালি দিবেন; সেই সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি জলে নিমজ্জিত হইবে। জলপ্রবেশের পূর্ব্বে অভিযুক্ত, বরুণদেবতাকে মন্ত্রযোগে অভিমন্ত্রিত করিবে; জলে, সে নাভিপ্রমাণ জলস্থ যজ্ঞবৃক্ষজ স্থূণা (খুঁটা) ধরিয়া বসিয়া থাকিবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি নিমজ্জিত হইলে পর, তোরণমূলস্থ বেগবান্ ধাবক দ্রুতবেগে মধ্যম-শরপাতস্থানে গমন করিবে। সেই ব্যক্তি মধ্যমশরপাতস্থানে উপস্থিত হইলে, মধ্যমশরগ্রাহী ধাবক দ্রুতবেগে তোরণমূলে আগমন করিবে। সেই ব্যক্তি যদি অভিযুক্তকে না দেখিতে পায়—অর্থাৎ অভিযুক্ত জলনিমগ্ন থাকে, আর তাহার একটি অঙ্গও দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে সে শুদ্ধ, অন্যথা দোষী।

শরনিক্ষেপকারী ব্যক্তি ক্ষত্রিয়।

"ক্ষেপ্তা তু ক্ষত্রিয়োজ্ঞেয়স্তদ্বৃত্তি
ব্র্রাহ্মণোঽপিবা।"

ক্ষত্রিয়বৃত্তি ব্রাহ্মণ হইলেও চলে।

ধাবকদ্বয়ও ধাবনপটু হওয়া প্রয়োজন। দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

"পঞ্চাশতোধাবকানাং যৌ স্যা-
তামধিকৌ জবে।
তৌ তত্র বিনিযোক্তব্যৌ শরান-
য়নকারণাৎ।"

পঞ্চাশৎ জন-ধাবকের মধ্যে যে দুইজন বেগে অধিক, তাহাদের দুইজনকে শরানয়ন কার্য্যে নিযুক্ত করিবে।

শরের পতন গ্রাহ্য হইবে, বিসর্পণ গ্রাহ্য হইবে না। এ বিষয়ে আপ্তোক্তি—

"শরস্য পতনং গ্রাহ্যং সর্পণন্তু বিব-
র্জ্জয়েৎ।
সর্পন্ সর্পন্ শরোযায়াদ্দূরাদ্দূরতরং
যতঃ।"

নিমজ্জিত ব্যক্তির একটীমাত্র অঙ্গও দৃষ্ট হইলে সে অপরাধী হইবে। 'অন্যথা ন বিশুদ্ধিঃস্যাৎ একাঙ্গস্যাপি দর্শনাৎ।' মস্তক সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন—যাহার মস্তক দৃষ্ট হইবে, সেও শুদ্ধ, প্রমাণ যথা,—

"শিরোমাত্রং তু দৃশ্যেত ন কর্ণৌ
নাপি নাসিকা।
অপ্সু প্রবেশনে যস্য শুদ্ধং তমপি
নির্দ্দিশেৎ।"

জলপ্রবেশে যাহার শিরোদেশ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু কর্ণযুগল ও নাসিকা দৃষ্টিগোচর হয় না, সেও শুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

বিষপ্রয়োগ।

প্রাড্‌বিবাক উপবাসপূর্ব্বক শুচিভাবে মহাদেবের পূজা করিবে। পূজাসমাপনান্তে মহাদেব-সন্নিধানে বিষ স্থাপন করিয়া, ধর্ম্ম প্রভৃতির আবাহন ও অর্চ্চনা শেষ করিয়া, অভিযুক্তের মস্তকে, অপরাধ-বিষয় ও মন্ত্রাবলী সমন্বিত পত্র স্থাপন করিয়া, বিষ অভিমন্ত্রিত করিয়া, দক্ষিণমুখস্থিত অভিযুক্তকে প্রদান করিবে। অভিযুক্ত, বিষ অভিমন্ত্রিত করিয়া ভক্ষণ

করিবে। ভক্ষণের পর যদি দেহে বিষ-বেগ উৎপন্ন না হয়, সহজে জীর্ণ হইয়া যায়, তবে সে ব্যক্তিকে নির্দ্দোষরূপে নির্দ্দেশ করিবে।

বিষতন্ত্রে বিষের সপ্ত প্রকার বেগ কথিত হইয়াছে; যথা,—

"বেগো রোমাঞ্চমাদ্যং রচয়তি বিষজং স্বেদবক্ত্রোপশোষৌ তস্যোর্দ্ধস্তৎ পরৌ দ্বৌ বপুষি জনয়তঃ বর্ণভেদ-প্রবেপৌ।
যোবেগঃ পঞ্চমোঽসৌ নয়তি বিবশতাং কস্যভঙ্গঞ্চ হিক্কাং, ষষ্ঠো নিঃশ্বাসমোহৌ বিতরতি চ মৃতিং সপ্তমো ভক্ষকস্য।"

প্রথম বিষবেগ দেহে রোমহর্ষণ আনয়ন করে। দ্বিতীয়বেগ ঘর্ম্ম ও মুখশোষ উৎপাদন করে। তৃতীয় ও চতুর্থ বেগ দেহে বর্ণ-ব্যত্যয় ও কম্পন উপস্থিত করে। পঞ্চম বেগে দেহ বিবশ হয়, স্বরভঙ্গ ও হিক্কা সমুপস্থিত হয়। ষষ্ঠবেগে শ্বাস ও মোহ আবির্ভূত হয়। সপ্তমবেগ ভক্ষকের মরণ সংঘটন করে। এই সকল বেগ উপস্থিত না হইলে ভক্ষক শুচি—নির্দ্দোষ।

শৃঙ্গী, বৎসনাভ ও হিমজ প্রভৃতি বিষ ব্যবহৃত হইতে পারিবে। চারিত, জীর্ণ, কৃত্রিম, ভূমিজ বিষ ত্যাগ করিবে। মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—

"ভৃষ্টং চ চারিতং চৈব ধূপিতং মিশ্রিতং তথা।
কালকূটমলাবুঞ্চ বিষং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।"

ভৃষ্ট, চারিত, জীর্ণ, ধূপিত, মিশ্রিত, কালকূট ও বিষ-অলাবু যত্নসহকারে পরিত্যাগ করিবে। এ সকল বিষ বিষশুদ্ধিতে প্রয়োগ করিবে না। যথাবিধি-পরিমাণ বিষ গ্রহণ করিয়া, ঘৃতসংপ্লুত ভাবে ভক্ষণ করিতে দিবে। হিমকালে বিষপ্রদান সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রমাণ—"দেয়ং শুদ্ধি হিমাগমে।" অপরাহ্ণ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে বিষ-প্রয়োগ নিষিদ্ধ, যথা—

নারদ-বচন—

"নাপরাহ্ণে ন মধ্যাহ্নে ন সন্ধ্যায়াং তু ধর্ম্মবিৎ।"

কালবিশেষে মাত্রাবিশেষ ব্যবস্থা, যথা—

"বর্ষে চতুর্যবামাত্রা গ্রীষ্মে পঞ্চযবা-স্মৃতা।
হেমন্তে সা সপ্তযবা শরদ্যল্পা ততোঽপি হি॥"

অর্থাৎ বর্ষায় বাত-প্রকোপনিবন্ধন চতুর্যব পরিমাণ বিষ ব্যবহার করিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে পঞ্চযব পরিমাণ, হেমন্ত সময়ে সপ্তযবপরিমিত ও শরৎ সময়ে ষট্-যবমিত বিষ ব্যবস্থেয়।

বিষের ত্রিশ গুণ ঘৃত বিমিশ্রিত করিয়া বিষ ভক্ষণার্থে প্রদান করিবে। মহর্ষি কাত্যায়ন বলেন,—

"পূর্ব্বাহ্ণে শীতলেদেশে বিষং দেয়ং তু দেহিনাম্।
ঘৃতে নিযোজিতং শ্লক্ষ্ণ পিষ্টং ত্রিংশদ্গুণান্বিতম্।"

অর্থাৎ স্নিগ্ধ প্রাতঃকালে অনাতপ প্রদেশে ত্রিংশদ্গুণ ঘৃতে মিশ্রিত করিয়া পেষণপূর্ব্বক যথাকাল-বিহিত বিষ ভক্ষণার্থে দান করিবে।

বিষ-ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক মণিমন্ত্র ঔষধাদি দ্বারা, অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মরক্ষার সুবিধা না পায়, এ ব্যবস্থাও রাজপুরুষগণ করিবেন। পিতামহ বলিয়াছেন—

"ওষধীন্ মন্ত্রযোগাংশ্চ মণীন্ অথ বিষাপহান্ :
কর্ত্তুঃ শরীরসংস্থাংশ্চ গূঢ়োৎপন্নান্ পরীক্ষয়েৎ।"

অভিযুক্তের শরীরে বিষ-প্রতিষেধক ঔষধিদ্রব্য, বিষাপহ মণি ও মন্ত্রসিদ্ধ রসায়নাদিযোগ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান আছে কি না, তাহা রাজপুরুষগণ 'তন্ন' 'তন্ন' করিয়া অনুসন্ধান করিবেন। নারদের মতে পঞ্চ শত করতালি দানের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিষ-চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। নারদের উক্তি,—

"পঞ্চ-তালি-শতং কালো নির্ব্বিকারো যদা ভবেৎ।
তদা ভবতি সংশুদ্ধঃ ততঃ কুর্য্যাৎ চিকিৎসিতং॥"[১]

নিরপরাধ ব্যক্তি বিষ ভক্ষণেও মরিবে না! কি ধর্ম্ম-নির্ভরশীলতা! কি দৈবী সাহসিকতা!

কোশপ্রয়োগ।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"দেবান্ উগ্রান্ সমভ্যর্চ্চ্য তৎস্নানোদকমাহরেৎ।
সংশ্রাব্য পায়য়েৎ তস্মাৎ জলং তু প্রসৃতিত্রয়ম্।"

উগ্র-প্রকৃতিক দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া, তাহাদের স্নানোদক সংগ্রহ করিবে। সেই স্নানোদক প্রাড়্বিবাক যথাবিধি অভিমন্ত্রিত করিবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিও ঐ জলকে অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎপরে ঐ অভিমন্ত্রিত বারি প্রসৃতি (অঞ্জলি) পরিমাণ পান করিবে। এখানেও ধর্ম্মাবাহন, দেবতার্চ্চনাদি কার্য্য (সর্ব্ব দিব্যেই এগুলি প্রযুক্ত হয়) যথানিয়মে করিতে হইবে। এই জলপানের পর যদি চতুর্দ্দশ-দিবস-কাল নিরাপদে অতিবাহিত হয়, তবে সে নির্দ্দোষ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"অর্ব্বাক্ চতুর্দ্দশাদহ্নঃ যস্য নো রাজদৈবিকং।
ব্যসনং জায়তে ঘোরং স শুদ্ধঃ স্যাৎন সংশয়ঃ॥"

চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে যাহার রাজকৃত বা দেবকৃত বিপৎপাত সংঘটিত না হইবে, সে শুদ্ধ, অন্যথা অপরাধী জানিবে।

জলপান সম্বন্ধে অবান্তর বিশেষ আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। দুর্গার স্নানোদক চোরগণকে পান করাইবে। ভাস্করের স্নানজল ব্রাহ্মণকে পান করাইবে না। পিতামহ বলেন,—

"ভক্তো যো যস্য দেবস্য পায়য়েৎ তস্য তজ্জলং।"

যে ব্যক্তি যে দেবতার ভক্ত, তাহাকে সেই দেবতার স্নানজল পান করাইবে।

দেবতার স্নানোদক বলিতে—সেই দেবতার অস্ত্র স্নান করাইয়া যে জল পাওয়া যাইবে—তাহাই বুঝিতে হইবে। এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণ যথা—

'দুর্গায়াঃ স্নাপয়েৎ শূলং আদিত্যস্য তু মণ্ডলং।
অন্যেষামপি দেবানাং স্নাপয়েৎ আয়ুধানিতু।'

দুর্গার শূল, আদিত্যের মণ্ডল ও অন্যান্য দেবগণেরও আয়ুধ স্নান করাইবে।

এই কোশপান ব্যাপার নাস্তিকাদির প্রতি প্রযুক্ত হইত না। প্রমাণ যেমন—

"মদ্যপস্ত্রী-ব্যসনিনাং কিতবানাং তথৈবচ।
কোশঃ প্রাজ্ঞৈর্ন দাতব্যঃ যে চ নাস্তিক-বৃত্তয়ঃ।"[১১]

অর্থাৎ মদ্যপায়ী ইন্দ্রিয়পরায়ণ, মিথ্যাবাদী, নাস্তিকবৃত্তি প্রভৃতি হীনচরিত্র অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের প্রতি কোশপানের ব্যবস্থা বিজ্ঞসম্মত নহে।

তপ্তমাস-প্রয়োগ।

সুবর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র-নির্ম্মিত অথবা মৃত্তিকাবিরচিত ষোড়শাঙ্গুল প্রশস্ত, চতুরঙ্গুল গভীর, মণ্ডলাকার পাত্র (কটাহ) বিংশতি পলপরিমিত ঘৃত ও তৈলদ্বারা পূর্ণ করিবে। ঐ ঘৃত-তৈল সুতপ্ত হইলে, তাহাতে মাষমাত্র সুবর্ণনির্ম্মিত মাষাকার দ্রব্য নিঃক্ষেপ করিবে। ঐ তপ্ত ঘৃত-তৈল-মধ্যস্থ তপ্তমাস দ্রব্য অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী যোগে অভিযুক্তব্যক্তি উদ্ধার করিবে। যদি করাগ্র দগ্ধ না হয়, বিস্ফোটক না জন্মে, কোনও অপচয় না হয়, করাঙ্গুলি নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিত থাকে, তবে তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া নির্ব্বাচন করিবে, ইতরথা অশুদ্ধ মনে করিবে। এতৎ সমস্ত পিতামহ বলিয়াছেন। তাঁহার বাক্য এই—

"সুবর্ণং রাজতং বাপি তাম্রং বা ষোড়শাঙ্গুলং।
চতুরঙ্গুলখাতন্তু মৃণ্ময়ং বাথমণ্ডলং।
পূরয়েৎ ঘৃততৈলাভ্যাং বিংশত্যাতু পলৈস্তু তৎ।
সুবর্ণমাসকং তস্মিন্ সুতপ্তে নিক্ষিপেৎ ততঃ।
অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিযোগেন উদ্ধরেৎ তপ্তমাষকম্।
করাগ্রং যোনধুনুয়াৎ বিস্ফোটোবা ন জায়তে।
শুদ্ধো ভবতি ধর্ম্মেণ নির্ব্বিকার-করাঙ্গুলিঃ॥"[১১]

তণ্ডুল প্রয়োগ। পিতামহ বলিয়াছেন—

"তণ্ডুলান্ কারয়েৎ শুক্লান্ শালের্নান্যস্য কস্যচিৎ।
মৃণ্ময়ে ভাজনে কৃত্বা আদিত্যস্যাগ্রতঃ শুচিঃ।
স্নানোদকেন সংমিশ্রান্ রাত্রৌ তত্রৈব বাসয়েৎ।
প্রাঙ্মুখোপোষিতং স্নাতং শিরোরোপিতপত্রকং।

তণ্ডুলান্ ভক্ষয়িত্বা তু পত্রে
বয়েৎ ততঃ।
পিপ্পলস্যতু নান্যস্য ত্বভাবে ভূর্জ্জ
এব চ।
লোহিতং যস্য দৃশ্যেত হনুস্তালু
চ শীর্য্যতে।
গাত্রঞ্চ কম্পয়েৎ যস্য তমশুদ্ধং
বিনির্দ্দিশেৎ।"

শালিধান্যের শুক্ল তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়া, মৃণ্ময় পাত্রে আদিত্যের সমীপে স্থাপন করিয়া, তাঁহার স্নানজলে ভিজাইয়া সেইখানে রাত্রিতে রাখিয়া দিবে। পরদিন-পূর্ব্বাহ্নে অভিযুক্তকে স্নান করাইয়া আনিবে। "প্রাড়্বিবাক" ধর্ম্মাবাহনাদি ও দেবপূজা সমাপ্ত করিয়া অভিযুক্তের মস্তকে অভিযোগ-বিবরণ ও মন্ত্রযুক্ত পত্র আরোপিত করিয়া, অভিযুক্তকে তণ্ডুল ভক্ষণ করাইবে। পরে নিষ্ঠীবন (থুঁ থুঁ ফেলা) করিতে বলিবে। পিপ্পলপত্র বা ভূর্জ্জপত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে। যদি নিষ্ঠীবন রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, কপোল ও তালুদেশ বিশীর্ণ হইতে থাকে, গাত্র প্রকম্পিত হয়, তবে সে অশুদ্ধ বা অপরাধী, ইহা নিশ্চয়।

ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রয়োগ।

বস্ত্রে অথবা ভূর্জ্জপত্রে সিতবর্ণ ধর্ম্ম ও অসিতবর্ণ অধর্ম্মমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া,—অথবা, রৌপ্যময় ধর্ম্ম ও লৌহ-ময় অধর্ম্ম গঠন করিয়া, শ্বেত ও কৃষ্ণ কুসুম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া, গোময়-পিণ্ড বা মৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নরূপে স্থাপন করিবে। উহা মৃত্তিকাপাত্রে রাখিয়া দিবে। অনন্তর প্রাড়্বিবাক ধর্ম্মা-বাহন ও দেবপূজাদি সমাপন করিবেন। পরে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিবে। অভি-যুক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিবে।

প্রতিজ্ঞা—

"যদি পাপবিমুক্তোহহং ধর্ম্মস্ত্বা-
য়াতু মে করে।
অশুদ্ধশ্চেৎ মম করে পাপ-
মায়াতু ধর্ম্মতঃ॥"

অর্থাৎ আমি যদি নির্দোষ হই, আমার হস্তে ধর্ম্ম আসুন, যদি আমি পাপী হই, তবে অধর্ম্ম আসুন। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, দুইটীর যে কোন পিণ্ডটী হস্তে ধারণ করিবে। ধর্ম্ম যদি হস্তগত হয়, তবে সে শুদ্ধ, অধর্ম্ম করগত হইলে, সে দোষী এবং ফলানুসারে তিরস্কার-পুরস্কার-ভাগী হইবে।

শ্রী——ভারতী।
ভারতীকুটীর, প্রতাপকাটী,
যশোহর।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও যোগভাষ্য।

ষড়্দর্শনের যে সমস্ত ভাষ্য আছে, তন্মধ্যে "যোগভাষ্য" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতে বৈনাশিক বা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ কিরূপে খণ্ডিত হইয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধে

দেখান হইতেছে। বৌদ্ধগণ প্রায়ই পর-মতকে উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করেন না। তাঁহাদের গ্রন্থে যে সমস্ত বিরুদ্ধবাদীদের মত উদ্ধৃত দেখা যায়, তাহা বিকৃত। প্রকৃত ঔপনিষদ্ মত বা সাংখ্য মত সম্বন্ধে বৌদ্ধ গ্রন্থ নীরব। ব্রহ্মজালাদি বৌদ্ধ সূত্রে কতকগুলি এরূপ মতের খণ্ডন দেখা যায়, যাহা বস্তুতঃ ছিল, কি এই সূত্রকর্ত্তাদের কল্পনাপ্রসূত, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

যোগশাস্ত্রে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করার উপদেশ আছে। ক্ষণিকবিজ্ঞান-বাদীরাও একাগ্র ও বিক্ষিপ্ত চিত্তের কথা বলেন্। কিন্তু তাঁহাদের মতানুসারে যে 'একাগ্র' ও 'বিক্ষিপ্ত' শব্দের তাৎপর্য্য গ্রহ ও সঙ্গতি হয় না, তাহা ভাষ্যকার দেখাইতেছেন।

ইহা বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ ক্ষণিকবাদ বুঝা উচিত। তন্মতে চিত্ত বা বিজ্ঞান প্রত্যর্থনিয়ত—অর্থাৎ প্রতি বিষয়ে উৎপন্ন ও সমাপ্ত হয়; আর তাহা প্রত্যয় মাত্র * বা জ্ঞানবৃত্তিমাত্র—নিরাধার এবং ক্ষণিক বা ক্ষণস্থায়ী। যেমন দশক্ষণব্যাপী ঘট-বিজ্ঞান হইলে, তাহাতে দশটী ভিন্ন ভিন্ন ঘট-বিজ্ঞান উঠিবে ও অত্যন্ত নাশ প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব বিজ্ঞানটি পর বিজ্ঞানের প্রত্যয় বা হেতু। তাহা-দের মূল শূন্য—অর্থাৎ তাহাদের উভয়ে কোন এক ভাবপদার্থ অন্বিত থাকে না, যে ভাব পদার্থের তাহারা বিকার বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। বৌদ্ধদের গাথা আছে, 'সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা উপ্পাদ ব্যয়ধম্মিনো। উপজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বূপসমো সুখো।'

অর্থাৎ সমস্ত সংস্কার (বোধ ব্যতীত সমস্ত সঞ্চিত আধ্যাত্মিক ভাব) অনিত্য; তাহারা উৎপাদ ও লয়ধর্ম্মী। তাহারা উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ বা বিলীন হয়। তাহাদের যে উপশম অর্থাৎ উঠা ও নাশ হওয়ার বিরাম, তাহাই সুখ বা নির্ব্বাণ। শুদ্ধ সংস্কার নহে, তৎসহভূ বিজ্ঞানও ঐরূপ। সাংখ্যশাস্ত্র-মতেও চিত্তবৃত্তি সকল পরি-ণামী বা অনিত্য এবং তাহাদের সম্যক্ নিরোধই কৈবল্য। সুতরাং প্রধানতঃ উভয় বাদে সাদৃশ্য আছে; কিন্তু উভয় বাদের দর্শনে ভেদ আছে। সাংখ্য বলেন—চিত্তের বৃত্তি সকল উৎপত্তি-লয়শীল বা সঙ্কোচ-বিকাশী বটে, কিন্তু বৃত্তি সকল চিত্ত নামক একই পদার্থের বিকার বা ভিন্ন অবস্থা। যেমন এক সের মাটির তালকে তুমি প্রতিক্ষণে নানা আকারে পরিণত করিতে পার, কিন্তু তাহাদের সব আকারেই এক সের মাটিই অন্বিত থাকিবে। অতএব সেই এক সের মাটিরই উহা বিকার, এরূপ বলা ন্যায্য। ইহাই সৎ-কার্য্যবাদের অন্তর্গত পরিণামবাদ।

বৌদ্ধ বলিবেন—তাহা নহে; যেমন প্রদীপে প্রতিক্ষণে নূতন নূতন তৈল দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তথাপি উহা এক প্রদীপ বলিয়া প্রতীত হয়, আলয়-বিজ্ঞান বা আমিত্বও সেইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষণিক

* বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রত্যয় শব্দের অর্থ হেতু। প্রত্যয় মাত্র বা পরক্ষণিক বিজ্ঞানের হেতু মাত্র, এরূপ অর্থও বৌদ্ধের দিক্ হইতে সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে প্রত্যয় অর্থে জ্ঞানবৃত্তি।

বিজ্ঞানের সন্তান হইলেও, এক বলিয়া প্রতীত হয়।

বৌদ্ধদের এই উদাহরণে ন্যায় দোষ আছে। বস্তুতঃ দীপশিখা অর্থে যাহা আলোক প্রদান করে, ইত্যাদি, তাদৃশ অর্থেই লোকে দীপশিখা শব্দ ব্যবহার করে। একইরূপ আলোক-প্রদান গুণ দেখিয়া লোকে বলে এক দীপশিখা। আলোক-প্রদান গুণ বহু নহে, কিন্তু এক। 'প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাতে নূতন নূতন তৈল দগ্ধ হয়, তাহা দীপশিখা, এ অর্থে কেহ দীপশিখা শব্দ ব্যবহার করে না যদি কেহ করে, সে পূর্ব্বের ও পরের দীপ শিখা এক, এরূপ মনে না। গঙ্গাজল অর্থে যেমন গঙ্গার খাতে যে জল থাকে তাহা, কোন নির্দ্দিষ্ট এক জলকে কেহ গঙ্গাজল বলে না; দীপশিখাও তদ্রূপ। নিবাতস্থিত হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য দীপশিখাকে এক বলিয়াই প্রতীতি বা ভ্রান্তি হয়। হইতে পারে; কিন্তু তাহা কেন হয়? প্রতি মুহূর্ত্তে শিখায় যে তৈল আসে, তাহা পূর্ব্ব তৈলের সমধর্ম্মক বলিয়া।

ইহা হইতে এই নিয়ম সিদ্ধ হয় যে, 'একাকার বহু দ্রব্য অলক্ষিতভাবে একে একে আমাদের গোচর হইলে, তাহা এক বলিয়া ভ্রান্তি হইতে পারে। কিন্তু ইহার দ্বারা পরিণামবাদ নিরস্ত হয় না। একাকার অনেক দ্রব্য থাকিলে এবং প্রকারবিশেষে বোধগম্য হইলে, তবে ঐরূপ প্রতীতি। কিন্তু সেই একাকার বহু দ্রব্য হয় কেমন করিয়া, তাহা সৎকার্য্যবাদ দেখায়। দীপশিখার উদাহরণ পূর্ব্বোক্ত মৃৎপিণ্ডের উদাহরণের বিরুদ্ধ নয়; কিন্তু পৃথক্ কথা। তাই একের দ্বারা অন্যের বাধ হয় না।

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরা ন্যায্য প্রণালী দেখাইতে পারেন না—কেমন করিয়া বহু আলয় বিজ্ঞান হয়। পূর্ব্ব প্রত্যয় বা হেতুভূত বিজ্ঞান হইতে উত্তর কার্য্যভূত বিজ্ঞান কিরূপে হয়, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরা তাহার অতি অন্যায্য উত্তর দেন। প্রত্যয়ভূত বিজ্ঞান সম্পূর্ণ শূন্য বা নাশ হইয়া গেল; আর অভাব হইতে এক বিজ্ঞানরূপ ভাব উৎপন্ন হইল, ক্ষণিকবাদীদের এই মত নিতান্ত অন্যায্য। অসৎ হইতে সৎ হওয়া, সতের অসৎ হইয়া যাওয়া ন্যায্য মানব-চিন্তার বিষয় নহে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের "Conservation of energy" বাদও সৎকার্য্যবাদের ছায়া।

আর অসৎ হইতে সৎ হওয়া বা সতের অসৎ হওয়ার উদাহরণ জগতে নাই! সমস্ত কার্য্যেরই উপাদান ও হেতু বা নিমিত্ত (বৌদ্ধের পচ্চয়) এই দুই কারণ থাকা চাই। পূর্ব্ববিজ্ঞান উত্তরবিজ্ঞানের নিমিত্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহার (উত্তর বিজ্ঞানের) উপাদান কি, আর পূর্ব্ববিজ্ঞানের উপাদানই বা কোথায় যায়?

এতদুত্তরে বৌদ্ধ বলেন, পূর্ব্ববিজ্ঞান 'শূন্য' হইতে হয়। 'শূন্য' অর্থে যদি ধারণার অযোগ্য কোন সত্তা হয়, তবে উহা ন্যায্য ও সাংখ্যেরই অনুগ। সাংখ্য বলেন—সমস্ত ব্যক্ত ভাবের মূল উপাদান 'অব্যক্ত' নামক ধারণার অযোগ্য এক সত্তা। সাংখ্যেরা বাহ্য ও অধ্যাত্ম পদার্থের মধ্যে

কার্য্য ও কারণ পরম্পরাক্রমে বুদ্ধিতত্ত্ব বা অহং মাত্র প্রত্যয় নামক সংক্ষোভ্য ব্যক্ত কারণ স্থির করেন; তাহার কারণ অব্যক্ত।

বৌদ্ধের বিজ্ঞানের ভিতর সাংখ্যের বুদ্ধ্যাদি তত্ত্বও আছে, সুতরাং সেই বিজ্ঞানের কারণ 'শূন্য' নামক সত্তা বলিলে, সাংখ্যেরই অনুগত কথা বলা হয়। 'দধির কারণ দুগ্ধ, দুগ্ধের কারণ গো' — এরূপ বলা এবং 'গোরসের কারণ গো' এরূপ বলা যেমন অবিরুদ্ধ, সেইরূপ। কিন্তু বিজ্ঞাতার কথা বৌদ্ধ স্পষ্ট করিয়া বলেন না। বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা কখনও শূন্য হইতে পারে না। সে বিষয়ে বৌদ্ধ হীন।

সাংখ্যযোগীর শিষ্য বুদ্ধদেব সম্ভবতঃ 'শূন্য' শব্দ সত্তা-বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম দার্শনিক বিচার হইতে কতক পরিমাণে মুক্ত, সুতরাং জনসাধারণ্যে বহুল প্রচারযোগ্য হইয়াছিল।

এখনও এরূপ বৌদ্ধসম্প্রদায় আছে, যাহারা শূন্যকে অভাব মাত্র মনে করে না; কিন্তু সত্তাবিশেষ বলে। শিকাগোর ধর্ম্মসভায় জাপানী বৌদ্ধগণ স্বমতোল্লেখ কালে বলিয়াছিলেন যে—বিজ্ঞানের এক essence আছে। যাহা বৌদ্ধদেরও অনেকে নির্ব্বাণ নামক শূন্যকে এক সত্তা বলেন। তবে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ সার্থক হওয়াতে, দর্শনশাস্ত্রে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। এই শূন্য শব্দই ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদূরিত হইবার অন্যতম কারণ।

কিন্তু ভারতে প্রাচীন কালে * এরূপ বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রসার লাভ করিয়াছিল, যাহারা শূন্যকে অভাব মাত্র বলিত। ভাষ্যকার তাহাদের মত যে সম্পূর্ণ অযুক্ত, তাহা নিম্ন প্রকার যুক্তির দ্বারা দেখাইয়াছেন।

চিত্তকে ক্ষণস্থায়ী মাত্র পদার্থ বলিলে, ক্ষণিকবাদীরা যে 'বিক্ষিপ্ত' 'একাগ্র' প্রভৃতি চিত্তাবস্থা বলে, তাহার কোন প্রকৃত অর্থ-সঙ্গতি হয় না। কারণ প্রত্যেক চিত্ত যদি বিভিন্ন ও ক্ষণস্থায়ী মাত্র হয়, তবে তাহা সব একাগ্র, কারণ ক্ষণস্থায়ী একটি চিত্তে এক একটি করিয়াই আলম্বন থাকে। যদি বল, সমানাকার বিজ্ঞানের প্রবাহকেই একাগ্র চিত্ত বলি, তাহাও নিরর্থক; কারণ সেই একাগ্রতা কোন্ চিত্তের ধর্ম্ম? প্রত্যেক চিত্তই যখন পৃথক্ সত্তা, তখন প্রবাহ-চিত্ত নামে এক সত্তা হইতে পারে না। অতএব একাগ্রতা প্রবাহ-চিত্তের ধর্ম্ম, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। আর প্রত্যেক চিত্ত যখন পৃথক্ পৃথক্, তখন সদৃশ আলম্বনই হউক, আর বিসদৃশ আলম্বনই হউক, সমস্ত চিত্তই একাগ্র হইবে। বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া কিছু থাকিবে না।

আর প্রত্যয় সকল পৃথক্ ও অসম্বন্ধ হইলে, এক প্রত্যয়ের দৃষ্ট বিষয়ের বা কৃত কর্ম্মের অপর প্রত্যয় স্মর্ত্তা বা ফলভোক্তা

---

* "কথাবলু" নামক পালিগ্রন্থ, যাহা অশোকের সময় রচিত, তাহাতে আছে যে সে সময় বৌদ্ধদের মধ্যে প্রায় ২২ প্রকার বিভিন্নবাদী ছিল।

হইতে পারে না। এ বিষয়ে ক্ষণিকবাদীরা উত্তর দিবেন যে—বিজ্ঞান, সংস্কার-সংজ্ঞাদি সংপ্রযুক্ত হইয়া উদিত হয়, আর পূর্ব্ব-ক্ষণিকবিজ্ঞান উত্তরক্ষণিকবিজ্ঞানের হেতু বলিয়া উত্তরবিজ্ঞান পূর্ব্ববিজ্ঞানের কতক সদৃশ সংস্কারাদি সম্প্রযুক্ত হইয়া উদিত হয়। স্মৃতি, কর্ম্ম চেতনাবিশেষ) বৌদ্ধমতে সংস্কার। তজ্জন্য উত্তরবিজ্ঞানে পূর্ব্ববিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত স্মৃত্যাদি অনুভূত হয়। কিন্তু ইহাতে পূর্ব্ববিজ্ঞান হইতে উত্তরবিজ্ঞানে কোন সত্তা যায়, এরূপ স্বীকার করা অহার্য্য হয়। কিন্তু ক্ষণিক-বাদে পূর্ব্ববিজ্ঞানের সমস্তই নাশ বা অভাব হয়। অতএব একই মৌলিক চিত্ত পদার্থের প্রত্যয় সকল ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম, এই সাংখ্যীয় দর্শনই যুক্ততম।

ঈদৃশ দর্শনের অনুকূল আর এক যুক্তি এই—"যাহা আমি দেখিয়াছিলাম, তাহা আমি স্পর্শ করিতেছি"—"যাহা আমি স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহা আমি দেখিতেছি" এইরূপ প্রত্যয়ে 'আমি' এই প্রত্যয়াংশ আমাদের এক বলিয়া অনুভব হয়।

ক্ষণিকবাদীরা বলিবেন—'উহা একই দীপ শিখা' এইরূপ জ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্ত একত্ব-জ্ঞান। কিন্তু উহা যে দীপশিখার ন্যায়, এরূপ কল্পনা করিবার হেতু কি? ক্ষণিকবাদীরা কেবল দৃষ্টান্ত দেন, কিন্তু যুক্তি দেন না। প্রত্যুত 'শূন্য' অর্থে অভাব, ইহা প্রতিপন্ন করিবার খাতিরে ঐরূপ কল্পনা করেন। অথবা 'যাহা সৎ—তাহা ক্ষণিক' এই অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞাকে ভিত্তি বা হেতু করিয়া 'আমিত্ব সৎ'—অত-এব তাহা ক্ষণিক, এইরূপ অযুক্ত 'উপনয়' ও 'নিগমনা' সিদ্ধ করেন। কিন্তু এরূপ কল্পনায় প্রত্যক্ষ একত্বানুভব বাধিত হয় না; কারণ প্রত্যক্ষ হইতেই অন্য প্রমাণ সাধিত হয়।

শ্রীহরিহরানন্দ আরণ্য।

ভারতে রাষ্ট্রতন্ত্র ও তাহার উপাদান।

রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধে বলিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকেরই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কেননা রাষ্ট্র শব্দটীর মধ্যে এরূপ গূঢ়, সুগভীর, চিন্তাপূর্ণ আলোচ্য বিষয় আছে যে, ইহার প্রত্যেকটি সাধারণ প্রবন্ধে বিবৃত করাও এক প্রকার অসম্ভব। সুতরাং রাজনীতিবিৎ পণ্ডিতগণ রাষ্ট্র পদার্থকে কিরূপ চক্ষে দেখেন তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে।

কতকগুলি লক্ষণের সহিত মিল রাখিয়া, সাধারণহিতার্থে ভিন্ন ভিন্ন মানবসম্প্রদায় একত্র হইয়া জাতি সংগঠন করিয়াছে। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে যেমন ব্রাহ্মণাদি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্রূপ একই দেশের অধিবাসিগণের মধ্যেও প্রদেশ, ভাষা, ধর্ম্ম, আচারপদ্ধতি, পুরাণ ও ইতি-হাসতত্ত্বসমূহ পৃথক বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষেও এই

কারণে বাঙ্গালী, মারহাটী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মাদ্রাজী, উড়িয়া, তিব্বতী, নেপালী, প্রভৃতি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত জাতি যখন সাধারণ-হিতার্থে বা দেশের কল্যাণার্থে প্রভূত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হন, তখন তাঁহারা ভারতসাম্রাজ্য সংগঠনে সমর্থ হইয়া থাকেন এবং পৃথিবীতে জাতিগতপ্রাণ ও স্বদেশ-ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্দেশ্য ও অভিমত পৃথক্ হইলেও, তাহারা যে মিলিত হইয়া একটি জাতিতে পরিণত হইতে পারেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ একই দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে জাতি, ভাষা এবং ধর্ম্মগত পার্থক্যও এক সাম্রাজ্য-গঠনে সম্পূর্ণরূপে সহায় হইতে পারে।

রাষ্ট্র নামে বৃহৎ বৃত্ত মধ্যে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত অন্তর্ভূত আছে। এই বিরাট বৃত্তমণ্ডলে জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা, ইতিহাস ও পুরাণতত্ত্বসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তরূপে ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থান করিতেছে। লিবারলই (Liberal) হউন আর কন্‌সারভেটিবই (Conservative) হউন, তাঁহাকে 'ইংরেজ' এই নামের মধ্যেই থাকিতে হইবে। হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন, তাঁহাকে যে 'ভারতবাসী' বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহারা লিবারল্ পার্টি, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও অভিমত একরূপ, যাঁহারা 'কন্‌সার্ ভেটিব' তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও অভিমত আর এক-রূপ। এই উদ্দেশ্য ও অভিমত উহাঁদিগের ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সাধারণ জাতীয় হিতকল্পে তাঁহাদের লক্ষ্যও সাধারণ ও এক দৃষ্ট হয়। যখন রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের সাধারণ-হিতাহিত সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তখন তাঁহাদের মধ্যে এত প্রভেদ, এত পার্থক্য, সমস্তই বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যায়। কেননা, স্বদেশহিতৈষণাকর্তৃক পরিচালিত হইয়া তাঁহারা মত-বিশেষত্ব সত্ত্বেও, এরূপ সমাজবদ্ধ ও একত্র হইয়া কার্য্য করার সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন। উহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা মনে করেন, স্বদেশ তাঁহাদের সাধারণ সম্পত্তি। তাঁহাদের মধ্যে সম-(আত্ম)-বেদনামূলক সহানুভূতি তাঁহা-দিগকে এইরূপ স্বদেশহিতৈষণায় প্রণোদিত করে। এই স্বদেশহিতৈষণা পরস্পরের মধ্যে সাধারণভাবে আছে বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন জাতিও একই শাসনের অধীন থাকিতে সমর্থ হয়। সামাজিক ব্যবহারে নৈতিক বল যেমন মূল্যবান্, ধর্ম্মরাজ্যে বিশ্বাস যেমন মূল্যবান্, স্বদেশ হিতৈষণাও রাজনীতিক্ষেত্রে তদ্রূপ মূল্যবান্। এইরূপ ভারতে সমষ্টিপ্রজাপ্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রতন্ত্ররূপ বিরাট বৃত্ত মধ্যে বহুজাতি—বাঙ্গালী, মারহাটী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মাদ্রাজী, উড়িয়া, তিব্বতী, নেপালী প্রভৃতি; বহু ধর্ম্মাবলম্বী—বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসীক প্রভৃতি, বহু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাসমষ্টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তরূপে ভিন্ন ভিন্নভাবে সন্নিবিষ্ট থাকিলেও উহার সমবেত ঐকমত্য-বল সামান্য নহে। একই রাষ্ট্রের সমষ্টি-প্রজাপ্রকৃতির কার্য্যকরী ক্ষমতা অসীম। উহা সকল জাতিকে সংযত ও আয়ত্ত রাখে।

বিরাট স্বার্থসাধনমূলক রাষ্ট্রতন্ত্র বা সমষ্টি প্রজাপ্রকৃতি ঐশ্বরিক ভাবের নিদর্শন-স্বরূপ। স্বয়ং ঈশ্বর সমষ্টি প্রজাপ্রকৃতির স্বার্থসাধনে পরিচালনভার গ্রহণ করেন। সমষ্টি প্রজাপ্রকৃতি সুনিয়মে পরিচালিত হইবার কোনরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হইলে, প্রজাবর্গ 'রামরাজ্যে' বসতির ন্যায় বাসসুখ অনুভব করিয়া থাকে। সমষ্টি প্রজাপ্রকৃতির শক্তি যে অসীম, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই জন্যই সমষ্টি প্রজাপ্রকৃতি বা রাষ্ট্রতন্ত্র মধ্যে জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা ও ব্যক্তিত্ব সর্ব্বদা পরাভূত ও অভিভূত থাকে। রাষ্ট্রধর্ম্মই কেন্দ্রশক্তিরূপে অবস্থিতি করে। এই রাষ্ট্র-ধর্ম্মই—তাহার অবান্তর বিভাগগত তাবৎ শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ করিয়া রাখে। একই রাষ্ট্রমধ্যে সমষ্টি প্রজাপ্রকৃতি মানবকে স্বদেশহিতৈষণায় প্রণোদিত করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব, জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষাগত পার্থক্য সমস্ত ভুলাইয়া দেয়।

জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছায় জাতীয় অভ্যুদয়ানুকূল সর্ব্ববিষয়ে প্রাধান্যলাভই রাষ্ট্রপ্রকৃতির মূলতত্ত্ব। প্রজাপুঞ্জ সমবেত হইয়া কল্যাণজনক সর্ব্ববিষয়ে যখন প্রাধান্য লাভ করিতে পারে, তখন সেই রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্র শাসনের উপযোগী হয়। জাতি, ভাষা, ধর্ম্মগত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রজাপ্রকৃতির সমবেত শক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং বিশ্বজনীন কল্যাণমূলক বিষয়ে প্রজাপুঞ্জের প্রাধান্য লাভের উপর রাষ্ট্রধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। যিনি রাষ্ট্রধর্ম্মের এই শিবপ্রদ বিধিসমূহ উল্লঙ্ঘন করেন কিম্বা যিনি প্রতিপালন করিতে প্রতিবন্ধক প্রদান করেন, তাঁহারা উভয়ে মহাপাতকী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনেকে মনে করেন, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী এক দেশে বাস করিলেও ইহা একটি রাষ্ট্ররূপে পরিচিত হইতে পারে না। কিন্তু এই ধারণা অত্যন্ত আধুনিক ও ভ্রমাত্মক। জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা-প্রভৃতি-গত পার্থক্য থাকিলেও, একই রাষ্ট্র মধ্যে প্রজাপুঞ্জ সমষ্টিরূপে তাহার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে। প্রজাপুঞ্জের সমগ্র স্বার্থ, ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের ইচ্ছা বা দাবী দাওয়া গ্রাহ্য করে না। ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় বা জাতি-বিশেষের স্বার্থ যখন সমষ্টি-প্রজাপুঞ্জের সমগ্র স্বার্থের অনুকূল হয়, তখন তাহা গ্রাহ্য ও সার্থক হয়। প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ যতই প্রভিন্ন হউক না, জাতি, ভাষা প্রভৃতির পার্থক্য বশতঃ ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য যতই কেন পৃথক্ হউক না, রাষ্ট্রতন্ত্রের সুমহান্ শ্রেষ্ঠ অধিকারের মধ্যে ঐ সমস্ত প্রভিন্নতা লয় পায়। কেননা, সমষ্টি ব্যষ্টি অপেক্ষা শক্তিশালী।

এই বিরাট রাষ্ট্রতন্ত্রকে একটি মনুষ্য-দেহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলিয়া একটি মনুষ্য-দেহ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। দশটি ইন্দ্রিয়-শক্তি দেহে অবস্থান করে বলিয়া উহা যেরূপ কার্য্যশক্তির আধার হইবে, উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গজাত কার্য্যশক্তি তদ্রূপ প্রবল

না। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দেহের থাকিয়া যে যে স্বার্থসাধনে নিয়োজিত তা অপেক্ষা সমগ্র দেহের স্বার্থ-অনেক অধিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই তুলনার হিসাবে দেখিতে গেলে ইহাই বুঝা যায় যে, সমস্ত সম্প্রদায় বা জাতি তাহাদের ভাষা ও ধর্ম্মাদিগত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া এইরূপ রাষ্ট্র গঠনে একটি-'নেশন' হইতে) সহায়তা করিতে পারে এবং তাহাদের বিচ্ছিন্ন শক্তি অপেক্ষা প্রজাপুঞ্জের সমবেত শক্তি বহু পরিমাণে আধিক্য ও প্রকর্ষ লাভ করিতে পারে।

রাষ্ট্রতন্ত্র পৃথিবীতে কিরূপে প্রচলিত হইল, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলে মনে হয়, প্রাচীন কালের পারিবারিক জীবন-পদ্ধতি হইতে উহা উদ্ভূত হইয়াছে। পারিবারিক জীবনপদ্ধতিই রাষ্ট্রতন্ত্ররূপে সুপ্রকাশিত হইয়াছে। পারিবারিক জীবনে আমরা পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ মিলিয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করি। আমাদের পরিবার-বর্গের মধ্যেও দেখিতে পাই যে, প্রত্যেকের আদর্শ ব্যক্তিগত ভিন্ন ও প্রয়োজন বা স্বার্থ অন্যরূপ; কিন্তু যে কার্য্য করিলে সমস্ত পরিবারবর্গের ইষ্টসাধন হয়, যে কার্য্য করিলে পরিজনসমূহ রক্ষা পায়, তদ্বিষয়ে আমরা সকলেই চেষ্টা করিয়া থাকি। পরি-বারবর্গের প্রত্যেকের ইচ্ছা ও আদর্শ ভিন্নরূপ হইলেও উহার কোন মূল্য নাই এবং ঐ ইচ্ছা ও আদর্শ পরিবারবর্গের সমষ্টি-স্বার্থসাধনসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। এই জন্যই পারিবারিক সাধারণ হিতার্থে, সমগ্র ও বিরাট স্বার্থ নিষ্পাদনার্থে আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ—প্রত্যেকের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত ভিন্নতা ও অন্যান্য বহু বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও, একত্র হইয়া অত্যন্ত অনুরাগের সহিত সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকি।

এইরূপে স্বদেশহিতৈষণার একটা দিক্ পারিবারিক জীবন হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই জন্যই যে স্বদেশহিতৈষণা আমরা রাজনীতিক্ষেত্রে দেখিতে পাই, তাহা গৃহ-হিতৈষণারূপে আমরা পারিবারিক জীবনেও দেখিতে পাই। পারিবারিক জীবনে গৃহকে আমরা স্বদেশ এবং পরিবার-প্রতিপালন-এষণাকে আমরা স্বদেশহিতৈষণা বলিতে পারি। গৃহ ও স্বদেশ, গৃহহিতৈষণা ও স্বদেশ-হিতৈষণা মনুষ্যজীবনের মূল বস্তু।

সর্ব্বপ্রকার হিতৈষণা আত্মসংরক্ষণের ভাব হইতে উৎপন্ন। এই আত্মসংরক্ষণের ভাব ক্রমে নৈতিক কর্ত্তব্য মধ্যে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পারিবারিক জীবনেও এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পারিবারিক আদর্শও আত্মসংরক্ষণের ভাব হইতে আরব্ধ হইয়াছে। যদি সংসার বা পরিবার শ্রীবৃদ্ধি লাভ না করে, তাহা হইলে পরিবারবর্গের কেহই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এই ভাব মূলতঃ আত্মস্বার্থের নিমিত্ত পূর্ণ ও পার্থিব হইলেও, উহা নৈতিক জীবনে কর্ত্তব্যরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই নৈতিক কর্ত্তব্যসাধন কালে ব্যক্তিগত সমস্ত স্বার্থকে নিরভিমানের মধ্যে নিমগ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপ্রকৃতি ও পারিবারিক জীবনপদ্ধতি, ইহারা একই ভাব হইতে সমুদ্ভূত এবং এই রাষ্ট্র-প্রকৃতি পারিবারিক জীবনপদ্ধতির সম্পূর্ণতা ও সম্প্রসার ভিন্ন আর কিছুই নহে। একই রাষ্ট্রের সমগ্র প্রজার কার্য্যক্ষেত্র সীমাবিশিষ্ট হইলেও, উহা বহু প্রশস্ত ও বিস্তৃত। প্রজাপুঞ্জের স্বার্থের নিকট—জাতি, পরিবার ও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাধীনতা, সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে হয়। সকলপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ গ্রাহ্য না করিয়া, সমষ্টি প্রজার স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বলবৎ রাখাই রাষ্ট্রতন্ত্রের নিয়ম। জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে মানবের যে সমস্ত স্বার্থ রাষ্ট্রতন্ত্র বা সমগ্র প্রজাপ্রকৃতির অনুকূল, তাহাই আমাদের গ্রাহ্য। সুতরাং স্ব স্ব পারিবারিক স্বার্থসাধনে মানবের যেরূপ প্রয়োজন, জাতীয় স্বার্থসাধনে প্রত্যেকের বোধ হয় ততোধিক প্রয়োজন। কারণ আগেরটা শুধু স্বার্থ, পরেরটা স্বার্থ-পরার্থ পূর্ণতায় মিশ্রিত পদার্থ. ফলতঃ বৃহত্তর স্বার্থে শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট বা অকর্ম্মণ্য হইবার উপক্রম হইলে, প্রভূত ব্যয়ে ও যথেষ্ট যত্নে তাহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়া থাকে; কিন্তু শরীর রক্ষার অর্থে কোন অঙ্গ কি প্রত্যঙ্গচ্ছেদনাদির প্রয়োজন হইলে তখন তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। বৃহৎ স্বার্থের নিকট ক্ষুদ্র স্বার্থ যে বলি দিতে হয়, ইহা সার্ব্বভৌমিক ও স্বাভাবিক নীতিতত্ত্ব। সেইরূপ স্বার্থ-সম্বন্ধ পরিবার ও সাম্রাজ্য মধ্যেও দৃষ্ট হয়। সমগ্র পরিবারের কল্যাণানুকূল যে সুমহান্ স্বার্থ, তাহার নিকট পরিবারস্থ ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লয় পায়; রাষ্ট্রান্তর্গত প্রজাপুঞ্জের কল্যাণার্থে পরিবার, জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম, সমস্তই রক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আবার যখন একপ সমস্যা উপস্থিত হয় যে, কোন ব্যক্তি বা পরিবার তাহাদের স্বার্থ উৎসর্গ না করিলে জাতি রক্ষা পায় না, তখন সেই সেই ব্যক্তি বা পরিবারের স্বার্থোচ্ছেদ-সাধন প্রয়োজন হইয়া উঠে। এইজন্য পারিবারিক স্বার্থরক্ষা কিম্বা জাতিগত স্বার্থরক্ষা যখন প্রশ্নের বিষয় হয়, তখন জাতিগত বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্যই ব্যস্ত হইতে হয়। কেননা পারিবারিক স্বার্থ নষ্ট হইলে একটি সমগ্র জাতির বা সমগ্র সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু জাতি শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে, জাতির স্বার্থ রক্ষিত না হইলে, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সমস্ত স্বার্থ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়. রাষ্ট্র রক্ষা না পাইলে, জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম, সমস্ত নষ্ট হয়; জাতি, ভাষা ও ধর্ম্ম রক্ষা না পাইলে, পারিবারিক সমস্ত সুখ ও শান্তি নষ্ট হয়; সুতরাং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্ত সুখ সংযত করিয়া রাষ্ট্রের স্বার্থ ও সুখ অন্বেষণ করাই প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য।

জাতিগত স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে, পরিবারস্থ প্রত্যেকের পরিণত বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে যাহাতে ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়মিত ও সুগঠিত হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। চরিত্রবান্ ব্যক্তিই রাষ্ট্রতন্ত্রকে পরিচালনা করিবার জন্য প্রভূত

কার্য্যশক্তি প্রদান করেন। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রী দেবী তাঁহাকে নিজ-সেবক বলিয়া আপনার করিয়া লন এবং মৃদু ও মধুর পারিবারিক বন্ধনকে তিনি আরও সুদৃঢ় করেন। রাষ্ট্রতন্ত্র পরিচালনা কালে তাঁহার সমষ্টি-কার্য্যশক্তির অনুকূলে যাহাতে ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বীয় উপযুক্ত অংশ প্রদান করিতে পারে, এরূপ ভাবেই তিনি আপনাকে পরিচালন করেন।

এ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল ও দেখান হইল যে, সাধারণ স্বার্থ সাধনের অনুকূলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা সমাজ, ও স্থলবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন জাতি যখন একদেশে একত্র হয়, তখন তাহার সমবেত সত্তাকে রাষ্ট্র বলে। এই রাষ্ট্রই জাতি ও জাতীয়ত্ব রক্ষা করিয়া থাকে। আরও দেখান হইয়াছে—যে সমস্ত শক্তি-সমষ্টিতে রাষ্ট্রতন্ত্র গঠিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক শক্তি অপেক্ষা সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি (National Power) প্রভূত বলশালী এবং ঐ রাষ্ট্র-স্বার্থ,—কি সাম্প্রদায়িক জাতিগত দাবী দাওয়া, কি পারিবারিক দাবি দাওয়া, কিম্বা ব্যক্তিগত স্বার্থ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ।

এক্ষণে রাষ্ট্রতন্ত্রের মূল প্রকৃতি কি, তাহাই আলোচনা করা যাউক্। রাষ্ট্রশক্তির মূল কারণ সংক্ষেপতঃ যদি 'সাধারণ স্বার্থ' বলা যায়, তাহা হইলে উহাকে বড়ই অস্পষ্টভাবে বর্ণন করা হয়। কেননা, এই সাধারণ স্বার্থই বা কি কি কারণে সমুদ্ভূত হয় এবং কি কি অবস্থায় ও কোন্ কোন্ জাতির মধ্যে সম্ভব হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত কি না, এরূপ আশঙ্কা যুক্তিযুক্তরূপেই সকলের মনে সমুপস্থিত হইতে পারে।

অনেকে হয়ত প্রথমেই মনে করিবেন—'জাতি, ভাষা এবং ধর্ম্ম এক না হইলে, প্রজাদিগের বা এক রাষ্ট্রভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি-সমষ্টির স্বার্থ সাধারণ ও এক হইতে পারেনা'। ইহা কতক পরিমাণে সত্যও হইতে পারে; কেননা জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষা এক হইলে, রাষ্ট্রগঠনে ইহা বাস্তবপক্ষে সহজে সাহায্য করে। কিন্তু তাই বলিয়া উহা কোন প্রকারেই অবশ্যপ্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য্য প্রধান উপকরণ নহে। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুইট্‌জারল্যাণ্ড ইউরোপের মধ্যে একটি উৎকৃষ্টরূপে শাসিত দেশ। এই সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে কতক ফ্রেঞ্চ, কতক ইটালিয়ান্, আর কতক জরমান্। দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক জরমান্ ভাষায়, একতৃতীয়াংশ ফ্রেঞ্চ ভাষায় এবং অপর তৃতীয়াংশ ইটালিক্ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। সমস্ত সুইট্‌জারল্যাণ্ডবাসী সমুন্নত শিরে যখন তাহাদের জন্মগত স্বত্বাধিকার প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত বা সম্প্রদায় তাহাদের কাহাকেও জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতে কি সমর্থ হইয়াছিল? বেল্‌জিয়ামের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফ্লেমিষ প্রদেশসমূহ হল্যাণ্ডবাসীদিগের দ্বারা এবং ওয়ালুন প্রদেশসমূহ ফ্রেঞ্চগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেও,

বেল্‌জিয়াম-রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনে তাহাদের মধ্যে কখনও কি অমিল দেখা গিয়াছে? ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করিলে ইতিহাস বলিবে—না। ফ্রান্সে প্রোটেস্ট্যান্ট (লুথার মতাবলম্বী খৃষ্টানগণ ও রোমানক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ দেখা যায়। ফ্রান্সে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইলেও, উহা ফ্রেঞ্চদিগকে এক সম্পূর্ণ জাতীয়ত্ব পাইতে কোনরূপ প্রতিবন্ধক জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছে কি? ইতিহাস বলিবে, না— মার্কিন মহাদেশের ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ সাম্রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত হয় নাই কি? পূর্ব্ব-পৃথিবীর অপূর্ব্ব নবগৌরব জাপান সাধারণতঃ বৌদ্ধপ্রধান হইলেও, উহা ৪।৫টি বিভিন্ন জাতি-ধর্ম্মীর বাসস্থান। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে—ধর্ম্ম, ভাষা, জাতি, সম্প্রদায় কিম্বা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব পূর্ব্বোক্তরূপ রাষ্ট্র গঠনে কোনরূপ বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিতে পারে না। আমি ও আমার ভায়ের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে ও অন্যান্য কোন ২ বিষয়ে মতের পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু সেই পার্থক্য আমাদের সাধারণ পারিবারিক বন্ধন শিথিল করিতে কি কোনরূপে সমর্থ হয়? জাতীয়ত্ব সম্বন্ধে বা রাষ্ট্রসংগঠনেও ঠিক এই নিয়ম। রাষ্ট্রবন্ধনে জাতি, ধর্ম্ম, ভাষাগত সমুদায় পার্থক্যের অসুবিধা অন্তর্হিত হইয়া যায়।

রাষ্ট্রসংগঠনে আর একটি কারণ থাকিতে পারে। দার্শনিকাগ্রগণ্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Mill এই কারণের উপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্ত প্রদান করিয়াছেন। "It is argued that "common historical traditions—a common national history, common pride and humiliation—is the strongest basis of nationality." অর্থাৎ তাঁহার মতে পৌরাণিক চিত্র, জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় গৌরব ও লাঞ্ছনা বা বিপদসমূহ (জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম্ম, ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন হইলেও) রাষ্ট্রগঠনে সবল কারণ হইতে পারে। পৌরাণিক চিত্র বা ঐতিহাসিক চরিত্রমালা যখন কোন জাতির সাধারণ সম্পত্তিরূপে পরিণত হইতে পারে, তখন যে উহা রাষ্ট্র-জাতীয়তাগঠনে সহায় হইতে পারে, ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে ইটালির পুনরভ্যুদয় কথা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাই বলিয়া উহাই পুষ্কল ও প্রধান কারণ নহে, এবং তজ্জন্যই সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহাসিক চরিত্রমালা ও পৌরাণিক চিত্রসমূহ সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত না হইলেও, তাঁহারা রাষ্ট্র-জাতীয়তা গঠনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসিগণ যখন মার্কিন দেশে উপনিবিষ্ট হইয়া, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ প্রভৃতি রাষ্ট্রগঠনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন কি পৌরাণিক চিত্র বা ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী তাঁহাদিগকে জাতীয় সাধারণ সম্পত্তিরূপে এবংবিধ রাষ্ট্রগঠনে সমর্থ করিয়াছিল? সাধারণ স্বার্থই রাষ্ট্র গঠনের প্রধান ভিত্তি।

তাহাহইলে এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, জাতি বা সাম্রাজ্যগঠনের প্রধান কারণ কি ও তাহার প্রতিষ্ঠা কোথায়?

জাতিগত, ভাষাগত কি ধর্ম্মগত পার্থক্য কিম্বা ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের সাধারণ্য রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য গঠনে যে প্রধান কারণ নহে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই তবে কি কারণে সুইট্জারল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ ভুলিয়া গিয়া একই জাতীয় পতাকার অধীনে সমবেত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন? কিরূপেই বা মার্কিন-বাসিগণ তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর কলহ বিবাদ ভুলিয়া গিয়া একই জাতিরূপে সংগঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন?

যদি আমরা আমাদের প্রাচীন পারিবারিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহা হইলে এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই মীমাংসিত হইতে পারে। একই জিজ্ঞাস্য বিষয়ে আমি ও আমার ভায়ের মধ্যে ভাব ও চিন্তায় পার্থক্য ও মতভেদ থাকিলেও, কিরূপে তবে আমরা মিলিত হইয়া একই আবাসে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতে সমর্থ হই? তাহার কারণ এই যে—পরিবারস্থ প্রত্যেক লোক তাহাদের একই আবাসভূমিকে, আবাসভূমির প্রত্যেক স্থান এমন কি আবাস ভূমির কুটীটীকেও আপনার বলিয়া বিবেচনা করেন। পারিবারিক মহান্ স্বার্থনিষ্পাদক একই আবাসভূমিকে পরিবারস্থ সকল লোকের আপনার বলিয়া জ্ঞানই আমাদিগকে পরস্পর বন্ধন করিয়া রাখে। এইরূপ আপনার বলিয়া জ্ঞান অপেক্ষা পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করিতে আর কোন পদার্থই শ্রেষ্ঠতর দৃষ্ট হয় না। রাষ্ট্রগঠনের বল, আর সাম্রাজ্য গঠনের বল কম আত্মস্বত্ব গঠনের বল ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। সুইট্জারল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ ঠিক এই কারণেই জাতীয় রাষ্ট্রসংগঠনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, সুইট্জারল্যাণ্ডের প্রত্যেক পাহাড়, প্রত্যেক নদ নদী, এমন কি সুইট্জারল্যাণ্ডের সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও সুইস্দিগের সাধারণ সম্পত্তি ও তাঁহাদের জাতীয় স্বার্থসাধন সহায়—উহা সুইট্জারল্যাণ্ডবাসী ভিন্ন আর কাহারও খাঁটি আপনার বলিবার অধিকার নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, জাতি-ধর্ম্ম প্রভৃতি-মূলক পার্থক্য থাকিলেও, রাষ্ট্র জাতীয়তা সংগঠনের প্রধান ও প্রকৃত কারণ আমাদের বাসস্থানকে—আমাদের খাইবার, শুইবার, বসিবার, দাঁড়াইবার, আজীবন-মরণ বিশ্রাম করিবার স্থানকে, খাঁটি আপনার বলিয়া জ্ঞান। আমরা যেমন আমাদের বাড়ীকে পরিবারস্থ সকলেরই নিজস্ব বলিয়া ভাবিতে পারি, তদ্রূপ আমরা আমাদের দেশকে দেশবাসী সকলেরই সাধারণ বাড়ী বলিয়া ভাবিতে পারি। যখন বাঙ্গালী, মারহাটী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, ইস্লামী, ও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষকে তাঁহাদের জন্মভূমি, অধিবাসভূমি বা আপনার বলিয়া ভাবিতে পারিবেন, তখন তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন ভাব, কিম্বা জাতীয় ইতিহাসের পার্থক্য

রাষ্ট্র বা Nationality সংগঠনের কোন রূপ অন্তরায় হইতে পারিবে না। মানব ও তাহার জন্মভূমি চিরসম্বন্ধযুক্ত ও পরস্পর আপেক্ষিক। জন্মভূমির জন্মসত্ত্বের সাধারণত্ব-দাবীই রাষ্ট্র জাতীয়তা সংগঠনের মূল কারণ।

অতএব "ভারতবাসিগণ একটী রাষ্ট্র (নেশন্)-রূপে পরিণত হইতে পারে না, একই রাষ্ট্রতন্ত্রের নিয়মাধীন থাকিতে পারে না" একথা যাঁহারা বলিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বড়ই ভুল শিক্ষা দিয়াছেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবাসিগণ বুঝিতে পারিতেছেন না যে—তাঁহারা বর্ত্তমান জাতিগত বন্ধনের মধ্যেও 'নেশন'রূপে অবস্থিত করিতেছেন। এই বোধের অভাবই—তাঁহাদের একতার অন্তরায় যদি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী প্রাণের সহিত মনে করেন যে—তাঁহাদের জন্মভূমি ভারত তাঁহাদের সাধারণ সম্পত্তি, জন্মভূমির কল্যাণই সাধারণ স্বার্থ ও সাধারণ কল্যাণ, তাহা হইলে রাজবিধিবাধাতার মধ্যেও ভারতে সমষ্টি-রাষ্ট্ররূপে জাতীয়তা সংগঠিত হইতে পারে।

সমগ্র দেশে এক রাজা হওয়ায়ও জাতীয়তা সংগঠিত হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ একই শাসনের অধীন হওয়ায়, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদের মধ্যে যে জাতীয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঃ——

বাসভবনে গোভিলাচার্য্য।

শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্রে ঘোষণা করিয়াছেন—"বেদানাং সামবেদোঽস্মি।" অর্থাৎ বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ। এই মহনীয় মহিম সামবেদের শ্রৌতসূত্র রচয়িতা আচার্য্যপ্রবর লাট্যায়ন, গৃহ্যসূত্রনেতা মহাত্মা গোভিলাচার্য্য। গোভিলাচার্য্য-বিরচিত গৃহ্যসূত্রে বাস্তুনির্ম্মাণের যে তথ্য বিবৃত হইয়াছে, তাহা অর্ব্বাক্‌কালীন স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিদ্‌গণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিতে সমর্থ। বাসভবন নির্ম্মাণপ্রসঙ্গে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের প্রতি যে তাঁহারা অধিকতর মনোযোগ করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত মাত্র এস্থলে প্রদত্ত হইবে।

গোভিল সর্ব্বপ্রথমেই বলিতেছেন—

"অবসানং জোষয়েত।" বাসভবন নির্ম্মাণের জন্য অবসান (বিরামবহুলস্থান—চলিত ভাষায় "ফাঁকা জায়গা।") স্থান সেবা করিবে—অর্থাৎ মনোনীত করিবে। 'অবসান' শব্দে ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন—"অন্যবাস্তুভিরবেষ্টিতং" যে স্থান অন্য বাস্তু (বাসভবন) দ্বারা বেষ্টিত নহে। বস্তুতঃ বাসভবনে অবাধ পবন-প্রবাহ ও যথেষ্ট রবিরশ্মিপাতের ব্যবস্থা না থাকিলে তাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল হইতে পারে না। যদি বাসভবনের চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত স্থান না থাকে, অপিচ বাস্তুভূমির চতুষ্পার্শ্ব বহুগৃহসঙ্কুল হয়, সে স্থানে বায়ুসঞ্চারের সুবিধা থাকে না। বায়ু-প্রবাহের ব্যাঘাত ঘটায় দোষবীজ স্থানচ্যুত হইতে পারে না।

সৌদ্রপাতের ব্যবস্থার অসদ্ভাবে পূতি-পর্য্যুষিত দ্রব্যাদি হইতে জাত বিষবীজ বৰ্দ্ধিত ও সমস্তাৎ ব্যাপ্ত হইয়া মানব-দেহের স্বাস্থ্যনাশের পন্থা উদ্ভাবন করে। সুতরাং তাদৃশ ভূমি বৰ্জ্জন করিতে বলিয়া মহর্ষি অশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

তৎপরে মহর্ষি বলিতেছেন,—

"সমং লোমশং অবিভ্রংশি প্রাচ্য উদীচ্যো বা যত্র আপঃ প্রবর্ত্তেরন্ অক্ষীরিণ্যঃ অকণ্টকাঃ যত্র ঔষধয়ঃ স্যুঃ।"

বাসভূমি সমতল ও দূর্ব্বাবৃত হইবে; স্থানটী অবিভ্রংশি—অর্থাৎ যে স্থান হইতে ভ্রংশনের (পতনের) সম্ভাবনা নাই, তাৎ-পর্য্যতঃ—যাহা উন্নতানত নহে, এরূপ হওয়া প্রয়োজন। উন্নতানত স্থানও সমতল করিয়া গৃহ নির্ম্মাণার্থে ব্যবহৃত হইতে পারিবে, এরূপ মনে হয়, কিন্তু এ ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ হয় না। 'সমং' বলাতেই ইহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইয়াছে। আমরা মনে করি, অবিভ্রংশি অর্থ—যে স্থানের ভ্রংশন ঘটিতে পারে না, এরূপ স্থান। পুষ্করিণী ও গর্ত্তাদির পূরণ দ্বারা যে স্থানকে সমভূমি করা হইয়াছে, সে স্থানের উপরিভাগে গৃহনির্ম্মাণ করিলে ভ্রংশনের (বসিয়া যাওয়ার) সম্ভাবনা যথেষ্ট। ঐরূপ স্থান স্বাস্থ্যকর হয় না। অভ্যন্তরভাগে অবকাশবাহুল্য থাকায়, বর্ষাসময়ে সে স্থানে জল সঞ্চিত হয়; ঐ সঞ্চিত জল বায়ু তাপ-বাহুল্যে শরৎ-সমাগমে বাষ্পাকার ধারণ করিয়া ভূমিতল আর্দ্র করিয়া উর্দ্ধোত্থিত হইতে থাকে, তদ্দ্বারা জ্বরোৎপত্তি ঘটিতে পারে। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন (১) বর্ষাকালে ভূবাষ্প, অম্ল-বিপাক (জলের সহিত উদ্ভিজ্জবীজের বহুল পরিমাণে মিশ্রণ হওয়ায়) বিকৃত দূষিত জল পান করিয়া অগ্নিবল, বায়ু, পিত্তাদি দোষ কুপিত হয়; সুতরাং দোষ-বৈষম্যে জ্বরাদি ঘটে। ভূবাষ্প বর্ত্তমান কালীন 'ম্যালেরিয়া গ্যাস"। মহর্ষিগণ বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া বাষ্প জানিতেন। বিভ্রংশি স্থানে বাস করিলে, এই ম্যালে-রিয়া গ্যাসের প্রকোপে জ্বরাক্রান্ত হইতে হয়, তজ্জন্য মহর্ষি বলিতেছেন, অবিভ্রংশি স্থান—অর্থাৎ যে স্থানে জলসঞ্চারের সম্ভা-বনা নাই, তাহাই বাস্তুনির্ম্মাণ করিবার জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

যে স্থানের পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে জল-প্রবৃত্তি থাকিবে, তাহাই বাসভূমির যোগ্য স্থান। "আপঃ প্রবর্ত্তেরন্" অর্থ জল প্রবর্ত্তিত হয়। এখানে কেহ কেহ বুঝিয়াছেন, উত্তরে বা পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ জলাশয় থাকিবে। পূর্ব্বে জলাশয় থাকার কথাটা প্রাচীন প্রবাদ দ্বারাও সমর্থিত হইতে পারে, কিন্তু উত্তরে জলাশয় থাকিলে, শীত-কালে স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা ঘটে না। উত্তরাগত বায়ুপ্রবাহ জলাকণামিশ্রিত হইয়া আগমন করায়, শীতসময়ে ঐরূপ স্থানে শ্লেষ্মাবৃদ্ধির সম্ভাবনা যথেষ্ট। বাসভবনের উত্তরদিগ্‌ভাগ বায়ুপ্রবাহবিরহিত হওয়াই উৎকৃষ্ট কল্প। বঙ্গের প্রাচীন প্রবচন "পূবে

---

(১) ভূবাষ্পাৎ মেঘনিস্যন্দাৎ পাকা-দম্লাজ্জলস্য চ।
বর্ষাস্বগ্নিবলে ক্ষীণে কুপ্যন্তি পবনাদয়ঃ॥
(চরকসংহিতা, বর্ষাচর্য্যা।)

হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে গুয়া, দক্ষিণে ভূয়ো।" পূর্ব্বদিকে হংস বিচরণ করিবে, অর্থাৎ পুষ্করিণী থাকিবে। পশ্চিম দিকে বংশতরুরাজী বিরাজ করিবে। উত্তরে বা পূর্ব্বভাগে জল প্রবর্ত্তিত হইবে। ইহাতে আমরা বুঝি, ভবনের পূর্ব্বদিক্ বা উত্তরদিক্ হইতে জল নিঃসারণের ব্যবস্থা থাকিবে। পূর্ব্বদিকে জলাশয় থাকায়, সেদিকে জল-বিগমের ব্যবস্থা করা সহজ। উত্তরদিক্ দিয়াও জলাপসারণের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। দক্ষিণাংশ-অবকাশভাগে পুষ্পারামাদির বিদ্যমানতা নিবন্ধন যে পথে জলসঞ্চারের সুবিধা থাকে না, পশ্চিম ভাগ অস্তগমনকালীন সূর্য্যকরসম্পাতে অলঙ্কৃত হওয়ায়, সেদিকে জলনির্গমপন্থা অধিককাল রবিরশ্মি সংস্পর্শ লাভ করিতে পারে না, তজ্জন্য জল নির্গমমার্গ আর্দ্র থাকার আশঙ্কা থাকে। পূর্ব্বাহ্নে ছায়াপাত সম্ভাবনা থাকায়, ঐ আর্দ্রতাপসারণ সমধিক সম্ভাবনীয় নয়। তাহাতে রোগ-উৎপত্তির আশঙ্কা থাকে। রৌদ্রের ক্রীড়াক্ষেত্রই জলনির্গমের প্রশস্ত পন্থা।

বাসস্থানে ক্ষীরিবৃক্ষ ও কণ্টকীবৃক্ষ ও কটুরস বনৌষধিসমূহ থাকিতে পারিবে না, ইহা ঋষির অভিমত। ক্ষীরিবৃক্ষ বটাদি বহুস্থানব্যাপী হওয়ায়, তলদেশ অনাতপ-প্রদেশে পরিণত হয়; এবং তলদেশে ক্ষুদ্র বৃক্ষ(আগাছা)রাজী-সমাকীর্ণ হওয়ায়, উহা অস্বাস্থ্য আনয়ন করে। এরূপ প্রবল উদ্ভিদ্‌শক্তি মানবী জীবশক্তির প্রসারের প্রতিকূল, এজন্য বাসগৃহের সমীপে ঐ জাতীয় বৃক্ষাদি থাকা অনর্থকর। কণ্টকীবৃক্ষ সকল অধিকাংশই কুব্জাকারে বর্দ্ধিত হয়; তাহাদের নিম্নভাগ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ বর্ষায় অধিকতর আর্দ্র থাকিয়া গৃহভূমির অস্বাস্থ্য বর্দ্ধিত করে। কণ্টকীবৃক্ষসমূহই দোষাবহ নহে; বিল্বাদি বৃক্ষও কণ্টকযুক্ত, কিন্তু তাহাদের বর্জ্জন অভিপ্রেত নহে। বন্য বদরী, নাটা, সূচীকণ্টক প্রভৃতি কণ্টকীবিরুদ্ এখানে ত্যাজ্য বলা হইতেছে।

কটুরস ওষধিসমূহ দেহের ত্রিদোষ-বিকৃতি আনয়ন করে। সুস্থ দেহে ঔষধি সেবন যেমন ব্যাধি আনয়ন করে, স্বাভাবিক শরীরে কটুরস (পিত্ত ও অবস্থা-বিশেষে বায়ুবর্দ্ধক) ঔষধিসংস্পর্শও তদ্রূপ অলক্ষ্যে অনিষ্ট আনয়ন করে। কটুরস ওষধি, যেমন সরিষা গাছ, লঙ্কা গাছ, ইত্যাদি। বর্ষমাত্রজীবী লঙ্কাগাছ এতদ্দেশে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়; যাহারা লঙ্কার চাষে অভিজ্ঞ, এ সংবাদ তাহাদের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। ওষধিবর্গ যে কেবল নীরবে অবস্থিতি করে, তাহা নহে; তাহারা গৃহ-প্রাঙ্গণের বায়ুমণ্ডলীতে তাহাদের শরীরসার স্বল্পমাত্রায় সমর্পণ করে; তাহা মানবদেহে সংসৃষ্ট হইলে, সূক্ষ্মভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে। তৎফলে দেহে ত্রিদোষ-ব্যতিক্রম হয়; তাহা অজ্ঞাতসারে রোগে পরিণত হয়। সূক্ষ্মদর্শী ঋষি তাই কটুরস ওষধি গৃহাঙ্গনে রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

তৎপরে মহর্ষি গোভিল ভারতীয় চিরন্তন ধারণার অনুরূপ স্থলের ব্যবস্থা করিতেছেন। এ ব্যবস্থায় অধিকারিভেদে বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। বহুকাল হইতে ভারতীয়

আর্য্যসন্তানগণ বিশ্বাস করেন যে, সত্বগুণ শুভ্র, রজোগুণ লোহিত ও তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ। এই বিশ্বসংসার ত্রিগুণের বিভিন্ন সংস্থান মাত্র। সুতরাং বিশ্বের শুভ্র বস্তুসমূহ সত্বময়, রক্তবর্ণ দ্রব্য রাজস ও অসিত বর্ণশালী বস্তুজাত তমোবহুল। যাহার প্রকৃতি যেরূপ, অর্থাৎ যাহার প্রকৃতিতে সত্বাদিভাবের মধ্যে যেটীর আধিক্য থাকে, সে তদ্গুণাত্মক বস্তুসমূহে অধিকতর অনুরাগসম্পন্ন হয়। পক্ষান্তরে—সে তদ্গুণময় দেবতা-পিশাচাদির উপাসনায় রত হয়। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন—"যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।" সত্বগুণসম্পন্ন মানবগণ সাত্বিকদেবতাগণের অর্চ্চনায় স্বভাবতঃ নিবিষ্ট হয়। রজঃস্বভাব নরগণ রাজসভাবাপন্ন যক্ষরাক্ষসাদির আরাধনায় স্বত নিরত হয়। তামস ব্যক্তিমণ্ডলী তমঃপ্রকৃতি ভূতপিশাচাদির উপাসক হইয়া থাকে। আবার সাত্বিক বৈষ্ণবগণ সত্বময় বিষ্ণুর উপাসক, শুভ্র বস্ত্র ধারণ করে, শুভ্র পুষ্প, শুভ্র চন্দন, শুভ্র মৃত্তিকাদ্বারা অর্চ্চনাকার্য্য সম্পাদন করে। রজোময়ী শক্তির উপাসকগণ রক্তবস্ত্র পরিধান করে; রক্তচন্দন, রক্তজবা, রক্ত—উপহার দ্বারা দেবীর পূজা সমাধান করে। এই বেশবৈচিত্র্য, উপহারবৈষম্য সত্বভাব হইতে রাজস দশাকে পৃথক্ করিয়া প্রমাণ করিতে চায়। এদিকে আবার আর্য্যশাস্ত্র মতে "ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ লোহিতঃ। বৈশ্যানাং পীতকোবর্ণঃ শূদ্রানামসিতস্তথা"। ব্রাহ্মণগণের বর্ণ শুক্ল, ক্ষত্রিয়গণের লোহিত, বৈশ্যের পীতবর্ণ ও শূদ্রের বর্ণ কৃষ্ণ হইবে। না হউক্, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু পুস্তকে যেভাবেই হউক্, কথাগুলি লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ সুতরাংই শ্বেতবর্ণ বস্তুর প্রতি অনুরক্ত হওয়া দরকার। মহর্ষি গোভিলও বলিতেছেন—"গৌরপাংশু ব্রাহ্মণস্য" "লোহিতপাংশু ক্ষত্রিয়স্য" "কৃষ্ণপাংশু বৈশ্যস্য।" যে স্থানের ধূলিসমূহ গৌর (অবদাত, সিত) বর্ণ, সেই স্থানে ব্রাহ্মণ বাস করিবেন। যে স্থানের রজোরাজি লোহিত, সে স্থানে ক্ষত্রিয় বাস করিবেন, যেখানকার ধূলিকুল কৃষ্ণবর্ণ, সেখানে বৈশ্যগণ বাসস্থান নির্দ্দেশ করিবেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার অনুরূপ বর্ণের স্থানে বাস করিবেন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও তাহাই করিবেন, এরূপ ঋষির অভিপ্রায় মনে করা যায়।

অতঃপর গোভিলাচার্য্য বলিতেছেন—

"স্থিরাঘাতং একবর্ণং অশুষ্কং অনুষরং অমরু-পরিহিতং অকিলিনম্।"

যে স্থান স্থিরাঘাত—অর্থাৎ যে স্থানের মৃত্তিকা আঘাত সহ্য করিতে পারে, স্বল্প আঘাতেই ধসিয়া না যায়, পুনঃপুনঃ আঘাত করিলেও সহজে গর্ত্তে পরিণত হয় না, সেস্থান বাসের জন্য নির্ব্বাচন করিবে। দৃঢ় স্থান শুষ্ক থাকে বলিয়া স্বাস্থ্যরক্ষায় অনুকূল হয়। যে স্থানের মৃত্তিকা নানা বর্ণবিশিষ্ট নহে, তাহা একবর্ণ, ঐরূপ স্থান বাসভবন নির্ম্মাণের যোগ্য। নানাবর্ণ মৃত্তিকা থাকিলে বুঝা যায়—স্থানটী অল্প দিনের—অর্থাৎ উহার মধ্যে অনেক অংশ এরূপ থাকে, যাহা অল্প দিনই অন্য দ্রব্য

হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে, সে স্থান—মৃত্তিকার বন্ধন দৃঢ় না হওয়ায় অস্বাস্থ্যকর হয়। অশুষ্ক—অর্থাৎ যে স্থানে ওষধি রোপণ করিলে তাহা শুষ্ক ও নির্বীর্য্য না হইয়া সরস ও বীর্য্যবান্ হয়, সে স্থান বাসার্হ। 'অনূষর'—যাহা উষর নহে। যেখানে পরিপুষ্টবীজ বপন করিলেও, তাহার অঙ্কুরদর্শনের প্রত্যাশায় বঞ্চিত হইতে হয়, তাদৃশ ক্ষার-বালুকা-কঙ্করাকীর্ণ অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের নাম উষর। অনূষর বলিলে বুঝা যায়, যেখানকার মৃত্তিকা অঙ্কুরজননের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী, তাদৃশ ক্ষেত্র। সে স্থানও বাস-ভবন রচনার সম্যক্ যোগ্য। অমরু-পরিহিতং—যাহার চতুর্দ্দিকে মরুক্ষেত্র বিদ্যমান নাই। মরু-পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বাস করা বিপৎসঙ্কুল। যেখানে জীবন রক্ষার জন্য অনবরত প্রকৃতিদেবীর পারিষদ্-বর্গের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, সেখানে জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য সকলের সং-সাধনার্থে অবকাশ-প্রত্যাশা কোথায়? আর্য্যঋষিগণ কোনওমতে স্বভাব-সংগ্রামে জয়ী হইয়া পশুবৎ জীবন বহন করাকে ঘৃণা করিতেন। সুতরাং যেখানে জীবন-যাত্রা অনায়াসসাধ্য, যে স্থানে পারলৌকিক কল্যাণপ্রদ কর্ম্ম সম্পাদনার্থ যথেষ্ট অবসর লাভ সম্ভব, তাদৃশ স্থানকেই তাঁহারা বাসের অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অক্লিন—অক্লিন্ন। 'ক্লিন্ন' শব্দটীর ক ও ল বিশ্লিষ্টভাবে ও লকারে ইকার যোগ করিয়া নএর লোপ করিয়া উচ্চারিত হইয়া 'কিলিন' হইয়াছে। এরূপ ব্যতিক্রমের অসংখ্য দৃষ্টান্ত ভাষার ভাণ্ডারে বিরাজ করিতেছে। ক্লিন্ন অর্থ আর্দ্র—ক্লেদযুক্ত। অকিলিন অনার্দ্র। আর্দ্র স্থানে বাস করায় শ্লেষ্মজন্য নানা পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ জ্বর, বাত, শ্বাস-কাসাদি রোগ আর্দ্র স্থানে অবস্থিতিনিবন্ধন সংঘটিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং যেস্থান অনার্দ্র (জলসিক্ত নহে), তাহাই বাস-ভবন নির্ম্মাণের পক্ষে প্রশস্ততম।

অতঃপর গোভিলাচার্য্য স্থানের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিতেছেন।

"দর্ভসম্মিতং ব্রহ্মচর্য্যকামস্য" "বৃহত্তৃণৈর্ব্বলকামস্য" "মৃদুতৃণৈঃ পশুকামস্য।"*৯

ব্রহ্মতেজঃ-প্রকর্ষপ্রার্থী ব্রাহ্মণের বাসস্থান কুশবহুল ও বলকামী ক্ষত্রিয়নন্দনের বাস-ভবন দীর্ঘতৃণপূর্ণ প্রদেশে এবং পশুকাম বৈশ্যপুত্রের গৃহস্থান ক্ষুদ্রতৃণসমন্বিত হওয়া প্রয়োজন। এখানে তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ দৈব-পৈত্র্য কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত, তাহাতে কুশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; সে কুশ গৃহপার্শ্বেই বিদ্যমান থাকিলে, আর কুশাহরণ ক্লেশ ও সময়াতিপাত সহ্য করিতে হয় না; সুতরাং তাদৃশস্থানই ব্রাহ্মণের পক্ষে সুসঙ্গত।

ক্ষত্রিয় জাতি বলের উপাসক, তাহাদের বলোপকরণ অশ্বাদি দীর্ঘতৃণ দ্বারা প্রতি-পালিত হইতে পারে, আর বীরণাদি দীর্ঘতৃণ "শর" নির্ম্মাণের উৎকৃষ্ট উপকরণ, সুতরাং ক্ষত্রিয়ের গৃহের অনতিদূরে এই অত্যাবশ্যকীয় উপকরণের অবস্থিতির অবশ্য প্রয়োজন।

বৈশ্য পশুপালক হইলেও, হস্তী-ঘোটকের

পালনে রত নহেন; তাঁহার প্রধান সম্পত্তি গোধন। গো-মহিষাদি গৃহ-পশু, যাহারা কোমল তৃণ ভক্ষণেই চিরদিন অভ্যস্ত, তাহাদের খাদ্য ক্ষুদ্রতৃণময় ভূভাগে বৈশ্যের প্রয়োজন। গোপালকেরা অদ্যাপি তাদৃশ ভূভাগ (গোচারণ মাঠ) জমা লইয়া গবাদির আহার-ব্যবস্থা করিয়া রাখে। অতএব বৈশ্য তদ্রূপ ভূমিই বাসার্থে গ্রহণ করিবে।

বাসভূমির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মহর্ষি গোভিল অধুনা বাসস্থানের আকৃতি বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিতেছেন; তদ্ যথা।—

"শাদাসম্মিতম্ মণ্ডলদ্বীপসম্মিতং বা যত্রবা স্বভ্রাঃ স্বয়ং খাতাঃ সর্ব্বতোঽভিমুখাঃ স্যুঃ।"

ইষ্টকাকার, দ্বীপাকার মণ্ডল ভূভাগ অথবা যে স্থানের পার্শ্বে অকৃত্রিম খাত ও গর্ত্তাদি জলাশয় থাকে, সেরূপ স্থান বাসার্থে মনোনীত করিবে। শাদা অর্থ ইষ্টক। "শাদাসম্মিত" বলায়, মনে করা যায় স্থানটী সমচতুষ্কোণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়; তবে সমচতুরস্র না হইয়া যদি চতুষ্কোণ মাত্র হয়, তাহাও বাসযোগ্য—দ্বীপাকার মণ্ডল ভাগ— অর্থাৎ দ্বীপ যেমন মধ্যোচ্চ ও ক্রমাবনত, পার্শ্বে গোলাকার, স্থানটীও তাদৃশ হইবে। জলনির্গমের সুবিধা সম্পাদনই বোধ হয় সর্ব্ব স্থানের উন্নতি সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য। স্বাভাবিক খাত নদী সরোবরাদির তীরবর্ত্তী স্থান মণ্ডলাকার বা চতুষ্কোণ না হইলেও ক্ষতি নাই। সেস্থানে ত্রিকোণ, পার্শ্বকোণ, বহুকোণ স্থানও বাস্তু নির্ম্মাণার্থে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে। তাৎপর্য্য— জলাশয়-তীরস্থ স্থানের আকৃতিগত সুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিতে হইবে না।

বাসভবনের জন্য উপযুক্ত স্থানের বিষয় বিবেচনা করিয়া সম্প্রতি গোভিলাচার্য্য বাসস্থানের স্বাস্থ্যসংরক্ষণোপযোগিতার প্রধান এবং প্রথম উপায় বিবৃত করিতেছেন।

"অনুদ্বার"—বাসগৃহ অনুদ্বার হইবে; অর্থাৎ এক পার্শ্বে যেস্থানে দ্বার থাকিবে, অপর পার্শ্বে তাহার সমসূত্রপাতেও দ্বার রক্ষা করিতে হইবে। দ্বার শব্দে এখানে দ্বার ও বাতায়ন, উভয়ই লক্ষিত। দ্বারের প্রয়োজন শুধু মানুষ যাতায়াতের জন্যই নহে। গৃহে বায়ুপ্রবাহ ও রৌদ্রসম্পাত স্বাস্থ্যরক্ষায় সর্ব্বপ্রধান সহায়; দ্বারপথ (দুয়ার জানালা) সেই জন্যই বহুল পরিমাণে নির্ম্মিত হয়। "বাতায়ন" অর্থই—বায়ুর আগম-নির্গমের পথ। ঐ দ্বারগুলি সমসূত্রপাতে রচিত হওয়ায়, একদিক্ হইতে বায়ু প্রবেশ করিয়া অন্য পথে প্রবাহিত হইতে পারে, ইহাতে গৃহস্থ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি দূষিত বায়ু শোধিত হয়; গৃহে রৌদ্রের পতন সম্বন্ধেও সুবিধা হয়। উভয়পার্শ্ব হইতেই সময়বিশেষে গৃহাভ্যন্তরে রবি-রশ্মিপাত হইতে পারে। এই গোভিল-প্রদত্ত অমূল্য উপদেশ প্রতিপালনে বহুদিন দেশ বিরত ছিল। পরবর্ত্তী শিল্পিকুলের অনভিজ্ঞতা ও গৃহস্থের অস্বাভাবিক আশঙ্কাদির ফলে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের গৃহগুলি প্রায়ই বাতায়নদরিদ্র, কচিৎ দ্বারাদির অসমসূত্রভাবে স্থাপিত। মহর্ষির অমূল্য আদেশে অমনোযোগিতায় অনেক প্রাচীন প্রাসাদ অন্ধকূপাকারে বিরাজিত ও অন্ধকারপ্রিয় চর্ম্মচটিকার কেলিস্থলী হইয়া রহিয়াছে।

মহর্ষি কোন্ প্রকার গৃহ উৎকৃষ্ট বলিতেছেন ?—

"তত্রাবসানং প্রাগ্দ্বারং যশস্কামঃ বলকামঃ কুর্ব্বীত উদগ্দ্বারং পুত্র-পশুকামঃ দক্ষিণদ্বারং সর্ব্বকামঃ ন প্রত্যগ্দ্বারং কুর্ব্বীত।" ১২

যিনি যশ-কামনা ধরেন, তিনি পূর্ব্বদ্বার গৃহ রচনা করিবেন। পুত্র ও পশুকাম ব্যক্তি উত্তরদ্বার গৃহ প্রস্তুত করিবেন। সর্ব্বকাম ব্যক্তি দক্ষিণদ্বার আবাস নির্ম্মাণ করিবেন। কখনও পশ্চিমদ্বার গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না। এই সকল বিধানে গূঢ় রহস্য আছে; অধুনাতন বিকৃতবুদ্ধি মানব তাহা সম্যক্রূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম নয়। সাধারণ বুদ্ধিতে ধারণা হয়, যে গৃহ পূর্ব্বদ্বার, সে গৃহে বাস করিলে যশ ও বললাভের সম্ভাবনা আছে। যশ ও বল স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। পীড়ার প্রবাহে যাহার জীবন যাতনাময়, তাহার বললাভ বা যশোভাগ্য কোথায়? পূর্ব্বদ্বার গৃহে প্রভাতে ও অপরাহ্নে উভয়পার্শ্বেই রৌদ্রপাতের সম্ভাবনা থাকায়, গৃহস্থল শুষ্ক হইয়া থাকে; তাহা আরোগ্য আনয়ন করে; সেরূপ স্থানে অসুখের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত অল্প; স্বাস্থ্য,বল ও যশ-অর্জ্জন-সম্ভাবনাই অধিক।

উত্তরদ্বার গৃহে পুত্র-পশু লাভের সম্ভাবনা কিরূপ, তাহা বুঝা যায় না; তবে একজন মহাত্মার নিকট শুনিয়াছিলাম যে, উত্তরদ্বার গৃহে উত্তর ও দক্ষিণের বায়ুপ্রবাহ নিরাবাধ হয়। উত্তর দিগাগত শীতবায়ু পশু-প্রকৃতির অনুকূল, আর দক্ষিণাগত মলয়বায়ু মানবের জননশক্তির সংবর্দ্ধক; সুতরাং উত্তর-দ্বার গৃহ পুত্র-পশু-কামনা-সাফল্যের সাধন।

দক্ষিণদ্বার গৃহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অস্মদ্দেশে জ্যেষ্ঠ পুত্র দক্ষিণদ্বার গৃহ অর্থাৎ 'উত্তরের পোঁতা' পায়। ইহা উৎকর্ষের প্রমাণ। উত্তরদ্বার গৃহে উত্তর বায়ুর প্রাবল্য ও দক্ষিণবায়ুর অপেক্ষাকৃত অল্প প্রবাহ থাকায়, উহাতে মানব শক্তির খেদ উপস্থিত হয়; উত্তরবায়ু মানব-প্রকৃতির স্ফূর্ত্তিসাধনে সক্ষম নয়, পরন্তু জড়তা আনয়ন করে। দক্ষিণবায়ুর প্রাবল্য ও উত্তরবায়ুর অল্পতায় দক্ষিণদ্বার গৃহ মানব-শক্তির সর্ব্ববিধ ভাবের স্ফূর্ত্তির পক্ষে সহায়তা করে, এই অভিপ্রায়ে বলা যাইতে পারে—দক্ষিণদ্বার গৃহ সর্ব্বকামনার সংসাধক।

পশ্চিমদ্বার গৃহে বাসের সুবিধা হয় না। পূর্ব্বাহ্নে সূর্য্য গৃহের পশ্চাদ্ভাগ প্রতপ্ত করেন, তখন পশ্চিমদ্বার-গৃহের অঙ্গনে সূর্য্যরশ্মিপাতের সুবিধা হয়না, তাহাতে রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে; অপরাহ্নের পতনোন্মুখরৌদ্র প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া মানবদেহস্পর্শ করিয়া পিত্তবৃদ্ধির সহায়তা করে। কার্য্যানুরোধে পুনঃ পুনঃ অঙ্গনে বিচরণ করায়, অপরাহ্ন-সূর্য্যকর সম্ভোগ দ্বারা জ্বরগ্রস্ত হইবার আশঙ্কাদি প্রাপ্ত হয়। এজন্যই পশ্চিমদ্বার-গৃহ নিষিদ্ধ। এ নিষেধের রহস্য এত সূক্ষ্ম যে, সাধারণ বুদ্ধির অগোচর, এজন্য আমরা ইহার যৌক্তিক-ব্যাখ্যা দিতে পারি না বা প্রকৃত-ব্যাখ্যারও (যাহা লিপিবদ্ধ করা হইল) মূল্যবত্তা সর্ব্বদা বুঝিতে পারি না। আমাদের স্বল্পদর্শী নয়ন যেখানে যায় না, ঋষিদিগের

সর্ব্বদর্শী চক্ষুঃ সেস্থানে অনায়াসে গমন করিত। তজ্জন্যই অলৌকিকদ্রষ্টা ঋষির সিদ্ধান্ত লৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন আমরা বুঝিতে সক্ষম হই না। যা কিঞ্চিৎ বুঝি, তদপেক্ষাও হয়ত কত গুরুতর—সূক্ষ্মতর তথ্য অনাবিষ্কৃত রহিয়া যায়।

অতঃপর মহর্ষি গৃহ-পার্শ্বেস্থানে স্থাপনের অযোগ্য বৃক্ষগুলির উল্লেখ করিতেছেন, যথা—

"বর্জ্জয়েৎ পূর্ব্বতোহশ্বত্থং প্লক্ষং দক্ষিণতস্তথা। ন্যগ্রোধমপরাদ্ দেশাৎ উত্তরাচ্চাপ্যুডুম্বরং। অশ্বত্থাদগ্নিভয়ং বিদ্যাৎ প্লক্ষাৎ ব্রূয়াৎ প্রমায়ুকাম্। ন্যগ্রোধাচ্ছস্ত্রসম্পীড়াম্ অক্ষ্যাময়ম্ উডুম্বরাৎ। আদিত্যদৈবতোহশ্বত্থঃ প্লক্ষোহি যমদৈবতঃ। ন্যগ্রোধো বারুণো বৃক্ষঃ প্রাজাপত্য উডুম্বরঃ।"

অর্থাৎ বাসবাটীর পূর্ব্বপ্রান্তে অশ্বত্থ বৃক্ষ রাখিবেনা, কারণ পূর্ব্বদিকস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষ গৃহস্থের অগ্নিভয় উৎপাদন করে। বাটীর দক্ষিণদেশে প্লক্ষ (পাঁকুড়—বট) বৃক্ষ থাকিলে, তাহাতে গৃহস্থজনগণেরআয়ুক্ষয় সম্ভাবনা আছে; অতএব দক্ষিণে প্লক্ষ রাখিবেনা। পশ্চিমদিকে ন্যগ্রোধ (নাকুড়) বৃক্ষ থাকিলে, গৃহবাসিগণের শস্ত্রপীড়ার আশঙ্কা থাকে, সুতরাং পশ্চিমে ন্যগ্রোধ বৃক্ষকে স্থান দিবেনা। উত্তরদিকে উডুম্বর (যজ্ঞ ডুমুর) বৃক্ষ থাকায়, বাটীস্থ ব্যক্তি সকলের চক্ষুঃপীড়া-ভয় হয়; অতএব উত্তরদিগ্ভাগে উডুম্বর বৃক্ষ থাকিলে, বিনষ্ট করিবে। অশ্বত্থ বৃক্ষের দেবতা আদিত্য; সূর্য্য তেজোময়, এইজন্য অশ্বত্থ বৃক্ষ তেজঃস্বরূপ অগ্নির আশঙ্কা জ্ঞাপন করে। প্লক্ষের দেবতা যম, যম মরণের অধিপতি, এই নিমিত্ত প্লক্ষ আয়ুক্ষয় করে। ন্যগ্রোধ তরুর দেবতা বরুণ; পূর্ব্বকালে বরুণদৈবত ন্যগ্রোধবৃক্ষ হইতে "বারুণ শস্ত্র" নির্ম্মিত হইত; সুতরাং ন্যগ্রোধ শস্ত্রভয় উৎপাদন করে। উডুম্বর বৃক্ষের দেবতা প্রজাপতি; উডুম্বর-নির্যাস চক্ষুস্পৃষ্ট হইলে চক্ষু নষ্ট হয়, এই হেতুক বলা হইতেছে—উডুম্বর বৃক্ষ চক্ষুরোগ উৎপাদন করিতে পারে। এই সকল বিশালকায় বৃক্ষ বাসভবনের অস্বাস্থ্যউৎপাদক; ইহারা সমীপদেশে থাকিলে, সাধারণতঃ গৃহস্থের অসুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। তবে অনিষিদ্ধ দিকে থাকিলে, বিশেষ দোষাবহ হয় না। অতঃপর মহর্ষি 'বাস্তুযাগ' প্রকরণ বলিয়াছেন, যে নানাকাণ্ডসঙ্কুল। পূজাজপ-যজ্ঞাদি ব্যাপার এস্থলে অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

তীর্থপদাশ্রিতঃ—
শ্রীঃ———
(যশোহর।)

কে বলে কালো!

হরি! কে বলে তোমায় কালো!
(তুমি) মদনমোহন, বনফুল-সাজে
সাজিয়া রয়েছ ভাল।
আমি দেখিতেছি রূপের প্রভায়
ত্রিলোক করেছ আলো!

কেন বা 'কালো' নাম তোমার!
এ যে শারদানীরদ নীলাকাশ-তলে
রাঙ্গামুখ প্রভাধার—
(ধীবে) যায় ধীরে ধীরে ডুবে সিন্ধুনীরে
রক্তাভায় নীলাম্বর
(ক'রে) রক্তিম উজ্জ্বল; অথবা শরতে
পূর্ণিমাতে সুধাকর
উজলে অম্বর, সেই নীলোজ্জ্বল
তব রূপ মনোহর!
(এ যে) নীলমণিময় নব-জলধর—
তরুণ অরুণ করে
যথা হাসে মৃদু, হরি! তব রূপে
তেমনি অমিয় ঝরে!
(যেন) প্রভাত-মৃদুল সমীরণ ভরে
বালার্ক-কিরণে মরি!
নীল উতপল যথা ভাসে জলে
সরসী উজল করি!
(সেই) সপ্ত স্বর্গধাম ধরা-পাতালের
সৌন্দর্য্য চরণতলে
রয়েছে তোমার, দেখিতেছি তব
অপার করুণা বলে!
(সেই) চরণে রাজিছে সুবর্ণ-নূপুর,
বাজিছে মধুর অতি!
যেন নীলাম্বুজে মধু পিয়ে গুঞ্জে
স্বর্ণ-পক্ষ প্রজাপতি!
(হরি!) কিবা পীতবাস রহিয়াছ পরি;
মৃদুল সমীর বশে
দুলিতেছে মৃদু, যেন নবঘনে
স্থির সৌদামিনী হাসে!
(আহা!) কিবা মনোহর স্নেহ-দয়া মাখা
মহিমা-প্রেম-মণ্ডিত—
হরি! তব বক্ষ, ভৃগুপদ-চিহ্ন-
কৌস্তভ-মণিশোভিত!

(মরি!) রক্তশতদল-, সুকোমল করে
ধরেছ মোহন বাঁশী!
(যেন) 'আয়' ব'লে বাঁশী ডাকে ভক্তজনে,
ছড়ায়ে প্রেমের রাশি!
(কিবা) রতন-বলয় রহিয়াছে পরা
তব ও কমল-করে;
নীল-মণি-তনু রত্ন-অলঙ্কারে
কি ছটা বিকাশ করে!
(তব) অতুল বদন কিবা সুপ্রসন্ন!
কি বাঁকা নয়ন দুটী!
কি বঙ্কিম ভুরু! কি ঈষৎ হাসি—
অধরে রয়েছে ফুটি!
(কিবা) জ্ঞান-সত্য-ধর্ম্ম তোমার হাসিতে—
কত প্রীতি-প্রেম ঝরে;
নীলাব্জ-নিন্দিত যুগল কপোলে
মাধুরী উছলি পড়ে!
(মরি!) অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রশস্ত ললাটে
প্রতিভা ভাসিছে ধীরে;
রতন-কুণ্ডল শোভিছে শ্রবণে,
চাঁচর কুন্তল শিরে!
(আহা!) শোভিছে কেমন শিখিপুচ্ছ-চূড়া,
মুক্তাহার কৃষ্ণকেশে,
ধীরে শিখিচূড়া কাঁপিছে কেমন
মৃদুল মন্দ বাতাসে!
(হরি!) বলিব কেমনে তব রূপ-কথা?
হৃদয় জুড়ায়ে যায়!
হেরিলে তোমারে, সাধ হয় মনে—
প'ড়ে থাকি রাঙ্গাপায়!
(তুমি) ত্রিলোক-সুন্দর, তবু কেন লোকে
বলে হে তোমারে কালো!
না পারি বুঝিতে, কিন্তু তুমি মোর
হৃদয়-জগত-আলো!

সাধুগীতা

(১)

অনিত্যে নিত্য কল্পনা,
এই ঘোর বিড়ম্বনা,
জগৎ ঢাকিয়া আছে ;—
বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান-যুত,
মহিমা-যশঃ-মণ্ডিত,
যাঁরে যেথা দেখা পাই,
শুধাই তাঁহার কাছে।—

(২)

বিশ্ব কি অনিত্য ধাম ?
ধ্বংস যদি পরিণাম,
তবে কেন তার তরে,
এ মমতা এত আশা ?
আমিই আমার নয়,
হই সৃষ্ট, পাই লয় ;
এই রূপে অনিবার
বার বার যাওয়া-আসা ?

(৩)

কভু পুত্র, পুনঃ পিতা,
কোন্ জন্মে ছিনু কোথা ?
এসেছি গিয়েছি ভবে,
এই রূপে কত বার ;
কত মাতা, কত পিতা,
কত ভগ্নী, কত ভ্রাতা ;
কেঁদেছে, কেঁদেছি, সবে,
যাতনায় ত্যজিবার।

(৪)

কিছু কি স্মরণ হয়,
সে দিনের সে সময় ;
গেছে কত, আর কত,
আছে হতে প্রকটিত ;
প্রলয়ের অন্তরালে।
চপল সফরী-সাজে,
সংসার-সরসী-মাঝে,
পায় লয়, পড়ে ধরা
কালরূপী ধীবরের
মায়াময় সূক্ষ্ম জালে!

(৫)

এই রূপে ক্রমাগত
কল্পে কল্পে অবিরত
সংসার-চক্রের সহ
ঘুরি ফিরি অহরহ,
জীবন-মরণ লভি,
আপন করম-বশে!
এই ত নিত্যের খেলা,
অনিত্যের সনে মেলা,
ভাণ্ড হতে ভাণ্ডান্তরে
নিত্যানিত্যে কোলাকুলি—
মগ্ন সদা স্বপ্নাবেশে!

(৬)

এই মিলে, এই মিলে,
উভয়ে মিলন আশে ;
অনন্য-মিথুন-ভাবে,
কাটে কাল মহোল্লাসে ;
অবশেষে যে যাহার
স্বরূপে মিশিয়া যায় ;
আপন ধরম-গুণে,
আপন চিনিয়া লয় ;
হাহাকার পরিশেষে!

(৭)

হে নিত্য-প্রকাশ প্রভু
অনিত্যের নিত্যসার!
নিত্যানিত্য সংসারের,
লীলাময় মূলাধার!
কৃপা করি নিজ গুণে,
নিত্য সেই মধুপুরে ;
টেনে লও অভাগারে,
এ কাল-কালিন্দীপারে॥

শ্রীঅটলবিহারী দাস।

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৫শ বর্ষ, ১৫শ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ। ১৩১৫ সাল, ১৮৩০ শকাব্দা।

ষড়্‌গুণ।

"ষড়্‌গুণ" ভারতীয় রাজশক্তি স্বরূপ বিশাল দেহের শোণিত-সঞ্চালন-ক্রিয়া। রক্তসঞ্চালন-প্রক্রিয়া শরীরের সংরক্ষণার্থেই প্রয়োজনমত ক্ষীণের পরিবর্দ্ধন, বিনষ্টের পরিবর্জ্জন, অপেক্ষিতের সমাহরণ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া প্রকৃতির অনুকূলতা করে; তদ্রূপ ষড়্‌গুণ-সাধনা উপচয়, অপচয়, সমীকরণ, ইত্যাদি বিসদৃশ ভাবের অধিকারভূমি অতিক্রম করিয়া রাজশক্তির সংরক্ষণ-উদ্দেশেই প্রকৃতির অনুকূলে উপস্থিত হয়। শোণিত-সঞ্চালনের বৈলক্ষণ্য ঘটিলে যেমন জীবনীশক্তি দুর্ব্বলতা অনুভব করে, ষড়্‌গুণ-সাধনের ব্যতিক্রমেও সেইরূপ রাজশক্তির মূলদেশ শিথিলতার আক্রমণে কাতর হয়। শোণিত-সঞ্চালন যেরূপ প্রাণের সম্বাদ বহন করে, ষড়্‌গুণানুষ্ঠান তদ্রূপ রাজশক্তির জীবনের তথ্য প্রচার করিতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ষড়্‌গুণের পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

অপ্রতিহত বুদ্ধি মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

> সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
> দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ং চ ষড়্‌গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা।"

অর্থাৎ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব, সংশ্রয়, এই ষড়্‌গুণ চিন্তা করিবে। রাজশক্তির মূলরক্ষাই ষড়্‌গুণ সাধনার উদ্দেশ্য। রাজশক্তির মূলদেশ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোশ ও দণ্ড, এই পঞ্চপ্রকৃতি। যে রাজশক্তি অমাত্যবলহীনা, তাহার বিশৃঙ্খলতা-নিরাস দেববালারও সাধ্য নহে।

অমাত্যবলসম্পন্না রাজশক্তি তরঙ্গাক্রান্ত হইয়াও, নিপুণ কর্ণধাররক্ষিত তরণীর মত আত্মরক্ষায় অসামর্থ্য অনুভব করে না। অমাত্যবল রাজশক্তির মস্তিষ্ক স্বরূপ। রাষ্ট্র (দেশ) হস্তচ্যুত হইলে, রণদক্ষ সুশিক্ষিত অগণ্য সৈন্য, রাজনীতিবিশারদ অমাত্যবর্গ ও রত্নরাজী রাজশক্তির স্বাস্থ্য আনয়নে সর্বদা সক্ষম হয় না। দুর্গহীন রাজশক্তি বর্ম্মশূন্য অনাবৃত দেহ যোদ্ধার ন্যায় শত্রুর তীক্ষ্ণ তরবারি হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসুবিধা অনুভব করে। কোষবলহীন রাজশক্তির প্রতি অমাত্যগণ, সৈন্যমণ্ডলী ও প্রকৃতিপুঞ্জ অনুরক্ত থাকে না। বরংচ বিরক্ত হয়; সে বিরক্তি তীব্রতা লাভ করিয়া শেষে নিঃসংশয়ে ও নিঃশঙ্কভাবে বিদ্রোহ-বিপ্লব আনয়ন করে। অর্থবলশূন্য গৃহপতি যেরূপে সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া অসহায় ভাবে বিনষ্ট হন, দেশপতির পক্ষেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। দণ্ডহীন রাজশক্তির শিথিল হস্ত হইতে দেশাধিকার অলক্ষ্যে স্খলিত হয়। দণ্ডব্যবহার ব্যতীত শক্তিশালী রাজারও অপযশ উপস্থিত হয়। যদি রাজা করুণাপরায়ণ হইয়া দণ্ডকে বিদায় প্রদান করেন, তবে দেশে সেই করুণা দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতা নামে প্রচারিত হইয়া, রাজশক্তির প্রতি প্রজাপুঞ্জের শ্রদ্ধা ও সমবেদনা বিনাশ করে। তাহাতে রাষ্ট্রমধ্যে বিপ্লব ও বিদ্রোহ আসিয়া আপনার অধিকার বিস্তৃত করে। সর্ব্বথা রাজশক্তির প্রকৃত ভিত্তি অমাত্য, দেশ, দুর্গ, অর্থ ও দণ্ডের উপর সংস্থাপিত। এই ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত—সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ষড়্‌গুণ সাধনার অত্যন্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি করা যায়।

প্রথমতঃ সন্ধি। সন্ধি অর্থ সম্মিলন। অভিজ্ঞ রাজনীতিবেত্তার উক্তি,

"উভয়ানুগ্রহার্থং হস্ত্যশ্বরথহিরণ্যাদি নিবন্ধনেনাবাভ্যাং।
অন্যোন্যস্য উপকর্ত্তব্যন্ ইতি নিয়মবন্ধঃ সন্ধিঃ।"

উভয় শক্তির পারস্পরিক উপকারার্থ "সৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ ও অর্থাদি প্রয়োজনীয়সামগ্রীর দ্বারা উভয়ে প্রয়োজনানুসারে উভয়ের উপকার করিব," এইরূপ নিয়ম বন্ধন (চুক্তি) করার নাম সন্ধি। সন্ধিপত্রে অর্থাৎ পরস্পরের অঙ্গীকারলিপিতে যে যে বিষয়ে যে যে সময়ে যে যে প্রকারে সহায়তা করিবার কথা বিবৃত থাকে, তদ্রূপে উপকার করা বা প্রাপ্ত হওয়া সন্ধির প্রথা। সন্ধির প্রথা বহির্ভূত ভাবে যদি কেহ কোনও উপকার করেন, তবে সেস্থানে সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করায় পূর্ব্বকৃত সন্ধির অধিকার বিনষ্ট হয়। "উভয়ানুগ্রহার্থং" এই বাক্যটী ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝা যায়, যে দুই রাজশক্তি স্বতন্ত্র অর্থাৎ যাহারা অন্যের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত "সামন্ত" নৃপতি নহে, তাহারাই সন্ধিকার্য্যে অধিকারী। সামন্ত নৃপতিগণ স্বপ্রভুর (সম্রাটের) অনভিমতে অন্য রাজশক্তির সহিত সন্ধি-বন্ধন করিতে অক্ষম। কারণ যে অন্যের আয়ত্তাধীন, তৎকৃত উপকার "অনুগ্রহ" নামে অভিহিত হইতে পারে না। যদি কোনও সামন্ত নৃপতি

সম্রাট্‌কে উপেক্ষা করিয়া অপর স্বতন্ত্র শক্তির সহিত সন্ধি বন্ধন করেন, তখন সেই সন্ধি সম্রাটের নিকট বিগ্রহচেষ্টা নামে আখ্যাত হইবে; সেস্থানে সম্রাট্‌ অপর স্বতন্ত্র শক্তিকে ঐ সন্ধির প্রত্যাহার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন; অসম্মতিতে বিগ্রহের উৎপত্তি হইবে।

সন্ধি দ্বিবিধ। মহামুনি বলিতেছেন—

'সমানযানকর্ম্মা চ বিপরীতস্তথৈব চ।
তদাত্বায়তিসংযুক্তঃ সন্ধিজ্ঞেয়ো দ্বিলক্ষণঃ।'

অর্থাৎ সমানযানকর্ম্মা ও অসমানযান-কর্ম্মা, এই দুই প্রকার সন্ধি। সমানযান-কর্ম্মা সন্ধি যেখানে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করা হয় ও কৃতকার্য্যের ফলভোগে উভয়েরই সমান অধিকার হয়। যেখানে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করা হয় না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত-কার্য্যের অসমান ফল এক এক জন লাভ করেন, সেস্থলে অসমানযানকর্ম্মা সন্ধি হয়। "সমানযানকর্ম্মার" বিবরণে প্রাচীন আচার্য্য মেধাতিথি-ভট্ট বলিয়াছেন—

"সমানযানকর্ম্মা যানফলং সহিতৌ তুল্যৌ গচ্ছাবঃ;
সমানফলভাগিতয়া ন চ ত্বয়াহম্‌ উল্লঙ্ঘনীয়ো য়ৎ ততোলপ্স্যতে তৎ তব মম চ ভবিষ্যতি।"

অসমান যানকর্ম্মার ব্যাখ্যায় মহাত্মা কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন—

"যঃ পুনঃ ত্বমত্র যাহি অহমন্যত্র যাস্যামীতি সাম্প্রতিকোত্তরকালীন ফলার্থিতয়া এব ক্রিয়তে সোহসমানযানকর্ম্মা।"

বিগ্রহ অর্থ বিরোধ—বিসম্বাদ। যে স্থলে দুই বা বহু শক্তির মধ্যে স্বার্থঘটিত ভিন্নমতভা উপস্থিত হওয়ায়, পরস্পরের যে কেহ বা যে কোন দুই শক্তি অঙ্গীকার অতিক্রম করেন, অথবা যে কেহ অপরের সঙ্গত অধিকার চালনে আপত্তি বা বাধা প্রদান করেন, কিম্বা যে কেহ অপরের আপৎ সময়ে উদাসীন থাকেন ও তাঁহার শত্রুবর্গের প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যরূপে উপকার করেন, তাহাতে পরস্পরের মধ্যে বলক্ষ-পরীক্ষা আরম্ভ হয়, তাহাই বিগ্রহ। বিগ্রহ যে কেবল তদুভয়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, তাহা নয়; অন্যতরের মিত্রপক্ষ কিম্বা উভয়ের মিত্রবল এই বিগ্রহের অধিকার-ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

বিগ্রহ দুই প্রকার। মহর্ষি মনুর উক্তি—

"স্বয়ং কৃতশ্চ কার্য্যার্থমকালে কাল এব বা।
মিত্রস্য চৈবাপকৃতে দ্বিবিধো বিগ্রহঃ স্মৃতঃ।"

স্বকৃত বিগ্রহ এবং মিত্রকৃত বিগ্রহ। শত্রুর বলপীড়া, শস্যহানি জনক্ষয়, বৈরোৎ-পাত, মিত্রদ্রোহ, প্রজাদ্রোহ, দেশবিপ্লবাদি অবস্থার অনুসন্ধান করিয়া শস্যোৎপত্তি সময়ে (অগ্রহায়ণ মাসাদিতে) কিম্বা সুযোগ-আদিকে অনুসরণ করিয়া শত্রুর সহিত যে বিগ্রহের অবতারণা হয়, তাহা স্বকৃত বিগ্রহ। স্বকৃত প্রবলপরাক্রান্ত বিজিগীষু

নরপতি মিত্ররাজের অপকার সাধনে উদ্যত হইলে, মিত্ররক্ষার্থে জিগীষু রাজার সহিত যে বিগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহা মিত্রকৃত বিগ্রহ। সন্ধিসূত্রে সৈন্য সম্পত্তি প্রভৃতি দ্বারা মিত্রের উপকার সাধন ও মিত্ররাজের শত্রুর সহিত স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ্য বিগ্রহ স্বতন্ত্র পদার্থ; এস্থানে সন্ধিতে বিগ্রহ-বিভ্রম না হয়, ইহা প্রত্যেকের চিন্তনীয়।

যান—অর্থাৎ শত্রুর প্রতি গমন। শত্রুর প্রতি গমনমাত্রেই বিগ্রহ-সন্ধি হয় না। যাত্রার ফল সন্ধি, বিগ্রহ, সংশ্রয়, পলায়নাদি বহুবিধ; ফলের নিশ্চয়তাও থাকিতে পারে না। ব্যর্থ যাত্রার দৃষ্টান্তও সংসারে সুবিরল নয়। সামান্য কার্য্য-সিদ্ধির জন্যও বহুস্থানে 'যান' অনুষ্ঠিত হয়। 'প্রস্তাব' কিম্বা সমালোচনার জন্য 'যানে'র অসদ্ভাব নাই। যানও দ্বিবিধ। অসহায় যান ও সসহায় যান। মনুর ব্যবহারশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে,—

"একাকিনশ্চাত্যয়িকে কার্য্যে
প্রাপ্তে যদৃচ্ছয়া।
সংহতস্য চ মিত্রেণ দ্বিবিধং যান-
মুচ্যতে।"

শত্রু রাজের অল্প কালের ব্যসনাদি অবগত হইয়া, স্বেচ্ছানুসারে শক্তিশালী নরপতি অন্য সহায়ের অপেক্ষা না করিয়া শত্রু-রাজ্যের উদ্দেশে যে যাত্রা করেন, তাহার নাম অসহায় যান। মিত্র সংগ্রহ না করিবার কারণ এস্থানে দুইটী। প্রথম কারণ নিজের সামর্থ্যাধিক্য। দ্বিতীয় কারণ এই যে, মিত্র সংগ্রহের অপেক্ষা করিলে শত্রু-রাজের স্বল্প কালের ব্যসন অপসৃত হইতে পারে, তৎসময়ে যাত্রার সাফল্য সম্ভাবনা অত্যল্পমাত্র। স্বয়ং সমধিক শক্তিশালী না হইলেও, মিত্রবলে বলীয়ান্ নরপতি পূর্ব্বকৃত অপকারের প্রতিশোধ প্রদানার্থে মিত্রবল সঙ্গে লইয়া শত্রুরাজ্যে যে যাত্রা করেন, তাহার নাম সসহায় যান।

আসন—অর্থ উদাসীনভাবে অবস্থিতি। যে সময় রাজা, বর্ত্তমানের অভাব-অসামর্থ্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া, সময়ের শুভ-সংযোগের ধ্যানে অনন্যমনে কালাতিপাত করেন, তখন তাঁহার সেই নীরবতা আসন বলিয়া বিবেচিত হয়। আসন কেবল নিশ্চেষ্টতা মাত্র নহে। কার্য্যের বহির্বিকাশ অল্প হইলেও, সংগ্রহের শক্তি-সঞ্চারের যে নীরব সাধনা, তাহারই নাম আসন। আসন ব্যতীত কোনও রাজশক্তি পরিপুষ্টিলাভ করেনা। নিত্য বিগ্রহ, সর্ব্বদা যান, সদাতন সংশ্রয়, পুনঃ পুনঃ দ্বৈধীভাব ও নানা সন্ধিতে রাজশক্তির বলক্ষয় ব্যতীত বলসঞ্চয়ের অবসর কোথায়? 'আসন' আত্মদৃষ্টি দান করে, তৎফলে স্বশরীরস্থ ক্ষতসংপূরণ কার্য্যে অবহিত হওয়া যায়।

আসনও দ্বিপ্রকার। মানবশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়—

"ক্ষীণস্য চৈব ক্রমশঃ—দৈবাৎ
পূর্ব্বকৃতেন বা।
মিত্রস্য চানুরোধেন দ্বিবিধংস্মৃত-
মাসনং।"

আত্মজন্য ও মিত্রজন্য আসন সম্ভব। পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত বহুব্যয়ায়াসসাধ্য যজ্ঞ ও

যুদ্ধ প্রভৃতি দ্বারা কোশ ও বলের ক্ষীণতা উপস্থিত হইলে কিম্বা দৈবোৎপাত—অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, মারীভয়াদি দ্বারা স্বদেশ উপপ্লুত হইলে, কোশ ও সৈন্যের সবলতা সত্বেও যে আত্মসম্বরণ—অর্থাৎ পর দ্বারা অনিষ্টের সম্ভাবনা অবগত হইয়াও তৎকালে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া নীরবে স্বদেশের বা স্বীয় কোশ-সৈন্যাদির দৃঢ়তা সম্পাদনের চেষ্টা বা চিন্তা করা আত্ম জন্য আসন। মিত্রজন্য আসন—সাধারণতঃ মিত্ররাজের অনুরোধে তন্মঙ্গলার্থে বলশালী রাজার আত্মসম্বরণ। শত্রুনিগ্রহে সামর্থ্য থাকিলেও মিত্ররাজের অনিষ্টাশঙ্কায় আত্মসম্বরণ প্রয়োজন। মিত্র জন্য আসন—সন্ধির নিয়মেও হইতে পারে। কোনও প্রবল শক্তির সহিত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজার নিয়ম বন্ধনে এরূপ একটী অঙ্গীকার থাকিলে, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজার মিত্ররাজের সহিত প্রবল রাজার বিগ্রহ সংঘটিত হইলে, প্রবলরাজা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবেন। সেরূপস্থলে দুর্ব্বল মিত্রের রক্ষার্থে মিত্রের অনুরোধে আত্মসম্বরণ করা অত্যন্ত আবশ্যক হয়। একদিকে আত্মরক্ষণ, অন্যদিকে মিত্ররক্ষা।

দ্বৈধীভাব—দ্বিধাকরণ; তাৎপর্য্যতঃ নিজ সৈন্যবল দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্থাপনের নাম দ্বৈধীভাব। শত্রুরাজার আক্রমণ-প্রতীকারার্থে সীমান্তপ্রদেশে সৈন্যনায়কের কর্ত্তৃত্বাধীনে যুদ্ধোপকরণসমন্বিত নিয়ত-পরিমাণ বলের অবস্থিতি, অপরদিকে কেন্দ্র-দুর্গে বহুসৈন্যসমাবৃত সেনাপতি বলাধ্যক্ষাদি সমাযুক্ত, রণধীর রাজার অবস্থিতি দ্বৈধীভাব। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণের ভ্রান্তি উৎপাদনার্থে প্রকাশ্যতঃ অল্পসৈন্য রক্ষা করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বহু সৈন্যের সমাবেশসাধনও দ্বৈধীভাব। দ্বৈধীভাব বিষয়ে রাজনীতি পরিচ্ছেদে মনু মহারাজের উক্তি উদ্ধৃত করা এ স্থানে নিতান্ত প্রয়োজন মনে করি।

'বলস্য স্বামিনশ্চৈবস্থিতি কার্য্যার্থ সিদ্ধয়ে।
দ্বিবিধং কীর্ত্ত্যতে দ্বৈধং ষড়্গুণ্য-গুণবেদিভিঃ।'

কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সেনাবল ও বলস্বামীর পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান দ্বৈধ বা দ্বৈধীভাব। ষড়্গুণজ্ঞ তত্ত্ববিদ্‌বর্গ এই দ্বৈধ দ্বিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই দ্বি প্রকার দ্বৈধ বিষয়ে মহর্ষি পরিস্ফুটরূপে বিশেষ কিছুই প্রকাশ করেন নাই, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব তথ্যের প্রকারভেদ-বিবরণ পাঠ করিয়া পণ্ডিতপ্রবর মহামান্য মৈত্রী তিথি লিখিয়াছেন—

"পরানুগ্রহার্থমেতৎ কর্ত্তব্যং স্বকার্য্যার্থঞ্চ ইত্যেবং দ্বৈধীভাবস্য দ্বিধাভাবঃ।"

অর্থাৎ দ্বৈধীকরণ এক প্রকার আত্ম মঙ্গলার্থ অনুষ্ঠিত হয় ও অপর প্রকার পর-মঙ্গলার্থ—অর্থাৎ মিত্র নৃপতির হিতার্থে আচরিত হয়।

সংশ্রয়—অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ। যখন বিপন্ন ক্ষীণবিত্ত নরপতি পররাজের প্রবলতর আক্রমণপ্রযত্ন ব্যর্থ করিবার জন্য অনন্যোপায় হইয়া পড়েন, তখন প্রবলতর মহীপতির

বিজিতা-ছায়ায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন; তখন সেই সমাশ্রয় লাভই সংশ্রয় বলিয়া কথিত হয়। সংশ্রয়ের ন্যায় বিপন্ন অবস্থা রাজশক্তির পক্ষে আর নাই, সংশ্রয় শত দোষের আকর। বিশ্বাস-ঘাতক চক্রচূড়ামণি রাজার আশ্রয়ে আত্ম সমর্পণ করিলে, পক্ষান্তরে আত্মবিনাশেরই পন্থা পরিষ্কৃত হয়। সংশ্রয়ণের পূর্ব্বে সমাশ্রয়ণীয় নরপতির বংশগৌরব, শিক্ষাদীক্ষা, সংসর্গ শক্তি, আচার-অনুষ্ঠান, জনপ্রিয়তা, আস্তিকতা প্রভৃতি রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে নিঃসন্দেহরূপে অবগত হইয়া, পরে সংশ্রয়ে মনোনিবেশ করিতে হইবে। সংশ্রয়ে পৌরুষ ভাব উদ্দীপিত হওয়া প্রয়োজন; কাপুরুষতার প্রচার প্রার্থনীয় নয়। যোগ্য পাত্রে আত্ম-সমর্পণ করিবে, সর্ব্বত্র শক্তিলাভের বার্ত্তা প্রচারিত হয়।

সংশ্রয় দুই প্রকার। যথা—

"অর্থসম্পাদনার্থঞ্চ পীড্যমানস্য শত্রুভিঃ।
সাধুষু ব্যপদেশার্থং দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ।"

শত্রু নৃপতির নির্দ্দয় আক্রমণে পুনঃ পুনঃ পীড্যমান ক্ষীণবল রাজা শত্রুর কর হইতে আত্মরক্ষণে অক্ষম হইয়া, মহাবল রাজার আশ্রয় গ্রহণ করে, এই এক প্রকার সংশ্রয়। আর ভবিষ্য বিপদের আক্রমণের আশঙ্কায় (তৎকালে নিরাপদে অবস্থিত) নরপতি নিজের সহায়-সম্পত্তির সংবাদ প্রচার ব্যপদেশে যে পরাশ্রয় গ্রহণ করেন, ইহা ২য় প্রকার সংশ্রয়। ইহাতে সভ্যেরা মনে করেন "ঐ নৃপতি মহাবল মহীপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান।" শত্রুবৃন্দ মনে করে "মহাতেজা নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করায় এই রাজা আমাদের অপেক্ষা অধিক বলশালী হইয়াছে। অতএব ইহার সহিত বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হওয়া মূঢ়তা।" সংশ্রয় বিপন্নের আশ্রয়। এই ষড় গুণ সাধনায় অকৃতকার্য্য হওয়ায়, দেশের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রতাপকাটী।

।সূক্তম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

ওঁ আপঃ সৃজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে।
নি চ দেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে ॥ ১২

পদপাঠঃ। আপঃ। সৃজন্তু। স্নিগ্ধানি। চিক্লীত। বস। মে। গৃহে। নি। চ। দেবীং। শ্রিয়ং। বাসয়। মে। কুলে।

অন্বয়ঃ—আপঃ স্নিগ্ধানি (স্নেহযুক্তানি কার্য্যাণি) সৃজন্তু হে চিক্লীত মে (মম) গৃহে নিবস চ। অপিচ শ্রিয়ং দেবীং মাতরং মে কুলে বাসয়।

পদ ব্যাখ্যা। আপঃ—শরভিমানিন্যো দেবতাঃ। সৃজন্তু—উৎপাদয়ন্তু। স্নিগ্ধানি—স্নেহসংযুক্তানি কার্য্যাণি। চিক্লীত—চিক্লীতাখ্য শ্রীপুত্র। মে—মম। গৃহে—গেহে।

নিবস চ—বাসং কুরু। (অপিচ) দেবীং—দ্যোতনশীলাং। মাতরম্ জননীং। শ্রিয়ং—লক্ষ্মীং। মে—মম। কুলে—অন্বয়ে। নিবাসয়—সংস্থাপয়।

বঙ্গার্থঃ। জলাভিমানিনী দেবতা স্নেহযুক্ত কার্য্য উৎপাদন করুন। হে লক্ষ্মী-তনয় চিক্লীত! তুমি আমার গৃহে অবস্থিতি কর, এবং তোমার জননী ঐশ্বর্য্যদেবতা শ্রীশক্তিকে আমার কুলে প্রতিষ্ঠিত কর।

আলোচনা। এই মন্ত্রে শ্রীদেবতার অখিলজগৎস্থিতিকারণ স্নেহমূর্ত্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে। এই বিশাল বিশ্বে যেখানে যতটুকু সৌকুমার্য্য মাধুর্য্য বিদ্যমান, সে সমস্তই স্নেহমূর্ত্তির বিকাশ মাত্র। ঐ যে পদ্মপত্রে প্রভাতকালীন মুক্তাফল টল্ টল্ করিতেছে, ঐ যে উন্মনা কবি নয়নোন্মাদনাপূর্ণ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ডকলাপ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, ঐ ক্ষুদ্র মুক্তাকারের মোহনমূর্ত্তিতে সংসারের সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমন্বয় দর্শন করিয়া সফলমনোরথ হইতেছেন, ঐ সামগ্রীটী স্নেহমূর্ত্তি শ্রীদেবতার একটীমাত্র চরণরেণু। স্নেহমূর্ত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ সলিলতত্ত্ব। জল জগতের এক অপূর্ব্ববস্তু, জগতের মূলাধার। মহর্ষি মনু সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণপ্রসঙ্গে সর্ব্বব্যাপী প্রকাশমূর্ত্তি আকাশ ও জগজ্জীবন সমীরণও বিদ্যোতন-স্বভাব তেজস্তত্ত্বকে উপেক্ষা করিয়া, "অপ এব সসর্জ্জাদৌ" লিখিয়াছেন। আগে আকাশের বিকাশ, পরে পবনের প্রবহন, তদনন্তর তেজের স্ফুরণ, অবশেষে জলের জন্ম। এইক্রম শ্রুতিসম্মত। শ্রুতি বলেন—

"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী।"

এই শ্রুতিসম্মত পন্থা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, মহর্ষি জলের কথাই সর্ব্বপ্রথমে বলিতেছেন। জল সাক্ষাৎ জগৎকারণ, আকাশ, বায়ু ও তেজস্তত্ত্ব পরম্পরায় কারণ; জল এই ভূতের যোনি, তাই ভৌমজগৎ জলতত্ত্বের কৃপাদৃষ্টি দ্বারা পরিপুষ্ট।

শ্রীঅনন্ত স্বয়ংই জলশিশায়ী, শ্রীদেবতা বা স্নেহদেবী সেই অনন্তশয্যাশায়িত শ্রীভগবানের চরণ-সেবা-সংস্কারে নিরতা। শ্রীদেবতার স্পষ্ট বিকাশ সলিলে, তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন, স্নেহ-মমতা—স্থিরকার্য্য উৎপাদন করুন। স্নেহদেবতার কৃপায় সর্ব্বত্র স্নেহের—স্থৈর্য্যের বিকাশ সংঘটিত হউক্।

চিক্লীত অর্থ কাম। শ্রীদেবতার হৃদয়মুকুর হইতে চিক্লীত বা কামদেব জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণাবতারেও লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণীদেবীর সন্তান প্রদ্যুম্ন কামাবতার। অপরদিকে স্নেহ, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যাদি-শক্তি অভিলাষ বা কাম উৎপাদন করে। কামনার সেবা দ্বারা (অর্থাৎ ঐহিক সৌভাগ্যজনক সকামকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা) লৌকিক সম্পৎ লাভ করা সর্ব্বথা বেদবিধিবোধিত। প্রথমেই সাধক কামদেবকে আহ্বান করিতেছেন; কারণ, কাম আসিলে কাম্য-কর্ম্ম আসিবে, তৎফলে শ্রীরও আবির্ভাব হইবে। যেমন সন্তানস্নেহবশবর্ত্তিনী জননী

স্তনয়ের আকুল আহ্বানে আত্মসম্বরণ করিতে পারেন না, সেইরূপ কামনায় উদয়ে অভ্যুদয় লাভ অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান বৈরাগ্য আনয়ন করিয়া জ্ঞান-নিষ্ঠার অধিকার প্রদান করে, তদ্দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। বৈরাগ্য অভ্যুদয়ের প্রতি দৃক্‌পাতও করে না; শ্রীর লালিত্যমূর্ত্তি বিবেকবৈরাগ্যবানের নয়নে অকিঞ্চিৎকর—অনাবশ্যক বোধে উপেক্ষিত। সুতরাং কামনা শ্রীর সংবাদ বহন করে, এ তথ্য সর্ব্বথা সত্য।

আমরা "সূক্তার্থসংগ্রহ" গ্রন্থ হইতে এই মন্ত্রের সমালোচনামূলক শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ধৈর্য্যচ্যুতির শঙ্কায় পাঠক মহাশয়গণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি—

"যদগ্রে আপএবাসন্ অদ্ভ্যঃ সর্ব্বমভূজ্জগৎ।
নারাঃ তা অয়নং যস্য সহি নারায়ণঃ স্মৃতঃ ।১
সূতে নরাংশ্চ যা আপঃ তা যদস্যায়নং হরেঃ।
তস্য স্বাভাবিকী শক্তিঃ দেবী নারায়ণী স্মৃতা ।২
অদ্ভ্যো হি পৃথিবীজাতা অগ্নিরপ্যভবত্তথা।
বায়ুরর্কোহপ্যপাং বৎসশ্চন্দ্রমাঃ সর্ব্বমপ্যথ ।৩
জীবং জীবরসং দিব্যং অমৃতং জলমুচ্যতে।
জায়তে লীয়তে যত্র জগৎ তৎ জলং ঈরিতম্ ।৪
তজ্জলমিতি শান্তাস্ত চিরং জলমুপাসতে।
তস্মাৎ সর্ব্বনিদানানাং অপাং স্রষ্টৃত্বমুচ্যতে ।৫
অপ্সু প্রতিষ্ঠিতঃ স্নেহঃ তেনৈব পরমাণবঃ।
জগদ্ভাবাঃ অপ্সসম্বন্ধাঃ তদ্ধানৌ স্যাৎ জগল্লয়ঃ ।৬
তস্মাদুপাসকো দেবীং প্রার্থয়েৎ অপ্‌স্বরূপিণীং।
ভোগ্যদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি মম স্নিগ্ধানি মাতৃকা ।৭
সৃজতু শ্রীরপাং দেবী ভোগভাবায় ভামিনী।
শ্রীদেব্যাঃ স্তনয়োর্যজ্ঞে চিক্লীতো নাম মন্মথঃ ।৮
অবশ্যবিকৃতৌ চিত্তে জাতঃ কামোহি চিত্তজঃ।
অয়মেব হি সংসারহেতুঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ।৯
জগৎ কামহিতং সর্ব্বং যেন দ্বৈত ফলোদয়ঃ।
যশ্চাকামহতো দেহী শ্রোত্রিয়ো ব্রহ্মণি স্থিতঃ ।১

ব্রহ্মসম্পৎস্যতে তস্য কর্ত্তব্যং নহি
　　বিদ্যতে ।
লক্ষ্ম্যাঃ ত্রিবর্গরূপায়াঃ প্রাপ্তিঃ
　　কামনিবন্ধনা ।১১
তস্মাৎ চিক্লীতনামানং লক্ষ্মী-
　　পুত্রং হি দুর্জ্জয়ং ।
কামদেবং সমারাধ্য যত্নতঃ প্রাপ্নু
　　য়াৎ শিবং ।১২
লক্ষ্মীঃ প্রযত্নসাধ্যাহি যত্নঃ কাম-
　　সমুদ্ভবঃ ।
তস্য ধর্ম্মাবিরুদ্ধস্য বিভূতিত্বং হরে-
　　র্যতঃ ।১৩
চিক্লীত শ্রীসূত স্বামিন্ চিরং
　　নিবস মে গৃহে ।
মৎকুলে চ চিরং তিষ্ঠ মচ্চিত্তে
　　সন্নিধিং কুরু ।১৪
ত্বদাগমনমাত্রেণ ত্বন্মাতা ত্বামনু-
　　ব্রজেৎ
ত্বয়ি প্রীতিপরা সাহি তব ছন্দো-
　　হনুবর্ত্তিনী ।১৫
শ্রীদেবীং তাং মম গৃহে চিরং বাসয়
　　মাতরম্ ।
নমোহস্তুতুভ্যং চিক্লীত ! শ্রীদেব্যৈ
　　চ নমোনমঃ ।১৬

উল্লিখিত শ্লোকসমূহের তাৎপর্য্য—

পৃথিবী-সৃষ্টির প্রাক্কালে জল বিদ্যমান ছিল । জল হইতে এই বিরাট্ বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে । সেই জলসমূহ "নারা" নামে অভিহিত হইত, তাহারাই (কারণ-সলিল-রূপে) শ্রীভগবানের আলম্বন, এই জন্য ভগবান "নারায়ণ" নামে কথিত হন। জলরাশি নরমণ্ডলী প্রসব করে, সেই জলরাশি ভগবানের আলয়, ভগবানের স্বাভাবিকী পরমাশক্তি, সুতরাং 'নারায়ণী' নামে খ্যাত হইয়া থাকে । জল হইতে পৃথিবী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, অগ্নিও জল-যোনি । (১) বায়ু এবং অর্কও জলের সন্তুতি । (২) চন্দ্রমাও জল হইতে উৎপন্ন । (৩) জল জীবন, জীবরস ও

(১) অগ্নি যে জল হইতে উদ্ভূত— এতৎ সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলেন "অদ্ভ্যোঽগ্নি র্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রং অশ্মনোলোহমুত্থিতং । তেষাং সর্ব্বগতং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি ।" জল হইতে অগ্নি, ব্রহ্ম হইতে ক্ষত্র ও প্রস্তর হইতে লৌহ উদ্ভূত হইয়াছে । ইহা-দের শক্তি সর্ব্বগামিনী হইলেও নিজের উৎপত্তিস্থানে বিলীন হয় । বহ্নিশক্তি জলে বিলীন হয় । ক্ষত্রশক্তি ব্রাহ্মণশক্তিতে অদর্শন-প্রাপ্ত হয়, লৌহশক্তি প্রস্তরে ক্ষীণ হয়, কার্য্য কারণে লীন হয়, ইহাই প্রসিদ্ধ প্রথা । জলের বাষ্পদশা অগ্নির কারণ, ইহা সত্য ।

(২) বায়ু অর্থ এখানে বায়ুগুণ গতি বা প্রবাহ, উহা জলে উপলব্ধ হয় । আদিত্য জলজ, ইহা ভারতের প্রসিদ্ধ প্রবাদ । বেদে দৃষ্ট হয় "অদ্ভ্যাবা এষঃ প্রাতরাদিত্য উন্নিনীষতি" প্রাতঃকালে জল হইতে আদিত্য উদিত হন । সমুদ্র-তীরে সূর্য্যোদয় দর্শনে বৈদিককালের আর্য্যকবির হৃদয়ে এ ভাবের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক । তাহারই অনুস্মৃতি এখন অবাধে আদৃত হইতেছে ।

(৩) সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক উপা-খ্যান চন্দ্রের সমুদ্রজাতত্ব প্রমাণ করে ।

অমৃত নামে কথিত হয়। জগতের উৎপত্তি ও লয়-কারণ বলিয়া ইহার নাম জল। (জায়তে ইতি জং, লীয়তে ইতি লং—জলং) "তজ্জলান" অর্থাৎ (ততো জায়তে তস্মিন্ লীয়তেঽনিতি চ ইতি তজ্জলান্—জগতের উৎপত্তিলয়স্থিতিকারণরূপে শান্তাত্মা ব্যক্তিগণ (পরব্রহ্মকে) উপাসনা করেন। "তজ্জলানিতি শান্তঃ উপাসীত" এই শ্রুতিবাক্যে জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয় কারণরূপে উপাস্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরমতত্ত্বের (তজ্জ-তল্ল-) জলরূপে উপাসনার নিদর্শন থাকায়, 'জলতত্ত্ব'

সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত বিশুদ্ধ নবনীত শ্রীমান চন্দ্র, এই পৌরাণিক ব্যাখ্যার অনুবর্ত্তী আভিধানিক চন্দ্রের নাম রাখিয়াছেন 'সমুদ্রনবনীত'। "রাজা সমুদ্র-নবনীত তমোম্নুদোমা" 'হারাবলী' কোষে 'শ্লোকাবধি' পরিচ্ছেদে। পৌরাণিক সমুদ্র-মন্থনতত্ত্ব ব্যাখ্যার স্থান এখানে নাই, তবে চন্দ্রের জলময়ত্ব বৈদিক ও জ্যোতিঃশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদে আছেঃ—"চন্দ্রমা অপস্বন্তরা সপর্ণো ধাবতে দিবি।" জলময় চন্দ্রমণ্ডল দ্যুলোকে ধাবমান হইতেছে। ইহা চন্দ্রমণ্ডলের জলময়ত্বের প্রমাণ। প্রসিদ্ধ জ্যোতিগ্রন্থ বৃহৎ সংহিতায় দৃষ্ট হয়—"সলিলময়ে শশিনি রবে দীধীতয়ো মূর্চ্ছিতাঃ তমোনৈশং ক্ষপয়ন্তি দর্পণোদর-নিহিতা ইব মন্দিরস্যান্তঃ।" দর্পণোদর-প্রতিফলিত আলোকরশ্মি যেমন মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে পতিত হইয়া তত্রত্য অন্ধকার বিনাশ করে, তদ্রূপ জলময় চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত রবিরশ্মি পৃথিবীতে পতিত হইয়া নৈশ তমোরাশির বিনাশ সংসাধন করে। উহা জলমণ্ডল-প্রতিফলিত বলিয়াই চন্দ্রের চন্দ্রিকা (জ্যোৎস্না) শীতল,—চন্দ্র শীতাংশু। এ তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানেরও অনুমোদিত।

জগৎস্রষ্টৃরূপে কথিত হয়। জলে স্নেহ প্রতিষ্ঠিত, জলে পরমাণু অধিষ্ঠিত, জগদ্ভাব জলসংবদ্ধ, জলনাশে জগতের নাশ সংঘটিত হয়, সেই জন্য উপাসক জগৎকারণীভূত জলশক্তিরূপিণী শ্রীদেবীর শ্রীচরণে সর্ব্বত্র শান্তি-স্থিরতা প্রার্থনা করিবেন। শ্রীদেবী আমার জন্য স্নিগ্ধ ভোগ্য সৃজন করুন, এইরূপ কামনা করিবেন। শ্রীদেবীর পয়োধরযুগল হইতে চিক্লীত নামক কাম উদ্ভূত হয়; জল ও পৃথিবীর বিকারস্বরূপ অন্তঃকরণে ঐ কাম উৎপন্ন হয়, এই জন্য কাম 'চিত্তজ' বলিয়া উক্ত। এই কাম বা অভিলাষ সংসারহেতু—অর্থাৎ জন্মান্তরকারক, কামনা কামিতভোগার্থে শরীরান্তর-সম্বন্ধরূপ জন্ম সংঘটন করে, নিষ্কাম ব্যক্তি শরীর বিরহিত হইয়া থাকে, সে অবস্থার নাম বিদেহ বা কৈবল্য। শ্রীগীতায় জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে
কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়, সদাতদ্ভাব-
ভাবিতঃ।"

যে ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া শরীর পরিত্যাগ করে, জীব তদ্ভাব-ভাবিত হইয়া সেইরূপ দেহাদি লাভ করে। কাম সর্ব্বার্থসাধক। যাহার কামনা আছে, সেই প্রয়োজনের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, ঋদ্ধির চঞ্চল অঞ্চল আকর্ষণ করে; যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ নিষ্কাম, সে স্থাণুবৎ অচল অটলভাবে বিদ্যমান থাকে। এই জগৎ কামসম্ভূত, দ্বৈতভাবের মূলে এই কাম বিরাজিত। উপনিষদের

মন্ত্র-মধুর ধ্বনি—"প্রজাপতিরকাময়ত প্রজা সৃজেয়মিতি" প্রজাপতি স্রষ্টা কামনা করিলেন—প্রজা সৃজন করিব।

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"

সেই তত্ত্ব-পদার্থে ঈক্ষণ বা কাম উৎপন্ন হইল,—"আমি বহুরূপে উৎপন্ন হইব।" বেদবাণী—

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি"

অগ্রে কাম আবির্ভূত হইয়াছিল। এই ঈক্ষণ-সিসৃক্ষা কাম দ্বৈতফল-তরুর মূল। যে নিষ্কাম মহাপুরুষ শ্রোত্রিয়ত্ব (যিনি ষড়ঙ্গ বেদ শাখা অধ্যয়ন করিয়া ষট্‌কর্ম্ম-সম্পন্ন হইয়াছেন, তিনি শ্রোত্রিয়) লাভ করিয়া ব্রহ্মসংস্থ হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন, তাঁহার কোনও কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ থাকে না। শ্রীগীতায় আছে—

"নৈবতস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।"

সেই ব্রহ্মভূত ব্যক্তির কর্ম্মে প্রয়োজন নাই, অকরণেও প্রত্যবায় নাই। অথবা কার্য্যেও প্রয়োজন নাই, কারণেরও অপেক্ষা নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গরূপিণী লক্ষ্মীর কৃপাপ্রাপ্তির মূলে কাম। সেই হেতু লক্ষ্মীতনয় চিক্লীত নামক কামদেবের অর্চ্চনা-চর্চ্চা দ্বারা মানব শ্রীলাভ করেন। লক্ষ্মী প্রযত্নসাধ্যা, প্রযত্ন আবার কাম ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। প্রযত্নবান পুরুষ-সিংহের পদতলে সম্পদের বিভূতিসম্ভার আশ্রয় গ্রহণ করে। এ বিষয়ে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রবচন স্মৃতিপথে উদিত হয়—

"উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।"

উদ্‌যোগী পুরুষসিংহের সমীপে লক্ষ্মী স্বয়ংই উপস্থিতা হয়েন। ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম শ্রীহরির বিভূতি। গীতোপনিষদে শ্রীপরমেশ্বর বলিতেছেন—

"ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।"

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! প্রাণিগণে ধর্ম্মাবিরুদ্ধ (যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে, এমত) কামরূপে আমিই বিদ্যমান। ভগবানের এই অঙ্গীকার প্রমাণ করিতে পারে—বৈধকাম ভগবদ্বিভূতি। এই ভগবদ্বিভূতিস্বরূপে কামের প্রকৃত পরিচয় না পাইয়া, বিধানশাস্ত্র-অতিক্রমকারী পশু-পিশাচ-প্রকৃতির পাষণ্ড-দল পুষ্টিমার্গের অপব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়াছে। হে চিক্লীত! শ্রীনন্দন! হে স্বামিন্! চিরকাল আমার গৃহে বাস কর, আমার বংশে চিরদিন অবস্থিতি কর, আমার চিত্তে সতত সন্নিহিত থাক। তোমার আগমনমাত্রে তোমার জননী শ্রীদেবী, তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ, তোমার অভিলাষানুবর্ত্তিনী হইয়া আমার গৃহে আগমন করিবেন। হে চিক্লীত! লক্ষ্মীদেবীকে আমার গৃহে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমাকে নমস্কার, তোমার জননী সর্ব্বসৌভাগ্যরূপিণী শ্রীদেবীকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।

দ্বাদশী ঋক্ উপরোক্ত তাৎপর্য্য প্রকাশ করে। এ মন্ত্রে আনুষ্ঠানিক মহত্বও বিদ্যমান, আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব।

এই ঋকের ঋষি চন্দ্রনামা, অমৃতেশ্বরী দেবতা, অনুষ্টুভ ছন্দ। অমৃতেশ্বরী চিক্লীত-জননী লক্ষ্মীর বীজমন্ত্র বং। সমুদ্রগামিনী গঙ্গাদি নদীর তীরে বিল্বমূলে শ্রীদেবতার যথাবিধি অর্চনা করিয়া চতুঃষষ্টিসহস্র (৬৪ হাজার) জপ করিলে, সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। সেই সাধকের গৃহে লক্ষ্মীর চিরকৃপা থাকিবে।

ওঁ আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীং।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ।

পদপাঠঃ। আর্দ্রাং, পুষ্করিণীং, পুষ্টিং, পিঙ্গলাং, পদ্মমালিনীং। চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং, লক্ষ্মীং, জাতবেদঃ, মে, আবহ।

অন্বয়ঃ। হে জাতবেদঃ! আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীং চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং মদর্থং আবহ।

পদব্যাখ্যা। হে জাতবেদ! হে অগ্নে! আর্দ্রাং—আর্দ্রগন্ধাং। পুষ্করিণীং—অভিষেকোদ্যতদিগ্‌গজশুণ্ডাগ্রং। (পদ্মবতীম্, পদ্মলতারূপাং বা) পুষ্টিং—পুষ্ট্যভিমানিনীং পুষ্টিরূপাম্বা। পিঙ্গলাং পিঙ্গলবর্ণাং। পদ্মমালিনীং—পদ্মস্রজাং। চন্দ্রাং—হ্লাদিনীং। হিরণ্ময়ীং—স্বর্ণরূপিণীং। লক্ষ্মীং—স্বনামপ্রসিদ্ধাং সৌভাগ্যদেবতাং। মে—মদর্থং আবহ—আহ্বয়স্ব।

বঙ্গার্থঃ। হে অগ্নিদেব! তুমি সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমার নিমিত্ত আহ্বান কর, সেই লক্ষ্মীদেবী আর্দ্রগন্ধা, তাঁহার মস্তকোর্দ্ধে অভিষেকার্থ বারিপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ লইয়া গজগণ শুণ্ড উত্থাপিত করিয়াছে। (পুষ্কর শব্দে গজশুণ্ডাগ্র বুঝায়।) তিনি সৃষ্টিরূপা পিঙ্গলবর্ণা পদ্মমালাধারিণী চন্দ্রবৎ আনন্দদায়িনী ও স্বর্ণময়ী।

আলোচনা। এই মন্ত্রে শ্রীদেবতার আহ্বানের জন্য পুনরায় সাধক দেবমুখ বহ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। লক্ষ্মীদেবী এই সকল বিশেষণে পূর্ব্বেও বিশেষিতা হইয়াছেন; এ মন্ত্রে নূতন সংবাদ বিশেষ কিছুই নাই, কেবল লক্ষ্মী-আহ্বানের জন্য সাধকের তীব্র উৎকণ্ঠার পরিচয় আছে।

ওঁ আর্দ্রাং যষ্করিণীং যষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীং।
সূর্য্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ।১৪

পদপাঠ। আর্দ্রাং, যষ্করিণীং, যষ্টিং, সুবর্ণাং, হেমমালিনীং। সূর্য্যাং, হিরণ্ময়ীং, লক্ষ্মীং, জাতবেদঃ, মে, আবহ।

অন্বয়। হে জাতবেদঃ! মদর্থং, আর্দ্রাং যষ্করিণীং যষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীং সূর্য্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং আবহ।

পদব্যাখ্যা। হে জাতবেদঃ—হে বিত্তাবসো! আর্দ্রাং—শীতলাঙ্গযষ্টিং স্নিগ্ধগন্ধাং। যষ্করিণীং—যষ্টিকরাং, বেত্রহস্তামিত্যর্থঃ। যষ্টিং যষ্টিমতীং দণ্ডধরাং ধর্ম্মরূপিণীং ইতি যাবৎ। সুবর্ণাং—শোভনকান্তিং রুক্মরূপিণীং রুক্মিণীং রুক্মদেবতাং বা। হেমমালিনীং—হেমবিকৃত শৃঙ্খলাদি মালাবতীং হেমপদ্মরচিতস্রগ্বিণীং বা। সূর্য্যাং—সূর্য্যবৎ প্রকাশমানাং ঐশ্বর্য্যশালিনীং বা। হিরণ্ময়ীং সুবর্ণময়ীং

ধনধান্যপ্রচুরাং। লক্ষ্মীং শ্রিয়ং। মে মদর্থং। আবহ আহ্বানং কুরু।

বঙ্গার্থ। হে অগ্নে! তুমি আমার জন্য স্নিগ্ধস্বভাবা বেত্রহস্তা ধর্ম্মদণ্ডধারিণী সুবর্ণা হেমমালিনী সূর্য্যা হিরণ্ময়ী লক্ষ্মীকে আহ্বান কর।

আলোচনা। দেবতার আহ্বান জন্য অগ্নি যজমানের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করেন। বেদে উল্লিখিত আছে—"অগ্নির্বৈ হোতা" অগ্নিহোতা—অর্থাৎ দেবগণের আহ্বান করেন, সুতরাং সেই ঋত্বিক্ "হোতা" নামে কথিত হন। অগ্নি (যজমানের প্রতিনিধিরূপে) দেবতাদের আহ্বান করিয়া স্বগৃহীত হবিঃ প্রদান করেন। যজমান দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞীয় দ্রব্য অগ্নির নিকট সমর্পণ করেন, ইহার নাম হোম। 'ইন্দ্রায় বষট্' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ইন্দ্রের জন্য অগ্নিতেই হবিঃ প্রদান করিতে হয়। অগ্নি উহা ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। অগ্নির এই গুণের নাম "হব্যদাতি" অর্থাৎ দেবতাদের ডাকিয়া যজমান-প্রদত্ত হব্য দান করা। অগ্নির মধ্যস্থতায় দেবগণ হব্য গ্রহণ করেন, তাই শাস্ত্রে আছে "অগ্নিমুখাঃ হি দেবাঃ" অগ্নি দেবগণের মুখ বা মুখ্য; তিনিই দেবতাদিগকে প্রাপ্যভাগ সমর্পণ করেন, অথবা অগ্নিই দেবগণের মুখ—অর্থাৎ দেবতারা বহ্নিমুখে ভোজন করেন। এ মন্ত্রে যজমান সেই কারণে লক্ষ্মীর আহ্বানের জন্য বহ্নিদেবের শরণাপন্ন হইয়াছেন। হবিঃ বহ্নিসাৎ করিলেই দেবতার তৃপ্তি, অন্যথায় নহে।

"শ্রীতত্ত্ব" নামক গ্রন্থেও লিখিত আছে, এই লক্ষ্মীসূক্তের চতুর্দ্দশমন্ত্র জপফলে দারিদ্র্য দূর হয়। এই মন্ত্র প্রত্যহ ত্রিসহস্র (৩ হাজার) জপ করিবে; জপকালে তড়াগ বা সরোবরতীরে অবস্থিত সাধক সূর্য্য অবলোকন করিবে। দ্বাত্রিংশৎ মাস জপের ফলে সূর্য্যসাযুজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ওঁ তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মী-
মনপগামিনীং।
যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো-
দাস্যোঽশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষান্
অহং।১৫

পদপাঠঃ। তাং, মে, আবহ, জাতবেদঃ, লক্ষ্মী, অনপগামিনীং। যস্যাং, হিরণ্যং, প্রভূতং, গাবঃ, দাস্যঃ, অশ্বান্, বিন্দেয়ং, পুরুষান্, অহং।

অন্বয়ঃ। হে জাতবেদঃ! তাং অনপগামিনীং লক্ষ্মীং মদর্থং আবহ, যস্যাং (আগতায়াং) প্রভূতং হিরণ্যং গাবঃ গাঃ দাস্যঃ দাসীঃ অশ্বান্ পুরুষাংশ্চ অহং বিন্দেয়ম্।

পদব্যাখ্যা। তাং—পূর্ব্বোক্তাং প্রসিদ্ধাং বা। মে—মদর্থং। আবহ—আহ্বয়। জাতবেদঃ—হে অগ্নে! লক্ষ্মীং—শ্রিয়ং। অনপগামিনীং—অজয়াং স্থিরামিতি যাবৎ। যস্যাং—আগতায়াং সত্যাম্। হিরণ্যং—সুবর্ণং। প্রভূতম্—প্রচুরং। গাবঃ গাং—বিভক্তিব্যত্যয়েন দাস্যঃ—দাসীঃ—দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা। অশ্বানু-বাজিনঃ। বিন্দেয়ং—লভেয়ং। পুরুষান্—দাসাদীন্। অহং—অস্মৎ প্রত্যয়বাচিক চেতনঃ।

বঙ্গার্থ। হে অগ্নি! আমার নিমিত্ত অপরিণামিনী লক্ষ্মীদেবীকে আহ্বান কর। যিনি আগমন করিলে, আমি প্রভূত হিরণ্য, গোধন, অসংখ্য দাসদাসী, বহু ঘোটকাদি প্রাপ্ত হইব।

আলোচনা। এই মন্ত্রে লোকপ্রসিদ্ধ সৌভাগ্যসম্পৎ শ্রীদেবতার মূর্ত্তি-ব্যক্তিরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। যেখানে লক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষ-পাত সংঘটিত হয়, সেখানে ধনধান্য, দাসদাসী, ঘোটকঘটা, গোবৎস প্রভৃতির সমবায় লক্ষিত হয়। সেখানে আনন্দ-উল্লাসে "হলহলা" "কলকলা"র অবধি থাকে না। সকাম সাধক এই লৌকিক সমৃদ্ধির বিজলী-বিস্ফুরণ দেখিবার জন্য ব্যাকুল।

পত্নী-পুত্র-গৃহক্ষেত্র-চামরছত্র যে শান্তি প্রদান করিতে পারে না, "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" যে পদবীতে আরোহণ করিলে অশেষ ক্লেশে মানব বিচলিত হয় না, যেখানে সমস্ত অভাবের পরিপূরণ, অনন্ত আশার সাফল্য, সেই সর্ব্বকাম-সর্ব্বেশ্বরত্ব লাভের জন্য শ্রীসূক্তের ঋষি অধিক আকুলতা প্রকাশ করেন নাই। সেই সংহিতাযুগে ঐশী শক্তির বিভিন্ন বিকাশ—বিচিত্র বিভূতির দিকেই মনীষিমন বিশেষ আকৃষ্ট ছিল। মানব-হৃদয়ের বৈরাগ্যতন্ত্রীতে তখনও সাধন-সম্পদের সুদৃঢ় অঙ্গুলী-সমাকর্ষণ সমুপস্থিত হয় নাই। সে ভাবপ্রবণ হৃদয়ের অদম্য উচ্ছ্বাস সংযম-সাধনার সুকঠিন বন্ধ-যোগে তখনও নিবারিত হয় নাই। নিবৃত্তি-দেবীর কৃপাদৃষ্টি তখনও ভারতে সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই।

এই পঞ্চদশ মন্ত্রের ঋষি কুবের। ছন্দ প্রস্তার-পংক্তি। হ্রীং শ্রীং হ্রীং—এই বীজত্রয় অনুলোম-বিলোমক্রমে মন্ত্রসম্পুটিত হইয়া জপে বিনিযুক্ত হইবে। এই মন্ত্রের কোটি-জপ রাজ্যেশ্বরত্ব প্রদান করিতে সক্ষম; ঐহিক সমৃদ্ধি প্রত্যাশায় এই মন্ত্রজপ সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর।

নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক শ্রীসূক্ত পাঠের ফলশ্রুতি লিপীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

যঃ শুচিঃ প্রযতোভূত্বা জুহুয়াৎ
আজ্যমন্বহং।
শ্রিয়ঃ পঞ্চদশর্চং চ শ্রীকামঃ সততং
জপেৎ।

যে ব্যক্তি শ্রীকাম—অর্থাৎ সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি কামনা করে, সে প্রতিদিন শুচি ও সংযত হইয়া পঞ্চদশমন্ত্রাত্মক শ্রীসূক্ত পাঠ করিবে ও শ্রীদেবতার উদ্দেশে সুসংস্কৃত বহ্নিতে ঘৃতদ্বারা হোমকার্য্য সম্পাদন করিবে। এতদ্দ্বারা পরিব্যক্ত হইল, শ্রীসূক্ত পাঠ ও শ্রীদেবতার উদ্দেশে আজ্যহোম সম্পাদনের ফল শ্রীলাভ।

এতৎসম্বন্ধে "মন্ত্ররহস্য" গ্রন্থে উল্লিখিত আছে,—

"অধিকারী যথাদেশে যথাকালে
যথামনুম্।
যাদৃগ বিধান-সন্ধানঃ প্রজপেৎ
তাদৃশং ফলম্।
কালদেশক্রিয়ারূপাদ্যনুরূপং লভে-
ন্নরঃ।

অত্যুৎকটেন পুণ্যেন তস্মিন্নেব হি জন্মনি।
তৎফলং প্রাপ্নুয়াৎ সিদ্ধো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
পুণ্যস্যান্নুৎকটত্বেতু চিরাৎ কিঞ্চিৎ ফলং লভেৎ।
প্রতিবন্ধকবাহুল্যে ফলং জন্মান্তরে ভবেৎ।
ন দেবতোষণং ব্যর্থং ভবিষ্যতি কদাচন।
তস্মান্মন্ত্রান্ জপেদ্ যোগী যত-শুদ্ধেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।

তাৎপর্য্য এই যে, অধিকারী যেরূপ কাল, দেশ, দ্রব্যসম্পৎ ও মন্ত্রসম্পৎ লইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে। যথোচিত স্থান-কাল-দ্রব্যাদির সমাবেশ না ঘটিলে, যথোপযুক্ত ফললাভের সম্ভাবনা নাই। তবে দেবযজন কখনও নিষ্ফল বা বন্ধ্য নহে; সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, যদি প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে সেই জন্মেই ফলোদয় হইয়া থাকে। অশুদ্ধরূপাদিদ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও স্বল্পফল প্রসব করে; কর্ম্ম কখনও পরিণামশূন্য হয় না। ইহজীবনে ফলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক-বাহুল্য ঘটিলে, পরজন্মেও ফলোদয় হইয়া থাকে; উপযুক্ত অধিকারীই যথোচিত ফল প্রাপ্ত হয়েন; অনধিকারীর ফললাভের আশা মরীচিকার পিপাসা-শান্তিপ্রত্যাশার সহচরী; সুতরাং যোগানুষ্ঠানদ্বারা যাঁহার চরিত্র পবিত্র ও চিত্ত সংযত হইয়াছে, তাঁহারই ফললাভের আশা। তাদৃশ মহাপুরুষের দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্ম নিজের ও পরের মস্তকে সুফল বর্ষণে সক্ষম হয়। অবিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রার্থনা দেবতার কর্ণে পৌঁছায় না। যে দুর্ব্বল হৃদয়ের আর্ত্তনাদ গভীর গুহাভ্যন্তরস্থ জনের চীৎকারের ন্যায় দুরস্থ শক্তির উদ্বোধন-সাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে। ওঁ শান্তিঃ *

শ্রীসূক্তং সমাপ্তম্।

তীর্থপদাশ্রিত শ্রীঃ——

(যশোহর।)

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম অষ্টক, প্রথম মণ্ডল।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম সূক্ত।

অগ্নিদেবতা।

বিশ্বামিত্র-পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। অগ্নির করি স্তুতি, যজ্ঞে যিনি পুরোহিত,
দেবতা ঋত্বিক্ হোতা সারত্নধারী।
২। অগ্নিপূর্ব্ব ঋষিস্তুত, নব্যদেরও সেইমত,
দেবগণে তিনি হেথা আবাহনকারী।

* শ্রীসূক্তের একাদশ মন্ত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বে হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সময়াভাবে অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করিতে পারি নাই। সংপ্রতি পাঠকবর্গের নিকট সবিনয়ে জানাইতেছি, শ্রীসূক্তের একাদশ মন্ত্র পর্য্যন্ত যে প্রণালীতে প্রকাশ করি, সেই প্রণালীর কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; কারণ, সমাপ্তির দিকেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

(বিনীত লেখক।)

৩। অগ্নি হ'তে মিলে ধন, পুষ্টি যাহা দিন দিন
যাহা যশোযুক্ত পূর্ণ শ্রেষ্ঠ বীরগণে।
৪। হিংসাহীন যেই যজ্ঞে, ব্যাপ্ত হও সর্ব্বদিকে,
ওহে অগ্নি! সেই যজ্ঞ চায় দেবগণে॥
৫। হোতা সিদ্ধ কর্ম্মবান, সত্য বহু কীর্ত্তিমান্
দেব অগ্নি! দেব-সনে এস হে ত্বরায়।
৬। হবির্দাতাগণ, কর যে কল্যাণ
তোমারই তা, হে অঙ্গিরা! সত্য সুনিশ্চয়।
৭। অগ্নি! মোরা প্রতিদিন, বুদ্ধিযোগে রাত্রি-দিন
করি তব নমস্কার আসি সন্নিধানে।
৮। তুমি হিংসাহীন যজ্ঞ-রক্ষাকারী দীপ্তিমান্
ঋতের দ্যোতনকারী, বর্দ্ধিত স্বস্থানে
৯। পুত্রের নিকটে পিতা হে অগ্নি! সুলভ যথা,
স্বস্তিহেতু সমবেত হও আমাদের তথা

দ্বিতীয় সূক্ত।

বায়ু প্রভৃতি দেবতা।

মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। এস বায়ু সুদর্শন, অলঙ্কৃত এই সোম
কর পান, শুন আমাদের আবাহন;
২। বায়ু! করি সোমসুত, যজ্ঞবিদ্ স্তোতা যত
তোমার উদ্দেশে করে মন্ত্রেতে স্তবন।
৩। বায়ু! প্রশংসিত অতি, বাক্য তব বহুগতি—
সোমপান হেতু হব্যদাতা প্রতি ধায়।
৪। ওহে ইন্দ্র বায়ু! এই সোম অভিষুত, এস
অন্নসহ—সোমগণ তোমাদিগে চায়।
৫। ওহে বায়ু! ইন্দ্র আর, হব্য অন্নে বাস কর,
জান অভিষুত সোমে—এস হে ত্বরিত।
৬। এস নর! ইন্দ্র-বায়ু হোতাদের বিনিষ্কৃত
সোমপানে কর্ম্ম ত্বরা হবে সম্পাদিত।
৭। পূতবল মিত্র আর, অরিনাশী বরুণেরে
আবাহনি ঘৃত-সেক কর্ম্ম সাধিবারে।
৮। ঋতবর্দ্ধি ঋতস্পর্শ হে মিত্র-বরুণ! উভে
হও এ বৃহৎ যজ্ঞে ব্যাপ্ত ঋত তরে।
৯। কবি, বহুজন্মজাত, আশ্রয় বহুলোকের,
হে মিত্র বরুণ! দাও কর্ম্মবল আমাদেরে।

তৃতীয় সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা।

মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। ক্ষিপ্রহস্ত শুভপতি, বহুভুজ অশ্বীদ্বয়!
হবিযুক্ত যজ্ঞ-অন্ন করহ কামনা।
২। বহুকর্ম্মকারী নর! বুদ্ধিমান অশ্বীদ্বয়
সুগম বুদ্ধিতে স্তুতি করহ ভজনা।
৩। আইস হে দেব, বৈদ্য, সত্যরূপ রুদ্রপথ,
সুসিক্ত এ ছিন্ন কুশে সোম-বিমিশ্রিত।
৪। এস ইন্দ্র বহুদীপ্ত! করে কামনা তোমাকে
অঙ্গুলিতে অভিষুত এরা নিত্য পূত।
৫। এস বুদ্ধি আকর্ষণে, বিপ্রের প্রেরণে, ইন্দ্র!
সুত-সোম-ঋত্বিকের স্তোত্র সন্নিধানে,—
৬। (এস) হবিযুক্ত ইন্দ্র ত্বরা এ স্তোত্রসমীপে;
ধর আমাদের অন্ন-অভিষব-স্থানে।
৭। হে রক্ষক, ফলদাতা, মানব-ধারক, এস
বিশ্বদেব! দাতার এ সুত সোম-পাশে;
৮। বৃষ্টিপ্রদ ত্বরাগতি বিশ্বদেবগণ! এস
সোমপানে, রশ্মি যথা প্রতিদিন আসে।
৯। বিশ্বদেব! ক্ষয়হীন, সর্ব্বব্যাপী দ্রোহহীন,
ধনের বাহক, কর যজ্ঞহবি পান।
১০। কর পূতা সরস্বতি! ধনদাত্রি অন্নবতি!
অন্ন-আশে আমাদের যজ্ঞ নির্ব্বহন।
১১। সুগতের প্রেরয়িত্রী, সুমতির চেতয়িত্রী,
সরস্বতী দেবী এই যজ্ঞের ধারিণী,
১২। প্রবাহ বহুবারি, চেতনাকারিণী—
সরস্বতী সবাকার ভজন-প্রকাশিনী॥

(প্রবাহ-অপেক্ষে)

ইন্দ্র দেবতা।

মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। সুরূপ-কারীকে নিজ রক্ষার্থ আহ্বান করি
দিনে দিনে;—দোহনার্থ সুগাভীকে যথা।
২। সোমপায়ি! এস যজ্ঞে, এসে কর সোম-পান,—
ধনদাত! হৃষ্ট হ'লে হন গাভীদাতা।
৩। জানি তোমা থাকি তব সন্নিহিত জ্ঞানী মাঝে,—
এস;—ছাড়ি আমাদের হ'য়োনা প্রকাশ।
৪। মেধাবী অজেয় ইন্দ্রে, জিজ্ঞাস জ্ঞানীর কথা,
যিনি দেন শ্রেষ্ঠধন তব সখা-পাশ,
৫। কর স্তুতি, আমাদের ইন্দ্র-সেবাকারিগণ
দূর হ নিন্দুক, হেথা অন্য দেশ হতে।
৬। অরিনাশি! অরি আর লোকে যেন আমাদের
সৌভাগ্য বাখানে—সুখী ইন্দ্রের প্রসাদে।
৭। দাও ইন্দ্রে ইহা,—আশু, যজ্ঞশোভা নৃ-মাদক
হর্ষদাতা, ইন্দ্রসখা কর্ম্মের সাধক।
৮। পিয়া ইহা শতক্রতো! বৃত্রদের হন্তা হও,
রণে এই যোদ্ধাদের হও হে রক্ষক।
৯। ওহে ইন্দ্র! শতক্রতু রণে হেন শক্তিমান্
ধনলাভ তরে করি তোমা অন্নবান্,—
১০। যে ইন্দ্রের ধনস্বামী, কর তাঁর গুণ-গান,
যজমান-সখা—তিনি সুপার মহান্।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ বি এল্।

হিন্দুর স্বদেশ-হিতৈষণা।

["নমঃশূদ্র-সুহৃদ্" পত্রিকার নিম্নলিখিত কবিতার প্রতি হিন্দু-সমাজের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরদিগের উন্নয়ন করার সময় উপস্থিত, নতুবা হিন্দু-সমাজে সামাজিক-বিভ্রাট আসিবার সম্ভাবনা এবং অনেকটা আসিয়াছে। বারান্তরে উহার আলোচনা করিব।]

সকল সমাজ করে এই আকিঞ্চন
স্বধর্ম্ম-আশ্রিত সবে,
উন্নতি লভুক্ ভবে,
করুক্ সে উচ্চ মঞ্চে আসন গ্রহণ;
কিন্তু এ কি হিন্দুদের,
বিষম ভ্রান্তির ফের,
একি এ বিদ্বেষ হিংসা বিভেদ বন্ধন!
ও ব্রাহ্মণ ও যে শূদ্র,
ও মহৎ ও যে ক্ষুদ্র,
অস্পৃশ্য চণ্ডাল ওরে ছুঁয়োনা কখন!
মান্দ্রাজের "পারিয়ার"
দশা দেখ একবার,
পারে না ব্রাহ্মণ সহ করিতে ভ্রমণ!
কুকুর—বিড়াল—চয়
কিন্তু গৃহে পোষা হয়,
তা হ'তেও ঘৃণ্য কিরে মানব-জীবন?
বলিতেও বুক ফাটে
রৌদ্রতাপে হেঁটে মাঠে
দারুণ পিপাসা-ক্লেশে হ'লেও মরণ—
তাহারা পথলে গিয়ে
একাঞ্জলি বারি নিয়ে
করিতে পারে না ঘোর তৃষা নিবারণ!

কুকুর শৃগালগণে,
সে জলে স্বচ্ছন্দ মনে
করে স্নান করে পান সুখে সন্তরণ!
কিন্তু সে "পারিয়া" যবে
হিন্দু ধর্ম্ম ছাড়ি সবে
পবিত্র যীশুর করে শিষ্যত্ব গ্রহণ,
তখন সে সরোবরে
সুখে বারিপান করে,
ব্রাহ্মণের সহ পায় সমান আসন!
হিন্দু-ধর্ম্মাশ্রয়ে যেই
পশ্বপেক্ষা ঘৃণ্য সেই,
অন্য ধর্ম্ম পরশনে পবিত্র সে জন!
তবু হিন্দুয়ানী তোর,
এত অভিমান ঘোর!
কি সুখে লজ্জায় ভবে দেখাও বদন?
স্বধর্ম্ম নাশিয়া হায়,
যারা পরধর্ম্মে যায়,
তখনি তাহারা পায় উন্নত আসন,
অবিচারী হিন্দুধর্ম্ম,
শ্রাদ্ধার্চ্চনা, বেদ, কর্ম্ম,
ছাড়িয়া সে হিন্দুত্বের বৈষম্য বন্ধন—
মুক্ত হয় পাপ হ'তে
পূত ধর্ম্ম পরশেতে,
এ হেন সাধনা নাহি সাধে কোন জন?
"পারিয়া"র মত হীন,
হ'য়ে হিন্দু-ধর্ম্মাধীন,
আছে আরো কত শত নর-নারীগণ।
ঘৃণিত ইতর প্রাণী,
তা হ'তেও ঘৃণ্য জানি
কেহ না তা'দের অঙ্গ করে পরশন।
অশিক্ষার অন্ধকারে,
চির দুঃখ কারাগারে,
অতি হীন হ'য়ে করে জীবন যাপন।

সমাজের অধস্তরে,
দুঃখে তাপে সবে মরে,
কে করে তা'দের তরে অশ্রু বরষণ?
তাদের উন্নতি হেতু
যদি কেহ শিক্ষা-সেতু
স্থাপিয়া, উদার প্রেমে দেয় আলিঙ্গন!
'জাতিনাশা পাপী' ব'লে
তারা খ্যাত ধরাতলে
তাদের সকলে বলে ঘৃণ্য কুবচন!
জানি না রে হিন্দুধর্ম্ম,
কিবা প্রেম, কিবা মর্ম্ম,
তোমার ও কর্ম্ম-কাণ্ড জানি না কেমন।
জগতের সার নীতি,
নর নারী প্রতি প্রীতি,
অনন্ত-চরণে প্রেম ভক্তি সমর্পণ।
দলিয়া সে মহাধর্ম্ম
জানি না এ কিবা কর্ম্ম
করিতেছ, ওরে হিন্দু দুঃখী নির্য্যাতন!
ওরে মন্দমতি ঘোর,
এই অভিমান তোর,
"স্বদেশ-স্বদেশ" বৃথা কপট ক্রন্দন।
প্রেম-ধর্ম্ম যাহে নাই
সে কর্ম্মের মূলে ছাই
নৈলে কিহে জাতিগত বৈষম্য পোষণ?
জানি না এ হিন্দুদের,
কিবা সে ভাগ্যের ফের,
দুর্গতি-সাগরে সবে হয়েছে মগন!
হইয়া বিচ্ছিন্ন বল
দিতে সব রসাতল
হয়ে ছিল জাতিভেদ বৈষম্য সৃজন।
সেই মহাপাপ-ফলে,
দলাদলি কোলানলে,
ভারতবাসীর গলে দাসত্ব বন্ধন।

এ দাসত্বে বিধাতার,
হেরি ইচ্ছা শুভ তাঁর,
অস্পৃশ্য অধম প্রতি করুণা বর্ষণ।
তাই আজ নিরন্তর,
হইতেছে অগ্রসর,
উন্নতি সোপানে সবে উঠিছে এখন।
একাসনে পড়ে শুনে,
বিদ্যা ধন মান গুণে,
লভিছে সকলে এক সমান আসন।
তবুও ত হিন্দুগণে,
চাহে সদা দুর্দ্দিনে,
না জানি কি হ'ত যদি তাঁদের শাসন!
উন্নতির তুরি-ধ্বনি,
চারিদিকে প্রতিধ্বনি,
হতেছে, সবার প্রাণে আশা উদ্বোধন।

শ্রীসীতানাথ বিশ্বাস (ডাক্তার)
দোহারা, ঢাকা।

সীমানির্ণয়।

পুরাকালে ভারতীয় সমাজে যেমন শান্তি, প্রীতি ও অনুরক্তির একাধিপত্য ছিল, তদ্রূপ নানাবিধ বিসম্বাদের সম্বাদও শুনা যাইত। ভারতীয় হিন্দুধর্ম্মাধিকরণে নানাপ্রকার বিবাদের মীমাংসা হইত, হিন্দুর ব্যবহার-শাস্ত্রে ইহার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। অদ্য আমরা প্রাচীনকালের 'সীমানির্ণয়-প্রণালী' ও তদানুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

ভূমি-বিষয়ক বিবাদ ছয়প্রকার, ইহার মধ্যে সীমাবিবাদও একরূপ। মহর্ষি কাত্যায়ন-বিরচিত ব্যবহার-শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়,

আধিক্যা ন্যূনতাচাংশে অস্তি-নাস্তিত্ব-মেব চ।
অভোগ-ভুক্তিঃ সীমা চ ষড় ভূবাদস্য হেতবঃ।

অর্থাৎ ভূমি-বিষয়ক বিবাদের কারণ ছয়প্রকার, সুতরাং ভূমি-বিবাদও ষড়্বিধ। আধিক্যে বিবাদ, ন্যূনতায় বিবাদ, অংশে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব-ঘটিত বিবাদ, অভোগ-ভুক্তি-হেতুক বিবাদ ও সীমাবিবাদ এই ষড়্বিধ বিবাদ। বাদী বলেন,—"এখানে আমার পাঁচ কাঠা হইতেও অধিক-পরিমাণ ভূমি আছে;"—প্রতিপক্ষ পাঁচকাঠা মাত্র স্বীকার করেন ও তদতিরিক্ত অংশ টুকুর অপলাপ করেন; এরূপস্থলের বিবাদ আধিক্য-বিবাদ। কারণ, পাঁচকাঠা ভূমি উভয়েরই সম্মত, আধিক্যেই প্রতিপক্ষের আপত্তি এবং তাহাই বিবাদের হেতু। ন্যূনতায় বিবাদ যথা,—পূর্ব্ববাদী বলেন, "আমার দশকাঠা ভূমি এখানে আছে,"—প্রতিবাদী প্রত্যুত্তর দেন, 'দশকাঠা নহে, তাহার ন্যূন-পরিমাণ ভূমি আছে।' এখানে প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক পূর্ব্ববাদীর প্রার্থিত ভূমির পরিমাণগত ন্যূনতা-প্রতিপাদনই বিবাদের কারণ। অংশে অস্তি-নাস্তি-বিবাদ যথা,—'এখানে আমার পাঁচকাঠা পরিমিত অংশ আছে', পূর্ব্বপক্ষ এইরূপ আপত্তি করায়, পরপক্ষ যদি বলেন যে—"এখানে তোমার অংশ নাই, অথবা তোমার অংশ থাকিলেও তাহার

কোনও নির্দ্দেশ নাই।" এরূপস্থলে অংশের অস্তিত্ব-কথন (আছে-স্বীকার করা স্বত্বেও অধিকার না দেওয়া) বা নাস্তিত্বপ্রচার (নাই বলা) বিবাদের কারণ। অভোগ-ভুক্তি-ঘটিত বিবাদ যেমন,—বাদী বলেন, "এই ভূমি আমার, এ ব্যক্তি বলপূর্ব্বক স্বল্পকালমাত্র ভোগ করিতেছে, ইহার পূর্ব্বে কদাপি ভোগ করে নাই;" প্রতিবাদী উত্তর দেন, "এ ভূমি আমি চিরদিন (পুরুষানুক্রমে) ভোগ করিতেছি, আমি চিরন্তর ভোগ প্রমাণ করিতে পারি।" এরূপ স্থানে বাদী দ্বারা কথিত প্রতিবাদীর অভোগ-ভুক্তি অর্থাৎ' আধুনিক দখল' বিবাদের জনক। প্রমাণের দ্বারা চিরন্তন ভোগ সাধিত হইলেই বিবাদের নির্ণয় হইতে পারে। সীমাবিবাদ—ভূমিদ্বয়ের মধ্যস্থলবর্ত্তী সীমা সম্বন্ধে যে বিবাদ, তাহাই সীমাবিবাদ। একপক্ষ বলেন, "এইস্থানে সীমা" অপরপক্ষ প্রত্যুত্তর দেন "ঐ স্থানে নহে, অপরস্থানে সীমা"। এরূপ বিষয়ে বিবাদের হেতু 'সীমা'। সীমার নির্ণয় হইলেই বিবাদের অবসান হয়। ষট্প্রকার ভূবিবাদের মধ্যে সীমা-বিবাদই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল, কারণ সীমা-ঘটিত বিবাদ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সংঘটিত হইতে পারে। সীমানির্ণয় কষ্টসাধ্য হওয়ার হেতু এই যে সহজে সীমাচিহ্নগুলির পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

সীমা সাধারণতঃ চারিপ্রকার। জনপদ-সীমা, গ্রামসীমা, ক্ষেত্রসীমা, গৃহসীমা। জনপদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী সীমা জনপদসীমা। দুই গ্রামের মধ্যস্থ সীমা গ্রামসীমা। দুই ক্ষেত্রের মধ্যস্থানে যে সীমা, তাহার নাম ক্ষেত্রসীমা। দুই বাটীর মধ্যে যে সীমা, তাহা গৃহসীমা।

মহর্ষি নারদ পঞ্চবিধ সীমার কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত চারি জাতীয় সীমাই প্রকৃতিভেদে পঞ্চবিধ হইতে পারে। নারদের উক্তি—

ধ্বজিনী মৎস্যিনী চৈব নৈধানী ভয়বর্জ্জিতা।
রাজশাসননীতা চ সীমা পঞ্চবিধা স্মৃতা।

ধ্বজ অর্থাৎ উচ্চ বৃক্ষাদিদ্বারা চিহ্নিত সীমা ধ্বজিনী, মৎস্যযুক্ত জলখাত-চিহ্নিত সীমা মৎস্যিনী, মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত অঙ্গার, তুষ, কেশাদি দ্বারা লক্ষিত গুপ্ত-সীমা নৈধানী, বাদি-প্রতিবাদীর পরস্পরেচ্ছায় উভয়মত-সিদ্ধ সীমা ভয়বর্জ্জিতা। যেখানে কোনও সীমাচিহ্ন বিদ্যমান নাই সেরূপ স্থলে রাজ-নির্ম্মিত সীমা (পরিমাপন বা জরিপের দ্বারা রাজা বা রাজপুরুষগণ যে সীমা স্থির করিয়া দেন) রাজ-শাসননীতা। এই সকল প্রকারে নির্ণীতা সীমা জনপদ মধ্যে, গ্রামাভ্যন্তরে, ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে ও দুই বাটীর মাঝখানে সর্ব্বত্রই থাকিতে পারে।

সীমানির্ণয় গ্রীষ্মে করিতে হয় 'জ্যৈষ্ঠে মাসি নয়েৎ সীমাং সুপ্রকাশেষু সেতুষু' জ্যৈষ্ঠ মাসে সেতু বা আইল্ সুপ্রকাশিত হইলে, সীমানির্ণয় করিবে। কেহ কেহ বলেন "চৈত্রে মাসি" অর্থাৎ চৈত্র মাসে।

সীমাব্যতিক্রম সহজসাধ্য জানিয়া, প্রাচীন হিন্দুগণ সুদৃঢ় সীমাচিহ্ন রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রকাশসীমাচিহ্ন সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

সীমাবৃক্ষাংস্তু কুর্ব্বীত ন্যগ্রোধাশ্বত্থ-
কিংশুকান্‌।
শাল্মলী-শাল-তালাংশ্চ ক্ষীরিণশ্চৈব
পাদপান্‌।
গুল্মান্‌ বেণূংশ্চ বিবিধান্‌ শমী-
বল্লীস্থলানি চ:
শরান্‌ কুঞ্জকগুল্মাংশ্চ যথা সীমা ন
নশ্যতি।
তড়াগান্যুদপানানি বাপ্যঃ প্রস্রব-
ণানি চ।
সীমাসন্ধিষু কার্য্যাণি দেবতায়ত-
নানি চ।

ন্যগ্রোধ (নাকুড়) অশ্বত্থ (যাহার পত্র সর্ব্বদা চঞ্চল) কিংশুক (সিমুল) শাল্মলী, শাল, তাল ও ক্ষীরিবৃক্ষসমূহ সীমা-সন্ধিতে রোপণ করিবে। এই সমস্ত বিশালাবয়ব দীর্ঘজীবী বৃক্ষ সহজে স্থানান্তরিত করা দুষ্কর, সুতরাং ইহাদের দ্বারা নির্দ্ধারিত সীমা সম্বন্ধে অনেকাংশে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব। গুল্ম, বেণু (বাঁশঝাঁড়), শর, কুঞ্জ, শমী (শাঁই) প্রভৃতিকেও সীমাস্থানে আরোপণ করিবে, এই সকল তৃণ গুল্মাদি সুন্দর সীমাচিহ্ন। এই গুলি বিদ্যমান থাকিলে, সহজে সীমা নষ্ট হয় না। সীমাচিহ্ন স্বরূপে 'স্থল' অর্থাৎ উন্নত ভূমি-ভাগ (মাটীর ঢিপি বা আইল্‌) রাখিয়া দিবে। সীমাস্থানে তড়াগ, কূপ, সরোবর প্রস্রবণ প্রভৃতি জলাশয় সকল বিদ্যমান থাকিবে। ক্ষেত্রসীমার জলাশয়ের উপকারিতা অপরিসীমা, কিন্তু সাধারণতঃ গ্রাম-সীমা জনপদ-সীমা ও গৃহসীমারই জলাশয় দৃষ্ট হয়। উভয় পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রের অধিপতিই জলাশয় দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন, সুতরাং এতাদৃশ মহোপকারক সীমাচিহ্নের প্রতি কাহারও সহজে বিদ্বেষ সংঘটিত হয় না। ক্ষেত্রসীমায় জলাশয়-নির্ম্মাণ প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল বলিয়া, তাৎকালিক রাজ-শক্তি 'ক্যানাল্‌ ট্যাক্স' বা তাদৃশ অপর কর-প্রবর্ত্তন করিতে বাধ্য হননাই। অধুনা ভারতের বহুস্থানে পুরাকালের হিন্দুরাজগণের নির্ম্মিত দীর্ঘিকা কূপাদি বিদ্যমান থাকিয়া, তাঁহাদের অমরকীর্ত্তির মঙ্গলবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। ক্ষেত্রসীমায় পুষ্করিণী বা কূপ খনন কৃষিকার্য্যের কত সৌষ্ঠব সম্পাদন করে, তাহা পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসিগণের অপরিজ্ঞাত নহে। সীমাসন্ধিতে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিবে। যাহারা দেবসেবায় কষ্টে উপার্জ্জিত সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সেই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসন্তান কখন দেবমন্দির বিনষ্ট করিয়া, সীমা-সন্দেহ উৎপাদন করিতে পারে না। যে দেব-মন্দির-ধ্বংসে হিন্দুর হৃৎপিণ্ডে শত বজ্রঘাত বেদনা অনুভূত হয়, যে দেবাগার-বিনাশক হিন্দু-বিধানশাস্ত্রে সুকঠোর দণ্ডভাগী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, যে দেবমন্দির দর্শনে হিন্দু যুক্তকরে ভক্তিভরে প্রণাম করেন, যে দেবমন্দিরের উচ্চ পতাকা বহুযোজন দূর হইতে দর্শন করিয়া, হিন্দুর প্রাণ গলিয়া যায়, সেই দেবমন্দির যে হিন্দুর নিকট "অক্ষয়-সীমা" স্বরূপে আদৃত হইবে, তাহার বিন্দুমাত্র সংশয়ও পরিলক্ষিত হয় না।

বহিশ্চিহ্ন বা প্রকাশ সীমাচিহ্ন সর্ব্বত্র সুলভ বা সম্ভাবিত নহে, পরন্তু ইহার

ব্যতিক্রম অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে এবং অল্প সময়েই সংসাধিত হইতে পারে, এজন্য গুপ্ত চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। অপ্রকাশচিহ্ন সম্বন্ধে মহর্ষি মনুর অভিমত—

"উপচ্ছন্নানি চান্যানি সীমালিঙ্গানি কারয়েৎ।
সীমাজ্ঞানে নৃণাং বীক্ষ্য নিত্যং লোকে বিপর্য্যয়ং ॥
অশ্মনোঽস্থীনি গোবালান্ তুষান্ ভস্ম কপালিকাঃ।
করীষমিষ্টকাঙ্গারশর্করাঃ বালুকাস্তথা।
যানি চৈবং-প্রকারাণি কালাদ্ভূমির্ন ভক্ষয়েৎ।
তানি সন্ধিষু সীমায়াং অপ্রকাশানি কারয়েৎ।
এতৈর্লিঙ্গৈর্নয়েৎ সীমাং রাজা বিবদমানয়োঃ ॥"

প্রকাশ সীমাচিহ্ন দ্বারা সর্ব্বত্র নিঃশেষরূপে সংশয়-নিরাস ঘটিতে পারে না, কারণ দীর্ঘকাল পরে বৃক্ষাদির দ্বারাও সীমা নিশ্চয় করা দুষ্কর। বহুবর্ষের অবসানে কেহ বলিতে পারে যে "এই ন্যগ্রোধ সীমা-বৃক্ষ নহে, সেই প্রাচীন ন্যগ্রোধ তরু বিনষ্ট হইয়াছে," সুতরাং এসকল দ্বারা সকল সময় নিশ্চয় করা যায় না বলিয়া রাজা গোপনীয়-চিহ্ন দ্বারা সীমা নির্দ্দেশ করিবেন। প্রস্তর-খণ্ড-সকল, অস্থিসমূহ, গোবাল (গরুর বালাঞ্চি বা বালাজ), তুষ, ভস্ম, (ছাই) ভগ্ন মৃৎপাত্র, শুষ্ক-গোময়, ইষ্টক, অঙ্গার (কয়লা) শর্করা (চাঁড়া, খোলাকুঁচী) ও বালুকা প্রভৃতি দ্রব্য সীমাস্থানে মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। এই সকল দ্রব্য বহুকাল ভূমি-মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়াও মৃত্তিকায় পরিণত হয়না। সীমাসন্দেহে ভূমি খনন করিলে, যে স্থানে এই সকল গুপ্তচিহ্ন পাওয়া যাইবে, তাহাই সীমাস্থল বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। এই অপ্রকাশ-সীমাচিহ্ন আর্য্য হিন্দুর গভীর বহুদর্শনের প্রকৃষ্ট পরিচয়। অদ্যাপি বৈদেশিক রাজশক্তি হিন্দুর এই অমূল্য উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, ভস্মাদি প্রোথিত করিয়া গুপ্ত-সীমাচিহ্ন রক্ষা করিতেছেন। আর্য্যসভ্যতা জগৎকে বহুস্থানে এইরূপ দূরদর্শন প্রদান করিয়াছে। ইহা ভারতীয়গণের অসীম গৌরবের সামগ্রী, সংশয় নাই।

সীমা-বিবাদ ঘটিলে সকল স্থানেই যে রাজা স্বয়ং সীমা-নির্ণয় করিবেন, তাহা নহে। সামন্ত, মৌল, উদ্ধৃত, গোপ, সীমাকৃষাণ প্রভৃতির দ্বারাই সাধারণতঃ সীমানির্ণয় করাইবেন। অশেষ বেদবিদ্যা-বিশারদ মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য স্বপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে 'সীমা-বিবাদ প্রকরণ' নামক পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

"সীম্নো বিবাদে ক্ষেত্রস্য সামন্তাঃ স্থবিরাদয়ঃ।
গোপাঃ সীমাকৃষাণা যে সর্ব্বে চ বনগোচরাঃ।

নয়েয়ুরেতে সীমানং স্থলাঙ্গারতুষ-
দ্রুমৈঃ।
সেতু-বল্মীক-নিম্নাস্থি চৈত্যাদ্যৈ-
রুপলক্ষিতাম্।
সামন্তা বা সমগ্রামাঃ চত্বারোঽষ্টৌ
দশাপি বা।
রক্তস্রগ্বসনাঃ সীমাং নয়েয়ুঃ ক্ষিতি-
ধারিণঃ।"

ক্ষেত্রের সীমা সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সামন্ত, স্থবির বা বৃদ্ধগণ, গোপ, সীমাকৃষাণ, বনচরবর্গ প্রভৃতিরা উন্নত ভূমিভাগ, অঙ্গার, তুষ, বৃক্ষ, সেতু (খাল ও বাঁধ বা আইল্) বল্মীক [উইঢিপি] প্রোথিত অস্থি ও চৈত্য (ইষ্টকাদি দ্বারা বদ্ধ বৃক্ষমূল) ইত্যাদি চিহ্নের দ্বারা সীমা নির্ণয় করিবে। আর যদি কোনও সীমা-চিহ্ন বিদ্যমান না থাকে, কিম্বা বিদ্যমান চিহ্ন সকল সন্দিগ্ধ হয়, তবে অষ্ট-সংখ্যক বা দশ-সংখ্যক সামন্ত রক্তমাল্য ধারণ ও রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক মস্তকে ক্ষিতি-খণ্ড গ্রহণ করিয়া সীমা নির্ণয় করিবে।

সামন্ত অর্থ—চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি ক্ষেত্রস্বামিগণ। "সমন্তাৎ চতুর্দিক্ষু ভবাঃ সামন্তাঃ ইতি।" সীমা-ব্যতিক্রমে বর্ত্তমান কালেও 'সামন্ত' প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। বিবাদাস্পদ ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহের অধিস্বামী কর্ষকগণ, স্বপ্রয়োজন বশতঃ চতুর্দ্দিকের ক্ষেত্রগুলির সীমার প্রতি লক্ষ্য করিতে বাধ্য হয়। এই পারিপার্শ্বিক বা "পাশএলে" প্রমাণ সীমাজ্ঞানের সর্ব্ব প্রধান উপকরণ। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিতেছেন,—

"গ্রামো গ্রামস্য সামন্তঃ ক্ষেত্রং
ক্ষেত্রস্য কীর্ত্তিতম্।
গৃহং গৃহস্য নির্দ্দিষ্টং সমন্তাৎ পরি-
রভ্য হি।"

গ্রামের সীমা-সন্দেহে পার্শ্ববর্ত্তি-গ্রামের মনুষ্যগণ, ক্ষেত্রের সীমা-বিবাদে পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রাধিপতিগণ, বাটীর সীমা-বিবাদে পার্শ্ব-বর্ত্তী গৃহস্থগণ 'সামন্ত' স্বরূপ বিবেচিত হইবে।

যাহারা একবার সীমা নির্ণয়ের সময় উপস্থিত থাকিয়া, তাবৎ ব্যাপার দর্শন করিয়া ছিল, পরবর্ত্তি-সময়ে সীমা-সন্দেহে তাহারা প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে; তাহাদের শাস্ত্রীয় নাম 'স্থবির' বা 'বৃদ্ধ'। মহামুনি কাত্যায়ন বলিতেছেন,—

"নিষ্পাদ্যমানং যৈর্দৃষ্টং তৎকার্য্যং
তদ্গুণান্বিতৈঃ।
বৃদ্ধা বা যদি বাঽবৃদ্ধাঃ তে তু বৃদ্ধাঃ
প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

সীমা-নির্দ্ধারণ কার্য্য পূর্ব্বে যাহারা দর্শন করিয়া ছিল, তাহারা বয়সে বৃদ্ধ হউক্ বা যুবক হউক্, সীমাতত্ত্বজ্ঞ হইলেই শাস্ত্র তাহাদিগকে বৃদ্ধ বলেন।

কাত্যায়ন 'মৌল' ও 'উদ্ধৃত' এই উভয়ের লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"যে তত্র পূর্ব্বং সামন্তাঃ পশ্চাৎ
দেশান্তরং গতাঃ।
তন্মূলত্বাৎ তু তে মৌলাঃ ঋষিভিঃ
পরিকীর্ত্তিতাঃ।
উপশ্রবণ-সম্ভোগ-কার্য্যাখ্যানোপ-
চিহ্নিতাঃ।

উদ্ধরন্তি পুনর্যস্মাৎ, উদ্ধৃতাস্তে ততঃ স্মৃতাঃ।”

যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে সামন্ত অর্থাৎ পার্শ্ববর্ত্তী ছিল, তৎপরে বিশেষ কারণে তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বে সীমা-রহস্য অবগত থাকা হেতুক এবং ঐ স্থান তাহাদের মূল বাসস্থান এইজন্য তাহারা "মৌল" নামে অভিহিত হয়। শ্রুতি-পরম্পরা, ভোগ, কার্য্য (সাক্ষিপ্রভৃতির দ্বারা স্বপক্ষসাধন ক্রিয়া বা কার্য্য) ও আখ্যান [ইতিবৃত্ত বা পুরাতন গল্প] ইত্যাদির রহস্য প্রচার দ্বারা যাহারা ভূমির প্রকৃত সীমা উদ্ধার করিতে পারে, তাহাদিগকে 'উদ্ধৃত' কহে। ইহাদের সকলেরই প্রকৃত সীমা জানিতে পারা সম্ভব।

গোপগণ গোচারণে রত থাকায় ক্ষেত্রের সীমা জানিবার সুবিধা পায়, সুতরাং কুত্রচিৎ তাহাদের দ্বারাও সীমা নির্ণয় হইতে পারে। সীমাকৃষাণ অর্থাৎ সীমা-সন্নিহিত ক্ষেত্রকর্ষক, তাহারা অবশ্যই সীমার সংবাদ রাখে। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

“ব্যাধান্ শাকুনিকান্ গোপান্ কৈবর্ত্তান্ মূলখাতকান্।
ব্যালগ্রাহান্ উঞ্ছবৃত্তীন্ অন্যাংশ্চ বনগোচরান্।”

ব্যাধ অর্থাৎ পশুহন্তা, শাকুনিক অর্থ পক্ষিবন্ধক, গোপ, কৈবর্ত্ত [হালিক ও জালিক দ্বিবিধ কৈবর্ত্ত। হালিকগণ কৃষিজীবী, জালিকেরা মৎস্য-বন্ধন-বিক্রয়জীবী] মূলখাতক (ওষধি ও বৃক্ষমূলাদি সংগ্রহ করিয়া যাহারা বিক্রয় করে) ব্যালগ্রাহ (সাপুড়ে) উঞ্ছবৃত্তি [যাহারা ক্ষেত্রে পতিত পরিত্যক্ত শস্যবল্লরী গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ইহাদের প্রাদেশিক নাম "নোড়াকুড়ুনী"] ও অন্যান্য বনচরবর্গকে সীমা-নির্ণয় কার্য্যে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিবে। ইহারা প্রায় সকলেই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনার্থে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে গমন করে, তাহাতে ক্ষেত্র-সীমা পরিজ্ঞানের সুবিধা থাকিতে পারে। এই সকল ব্যক্তি বিদ্যমান সীমাচিহ্নের সংবাদ অবগত আছে সুতরাং ইহাদের দ্বারা সীমানিরূপণ করাইবে।

সীমাচিহ্ন না থাকিলে, সামন্তগণ সীমার সামঞ্জস্য সাধন করিবেন। সকলেই সীমানির্ণয়ে শপথপূর্ব্বক কার্য্য করিবেন। মহর্ষি মনুও এ বিষয়ে বলিয়াছেন,—

‘শিরোভিস্তে গৃহীত্বোর্ব্বীং স্রগ্বিণো রক্তবাসসঃ।
সুকৃতৈঃ শাপিতাঃ স্বৈঃ স্বৈঃ নয়েয়ুস্তে সমঞ্জসম্।”

সীমা-নির্ণয়-সময়ে মস্তকে মৃত্তিকা ধারণপূর্ব্বক রক্ত মাল্য ও বস্ত্র পরিধান করিয়া, নিজের নিজের পূর্ব্বকৃত সুকৃত উচ্চারণপূর্ব্বক শপথ করিয়া, সীমা-সামঞ্জস্য করিবে। শপথকারীরা বলিবেন, 'যদি আমি জ্ঞানানুসারে সীমার অপলাপ করি, তবে যেন আমার পূর্ব্বকৃত সুকৃত-সমূহ বিনষ্ট হয়।' এরূপ কঠোর শপথ প্রাচীন সময়ে সত্য-কথনের সহায়তা করিত। অধুনা শপথাদির প্রতি বিশ্বাস-হীনতায় দেশে ইহার মূল্য অল্পই আছে।

সর্ব্ব-প্রথমে সাক্ষিদ্বারা সীমা-নির্ণয় করাইবে। তদভাবে সামন্তগণ, তদভাবে

তৎসংসক্তগণ, তাহাতেও অসুবিধা হইলে মৌল, বৃদ্ধ উদ্ধৃত প্রভৃতিরা সীমানির্ণয় করিবে। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমেই সাক্ষিগণের স্থান যথা,—

"সাক্ষি-প্রত্যয়এব স্যাৎ সীমাবাদ-
বিনির্ণয়ঃ।"[১]

সীমানির্ণয় (প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ) সাক্ষিদ্বারাই নিষ্পন্ন হইবে। কিরূপ সাক্ষী সীমানির্ণয়ের উপযুক্ত, তৎসম্বন্ধে মহর্ষি নারদের গূঢ়ার্থ বচন এই,—

"আগমং চ প্রমাণং চ ভোগকালং
চ নাম চ।
ভূভাগলক্ষণং চৈব যে বিদুস্তেহত্র
সাক্ষিণঃ।"

যাহারা ভূমির 'আগম' অর্থাৎ কিরূপে প্রাপ্তি ঘটিয়াছে তাহা, 'প্রমাণ' অর্থাৎ ভূমি কয় বিঘা বা কয় কাঠা (প্রাচীনকালে দণ্ডদ্বারা ভূমির পরিমাণ করা হইত), কতদিন ভোগ করা হইতেছে, ভোক্তার নাম এবং ভূমি-খণ্ডের বিশেষ নাম (যেমন 'অমুকের ভিটা' 'অমুকের ডাঙ্গা' 'অমুকের কুড়' ইত্যাদি এবং বর্ত্তমান কালে 'নামজাদে' কথা দ্বারা যে পদার্থ লক্ষিত হয় তাহা, যথা নামজাদে 'আসি' নামজাদে 'ঝড়ভাঙ্গা' ইত্যাদি) এবং ভূমির লক্ষণ (চতুষ্কোণ, পঞ্চকোণ, শালিক্ষেত্র, ইক্ষুক্ষেত্র প্রভৃতি) যাহারা অবগত আছে, তাহারাই সাক্ষী। সাক্ষিগণকে বাদী, প্রতিবাদী ও গ্রামেয়ক এবং কুলাদির সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে; তাহারা সর্ব্বসম্মুখে যাহা বলিবে, তদনুসারে রাজা সীমানির্ণয় করিবেন। সীমানির্ণয়-পত্রে সীমার পরিচয় লিখিত হইবে এবং সাক্ষিগণের নাম লিখিত থাকিবে ও রাজমুদ্রা অঙ্কিত হইবে। রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি-স্বরূপ অপর কোনও ব্যক্তি স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিবেন। এতদ্বিষয়ে মহর্ষি মনু বলিতেছেন,—

"গ্রামেয়ক-কুলানাঞ্চ সমক্ষং সীম্নি
সাক্ষিণঃ।
প্রষ্টব্যাঃ সীমলিঙ্গানি তয়োশ্চৈব
বিবাদিনোঃ।
তে পৃষ্টাস্তু যথা ব্রূয়ুঃ সামন্তাঃ
সীম্নি নির্ণয়ং।
নিবধ্নীয়াৎ তথা সীমাং সর্ব্বাংস্তাং-
শ্চৈব নামতঃ।"

এই প্রকার সাক্ষী না পাওয়া গেলে, সামন্তগণ নির্ণয় করিবে। মনু বলেন,—

"সাক্ষ্যভাবে তু চত্বারো গ্রামাঃ
সীমান্ত-বাসিনঃ।
সীমাবিনির্ণয়ং কুর্য্যুঃ প্রযতাঃ রাজ-
সন্নিধৌ।"

সাক্ষীর অভাবে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী চারিজন যথানিয়মে রাজনিকটে সীমা-নির্ণয় করিবে। সামন্তগণ যদি স্বার্থপরতা-বশতঃ যথাযথভাবে কার্য্য করিতে অশক্ত হয়, তবে তৎপার্শ্ববর্ত্তী সংসক্তগণ নির্ণয় করিবে। কাত্যায়ন বলেন,—

"স্বার্থসিদ্ধৌ প্রদুষ্টেষু সামন্তেষু
অর্থ-গৌরবাৎ।
তৎসংসক্তৈশ্চ কর্ত্তব্য উদ্ধারো
নাত্র সংশয়ঃ।"

সামন্তগণ স্বার্থ-দূষিত হইলে, তৎসক্তগণ-দ্বারা সীমার উদ্ধার করিবে, তদভাবে মৌল,

বৃদ্ধ ও উদ্ধৃত প্রভৃতি দ্বারা সীমাস্থির করাইবে। "তেষামভাবে + মৌলবৃদ্ধোদ্ধৃতাদয়ঃ।" তাহাদের অভাবে মৌল, বৃদ্ধ, উদ্ধৃত প্রভৃতিরা সীমানির্ণয় করিবে।

সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মবিৎ একমাত্র ব্যক্তিও সীমানির্ণয় করিতে পারিবেন, যদি উভয়পক্ষ তাঁহাকে মধ্যস্থরূপে মনোনীত করেন। নারদ বলিয়াছেন,—

"একশ্চেদুন্নয়েৎ সীমাং সোপবাসঃ সমুন্নয়েৎ।
রক্তমাল্যাম্বর-ধরো ভূমিমাদায় মূর্ধনি।"

যদি একজন উভয়-পক্ষ-মনোনীত মধ্যস্থ ধর্ম্মজ্ঞ সীমানির্ণয় করেন, তবে তিনি উপবাসপূর্ব্বক রক্তমাল্য ও বস্ত্র ধারণ করিয়া, মস্তকে ভূমিখণ্ড লইয়া কার্য্য করিবেন।

যদি সীমানির্ণয়ের অসুবিধা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নদীবেগাদিদ্বারা সীমাচিহ্ন বিনাশিত হয়, তবে তাবৎ প্রদেশ অনুমান করিয়া, নদীবেগোত্থিত নব তটভাগ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। নদীতে যে পরিমাণ স্থান গ্রাস করিবে, নদ্যুত্থিত 'চর' হইতে তাবৎ ভূভাগ ভূস্বামী গ্রহণ করিবেন;—এইরূপ প্রথা প্রাচীন সময়ে প্রচলিত ছিল।

সীমানির্ণয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতে গিয়া, যদি সাক্ষীরা মিথ্যা কথা বলেন, তবে রাজা তাহাদিগকে দ্বিশত পণ দণ্ড করিবেন। সামন্তগণ মিথ্যা বাক্য বলিলে, তাঁহাদের দণ্ড মধ্যম-সাহস (৫৪০ পণ) ও মৌল উদ্ধৃতাদিরা মিথ্যাবাদী হইলে, প্রথম-সাহস (২৭০ পণ) দণ্ডভাগী হইবে। প্রমাণের দ্বারা মিথ্যাবাক্য অবগত হইলে, রাজা সাক্ষিপ্রভৃতিকে দণ্ডিত করিয়া, পুনরায় যথোচিত প্রমাণদ্বারা সীমাবিচার আরম্ভ করিবেন।

'দণ্ডয়িত্বা পুনঃ সীমাং বিচারয়েৎ।'

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

'ত্যক্ত্বা দুষ্টাংস্তু সামন্তান্ অন্যান্ মৌলাদিভিঃ সহ।
সংমিশ্র্য কারয়েৎ সীমাং এবং ধর্ম্মবিদোবিদুঃ।'

দুষ্ট সামন্ত ও মৌলাদি পরিত্যাগ করিয়া, অন্য সামন্তাদির সহিত মিলিত হইয়া, পুনরায় সীমানির্ণয় করিবে, ইহাই যথার্থ ধর্ম্ম।

যদি সামন্তাদি না পাওয়া যায়, সীমাচিহ্নও না থাকে, তখন রাজা স্বয়ং উপযোগ অনুসারে সীমানির্ণয় করিবেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"অভাবে জ্ঞাতৃচিহ্নানাং রাজা সীম্নঃ প্রবর্ত্তিতা।"

সামন্ত প্রভৃতি জ্ঞাতা ও সীমালিঙ্গের অভাব হইলে, রাজা উভয়পক্ষের সুবিধানুসারে সীমা স্থাপন করিবেন।

মর্য্যাদাভূমি সর্ব্ব-সাধারণী, এই ভূমি বহু ক্ষেত্রের ব্যবচ্ছেদিকা। মর্য্যাদাভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে ভেদ করিলে প্রথম-সাহস দণ্ড, সীমা অতিক্রম করিয়া কর্ষণ করিলে উত্তম-সাহস দণ্ড এবং ভয় দেখাইয়া ভূমি হরণ করিলে মধ্যম-সাহস দণ্ড হইবে। এ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দৃষ্ট হয়,—

"মর্য্যাদায়াঃ প্রভেদে চ সীমাতিক্রমণে তথা।

ক্ষেত্রস্য হরণে দণ্ডাঃ অধমোত্তম-
মধ্যমাঃ।"[১]

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা
ভীষয়া হরন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাৎ অজ্ঞানাৎ
দ্বিশতোদমঃ।"[১]

গৃহ, ক্ষেত্র, তড়াগ বা আরাম যদি কেহ ভয় দেখাইয়া হরণ করে, তবে তাহার দণ্ড পঞ্চশত পণ। যদি নিজ-ভূমি মনে করিয়া অজ্ঞানবশতঃ হরণ করে, তবে দ্বিশত পণ দণ্ড বিহিত। সীমানির্ণয়ে মিথ্যা-কথন ও সীমাতিক্রমে আর্য্য মহর্ষিগণ দণ্ড প্রদান করিতেন। সমস্ত সংসারে এ প্রথা প্রচলিত আছে।

শ্রী——ভারতী
যশোহর।

লেখ্য।

ইতিহাস যে অতীত-কালের অন্ধকারময় যুগের প্রকৃত সংবাদ অবগত নহে, প্রবাদও যেখানে শঙ্কাশূন্য-মানসে পদার্পণ করিতে সক্ষম হয় না, সেই প্রাচীনতম সময়ে, যে সময় বৃহদারণ্যকের সুপ্রথিত বেদবিদ্যা-বিশারদ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ভারতে ব্যবস্থাপকের সম্মানিত আসনে আরোহণ করিয়া, দিগন্তবিস্তারি-যশঃসৌরভে দিঙ্মণ্ডল সুরভিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতীয় সমাজে লিখনপ্রণালীর কতদূর উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা পুরাতত্ত্ববিদের অগোচর নাই। তখন লেখ্য বা দলীল (লিপিকা) রাজদ্বারে ও সমাজে প্রধান প্রমাণরূপে পরিগণিত হইত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, প্রমাণের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি
কীর্ত্তিতাঃ।
তেষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতমমুচ্যতে।"

লিখিত (লেখ্য), ভোগ ও সাক্ষী এই ত্রিবিধ প্রমাণ। এই তিনটির যে কোনও একটি না পাওয়া গেলে, "দিব্য প্রমাণ" গৃহীত হইবে। এখানে সর্ব্বপ্রথমেই লিখিত বা দলীলের নাম দৃষ্ট হইতেছে। লিপির বহুল-প্রচার—এমন কি, রাষ্ট্রের সমস্ত গ্রামে অনধিকসংখ্যায় লিপিজ্ঞ না থাকিলে, কখনই 'লেখ্য' সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ-পদবীতে আরোহণ করিতে পারে না। যে সময় পল্লীকৃষক ঋণগ্রহণ করিতেও লেখ্য (খত্ বা তমস্সুক্) প্রস্তুত করিয়া দিত, সে সময় প্রতিগ্রামে অন্ততঃ কতিপয় ব্যক্তিরও লিখন-প্রণালী অবগত হওয়া সুসম্ভব। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই বিষয়ের বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—লেখ্য দ্বিবিধ—শাসন ও জানপদ। 'শাসন'—রাজকীয় তাম্রশাসনাদি। রাজা ভূমি বা নিবন্ধ (বাজার খেয়াঘাট প্রভৃতিতে শুল্ক বা তোলা-গ্রহণ) উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিয়া, লেখ্য সম্পাদন করিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় দৃষ্ট হয়—

"দত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যং
তু কারয়েৎ।
আগামি-ভদ্রনৃপতি-পরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ।"

রাজা ভূমি বা নিবন্ধ দান করিয়া, ভবিষ্যৎ ভদ্র রাজার পরিজ্ঞানের জন্য লেখ্য প্রণয়ন করিবেন। রাজলেখ্য—কিরূপ হইবে, তাহার বর্ণনা,—

"পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্।
অভিলেখ্যাত্মনো বংশ্যান্ আত্মানং চ মহীপতিঃ।
প্রতিগ্রহপরীমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনং।
স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরঃ।"

রাজা পট ('কার্পাসিকে পটে'—বস্ত্র অথবা তুলটকাগজে, কিম্বা শিলাপট্টে) বা তাম্রপট্টে (তাম্রফলকে) নিজের মুদ্রা (মোহর) চিহ্নিত করিয়া, নিজের বংশীয় পূর্ব্বপুরুষগণ ও নিজের নাম লিখিয়া, প্রদত্ত ক্ষেত্র তাহার চতুঃ-সীমা ও পরিমাণ, নিবন্ধের পরি-ণামও যতদিন বিদ্যমান থাকিবে—তাহার বর্ণনা লিখিয়া, হস্তাক্ষর (দস্তখত) সংযুক্ত করিয়া, তারিখ যুক্ত (মাস, বার, তিথি, দিন ও সম্বৎসর ইত্যাদি যুক্ত—বর্ত্তমান কালে ও স্বল্পপূর্ব্বকালে যুধিষ্ঠির-গতাব্দ, বিক্রমসংবৎ, শকাব্দ ইত্যাদি লিখার ব্যবস্থা) "শাসন" প্রস্তুত করিবেন। এই রাজ-শাসনের লেখক হইবেন "সান্ধি-বিগ্রহিক" নামক প্রধানতম রাজকর্ম্ম-চারী।

"সন্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেদ্ যস্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেদ্রাজশাসনম্।"

সন্ধিবিগ্রহকারী রাজশাসনের লেখক হইবেন, রাজাজ্ঞায় তিনি রাজ-শাসন লিখিবেন। 'অধুনা ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান সম্বল এই হিন্দু-রাজ-শাসন—অর্থাৎ শিলালিপী ও তাম্রশাসন। কান্যকুব্জ, কাশ্মীর, কাশী, শ্রাবস্তী, উজ্জয়িনী, গৌড় প্রভৃতি নগরীর হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিগণের শিলালিপী ও তাম্রশাসন ঐতিহাসিক জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, ইহা গবেষণা-বিজ্ঞের অজ্ঞাত নহে। এই 'শাসনপত্র' কেবল রাজাই প্রচার করিতে পারেন। "জানপদ" লেখ্য জনপদের সর্ব্বসাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যবহৃত হইত। জানপদ লেখ্য আবার দুই প্রকার, মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—

"লেখ্যং তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং স্বহস্তান্য-কৃতং তথা।
অসাক্ষিমৎ সাক্ষিমচ্চ সিদ্ধির্দেশস্থিতেস্তয়োঃ।"

'জানপদ লেখ্য দ্বিবিধ, এক প্রকার স্বহস্তকৃত, অন্যবিধ অন্য-হস্তকৃত। স্বহস্ত-কৃত লেখ্য অসাক্ষিমৎ ও অন্য-হস্তকৃত সাক্ষিযুক্ত হইবে। এখানে তমসুক্ এবং অন্যান্য দলীল অন্য-হস্তকৃত নামে অভিহিত হইতেছে। অন্য-হস্তকৃত (অন্য-লিখিত) দলীলে সাক্ষী থাকিবে। অন্য-লিখিত দলীল যে 'অন্যই লিখিবে', নিজহস্তে লিখিলে সিদ্ধি হয় না, এমন নহে। অন্যে লিখিলেও দলীল নিষ্পত্তি হয়, এজন্য উহার নাম অন্য-হস্তকৃত। বস্তুতঃ সাক্ষিযুক্ত এবং সাক্ষিহীন নিজ-হস্ত-লিখিত—এই দুই প্রকার দলীলের কথা এখানে বলা হইতেছে। সাক্ষিহীন স্বহস্তকৃত লেখ্য বর্ত্তমানকালীন "হ্যাণ্ডনোট" জাতীয়। উহা স্বয়ং না লিখিলে সিদ্ধি হইবে না, ইহাই তৎকালীন প্রথা ছিল। 'হ্যাণ্ডনোট'-জাতীয় দলীলে সাক্ষী লেখা হইত না। কোনও কোনও স্থানে দেশাচার অনুসারে উক্ত বিধির ব্যতিক্রম হয় এবং নববিধানেরও সাক্ষাৎ লাভ করা যায়—ইহাই ঋষিবাক্যের তাৎপর্য্য। অন্য-কৃত লেখ্য সম্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"যঃ কশ্চিদর্থো নিষ্ণাতঃ স্বরুচ্যা তু পরস্পরং।
লেখ্যং তু সাক্ষিমৎ কার্য্যং তস্মিন্ ধনিক-
পূর্ব্বকম্।"

পরস্পরের মধ্যে স্বেচ্ছামত যে বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে, কালান্তরে তাহার অন্যথা হইতে পারে—এই শঙ্কায়, বিসম্বাদ-সময়ে পূর্ব্বকৃত মীমাংসার পরিচয়স্বরূপ সাক্ষি-যুক্ত লেখ্য মীমাংসাকালে প্রস্তুত করিবে। অধমর্ণ তাহাতে ধনীর নাম বিবরণাদি লিখিয়া, পরে নিজ নামাদি লিখিবে, এই লেখ্য 'খৎ'। প্রথমে মহাজনের সহিত বন্দোবস্ত ঠিক করিবে। যত টাকা ঋণ গ্রহণ করিবে, মাসিক যত সুদ, যখন পরিশোধের ওয়াদা—সমস্ত অগ্রে মীমাংসা করিয়া লইবে; পরে পরস্পরের মধ্যে যে কেহ সময়ান্তরে ইহার অপলাপ করিতে পারেন, এইজন্য সাক্ষি-সমক্ষে লেখ্য নির্ম্মাণপূর্ব্বক সাক্ষি-সম্মুখেই ঋণ গ্রহণ করিবে। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের মধ্যে ঋণবিবাদ উপস্থিত হইলে, এই লেখ্য বিচারালয়ে প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইবে। দলীলে পরস্পরের নাম-জাতি-গোত্র, পিতৃ-নামাদি ও মাস, বর্ষ, পক্ষ, তিথি-বারাদির উল্লেখ করিতে হইবে। ঋষি বলেন,—

"সমামাসতদর্দ্ধাহর্নামজাতি-স্বগোত্রকৈঃ।
সব্রহ্মচারিকাত্মীয়পিতৃনামাদিচিহ্নিতম্।"

দলীল লেখা শেষ হইলে অধমর্ণ তাহাতে নাম সহী করিবেন,

"সমাপ্তেঽর্থে ঋণীনাম স্বহস্তেন নিবেশয়েৎ।
মতং মেঽমুকপুত্রস্য যদত্রোপরি লেখিতম্।"

ঋণী স্বহস্তে লিখিবেন, উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে আমার সম্মতি আছে। সাক্ষীগণও দলীলে নাম স্বাক্ষর করিবেন,—

"সাক্ষিণশ্চ স্বহস্তেন পিতৃনামকপূর্ব্বকং।
অত্রাহমমুকঃ সাক্ষী লিখেয়ুরিতি তে সমাঃ।"

সাক্ষিগণও স্বহস্তে "আমি অমুকের পুত্র অমুকনামা এই দলীলে সাক্ষী।" এইরূপ লিখিয়া দিবে। সমগুণ ও সমসংখ্যক সাক্ষি-নিয়োগই তৎকালের ব্যবস্থা ছিল। যে অধমর্ণ বা যে সাক্ষী লিখিতে জানেনা, তাহার সম্বন্ধে মহর্ষি নারদ লিখিয়াছেন,—

"অলিপিজ্ঞ ঋণী যঃ স্যাৎ স্বমতং স তু লেখয়েৎ
সাক্ষী বা সাক্ষিনান্যেন সর্ব্বসাক্ষিসমীপতঃ।"

নিরক্ষর অধমর্ণ ও সাক্ষী নিজের সম্মতি অপরের দ্বারা লেখাইবে। হয় দলীল লেখ-কের দ্বারা, নয় অন্য লিপিজ্ঞ সাক্ষিদ্বারা লেখাইবে। সর্ব্বসাক্ষি-সমক্ষে ঐ সম্মতি-লিখন হওয়া দরকার। এস্থানে "কলম ছুঁইয়া" দেওয়া বা 'হাতের ছাপ' (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ) দেওয়ার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা পরবর্ত্তি-প্রথা মনে করা যায়। ঋণী ও সাক্ষীগণের স্বাক্ষর সমাপ্ত হইলে, সর্ব্বশেষে লেখক লিখিবেন—

"উভয়াভ্যর্থিতেনৈতৎ ময়া হ্যমুকসূনুনা।
লিখিতং হ্যমুকেনেতি লেখকোঽন্তেততো
লিখেৎ।

উভয়-(উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ-) পক্ষের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া, অমুকের পুত্র অমুক আমি দলীল লিখিতেছি, এই কথা সর্ব্বশেষে লেখক লিখিবেন। দলীল সম্বন্ধে বিশেষ কথা মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

"দেশাচারাবিরুদ্ধং যৎ ব্যক্তাধিবিধিলক্ষণম্।
তৎ প্রমাণং স্মৃতং লেখ্যং অবিলুপ্তক্রমাক্ষরং।"

যে লেখ্য দেশাচারাবিরুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে দেশ-প্রচলিত নিয়মের বহির্ভূত কোনও

'সুর্ত্ত' লেখা হয় নাই, আর যাহাতে আধি-বিধি স্পষ্টরূপে লেখা হইয়াছে (আধি অর্থ "বন্ধ" তাহার নিয়ম অর্থাৎ যাহা বন্ধকী দলীল—তাহাতে বন্ধকের বিবরণ বিশেষরূপে লিখিতে হইবে) যাহার অক্ষর-সমূহ বিলুপ্ত হয় নাই, সেই দলীল ধর্ম্মাধিকরণে প্রমাণ-স্বরূপে পরিগৃহীত হইবে। দলীলের সম্পাদন সাধুভাষা বা প্রাদেশিক ভাষায় যেরূপ ইচ্ছা করা যায়, তাহার বিশেষ বিধান নাই, কেবল লেখা সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই সকল দলীল সুস্থচিত্ত ব্যক্তিদ্বারা স্বেচ্ছামত সম্পাদিত হইলেই প্রমাণ-রূপে গণ্য হয়, অন্যথায় নহে। ব্যবস্থাতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি নারদের সংহিতায় দৃষ্ট হয়—

"মত্তাভিযুক্ত-স্ত্রীবাল-বলাৎকারকৃতং চ যৎ।
তদপ্রমাণং লিখিতং ভয়োপধিকৃতং তথা।"

মদমত্ত ব্যক্তিদ্বারা যে লেখ্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার প্রামাণ্য নাই। মদ্য পান করিয়া, বিকৃত মস্তিষ্কে যদি কোনও ব্যক্তি সর্ব্বস্ব দান করিয়া, দানপত্র প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তাহা হিন্দু-ধর্ম্মাধিকরণে কার্য্যকারী হইত না। অভিযুক্ত অর্থাৎ যে ব্যক্তির নামে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, যে সতত রাজ-পুরুষগণের তত্ত্বাবধানে আছে এবং যে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে, সে যদি রাজপুরুষগণের অজ্ঞাতে কোনও লেখ্য সম্পাদন করে, তাহার প্রামাণ্য থাকিবে না। 'বাল' অর্থাৎ অপ্রাপ্ত-ব্যবহার (নাবালক) এবং স্ত্রী (সধবা স্বামি-সত্ত্বে, তাঁহার অজ্ঞাতে এবং বিনানুমতিতে) ইহাদের অস্বতন্ত্রতাপ্রযুক্ত, ইহাদের দ্বারা সম্পাদিত দলীল কার্য্যকারী হইবে না। যে দলীল জোর করিয়া লিখাইয়া লওয়া হইয়াছে, কিম্বা যে দলীল ভয় দেখাইয়া কিম্বা ছল বিস্তার করিয়া সম্পাদন করা হইয়াছে, তাহার প্রামাণ্য থাকিবে না। "হ্যাণ্ডনোট" স্থলেও এ নিয়ম খাটিবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"বিনাপি সাক্ষিভির্লেখ্যং স্বহস্তলিখিতং তু যৎ।
তৎ প্রমাণং স্মৃতং লেখ্যং বলোপধিকৃতাৎ ঋতে।"

সাক্ষী ব্যতীতও স্বহস্ত-লিখিত দলীল আদালতে গৃহীত হইবে, কিন্তু বল বা ছলে নিষ্পাদিত হইলে, তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করা হইবে না। বহুস্থলে ঘটনা হয়—প্রবল-শক্তি ভূস্বামী দুর্ব্বল সম্বলহীন প্রজাকে পদাতিক দ্বারা ধরাইয়া আনেন এবং বলপূর্ব্বক দলীল লেখাইয়া লন্। 'খত্' ও 'হ্যাণ্ডনোট্' দুইই এরূপভাবে সম্পন্ন হইতে শুনা যায়। আদালতে দলীল দাখিল সম্বন্ধে ব্যবহারজ্ঞ মহর্ষির উক্তি—

"কর্ত্রা তু যৎ কৃতং কার্য্যং সিদ্ধ্যর্থং তস্য সাক্ষিণঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিবাদেষু স্বকৃতং বাথ লেখ্যকম্।"

কর্ত্তা যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত বিবাদ-সময়ে সাক্ষিগণ প্রবৃত্ত হন, অথবা নিজকৃত দলীল প্রবৃত্ত হয়। "কেহ কোনও ব্যক্তির নিকট কিছু ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, কাহাকেও কিছু দান করিয়াছেন, কাহারও নিকট কিছু বিক্রয় করিয়াছেন, কাহারও কাছে কিছু বন্ধক রাখিয়াছেন ইত্যাদি—যে কিছু কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তদ্‌বিষয়ে পরবর্ত্তিকালে বিবাদ সংঘটিত হইলে, অর্থাৎ যদি উত্তমর্ণ-অধমর্ণ, দাতা-গ্রহীতা, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে তদ্বিষয়ে বিসম্বাদ হয় এবং পূর্ব্বপক্ষ ধর্ম্মাধিকরণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন সাক্ষী বা স্বকৃত দলীলের দ্বারাই নিজকার্য্য প্রমাণিত হইবে। যদি অধমর্ণ গৃহীত ঋণ অস্বীকার করেন, তবে তাহার কার্য্যের জন্য, সাক্ষিগণ ও তৎপ্রদত্ত লেখ্য (খত্) তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ-স্বরূপ উপস্থিত হইবে। যদি দলীল অত্যন্ত জীর্ণ, ছিন্ন বা ব্যবহারাক্ষম হয়, তবে দলীল বদলাইতে হইবে। মহামুনি যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"দেশান্তরস্থে দুর্লেখ্যে নষ্টোন্মৃষ্টে হৃতে তথা।
ভিন্নে দগ্ধেঽথবা ছিন্নে লেখ্যমন্যত্তু কারয়েৎ।"

লেখ্য যদি অতিদূর দেশে থাকে, যাহা সম্প্রতি পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, সেরূপস্থলে অধমর্ণ দ্বারা অন্য লেখ্য প্রস্তুত করাইয়া লইবে। দলীলের অক্ষরাদি এত অস্পষ্ট ও বিকৃত হয়, যে তাহা পাঠ করিয়া, অর্থবোধের সম্ভাবনা নাই, সেরূপস্থলে অন্য দলীল নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। যদি বহুকাল পরে অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ হয় অথবা উন্মৃষ্ট হয় (পুঁছিয়া যায়) কিম্বা তস্করাদির দ্বারা অপহৃত হয়, অথবা ভিন্ন (বিদলিত) দগ্ধ (অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত) বা ছিন্ন (ছেঁড়া) হয়, তবে অন্যলেখ্য নির্ম্মাণ করাইবে। এই "দলীল বদ্‌লান" ব্যাপার অর্থী প্রত্যর্থী উভয়ের ইচ্ছা হইলেই হইবে, নচেৎ প্রত্যর্থী যদি অস্বীকার করে, তখন রাজদ্বারে প্রতীকার-চেষ্টা করিতে হইবে। দেশান্তরস্থ দলীল আনয়নের জন্য, বিচার-পতির নিকট আবেদন করিলে সময় পাওয়া যাইত। মহর্ষি নারদ এ বিষয়ে বলিয়াছেন,

"লেখ্যে দেশান্তরন্যস্তে শীর্ণে দুর্লিখিতে হৃতে।
সতস্তৎ কালকরণমসতোদ্রষ্টৃ দর্শনম্।"

দলীল যদি দেশান্তরে স্থিত হয়, শীর্ণ হয়, দুষ্পাঠ্য হয় কিম্বা অপহৃত হয়, তবে যে দলীল স্থানান্তরে আছে কিম্বা শীর্ণ ও দুষ্পাঠ্য হইয়াছে, তাহা আনিবার জন্য সময় নিতে হইবে, আর যে দলীল সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হইয়াছে, আর পাইবার প্রত্যাশা নাই, তাহা সাক্ষিদ্বারা নিরূপণ করিবে। যেখানে দলীলখানি বিনষ্ট হইয়াছে, সাক্ষিগণেরও জীবন-লীলা শেষ হইয়াছে, সেখানে দিব্য প্রমাণ আদৃত হইবে। মহর্ষি বলিয়াছেন,

"অলেখ্যসাক্ষিকে৹ দৈবীং ব্যবহারে বিনির্দ্দিশেৎ।"

লেখ্য বা সাক্ষী কিছুই যেখানে নাই, সেখানে দৈবীক্রিয়া বা দিব্যপ্রমাণ দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন করিতে হইবে। যদি দলীলের সত্যতা বিষয়ে সংশয় হয়, তবে কিরূপে নিরূপণ করিবে—তাহা মহর্ষি বলিতেছেন,—

"সন্দিগ্ধ-লেখ্য-শুদ্ধিঃ স্যাৎ স্বহস্তলিখিতাদিভিঃ।
যুক্তি-প্রাপ্তি-ক্রিয়া-চিহ্ন সম্বন্ধাগমহেতুভিঃ।"

সন্দিগ্ধ দলীল শোধন করিতে হইবে। কিরূপে শোধন হয়? উত্তর—স্বহস্ত-লিখিত, যুক্তি-প্রাপ্তি, ক্রিয়া, চিহ্ন, সম্বন্ধ—আগম এই সকল হেতুদ্বারা। দলীল অযথার্থ বোধ হইলে, যাহার দ্বারা লিখিত—তাহার অপর লেখার সহিত মিলাইয়া দেখিবে। যদি উভয় লেখা সদৃশ বোধ হয়, তবে দলীল 'যথার্থ' বলিয়া মনে করিবে। যে ব্যক্তি উত্তমর্ণ বলিয়া প্রকাশ—ঐ সময়ে তাঁহার তত টাকা দিবার সম্ভাবনা ছিল কিনা, এইরূপ বিচার "যুক্তি-প্রাপ্তি"। ক্রিয়া—সাক্ষিসমূহের দ্বারা দলীলের যথার্থতা প্রমাণ করান। চিহ্ন—অসাধারণ চিহ্ন; সে ব্যক্তি নাম লিখিতে গিয়া, নূতন যে একরূপ 'শ্রী' ব্যবহার করিত, সেইরূপ "শ্রী" যদি সন্দিগ্ধ দলীলে থাকে, তবে তাহাও যথার্থ দলীল মনে করিবে। সম্বন্ধ—মহাজন ও ঋণীর এতৎপূর্ব্বেও এই সম্বন্ধ ছিল,—অর্থাৎ বহুবার ইহাদের দান-গ্রহণ প্রচলিত আছে, সুতরাং ইহা সত্য প্রমাণ। আগম—উত্তমর্ণ তৎকালে এই এই উপায়ে অর্থ পাইতে পারিতেন সুতরাং তিনি ঋণ দিতে পারেন, অতএব দলীল যথার্থ, এইরূপ মনে করা। এই সকল হেতুদ্বারা সকল সময়ে সত্য নিরূপণ হয় না বটে, কিন্তু সাধারণতঃ ইহাই বিবেচনার বিষয়ীভূত হয়। তৎকালে জাল-দলীলের নাম ছিল "কূট-লেখ্য"। মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন,

"ন ময়ৈতৎ কৃতং পত্রং কূটং এতেন কারিতম্।
অধরীকৃত্য তৎপত্রং অর্থে দিব্যেন নির্ণয়ঃ।"

যদি কোনও দলীলে সংশয় উপস্থিত

হয়, তাহার কোন সাক্ষীও না থাকে; এরূপাবস্থায় যদি অধমর্ণ বলে যে, এই দলীল আমি সম্পন্ন করি নাই, এই ব্যক্তি কূট (জাল) করিয়াছে;—তবে বিচারে ঐ দলীল পরিত্যাগ করিয়া, দিব্য দ্বারা সত্যতা নির্ণয় করিতে হইবে। রাজকীয় লেখ্য ছিল, রেজিষ্ট্রী দলীলের নাম। যে সকল দলীল রাজার জ্ঞাতসারে তাঁহার সম্বন্ধে নিষ্পাদিত হইত, তাহার নাম "রাজকীয় লেখ্য"। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—

"রাজ্ঞঃ স্বহস্তসংযুক্তং স্বমুদ্রাপরিচিহ্নিতং।
রাজকীয়ং স্মৃতং লেখ্যং সর্ব্বেষর্থেষু সাক্ষিমৎ।"

রাজার স্বাক্ষরযুক্ত রাজমুদ্রা-(মোহর-) চিহ্নিত লেখ্য—"রাজকীয় লেখ্য" নামে অভিহিত হয়। এইরূপ লেখ্য সর্ব্ববিষয়েই হইতে পারে; এই লেখ্যে সাক্ষী থাকা প্রয়োজন। সকলবিষয়েই এইরূপ দলীল হইতে পারে এবং ইহার সাক্ষী প্রয়োজন হইবে, এরূপ নির্দ্দেশ করায় বুঝা যায়, ইহা রাজাদেশ-পত্র নহে। রাজাদেশে সাক্ষীর প্রয়োজন নাই, সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনেও রাজাদেশ পত্র প্রচারিত হয় না। যে সমস্ত দলীলের 'সর্ত্ত' রাজশাসনের অনুমত কিনা এ বিষয়ে সংশয় হয়, কিম্বা যেস্থানে অধিকার-নিশ্চয়ের ইচ্ছা হয়,সে সকল দলীল রাজার সভায় লিখিত ও মুদ্রাঙ্কিত হইবে,—ইহাই সঙ্গত নিয়ম মনে করা যায়। রাজকীয় জয়পত্র সম্বন্ধে বৃদ্ধ বশিষ্ঠের উক্তি এই—

"যথোপন্যস্তসাধ্যার্থ-সংযুক্তং সোত্তরক্রিয়ং।
সাবধারণকং চৈব জয়পত্রকমিষ্যতে।
প্রাড়্‌বিবাকাদি-হস্তাঙ্কং মুদ্রিতং রাজমুদ্রয়া।
সিদ্ধেঽর্থেবাদনে দদ্যাৎ জয়িনে জয়পত্রকম্।"

বাদী জয়লাভ করিলে, যথাযথ ভাবে পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর, সাধন ও অবধারণ এই চতুষ্পাদ বিচারের বিবরণ ও সারভূত জয়বার্ত্তা পত্রে লিখিয়া দিবে। প্রাড়্‌বিবাক সেই জয়পত্রে স্বাক্ষর করিবেন। তাহাতে রাজমুদ্রা (মোহর) অঙ্কিত করিয়া দিবে। এই জয়-পত্র অন্য আকারে অধুনাও প্রচলিত আছে। এইরূপ "হীনপত্র" প্রচলিত ছিল। অন্যবাদী (যে আবেদন সময়ে একরূপ বলে, বিচারকালে অন্যরূপ বলে সে) ক্রিয়াদ্বেষী (নিজের পরাজয়-সম্ভাবনায় যে ধর্ম্মাধিকরণ ও রাজার দোষ দেয় সে) অনুপস্থিত (মিথ্যা মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া,মোকর্দ্দমার দিনে যে উপস্থিত না হয় সে) নিরুত্তর (যে কোনও উত্তর দেয় না সে) আহূত-প্রপলায়ী (রাজকর্ত্তৃক আহূত হইয়া যে পলায়ন করে সে) এই পঞ্চবিধ ব্যক্তি 'হীন' নামে অভিহিত হইবে। ইহারা দণ্ডার্হ। এই সকল ব্যক্তির দণ্ডদানের জন্য রাজা "হীনপত্র" প্রচার করিবেন; তদ্দৃষ্টে ইহাদের শাস্তির ব্যবস্থা হইবে। লেখ্য সম্বন্ধে অপর বহু বক্তব্য আছে, সময়ান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

শ্রী——ভারতী——
ভারতী-কুটীর, প্রতাপকাটী—
যশোহর।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে দুই একটী কথা—এই নামে পূর্ব্বে হিন্দু-পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, লেখক তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। নামেই পুস্তকের পরিচয়। অধিকার-ভেদে সাধনার তিন পথ,—কর্ম্ম, জ্ঞান, ও ভক্তি। ত্রিবিধ মার্গেই গম্যস্থানে যাওয়া যায়। নিষ্কামকর্ম্ম, তত্ত্বজ্ঞান ও অহৈতুকী ভক্তি—এক রাজ্যেরই সামগ্রী। গুরুতর বিষয় সংক্ষেপে সুন্দর রূপে বলা দুষ্কর কার্য্য। লেখক সেজন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন, এবং বহুলাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এরূপ পুস্তকের অধিক প্রচার, হিন্দুসমাজের মঙ্গলজনক। পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কণ মনোরম। মূল্য।• আনা মাত্র।

১৮৩০, ১৩১৫।

গ্রাহক মহাশয়গণ !

☞ বর্ত্তমান বর্ষের দেয় মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮৩০।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ১৷০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য।৵০।

☞ পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য অবশ্য স্ব স্ব গ্রাহক-নম্বর দিবেন।

শ্রীশ্রীহরি।

(১৮৬৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা

১৫শ বর্ষ, ১৫শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। ভাদ্র। ১৩১৫ সাল, ১৮৩০ শকাব্দা।

যজুর্ব্বেদ—রুদ্রাধ্যায়।

নমস্তে রুদ্রমন্যব উতোত ইষবে নমঃ।
বাহুভ্যামুত তে নমঃ। ১

পদপাঠঃ। নমঃ। তে। রুদ্র। মন্যবে। উতো। তে। ইষবে। নমঃ। বাহুভ্যাং। উত। তে। নমঃ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার। তে—তোমার রুদ্র—(সম্বোধনে) হে রুদ্রদেব। মন্যবে—ক্রোধকে। উতো—এবং। তে—তোমার। ইষবে—বাণকে। নমঃ—নমস্কার। বাহুভ্যাং—বাহুদ্বয়কে। উত—ও। তে—তোমার। নমঃ—নমস্কার।

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারঃ। তে—তব। রুদ্র—দেবতাবিশেষ। মন্যবে—ক্রোধায়। উতো—অপিচ। তে—তব। ইষবে—বাণায়। নমঃ—নমস্কারঃ (অস্তু)। বাহুভ্যাং—দোর্ভ্যাং। উত—অপিচ। তে—তব। নমঃ—নমস্কারঃ অস্তু।

অন্বয়ঃ। হে রুদ্র তে মন্যবে নমঃ অস্তু। উতো (অপিচ) তে ইষবে নমঃ অস্তু। উত (অপিচ) তে বাহুভ্যাং নমঃ অস্তু।

মন্ত্রব্যাখ্যা। হে রুদ্র! (রুৎ দুঃখং দ্রাবয়তি, 'রু'গতৌ ইত্যস্মাৎ গত্যর্থানাং জ্ঞানার্থত্বাৎ রুৎ রবণং জ্ঞানং রাতি দদাতি, পাপিনো নরান্ দুঃখভোগেন রোদয়তি ইতি বা রুদ্রঃ।) তে তব মন্যবে ক্রোধায় নমঃ নমস্কারোঽস্তু। অপিচ তব ইষবে বাণায় নমঃ অস্তু, অপিচ তব বাহুভ্যাং নমঃ অস্তু। তব ক্রোধবাণহস্তাঃ অস্মদরিষেব প্রসরন্তু নাস্মাসু ইত্যর্থ ইতি মহীধরাচার্য্যঃ।

বঙ্গার্থঃ। হে রুদ্র! তোমার ক্রোধকে নমস্কার এবং তোমার বাণকে নমস্কার ও তোমার বাহুযুগলকে নমস্কার;—অর্থাৎ তোমার ক্রোধ, বাণ ও বাহুদ্বয় আমাদের শত্রুগণের প্রতি প্রসারিত হউক, অপিচ আমাদের নিকট হইতে নিবৃত্ত হউক।

আলোচনা। 'রুদ্র' শব্দের অর্থ যিনি 'রুৎ' (দুঃখ) বিদ্রাবিত (বিদূরিত) করেন অর্থাৎ দুঃখহারী। 'রু' ধাতুর অর্থ গতি বা জ্ঞান, সুতরাং. রুদ্র শব্দের অপর অর্থ—যিনি রুৎ বা জ্ঞান দান করেন, তাৎপর্য্যতঃ জ্ঞানপ্রদ। 'রুদ্' ধাতু হইতে রুদ্র পদ নিষ্পন্ন হইলে অর্থ হয়—যিনি পাপি-নরগণকে দুঃখ ভোগ দ্বারা রোদন করান। যিনি জগতের জ্ঞান-গুরু, যিনি পাপীর শাস্তা, সেই করুণাময় জ্ঞানময় ন্যায়বিচারক ভগবান্‌ই রুদ্র নামে অভিহিত হইতেছেন। কেহ কেহ এখানকার 'রুদ্র' শব্দে—গর্জ্জন-কারী "মেঘের অন্তরদেবতা" বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, গর্জ্জন দ্বারা তাঁহার ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যায়, উল্কাপাতাদি ঐ দেবতার বাণ, সমুদ্র ও নদী হইতে উত্থিত জলস্তম্ভ তাঁহার এক বাহু, বৃষ্টিধারাসমূহ অপর বাহু। মেঘের অন্তর-দেবতার সংহারমূর্ত্তি অপসারিত করিবার জন্য প্রার্থনা করা হই-তেছে। সংহারকের ক্রোধ, বাণ ও বাহুবল প্রয়োজন, সুতরাং মেঘ-দেবতার গর্জ্জন, উল্কা-পাত ও জলস্তম্ভাদি উপদ্রব-মূর্ত্তিকে নম-স্কার করিয়া, তাৎপর্য্যতঃ তাহাদের তিরোধান কামনা করা হইতেছে। কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, কি শক্তি কি কার্য্য, কি বাহ্য কি আন্তর—সর্ব্ববিধ ভাবেই রুদ্র দেবতার বর্ণনা করা হইতেছে।

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপ-কাশিনী। তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি। ২

পদপাঠঃ। যা। তে। রুদ্র ! শিবা। তনূঃ। অঘোরা। অপাপকাশিনী। তয়া। নঃ। তন্বা। শন্তময়া। গিরিশন্ত। অভিচাকশীহি।

পদব্যাখ্যা। যা—যে। তে—তোমার। রুদ্র—হে রুদ্র ! শিবা—মঙ্গলরূপা শান্তা। তনূঃ—মূর্ত্তি শরীর। অঘোরা—সৌম্যা। অপাপকাশিনী—পুণ্য-ফলদা। তয়া—সেই (তনূদ্বারা)। নঃ—আমাদিগকে। তন্বা—শরীর বা মূর্ত্তিদ্বারা। শন্তময়া—সুখময়ী-মূর্ত্তিদ্বারা। গিরিশন্ত! হে গিরিশন্ত। অভিচাকশীহি—নিরীক্ষণ কর।

পদপরিবর্ত্তনম্। তে—তব। রুদ্র—হে রুদ্রদেব। শিবা—শান্তা। তনূঃ—দেহঃ। অঘোরা—অবিষমা। অপাপকাশিনী—পুণ্য-প্রকাশিকা। তয়া-'উক্তয়া'। নঃ—অস্মান্। তন্বা—মূর্ত্ত্যা। শন্তময়া—সুখতময়া। গিরি-শন্ত ! কৈলাসস্থ মঙ্গলপ্রদ ! অভিচাকশীহি—অভিপশ্য।

অন্বয়ঃ। হে রুদ্র। তে (তব) যা শিবা অঘোরা অপাপকাশিনী তনূঃ (অস্তি), হে গিরিশন্ত ! তয়া শন্তময়া তন্বা (অস্মান্) নঃ অভিচাকশীহি।

মন্ত্রব্যাখ্যা। হে রুদ্র ! তব যা শিবা মঙ্গলময়ী শান্তা অঘোরা অবিষমা অপাপকাশিনী (পাপং অশুভং কাশয়তি প্রকাশয়তি পাপ-কাশিনী,ন পাপকাশিনী অপাপকাশিনী, যা পুণ্য-ফলমেব দদাতি ন পাপফলং ইত্যর্থঃ ইতি মহীধরঃ।) পুণ্যপ্রদা তনূঃ শরীরং মূর্ত্তিঃ—তয়া তাদৃশ্যা শন্তময়া সুখতময়া তন্বা হে গিরি-শন্ত ! (গিরৌ কৈলাসে স্থিতঃ শং সুখং প্রাণিনাং তনোতি বিস্তারয়তি ইতি গিরিশন্তঃ, গিরি বাচি স্থিতঃ শং তনোতীতি, গিরৌ মেঘে স্থিতঃ বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ শং তনোতি, গিরৌ শেতে গিরিশঃ অসতি গচ্ছতি জানাতীতি অর্থঃ

সর্ব্বজ্ঞঃ, গিরিশশ্চাসৌ অন্তশ্চেতি গিরিশন্তঃ, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ অকারলোপঃ।) নঃ অস্মান্ অভিচাকশীহি অভিপশ্য।

বঙ্গার্থঃ। হে রুদ্র! তোমার যে মূর্ত্তি কল্যাণরূপা ও পুণ্যস্বরূপা সৌম্যা মঙ্গল-দায়িনী,—হে গিরিশন্ত! সেই মূর্ত্তির দ্বারা আমাদিগকে অবলোকন কর। (তাৎপর্য্যতঃ—তোমার উগ্রমূর্ত্তি বা ভীষণরূপে যেন আমাদের দর্শন না দেও। আমরা সৌম্যরূপ দেখিতে বাসনা করি।)

আলোচনা। 'গিরিশন্ত' শব্দের নানা অর্থ—যিনি গিরিতে অর্থাৎ কৈলাশপর্ব্বতে থাকিয়া শিবরূপে জীবগণের শং বা মঙ্গল বিস্তার করেন, তিনি গিরিশন্ত। যিনি গিরি অর্থাৎ বাক্যে অবস্থিত হইয়া শং বা কল্যাণ বিস্তার করেন তিনি গিরিশন্ত। শিব সর্ব্ববিধ শব্দের আশ্রয় এবং শঙ্করী অর্থসমূহের অধীশ্বরী, এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, রুদ্র সকল শব্দে বিদ্যমান থাকিয়া, জগতের মঙ্গল বিস্তার করেন।* অন্যভাবে স্তববাক্যে বাক্যার্থস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অর্থাৎ স্তুত হইয়া, যিনি মঙ্গল বিধান করেন তিনিই গিরিশন্ত। গিরিতে অর্থাৎ মেঘে অবস্থিত থাকিয়া, বৃষ্টি প্রভৃতিরূপে ভূমণ্ডলের অশেষ মঙ্গলসাধন করেন বলিয়াও গিরিশন্ত। গিরিশ+অন্ত=গিরিশন্ত। গিরিশ যিনি গিরিতে (বুদ্ধিতে বা হৃদয়ে) শয়ন করেন ও অন্ত অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ (জ্ঞানার্থক 'অম' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ে 'অন্ত' পদ সিদ্ধ হইয়াছে।) তিনিও গিরিশন্ত কৈলাশাচলের দেবতা, বাক্যের দেবতা, মেঘের দেবতাও হৃদয়স্থ সর্ব্বজ্ঞদেবতা এ সকলই একের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। রুদ্রদেবতার মেঘশরীরের উদয় প্রার্থনীয়, কিন্তু মেঘের যে সৌম্য মূর্ত্তি কৃষ্যাদির হিতসাধিকা তাহাই ভক্ত দেখিতে চাহেন। যে ভীমমূর্ত্তি ঝঞ্চা, প্লাবন, প্রভৃতি অনিষ্ট আনয়ন করে, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন না।

যামিষুঙ্গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মাহিংসীঃ
পুরুষং জগৎ। ৩

পদপাঠঃ। যাম্। ইষুং। গিরিশন্ত। হস্তে। বিভর্ষি। অস্তবে। শিবাং। গিরিত্র। তাং। কুরু। মা হিংসীঃ। পুরুষং। জগৎ।

পদব্যাখ্যা। যাং—যে। ইষুং—বাণকে। গিরিশন্ত—হে হৃদ্‌গত সর্ব্বজ্ঞ! হস্তে—করে। বিভর্ষি—ধারণ কর। অস্তবে—শত্রুগণের প্রতি ক্ষেপনার্থ। শিবাং—শান্ত। গিরিত্র! কৈলাস-পর্ব্বতস্থ জীবত্রাতা! তাং—তাহাকে। কুরু—কর। মা হিংসীঃ—বিনাশ করিও না। পুরুষং—পুত্রপৌত্রাদি। জগৎ—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড।

পদপরিবর্ত্তনম্। যাং—যং। ইষুং শরং। গিরিশন্ত-কৈলাসস্থ মঙ্গলপ্রদ! হস্তে—করে। বিভর্ষি—ধারয়সি। অস্তবে—অসিতুং ক্ষেপ্তুং। গিরিত্র! হে গিরিস্থ রক্ষক! শিবাং—কুশল-কারিণীং। তাং—তং। কুরু—বিধেহি। মা হিংসীঃ—মা বধীঃ। পুরুষং—পুংসন্তানং। জগৎ—চরাচরাত্মক-বিশ্বং।

অন্বয়ঃ। হে গিরিশন্ত ত্বং অস্তবে যাং ইষুং হস্তে বিভর্ষি হে গিরিত্র তাং শিবাং কুরু পুরুষং জগৎ মা হিংসীঃ।

* শব্দজাতমশেষন্ত ধত্তে মুদ্রেন্দুশেখরঃ।
অর্থজাতমশেষন্ত শঙ্করপ্রাণবল্লভা।

মন্ত্রব্যাখ্যা। হে গিরিশন্ত! যাং ইষুং বাণং হস্তে করে অস্তবে ক্ষেপ্তুং (অসু-ক্ষেপণে তুমর্থে 'তবে' প্রত্যয়ঃ অসিতুং শত্রুন্ ক্ষেপ্তুমিত্যর্থ ইতি মহীধরঃ।) বিভর্ষি—বহসি, হে গিরিত্র! (গিরৌ কৈলাশে স্থিতঃ ভূতানি ত্রায়ত ইতি) তামিষুং শিবাং কল্যাণপ্রদাং সম্পাদয়। কিঞ্চ পুরুষং পুত্রপৌত্রাদিকং জগৎ (জঙ্গমমন্যদপি গবাশ্বাদিকং ইতি মহীধরা-চার্য্যঃ।) মাহিংসীঃ ন বিনাশয়।

বঙ্গার্থঃ। হে গিরিশন্ত! শত্রুগণের প্রতি নিঃক্ষেপ করিবার জন্য (অথবা জগৎ বিনাশ করিবার জন্য) যে বাণ তুমি করে ধারণ করিয়াছ, হে গিরিত্র! ঐ বাণকে শান্ত কর, পুরুষ ও জগৎ বিনষ্ট করিও না।

আলোচনা। 'গিরিত্র' অর্থ—যিনি কৈলাস পর্ব্বতে বর্ত্তমান থাকিয়া, জীবগণকে রক্ষা করেন সেই শিব। কোনও মতে, পর্ব্বতোপরি উদিত মেঘমালার অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া, যিনি জগতের কল্যাণ কামনা করেন তিনি গিরিত্র। ভগবানের দুই ভাব. সৌম্য ও তীব্র বা উগ্রভাব। শত্রুসংহারক বিশ্ববিনাশক বাণ-ধারী রুদ্রদেবের উগ্রভাব চিন্তা করিয়া, ভক্ত ভীতচিত্তে রুদ্রশরকে শান্ত করিতে বলিতে-ছেন। এ মন্ত্রে বিনাশ-মূর্ত্তির তিরোধান ও সৌম্যমূর্ত্তির আবির্ভাব কামনা করা হই-তেছে। শ্রীগীতায় দৃষ্ট হয়—শ্রীভগবানের দংষ্ট্রা-করাল ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, ভীতমনাঃ অর্জ্জুন ভীষণভাব পরিহার পূর্ব্বক শান্তমূর্ত্তি ধারণে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন। সর্ব্বত্র এই একই ভাবের বিকাশ।

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছাবদামসি। যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগৎ অযক্ষ্মং সুমনা অসৎ। ৪

পদপাঠঃ। শিবেন। বচসা। ত্বা। গিরিশ। অচ্ছ। বদামসি। যথা। নঃ। সর্ব্বং। ইৎ। জগৎ। অযক্ষ্মং। সুমনাঃ। অসৎ।

পদব্যাখ্যা। শিবেন—মঙ্গলময় (দ্বারা)। বচসা—স্তুতিবাক্যদ্বারা। ত্বা—তোমাকে। গিরিশ—হে রুদ্র! অচ্ছাবদামসি—প্রার্থনা করিতেছি। যথা—যেমতে। নঃ—আমা-দিগের। সর্ব্বং—সমস্ত। ইৎ—বিনাশশীল। জগৎ—বিশ্ব—তাৎপর্য্যতঃ নিখিল জীবসর্গ। অযক্ষ্মং—নীরোগ। সুমনাঃ—সুচিত্ত। অসৎ—হয়। (তাহাই কর)।

পদপরিবর্ত্তনম্। শিবেন—মঙ্গলাত্মকেন। বচসা—স্তোত্রেন বচনেন। ত্বা—ত্বাং। গিরিশ! গিরিস্থকল্যাণপ্রদ! অচ্ছাবদামসি—প্রার্থয়ামহে। যথা—যেন প্রকারেণ। নো—হস্মাকং। সর্ব্বং—সকলং। ইৎ—(এতি গচ্ছ-তীতি ইৎ) বিনাশি, (মহীধর-মতে) এব। জগৎ—জঙ্গমং। অযক্ষ্মং—রোগবিহীনং। সুমনাঃ—শোভনমনস্কং। অসৎ—ভবতি।

অন্বয়ঃ। হে গিরিশ! শিবেন বচসা ত্বা অচ্ছাবদামসি। যথা নঃ সর্ব্বমেব জগৎ অযক্ষ্মং সুমনাঃ চ অসৎ (তথা কুরু ইতি শেষঃ।)

মন্ত্রব্যাখ্যা। হে গিরিশ! (গিরৌ কৈলাশে শেতে শিবরূপেণ, গিরৌ পর্ব্বত-শিখরে শেতে উদেতি মেঘরূপেণ) শিবেন—শান্তেন বচসা স্তববাক্যেন ত্বাং অচ্ছা প্রাপ্তুং বদামসি বদামঃ প্রার্থয়ামহে ইত্যর্থঃ।

(অচ্ছাভে রাপ্ত মিতি শাকপূণিঃ। সংহিতায়াং নিপাতস্চ ইতি দীর্ঘঃ। ইদন্তোসসি ইতি মহীধরঃ।) কিং বদাম ইত্যাপেক্ষায়ামাহ যথা যেন রূপেন নো হস্মাকং সর্ব্বমিৎ (সর্ব্বমেবেতি মহীধরঃ।) সর্ব্বং বিনাশশীলং জগৎ বিশ্বং (জগমাঃ নয়াঃ পর্ব্বাদি চ ইতি মহীধরঃ।) অযক্ষ্মং—যক্ষ্মনা রুজা অনভিভূতং সুমনাঃ—স্বচ্ছচিত্তং (জগদিত্যস্য বিশেষণং সুমনাঃ পদং, ক্লীবতা হু চিত্তা, পুংস্ত্বমার্ষং।) অসৎ—ভবতি (অসদিতি লেটোহডটব্বিত্যাট্ ইলোপঃ।) (তথা বিধেহীতি শেষঃ।)

বঙ্গার্থঃ। হে গিরিশ! আমরা স্তুতিবাক্যে তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে আমরা ও এই সমগ্র বিনাশস্বভাব জগৎ সুস্থচিত্ত ও রোগশূন্য হইতে পারে, (তাহাই কর।)

আলোচনা। 'গিরিশ' শব্দে কৈলাশ-পর্ব্বতশায়ী ভগবান্ শিবকে বুঝায়। গিরিতে পর্ব্বতপৃষ্ঠে যিনি মেঘাকারে উদিত হন' তিনি ও গিরিশ। গিরি অর্থাৎ হৃদয়-গিরি-গুহায় (বুদ্ধিতে) যিনি অবস্থান করেন, তিনিও সর্ব্বান্তরস্থ ভগবান্ গিরিশ। কৈলাশ-পতি ও মেঘ-দেবতা স্বীয় দৈব শক্তিতে সুবৃষ্টির দ্বারা ও সর্ব্বান্তর্যামী স্বমহিমায় জগৎ সুস্থচিত্ত ও রোগহীন করিতে পারেন। এই মন্ত্রে জীব-জগতের মানসিক শান্তি ও কায়িক কল্যাণের প্রার্থনা করা হইতেছে।

অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যোভিষক্। অহীংশ্চ সর্ব্বান্ জম্ভয়ন্ সর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যঃ অধরাচীঃ পরাসুব। ৫

পদপাঠঃ। অধ্যবোচৎ। অধিবক্তা। প্রথমঃ। দৈব্যঃ। ভিষক্। অহীন্। চ। সর্ব্বান্। জম্ভয়ন্। সর্ব্বাঃ। চ। যাতুধান্যঃ। অধরাচীঃ। পরাসুব।

পদব্যাখ্যা। অধ্যবোচৎ—আমাকে সকলের অধিক্ বলুন্। অধিবক্তা—অধিক বক্তা। প্রথমঃ—সকলের পূজ্য। দৈব্যঃ—দেবতাগণের হিতকর। ভিষক্—চিকিৎসক। অহীন্—সর্প-গণকে। চ—এবং। সর্ব্বান্—সকলকে। জম্ভয়ন্—বিনাশ করিয়া। সর্ব্বাঃ—সকলকে। চ—ও। যাতুধান্যঃ—যাতুধানী বা রাক্ষসীদিগকে। অধরাচীঃ—অধোগমনশীলা বা হীনচিত্তা-(দিগকে)। পরাসুব—বিতাড়িত কর।

পদপরিবর্ত্তনম্। অধ্যবোচৎ—অধিবক্তু। অধিবক্তা—অধিকবদনশীলঃ। প্রথমঃ—সর্ব্বেষাং মুখ্যঃ। দৈব্যঃ—দেবেভ্যোহিতঃ। ভিষক্—রোগাপহঃ। অহীন্—সর্পাদীন্। চ—অপি। সর্ব্বান্—সকলান্। জম্ভয়ন্—নাশয়ন্। সর্ব্বাঃ—সকলাঃ। যাতুধান্যঃ—যাতুধানীঃ রাক্ষসীঃ। অধরাচীঃ—অধোগমনস্বভাবাঃ নিকৃষ্টচিত্তাঃ বা। পরাসুব—পরাক্ষিপ।

অন্বয়ঃ। (রুদ্রঃ মাং) অধ্যবোচৎ,। (কীদৃশঃ সঃ ইতি জিজ্ঞাসায়াং) অধিবক্তা প্রথমঃ দৈব্যঃ ভিষক্। (হে রুদ্র!) সর্ব্বান্ অহীংশ্চ জম্ভয়ন্ সর্ব্বাশ্চ অধরাচীঃ যাতুধানীঃ পরাসুব।

মন্ত্র-ব্যাখ্যা। অধ্যবোচৎ—মাং সর্ব্বাধিকং বদতু রুদ্রঃ। (তেনোক্তে মম সর্ব্বাধিক্যং ভবেদিতি ভাবঃ)। (সঃ রুদ্র কীদৃক্ ইত্যাহ) অধিবক্তা—অধিকং বদতি যঃ সঃ। প্রথমঃ—আদিমঃ দৈব্যঃ দেবহিতঃ। ভিষক্—রোগ-

স্মাপুকঃ। (স্মরণেনৈব রোগনাশাদ্ভিষক্ত্বং ইতি মহীধরঃ) আদৌ পরোক্ষমুক্ত্বা প্রত্যক্ষমাহ হে রুদ্র! ত্বং সর্বান্ অহীন্—সর্পব্যাঘ্রাদীন্ অহিতকরান্ জময়ন্ নাশয়ন্ সর্বাশ্চ যাতুধন্যঃ—যাতুধানীঃ রাক্ষসীঃ— (দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা) অধরাচীঃ—অধরে দেশে অঞ্চতীতি অধোগামিনীঃ অধমচিত্তাঃ বা পরাসুব অস্মত্তো দূরীকুরু। 'চ' সমুচ্চয়ে—সর্পনাশ-রাক্ষসীক্ষেপৌ সহৈব কুরু ইত্যর্থ ইতি মহীধরাচার্যাঃ।

বঙ্গার্থঃ। সর্বপূজ্য দেবহিত রোগনাশক রুদ্রদেব আমাকে সকলের শ্রেষ্ঠ বলুন। হে রুদ্র! তুমি এক সঙ্গে সর্পাদি বিনাশ করিয়া, হীনচিত্তা রাক্ষসীসকলকে বিতাড়িত কর।

আলোচনা। প্রথমে সাধকের কাছে দেবতা অপ্রকাশিত থাকেন, পরে স্তবাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ হন। এ মন্ত্রে প্রথমে "রুদ্র করুন" এইরূপ পরোক্ষ উল্লেখ করা হইয়াছে। পরার্দ্ধে 'হে রুদ্র! বিদূরিত কর" এইরূপ প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। প্রত্যক্ষ ব্যক্তিকে 'তুমি কর' বলা যায়, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ ব্যক্তিকে 'তিনি করুন' বলিতে হয়। এই মন্ত্রে রুদ্রকে অধিবক্তা আদিদেব, দেববলের হিতকর ও স্মরণ মাত্রেই সর্বব্যাধি-নাশক বলা হইয়াছে। রুদ্র আমাকে শ্রেষ্ঠ বলুন—বলার তাৎপর্য্য এই যে, রুদ্র সত্যবাদী. তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিলেই আমি শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিব। ক্রূরচিত্ত রাক্ষসীগণকে দূর কর, সর্পাদিকে বিনাশ কর, এই প্রার্থনায় রুদ্রদেবের অহিতনিবারণী শক্তির কথা বলা হইয়াছে। এখানে মেঘ-দেবতা রুদ্র শব্দের লক্ষ্য মনে করিলে, অতি-বৃষ্টিতে যে শস্য-হানি, স্বাস্থ্য-হানি, রোগোৎপত্তি, সর্পাদির প্রাবল্য ও মহামারী জনিত রাক্ষস-প্রেতভীতির উদয় হইতে পারে, সু বৃষ্টিদ্বারা স্বাস্থ্য-সাধন, সর্পাদি-বিনাশ ও প্রেত দূরীকরণাদি দ্বারা তাহার নিরাকরণ প্রার্থনা করা হইতেছে।

অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশো বৈষাং হেড়-ঈমহে। ৬

পদপাঠঃ। অসৌ। যঃ। তাম্রঃ। অরুণঃ। উত। বভ্রুঃ। সুমঙ্গলঃ। যে। চ। এনং। রুদ্রাঃ। অভিতঃ। দিক্ষু। শ্রিতাঃ। সহস্রশঃ। বা। এষাং। হেড়ঃ। ঈমহে।

পদব্যাখ্যা। অসৌ—ঐ। যঃ যে। তাম্রঃ—অত্যন্ত রক্তবর্ণ। উত—এবং। বভ্রুঃ—পিঙ্গলবর্ণ। সুমঙ্গলঃ—মঙ্গলময়। যে—যাহারা। চ—আর। এনং—ইহাকে। রুদ্রাঃ—দেবগণ বা কিরণসমূহ। অভিতঃ—দিক্ষু—সকলদিকে। শ্রিতাঃ—অবস্থিত আছে। সহস্রশঃ—অসংখ্য। এষাং—ইহাদিগের। হেড়ঃ—ক্রোধ। ঈমহে—দূর করিব।

পদপরিবর্ত্তনম্। অসৌযঃ দৃশ্যঃ। তাম্রঃ—অত্যন্ত-রক্তঃ। অরুণঃ—সামান্যতো লোহিতঃ। উত—অপিচ। সুমঙ্গলঃ—শোভন মঙ্গলপ্রবর্ত্তকঃ। এনং—অমুং। রুদ্রাঃ—কিরণানি নক্ষত্রস্থাঃ দেবতাঃ বা। অভিতঃ—সর্বতঃ। দিক্ষু—আশাসু। শ্রিতাঃ—অধিষ্ঠিতাঃ। সহস্রশঃ—অসংখ্যেয়াঃ। বা—অপি। এষাং—রুদ্রাণাং। হেড়ঃ—ক্রোধং কোপং। ঈমহে—নিরাকুর্মঃ।

অন্বয়ঃ। যো হসৌ রুদ্রঃ সুমঙ্গলঃ তাম্র অরুণঃ বভ্রুশ্চ (ভবতি) যে চ সহস্রশঃ রুদ্রাঃ

এবং রুদ্রং অভিতঃ দিক্ষু শ্রিতাঃ এষাং (তস্য) চ হেড়ঃ (বয়ং) ঈমহে।

মন্ত্রব্যাখ্যা। যো অসৌ সবিতৃরূপঃ প্রত্যক্ষঃ রুদ্রঃ উদয়সময়ে তাম্রঃ অস্তগমনসময়ে অরুণঃ (অত্র কেচিৎ উদয়েঽরুণঃ অস্তসময়ে তাম্র ইত্যাহুঃ।) মধ্যাহ্নে পিঙ্গলবর্ণঃ—চ ভবতি যঃ সকলকুশল-প্রবর্ত্তকঃ (বভ্রুদয়ে সর্ব্বমঙ্গলপ্রবর্ত্তনাৎ ইতি মহীধরাচার্য্যাঃ।) এবং আদিত্যং অভিতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু শ্রিতাঃ—অভিনিবিষ্টাঃ যে চ সহস্রশঃ রুদ্রাঃ কিরণরূপেণ (নক্ষত্রশ্রিতাশ্চ যে দেবাঃ 'দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি ইতি শ্রুতেঃ।) নক্ষত্ররূপেণ বা তেষাং সর্ব্বেষাং তস্য চাদিত্যস্য হেড়ঃ কোপং অস্মদপরাধজং ঈমহে বয়মস্য নিবারয়ামঃ ভক্ত্যা নিরাকুর্ম্মঃ। (হেড়ঃ ইতি ক্রোধ নাম ইতি নিরুক্তম্।)

বঙ্গার্থঃ। ঐ যে মঙ্গলময় আদিত্য-স্বরূপ রুদ্র কখনও তাম্রবর্ণ, কখনও অরুণ বর্ণ এবং কখনও পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিতেছেন, আর ঐ যে উঁহার সকলদিকে সহস্র২ রুদ্রগণ কিরণরূপে বিদ্যমান আছে, ইহাদের সকলেরই কোপ দূর করিব। (ভক্তি দ্বারা ইহাদিগের নিকট ক্ষমা লাভ করিব এই-রূপ তাৎপর্য্য।)

আলোচনা। এইমন্ত্রে রুদ্র-দেবতাকে সূর্য্যরূপে ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বা কিরণমালারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। রুদ্র-দেব বিশ্ববিভূতিমান্ ইহাই সমগ্র রুদ্রাধ্যায়ের রহস্য। রুদ্রের স্নেহপ্রাকৃতিক মেঘরূপ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সম্প্রতি তেজঃস্বভাব রবি-রূপের বর্ণনা দ্বারা, 'জগতের সমস্তভাবই রুদ্রবিভূতি' বলা হইতেছে। নক্ষত্র-সমূহে রুদ্রগণ বিরাজ করিতেছেন,—কিরণ-রূপে তাঁহারাই বিরাজিত, ইহা শাস্ত্রসম্মত। দেবতারা কিরণশরীর বলিয়া 'কিরণদেহ' নামে অভিহিত হন। নক্ষত্রসকল দেব-গণের বাসগৃহ, বেদ বলেন, 'দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি।' প্রকৃতপ্রস্তাবে মেঘে বিদ্যুতে, বজ্রে সূর্য্যে, কিরণে, নক্ষত্রে সর্ব্বত্র যে একই দেবতার এক মহাশক্তির বিকাশ, রুদ্রাধ্যায়ে তাহাই প্রকৃষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মহীধর বলেন,—আদিত্য উদয়সময়ে তাম্র-(অত্যন্ত রক্ত) বর্ণ, অস্তকালে অরুণ-(লোহিত) বর্ণ ও মধ্যাহ্নসময়ে পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করেন। কেহ২ বলেন, উদয়ে অরুণ-বর্ণ, অস্তকালে তাম্রবর্ণ এবং গ্রহণ সময়ে আদিত্যমণ্ডল পিঙ্গলবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অসৌ যোঽবসর্পতি নীল-গ্রীবো বিলোহিতঃ। উতৈনং গোপা অদৃশ্রন্নদৃশ্রন্নুদহার্য্যঃ সদৃষ্টো মৃড়য়াতি-নঃ। ৭

পদপাঠঃ। অসৌ। যঃ। অবসর্পতি। নীলগ্রীবঃ। বিলোহিতঃ। উত। এনং। গোপাঃ। অদৃশ্রন্। অদৃশ্রন্। উদহার্য্যঃ। সঃ। দৃষ্টঃ। মৃড়য়াতি। নঃ।

পদব্যাখ্যা। অসৌ—ঐ। যঃ—যে। অব-সর্পতি—নিরন্তর গমন করিতেছেন। নীল-গ্রীবঃ—নীলকণ্ঠ। বিলোহিতঃ—অতিরক্ত-বর্ণ। উত—ও। এনং—ইহাকে। গোপাঃ—রাখালগণ অদৃশ্রন্—দর্শন করে। উদহার্য্যঃ—জলানয়ন-কারিণী নারীসকল। সঃ—তিনি। দৃষ্টঃ—অবলোকিত হইয়া। মৃড়য়াতি—সুখী করুন্। নঃ—আমাদিগকে।

পদ-পরিবর্ত্তনং। যোহসৌ—দৃশ্যঃ। অবসর্পতি—নিরন্তরং গচ্ছতি। নীলগ্রীবঃ—নীলকণ্ঠঃ। বিলোহিতঃ—বিশেষেণ রক্তঃ। উত—অপি। এনংরুদ্ররূপং রবিং। গোপাঃ—গোচারকাঃ। অদৃশ্রন্—অবলোকয়ন্তি। উদহার্য্যঃ—সলিলগ্রাহিণ্যঃ রমণ্যঃ। সঃ—রুদ্রঃ রবিঃ। দৃষ্টঃ—অবলোকিতঃ। মৃড়য়াতি—সুখয়তু। নঃ—অস্মান্।

অন্বয়ঃ। যোহসৌ নীলগ্রীবঃ বিলোহিতঃ আদিত্যঃ অবসর্পতি, যং এনং গোপা উত (অপি) অদৃশ্রন্ উদহার্য্যাশ্চ অদৃশ্রন্ স দৃষ্টঃ নঃ মৃড়য়াতি।

মন্ত্রব্যাখ্যা। যোহসৌ রবিঃ প্রতিদিনং উদয়াস্তময়ৌ কুর্ব্বন্ নিরন্তরং গচ্ছতি, যঃ নীলগ্রীবঃ, (বিষধারণেন নীলা গ্রীবা কণ্ঠঃ যস্য সঃ) অস্তময়ে নীলকণ্ঠইব লক্ষ্যঃ, বিলোহিতঃ বিশেষেণারুণঃ, এনং রবিং গোপালাঃ উত সংস্কারহীনাঃ অপি অদৃশ্রন্ পশ্যন্তি,অপিচ উদহার্য্যঃ-(উদকং হরন্তি তাঃ, উদকস্যোদাদেশঃ ইতি মহীধরঃ।) জলহারিণ্যঃ যোষিতঃ অদৃশ্রন্ পশ্যন্তি (দৃশের্লাঙ ইরিতোবেতি চ্লেরঙ্ রুগাগমশ্ছান্দসঃ।) যঃ আগোপাল।ঙ্গনাপ্রসিদ্ধঃ- স রুদ্রঃ দৃষ্টঃসন্অস্মান্ মৃড়য়াতি সুখয়তু, অসৌ মণ্ডলবর্ত্তী রুদ্রএব তপতীতি জ্ঞাতঃ সুখং করোতু ইত্যর্থঃ ইতি মহীধরাচার্য্যাঃ।

বঙ্গার্থঃ। ঐ যে নীলকণ্ঠ লোহিতবর্ণ আদিত্য নিরন্তর গমন করিতেছেন। যাহাকে গোপগণ-ও জলপূর্ণকলসবাহিনী রমণীরাও অবলোকন করিতেছে, তিনি অবলোকিত হইয়া আমাদিগকে সুখী করুন্।

আলোচনা। এই মন্ত্রে বলা হইতেছে যে, সূর্য্যকে বৈদিকসংস্কারবিহীন রাখাল ও যাহারা জল-কলসী কক্ষে লইয়াছে সেই রমণীরা প্রতিদিন দর্শন করিতেছে, অর্থাৎ যিনি অশিক্ষিত গোপ ও অনভিজ্ঞ নারীকুলেরও দৃষ্টিগোচর হন এবং অস্তসময়ে সুলোহিতবর্ণ হইয়াও আকাশের গাঢ়নীলরাগে শোভিত হইয়া, যিনি বিষকণ্ঠ মহাদেবের ন্যায় দৃষ্ট হয়েন, সেই আদিত্য-স্বরূপ রুদ্র আমাদিগকে সুখী করুন্। আদিত্য-মণ্ডলে অবস্থিত হইয়া রুদ্রই তাপপ্রদান করেন,—ইহাই এমন্ত্রের রহস্য।

নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে। অথো যে অস্য সত্বানো হহন্তেভ্যোঽকরব' নমঃ। ৮

পদপাঠঃ। নমঃ। অস্তু। নীলগ্রীবায়। সহস্রাক্ষায়। মীঢ়ুষে। অথো। যে। অস্য। সত্বানঃ। অহং। তেভ্যঃ। অকরমং। নমঃ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার। অস্তু হউক। নীলগ্রীবায়—নীলকণ্ঠকে। সহস্রাক্ষায়—ইন্দ্রকে। মীঢ়ুষে—বৃষ্টিকর্ত্তাকে। অথো—এবং। যে—যাহারা। অস্য—ইহার (রুদ্রের)। সত্বানঃ—ভৃত্যবর্গ। অহং—আমি। তেভ্যঃ—তাহাদিগকেও। অকরবং—করি। নমঃ—নমস্কার।

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারঃ। অস্তু—ভবতু। নীলগ্রীবায়—রুদ্রায়। সহস্রাক্ষায়—ইন্দ্রায়। মীঢ়ুষে—পর্জ্জন্যায় বরুণায় বা। অথো—অপিচ। অস্য—রুদ্রস্য। সত্বানঃ—প্রাণিনঃ পার্ষদাঃ। তেভ্যঃ—ভৃত্যেভ্যঃ। অকরবং—করোমি। নমঃ—নমস্কারং।

অন্বয়ঃ। নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে নমঃ অস্তু। অথো (অপিচ) যে অস্য সত্বানঃ (বিদ্যন্তে) অহং তেভ্যঃ নমঃ অকরবম্।

মন্ত্রব্যাখ্যা। নীলকণ্ঠস্বরূপায় সহস্রাক্ষায় (সহস্রমক্ষীণি যস্য তস্মৈ) ইন্দ্রাত্মকায় মীঢ়ুষে - সেক্তে বৃষ্টিকর্ত্রে বরুণায় পর্জ্জন্যায় বা ('মিহ্' সেচনে ক্বসন্তো। নিপাতঃ ইতি মহীধরাচার্য্যঃ।) অপিচ যে চাস্য রুদ্রস্য সত্বানঃ ভৃত্যাঃ ভক্তাঃ বা তেভ্যঃ নমস্কারং অহং অকরবং করোমীত্যর্থঃ। যঃ নীলকণ্ঠঃ ইন্দ্রঃ পর্জ্জন্যঃ বরুণো বা স রুদ্র এব, তস্মৈ তৎপার্ষদেভ্যশ্চ নমঃ ইতি ভাবঃ।

মন্ত্রার্থঃ। যিনি নীলকণ্ঠ সহস্রাক্ষ ও বর্ষণকারী, তাঁহাকে এবং তাহার যে সকল অনুচর আছে, আমি তাহাদিগকে নমস্কার করি।

আলোচনা। এই মন্ত্রে রুদ্রদেবকে সর্ব্বদেব-স্বরূপে বর্ণনা করা হইতেছে। যিনি সমুদ্র-মন্থনোত্থিত গরল পান করিয়া, নীলকণ্ঠ নাম ধারণ করিয়াছেন, অথবা যিনি অস্তকালীন শুলোহিত সূর্য্যরূপে নীলাকাশে নীলকণ্ঠ-সদৃশ দৃষ্ট হন তিনি, যিনি সহস্র চক্ষু অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী ইন্দ্রদেবতা, যিনি মীঢ়ুষ বা জলসেককারী মেঘ বা বরুণদেবতা, সেই সর্ব্বদেবাত্মক রুদ্র ও তাঁহার ভৃত্যবর্গকে নমস্কার করি,—বলিয়া, বেদও ভক্তমুখে প্রকারান্তরে "সকল ভূতভৌতিক শক্তি একই দেবতার বিভিন্ন বিগ্রহ ব্যতীত অন্য নহে", ইহাই জ্ঞাপন করিতেছেন। কোনও ব্যাখ্যাতার মতে, এই মন্ত্রে সূর্য্যদেবকেই রুদ্ররূপে বলা হইতেছে। তাঁহাদের ব্যাখ্যা—সহস্রাক্ষ বহুরশ্মি ও বৃষ্টিকারণ যে সূর্য্য—(আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ। আদিত্যই বৃষ্টির কারণ।) যিনি অস্তকালে নীলকণ্ঠরূপে দৃশ্যমান হয়েন, তাঁহাকে ও তাঁহার অনুগত মেষাদি দ্বাদশ রাশিকে নমস্কার।

প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরার্ত্ন্যোর্জ্যাম্।
যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তাঃ
ভগবোবপ। ৯

পদপাঠঃ। প্রমুঞ্চ। ধন্বনঃ। ত্বং। উভয়োঃ। আর্ত্ন্যোঃ। জ্যাম্। যাঃ। চ। তে। হস্তে। ইষবঃ। পরা। তাঃ। ভগবঃ। বপ।

পদব্যাখ্যা। প্রমুঞ্চ—পরিমুক্ত কর। ধন্বনঃ—ধনু হইতে। ত্বং—তুমি। উভয়োঃ—দুই। আর্ত্ন্যোঃ—ধনুকোটী হইতে। জ্যাম্—ধনুর্গুণ। যাঃ—যে সকল। চ—এবং। তে—তোমার। হস্তে—হাতে। ইষবঃ—বাণসকল। তাঃ—তাহাদিগকে। ভগবঃ—হে ভগবন্! পরাবপ—পরিত্যাগ কর।

পদপরিবর্ত্তনম্। প্রমুঞ্চ—দূরীকুরু। ধন্বনঃ—ধনুষঃ। উভয়োঃ—দ্বয়োঃ। আর্ত্ন্যোঃ—কোট্যোঃ। জ্যাম্—মৌর্ব্বীং। (অপিচ) যঃ তে—তব। হস্তে—করে। ইষবঃ—বাণাঃ। তাঃ—ইষূঃ। ভগবঃ—ষড়ৈশ্বর্য্য-শালিন্! পরাবপ—পরাক্ষিপ।

অন্বয়ঃ। হে ভগবঃ! ত্বং ধন্বনঃ উভয়োঃ আর্ত্ন্যোঃ জ্যাং প্রমুঞ্চ যাশ্চ ইষবস্তে হস্তে বিদ্যন্তে তাঃ পরাবপ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। হে ভগবঃ ভগবন্! (ভগৎ ষড়্‌বিধমৈশ্বর্য্যমস্যাস্তীতি ভগবান্। মতুপসো রুঃ সম্বুদ্ধৌ ছন্দসীতি রুত্বম্ ইতি ভগবঃ ইতি মহীধরাচার্য্যঃ।) ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত! ত্বং তব ধন্বনঃ ধনুষঃ উভয়োরার্ত্ন্যোঃ দ্বয়োঃ কোট্যোঃ জ্যাং মৌর্ব্বীং প্রমুঞ্চ পরিত্যজ। যাশ্চ তে তব হস্তে ইষবঃ বাণাঃ তাঃ ইষূঃ

শরাবপ পরাক্ষিপ। (উগ্ররূপং বিহায় সৌম্যো ভব।)

বঙ্গার্থঃ। হে ভগবন্ রুদ্র! তুমি তোমার ধনুর উভয় কোটী হইতে জ্যা মুক্ত কর, এবং তোমার হস্তে যে সকল বাণ বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর।

আলোচনা। এই মন্ত্রে রুদ্রদেবকে 'ভগবান্' বলা হইতেছে। ভগ—ষট্ প্রকার ঐশ্বর্য্য। শাস্ত্রে আছে "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগইতীরণা।" সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য এই ছয়টীকে 'ভগ' বলা যায়। এই ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য যাঁহার নিত্য বিদ্যমান, তিনিই ভগবান্! রুদ্রদেব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি সর্ব্বাধার ভগবান্। বৈদিক প্রক্রিয়ায় 'ভগবৎ' শব্দ সম্বোধনে 'ভগবঃ' এইরূপ ধারণ করিয়াছে। ধনুকের জ্যা খুলিয়া ফেলিতে এবং করস্থিত বাণ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করায় বলা হইতেছে যে, রুদ্র! তুমি ভীষণ ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৌম্যমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে অনুগৃহীত কর।

বিজ্যং ধনুঃ কপর্দ্দিনো বিশল্যো বাণ-বান্ উত। অনেশন্ অস্য যা ইষবঃ আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ। ১০

পদপাঠঃ। বিজ্যং। ধনুঃ। কপর্দ্দিনঃ। বিশল্যঃ। বাণবান্। উত। অনেশন্। অস্য। যাঃ। ইষবঃ। আভুঃ। অস্য। নিষঙ্গধিঃ।

পদব্যাখ্যা। বিজ্যং—জ্যাশূন্য। ধনুঃ—শরাশন। কপর্দ্দিনঃ—রুদ্রের। বিশল্যঃ—নিষ্ফল। বাণবান্—বাণাধার। উত—আর এবং। অনেশন্—বিনষ্ট হউক্। অস্য—রুদ্রের। যাঃ—যে। ইষবঃ—শরসমূহ। আভুঃ—রিক্ত (খালি) হউক্। নিষঙ্গধিঃ—খড়্গাধার কোষ। (তরবারির খাপ্।)

পদপরিবর্ত্তনম্। বিজ্যং—জ্যাহীনং। ধনুঃ—শরাসনম্। কপর্দ্দিনঃ—জটিলস্য রুদ্রস্য বিশল্যঃ—ফলকহীনঃ। বাণবান্—তূণীরঃ। উত—অপি। অনেশন্—নশ্যন্তু। অস্য—রুদ্রস্য। ইষবঃ—শরাঃ। আভুঃ—রিক্তঃ অস্তু। অস্য—এতস্য। নিষঙ্গধিঃ—করবাল-কোষঃ।

অন্বয়ঃ। কপর্দ্দিনঃ ধনুঃ বিজ্যং ভবতু অস্য বাণবান্ বিশল্যো ইস্তু উত অস্য যা ইষবঃ তা অনেশন্। অস্য নিষঙ্গধিঃ আভুঃ ভবতু।

মন্ত্রব্যাখ্যা। কপর্দ্দো জটাজুটোঽস্যাস্তীতি কপর্দ্দী রুদ্রঃ। তস্য ধনুঃ বিজ্যং (বিগতা জ্যা যস্য তৎ) মৌর্ব্বীরহিতং অস্ত, বাণবান্ (বাণাঃ অস্মিন্ সন্তীতি) তূণং। বিশল্যঃ—(বাণাগ্রগতোলোহভাগঃ শল্যং তদ্রহিতঃ বাণধিনিরগ্রবাণোঽস্ত ইতি মহীধরাচার্য্যঃ।) ফলকহীনং ভবতু, অপিচ অস্য যা ইষবঃ তা অনেশন্ (নশ অদর্শনে নশেরত এত্বং) অস্য রুদ্রস্য নিষঙ্গধিঃ (নিষঙ্গঃ খড়্গঃ ধীয়তে ঽস্মিন্নিতি) কোষঃ আভুঃ শূন্যঃ অস্ত। রুদ্রঃ অস্মান্ প্রতি ন্যস্তসর্ব্বশস্ত্রো ভবতু উত্যর্থঃ ইতি মহীধরাচার্য্যঃ।

বঙ্গার্থঃ। কপর্দ্দীর ধনুঃ জ্যাবিহীন হউক, বাণাধার ফলকহীন বাণসমূহের দ্বারা পূর্ণ

হউক্, এবং রুদ্রের ইষুসকল বিনষ্ট হউক্, ও তাহার খড়্গ-কোষ রিক্ত অর্থাৎ খড়্গ-বিহীন হউক্।

আলোচনা। এ মন্ত্রে রুদ্রকে সর্ব্ববিধ অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থির-ভাবে ধীর-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবার জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে। সাধক ধনুর গুণ, বাণের ফলা, ও কোষে তরবারি বা খড়্গ না থাকে, এই রূপ শিষ্ট শান্ত সংযত অভয়প্রদরূপ প্রার্থনা করিতেছেন।

যা হেতির্মীঢ়ুষ্টম হস্তে বভুব তে ধনুঃ তয়াস্মান্ বিশ্বতস্ত্বং অযক্ষ্ময়া পরিভুজ। ১১

পদপাঠঃ। যা। হেতিঃ। মীঢ়ুষ্টম। হস্তে। বভুব। তে। ধনুঃ। তয়া। অস্মান্। বিশ্বতঃ। ত্বং। অযক্ষ্ময়া। পরিভুজ।

পদব্যাখ্যা। যা—যে। হেতিঃ—আয়ুধ। মীঢ়ুষ্টম।—বর্ষণকারিন্। হস্তে—হাতে। বভুব—আছে। তে—তোমার। ধনুঃ—ধনুক। তয়া—তাহার দ্বারা। অস্মান্—আমাদিগকে। বিশ্বতঃ—সর্ব্বপ্রকারে। ত্বং—তুমি। অযক্ষ্ময়া—নিরুপদ্রব দৃঢ় অস্ত্রদ্বারা। পরিভুজ—পরিপালনকর।

পদপরিবর্ত্তনং। হেতিঃ—আয়ুধং। মীঢ়ুষ্টম—বরষুর্ক সেক্তৃতম।—হস্তে—করে। বভুব—অস্তি। তে—তব। ধনুঃ—শরাসনং। তয়া—করণ-ভুত-ধনুরাখ্যয়া হেত্যা। অস্মান্—নঃ। বিশ্বতঃ—সর্ব্বতঃ। অযক্ষ্ময়া—নিরুপদ্রবয়া। পরিভুজ—পরিপালয়।

অন্বয়ঃ। হে মীঢ়ুষ্টম! তব হস্তে যা হেতিঃ ধনুঃ বভুব ত্বং তয়া অযক্ষ্ময়া অস্মান্ বিশ্বতঃ পরিভুজ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। হে মীঢ়ুষ্টম সেক্তৃতম! (অতিশয়েন মীঢ়্বান্ মীঢ়ুষ্টমঃ, তসো মত্বর্থে ইতি ভ সংজ্ঞায়াং বসোঃ সম্প্রসারণং ষত্বষ্টুত্বে।) তে তব করে যা ধনুরূপা হেতি-রস্ত্রং বভূব অস্তি তয়া অযক্ষ্ময়া (নাস্তি যক্ষ্মা রোগো যস্যাস্তয়া) নিরুপদ্রবয়া দৃঢ়য়া (অনুপদ্রবকারিণ্যা বা) হেত্যা বিশ্বতঃ অস্মান্ পরিভুজ পরিপালয় (ভুজের্বিকরণ-ব্যত্যয়ে শ-প্রত্যয়ঃ।)

বঙ্গার্থঃ। হে বর্ষকপ্রধান! তোমার হস্তে ধনু আয়ুধ রহিয়াছে, তাহা দ্বারা—সেই নিরুপদ্রব বা সুদৃঢ় অস্ত্রদ্বারা, কিম্বা সেই অনুপদ্রবকারি আয়ুধ দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পরিপালন কর।

আলোচনা। এই মন্ত্রে 'মীঢ়ুষ্টম' শব্দে রুদ্রকে বর্ষণকারী বলা হইতেছে। রুদ্রদেব অস্ত্রদ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদিকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করুন, কিন্তু সেই অস্ত্র যেন দৃঢ় অথচ অনুপদ্রবকারি হয়। এখানে রুদ্রদেবের বর্ষণশক্তি-রূপ ধনুদ্বারা ভক্তগণকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করা হইতেছে, কিন্তু বর্ষণাস্ত্রের প্রয়োগ বহু বিপত্তি আনয়ন করিতে পারে, সুতরাং আশঙ্কায় বলিতেছেন—সে অস্ত্র যেন উপদ্রবকারি না হয়—অর্থাৎ বর্ষণ-শক্তি যেন অহিতকরভাবে আবির্ভূত না হয়, পরন্তু হিত-সাধক সৌম্যভাবে উপস্থিত হইয়া জগতের কল্যাণসাধন করে।

পরিতে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ।
অথো য ইষুধিস্তবারে অস্মন্নিধেহি তং। ১১

পদপাঠঃ। পরি। তে। ধন্বনঃ। হেতিঃ। অস্মান্। বৃণক্তু। বিশ্বতঃ। অথো। যঃ। ইষুধিঃ। তব। আরে। অস্মৎ। নিধেহি। তং।

পদব্যাখ্যা। তে—তোমার। ধন্বনঃ—ধনুকের। হেতিঃ—অস্ত্র, বাণ। অস্মান্—আমাদিগকে। পরিবৃণক্তু—পরিত্যাগ করুক। বিশ্বতঃ—সর্ব্বপ্রকারে। অথো—আর। যঃ—যে। ইষুধিঃ—বাণাধার তুণ। তব—তোমার। আরে—দূরে। অস্মৎ—আমাদিগের নিকট হইতে। নিধেহি—স্থাপন কর। তং—তাহাকে।

পদপরিবর্ত্তনং। তে—তব। ধন্বনঃ—ধনুষঃ। হেতিঃ—শরঃ। অস্মান্—নঃ। পরিবৃণক্তু—পরিত্যজতু। বিশ্বতঃ-সর্ব্বতঃ। অথো—অপিচ। যঃ ইষুধিঃ—তূণীরঃ। তব—তে। আরে—দূরে। অস্মৎ—অস্মত্তঃ। নিধেহি—স্থাপয়। তং—বাণং।

অন্বয়ঃ। হে রুদ্র! তে ধন্বনঃ যা হেতিঃ সা অস্মান্ বিশ্বতঃ পরিবৃণক্তু, অথো যঃ তব ইষুধিঃ তং অস্মৎ আরে নিধেহি।

মন্ত্রব্যাখ্যা। মন্ত্রাদৌ পঠিতস্য "পরি" ইতস্য "বৃণক্তু" ইত্যেতেন যোগঃ সামর্থ্যাৎ। তে তব ধন্বনঃ হেতিঃ ধনুঃসম্বন্ধি আয়ুধং অস্ত্রং বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ অস্মান্ পরিবৃণক্তু ত্যজতু মা হন্তু ইত্যর্থঃ। (বৃজী বর্জ্জনে ইত্যস্য রুধাদি-পঠিতস্য শ্নম্প্রাপ্তৌ রূপং) অপিচ যঃ তব ইষুধিঃ তূণীরঃ তং অস্মৎ আরে অস্মত্তঃ বিদূরে নিধেহি স্থাপয়। তব ধনুর্মুক্তাঃ শরাঃ অস্মান্ পরিত্যজন্তু—, তূণীরঃ চ তব অস্মত্তো দূরে অস্মৎ-শত্রু-প্রভৃতিষু স্থাপয়—নাস্মাস্বিতি ভাবঃ। দুর্বৃত্তান্ জহি, মা তে সেবকান্ ইতি রহস্যম্।

বঙ্গার্থঃ। হে রুদ্রদেব! তোমার ধনুকে যে শর সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগ করুক। আর তোমার তূণ আমাদিগের হইতে দূরে স্থাপন কর।

আলোচনা। মন্ত্রের প্রথমে যে 'পরি' পদ আছে, তাহা 'বৃণক্তু'র সঙ্গে মিলিত হইয়া অর্থ প্রকাশ করিবে। এরূপ মিলন বৈদিক-সাহিত্যে বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। এই মন্ত্রে ধনুর্দ্ধারী রুদ্রকে অনুরোধ করা হইয়াছে,—তোমার ধনুকের শর যেন আমাদের উপর পতিত না হয় এবং তোমার বাণাধার আমাদের ছাড়িয়া দুর্বৃত্ত ও শত্রুগণের প্রতি স্থাপন কর। অর্থাৎ, আমরা তোমার অনুগত, আমাদিগকে রক্ষা কর ও দুর্বৃত্তগণকে দমন কর।

অবতত্য ধনুষ্ট্বম্ সহস্রাক্ষ শতেষুধে।
নিশীর্য্য শল্যানাং মুখাঃ শিবোনঃ সুমনা ভব। ১৩

পদপাঠঃ। অবতত্য। ধনুঃ। ত্বং। সহস্রাক্ষ। শতেষুধে। নিশীর্য্য। শল্যানাং। মুখাঃ। শিবঃ। নঃ। সুমনাঃ। ভব।

পদব্যাখ্যা। অবতত্য—জ্যাবিহীন করিয়া। ধনুঃ—শরাসন। ত্বং—তুমি। সহস্রাক্ষ—

হে সহস্রনেত্র! শতেষুধে! হে শততূণধর। নিশীর্য্য—শীর্ণ করিয়া। শল্যানাং—বাণের ফলকসমূহের। মুখাঃ—মুখসকল। শিবঃ—শান্ত। নঃ—আমাদের প্রতি। সুমনাঃ—প্রসন্নচিত্ত। ভব—হও।

পদপরিবর্ত্তনম্। অবতত্য—অপজ্যাকং বিধায়। ধনুঃ—কোদণ্ডং। সহস্রাক্ষ—সহস্রনয়ন! শতেষুধে—শততূণ! নিশীর্য্য—শীর্ণানি কৃত্বা। শল্যান্যাং—বাণাগ্র-লোহফলকানাং। মুখাঃ—মুখানি। শিবঃ—শান্তঃ। নঃ—অস্মান্। সুমনাঃ—শোভনচিত্তঃ। ভব—তিষ্ঠ।

অন্বয়ঃ। হে সহস্রাক্ষ শতেষুধে! ত্বং ধনুঃ—অবতত্য শল্যানাং মুখানি নিশীর্য্য নঃ প্রতি শিবঃ সুমনাঃ চ ভব।

মন্ত্রব্যাখ্যা। হে সহস্রনেত্র (সহস্রমক্ষীণি যস্য সঃ) শতেষুধে। (শতং ইষুধয়ো যস্য সঃ) ত্বং ধনুঃ অবতত্য বিগৌর্বীকং বিধায়, শল্যানাং বাণাগ্রতীক্ষ্ণধারলোহখণ্ডানাং মুখাঃ অগ্রাণি (মুখাঃ—ইতি দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা বিভক্তিব্যত্যয়েন) নিশীর্য্য শ্লথীকৃত্য (শৄ হিংসায়াং সমানেহনও পূর্ব্বে ক্তো ল্যপ ঋত ইদ্ধাতোঃ।) অস্মান্ প্রতি শিবঃ মঙ্গলরূপঃ সুমনাঃ সদয়চিত্তশ্চ ভব ইত্যর্থঃ। অস্মান্ অনুগৃহাণ ইতি ভাবঃ।

বঙ্গার্থঃ। হে সহস্রাক্ষ! হে শতেষুধে! তুমি শরাসন জ্যাশূন্য করিয়া, বাণের অগ্রস্থ লোহফলকসকল শিথিল করিয়া, আমাদের প্রতি মঙ্গলস্বরূপ ও অনুগ্রহ-পরায়ণ হও।

আলোচনা। এই মন্ত্রে বলা হইতেছে,—ভীষণ যোদ্ধৃবেশ পরিত্যাগ করিয়া, সৌম্য হৃদয়-চিত্ত-রূপে আমাদিগকে অনুগৃহীত কর। শান্তরূপ ধারণের প্রার্থনা পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছে, এখানে নূতন 'সদয়' হওয়ার কথা।

নমস্ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে। উভাভ্যামুত তে নমো বাহুভ্যাস্তব ধন্বনে। ১৪

পদপাঠঃ। নমঃ। তে। আয়ুধায়। অনাততায়। ধৃষ্ণবে। উভাভ্যাং। উত। তে। নমঃ। বাহুভ্যাং। তব। ধন্বনে।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার। তে—তোমার। আয়ুধায়—বাণকে। অনাততায়—ধনুতে যে বাণ যোজনা করা হয় নাই তাহাকে। ধৃষ্ণবে—শত্রুবিনাশকার্য্যে যে বাণ প্রগল্ভ তাহাকে। উভাভ্যাং—দুইটীকে। উত—এবং। তে—তোমার। নমঃ—নমস্কার। বাহুভ্যাং—বাহুদ্বয়কে। তব—তোমার। ধন্বনে—ধনুকে।

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারঃ অস্তু। তে—তব। আয়ুধায়—বাণায়। অনাততায়—শরাসনে অনারোপিতায়। ধৃষ্ণবে—শত্রুধর্ষণস্বভাবায়। উভাভ্যাং—দ্বাভ্যাং। উত—অপিচ। তে—তব। নমঃ—নমস্কারঃ। বাহুভ্যাং—দোর্ভ্যাম্। তব—তে। ধন্বনে—ধনুষে। (নমস্কারঃ অস্তু ইতি শেষঃ।)

অন্বয়ঃ। হে রুদ্র! তে অনাততায় ধৃষ্ণবে আয়ুধায় নমঃ। উত তে উভাভ্যাং বাহুভ্যাং নমঃ। তব ধন্বনে চ নমঃ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। তব আয়ুধায় বাণায় নমঃ নতিরস্তু। কীদৃশায় বাণায় ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—অনাততায় ধনুষি অনারোপিতায় ধৃষ্ণবে ধর্ষণশীলায় (ধৃষেঃ ক্নুপ্রত্যয়ঃ।) রিপূন্ নাশয়িতুং প্রগল্ভায়। উত অপিচ তে

উতাভ্যাং স্বাভ্যাং বাহুভ্যাং নমঃ তব ধন্বনে শরাসনায় নমঃ অস্তু (তস্যাপি বিশেষণং অনাততায় অবতারিতমৌর্ব্বীকায় ইতি মহীধরাচার্য্যাঃ।)

বঙ্গার্থঃ। হে রুদ্র! তোমার যে আয়ুধ ধনুকে আরোপিত হয় নাই অর্থাৎ তূণীরমধ্যে অবস্থান করিতেছে, যে বাণ শত্রুবিনাশে প্রগল্ভ, সেই বাণকে নমস্কার করি। তোমার বাহুযুগলকে নমস্কার করি, তোমার ধনুকেও নমস্কার করি।

আলোচনা। পূর্ব্বে, যে সকল বাণ ধনুতে যোজিত, তাহাদিগকে শান্ত করিতে বলা হইয়াছে;—অধুনা যে বাণ তূণমধ্যে অবস্থান করিয়া, শত্রু-বিনাশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে তাহাকে, বাণত্যাগকারী বাহুদ্বয়কে ও বাণাসন ধনুকে নমস্কার করা হইতেছে। মহীধরাচার্য্যের মতে 'অনাতত' বিশেষণটী 'ধনু'র প্রতিও প্রযুক্ত হইবে। তাহার ফলে, যে ধনুর গুণ খুলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাকে নমস্কার করি;—এইরূপ অর্থবোধ উৎপন্ন হইবে। ইহা পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত বেশ সুসঙ্গত হয়।

মানো মহান্তমুত মানো অর্ভকম্মান-উক্ষন্তমুত মান উক্ষিতম্। মানো-বধীঃ পিতরংমোত মাতরং মানঃ প্রিয়াস্তম্বো রুদ্র রীরিষঃ। ১৫

পদপাঠঃ। মা। নো। মহান্তং। উত। মা। নো। অর্ভকং। মা। নো। উক্ষন্তং। উত। মা। নঃ। উক্ষিতম্। মা। নো। বধীঃ। পিতরং। মা। উত। মাতরং। মা। নঃ। প্রিয়াঃ। তন্বঃ। রুদ্র। রীরিষঃ।

পদব্যাখ্যা। মা—না। নো—আমাদিগের। মহান্তং—বৃদ্ধগণকে। উত—অথবা। মা—না। নো-আমাদের। অর্ভকং—শিশুকে। মা—না। নো-আমাদের। উক্ষন্তং—তরুণকে। মা—না। নঃ-আমাদের। উক্ষিতং—গর্ভস্থকে। মা—না। নঃ আমাদের বধীঃ—বিনাশ করিও। পিতরং—পিতাকে। মা—না। উত—এবং। মাতরং—মাতাকে। মা—না। নঃ—আমাদের। প্রিয়াঃ—বল্লভাগণকে। তন্বঃ—শরীরসমূহ। রুদ্র!—হে রুদ্রদেব! মা রীরিষঃ—বিনাশ করিও না।

পদপরিবর্ত্তনম্। মা—নিষেধার্থে (সর্ব্বত্র অস্মিন্ মন্ত্রে,) নঃ—অস্মাকং (সর্ব্বত্র অস্মিন্ মন্ত্রে 'নো' 'নঃ' ইত্যস্য অস্মাকং ইত্যেবার্থঃ।) মহান্তং—অধিকবয়স্কং। উত—অথবা। অর্ভকং—বালকং। উক্ষন্তং—সেক্তারং যুবকং। উক্ষিতং—সিক্তং ভ্রূণং। বধীঃ—নাশয়। পিতরং—জনকং। উত—চ। মাতরং—জননীং। প্রিয়াঃ—প্রেমাস্পদভূতাঃ রমণীঃ। তন্বঃ—শরীরাণি—পুত্রাদিরূপাণি। মা রীরিষঃ—মা হিংসীঃ।

অন্বয়ঃ। হে রুদ্র! নঃ মহান্তং মা বধীঃ, উত নঃ অর্ভকং মা (বধীঃ,) নঃ উক্ষন্তং মা বধীঃ, উত নঃ উক্ষিতং মা বধীঃ। নঃ পিতরং উত মাতরং মা বধীঃ। নঃ প্রিয়াঃ তন্বঃ মা রীরিষঃ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। অস্মিন্ মন্ত্রে 'মা' ইতি সর্ব্বত্র নিষেধাত্মকং অব্যয়ম্। 'নঃ' ইতি সর্ব্বত্র 'অস্মাকং' ইত্যর্থকং অস্মচ্ছব্দষষ্ঠী-বহুবচনান্তং রূপং। মা নঃ বধীঃ মহান্তং—অস্মাকং বৃদ্ধগণং মা হিংসীঃ। অর্ভকং বালং উক্ষন্তং বীজসেক্তারং (উক্ষ সেচনে ইত্যস্মাৎ শতৃপ্রত্যয়ান্তং রূপং উক্ষদিতি তস্য দ্বিতীয়ায়াং)

যুবানং উক্ষিতং—সিক্তং গর্ভস্থং ভ্রূণং পিতরং মাতরং চ মা বধীঃ ন বিনাশয়। (মহান্তমিত্যনেন সিদ্ধে মাতাপিত্রোঃ পুনর্গ্রহণমাদরার্থং ইতি মহীধরাচার্য্যঃ।) নঃ অস্মাকং প্রিয়াঃ প্রেমিকাঃ তন্বঃ তনূঃ (দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা) মা রীরিষঃ ন নাশয়। (রিষ হিংসায়াং ইত্যস্য রূপং।)

বঙ্গার্থঃ। হে রুদ্র! আমাদিগের বয়োবৃদ্ধগণকে বিনাশ করিও না এবং আমাদিগের বালকগণকে বধ করিও না। আমাদিগের বীজসেক্তা যুবকগণকে বধ করিও না, ও আমাদের গর্ভস্থ ভ্রূণ সকলকে বিনষ্ট করিও না। বিশেষতঃ—আমাদের পিতাকে কিম্বা মাতাকেও বধ করিও না। আমাদের বল্লভা-পত্নীগণকে নাশ করিও না। আমাদের শরীরকে হিংসা করিও না।

আলোচনা। এ মন্ত্রে রুদ্রদেবের নিকট সমাজের—গৃহের রক্ষা কামনা করা হইতেছে। বালক, বয়স্ক, যুবক, গর্ভস্থ, পিতা, মাতা, পত্নী ও দেহ বিনাশ করিও না—বলা হইতেছে। সমাজে সর্ব্ববিধ অবস্থায় এই সর্ব্ববিধ জীবনের প্রয়োজন। কেবল বৃদ্ধের দেশ, শিশুর সমাজ; বা তরুণের সম্প্রদায় ও রমণীর সমূহ অপরাপেক্ষা ব্যতীত জীবিত থাকে না। 'বয়স্ক' বলায় পিতা মাতার কথা বলা হয়, কিন্তু মহীধর বলেন, অধিক আদর-প্রদর্শন উদ্দেশে 'মহান্তং' বলিয়াও 'পিতরং' 'মাতরং' বলা হইয়াছে।

মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি মানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ। মানো বীরান্‌রুদ্রভামিনোবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে। ১৬

পদপাঠঃ। মা। নঃ। তোকে। তনয়ে। মা। নঃ। আয়ুষি। মা। নঃ। গোষু। মা। নঃ। অশ্বেষু। রীরিষঃ। মা। নঃ। বীরান্। রুদ্র। ভামিনঃ। বধীঃ। হবিষ্মন্তঃ। সদমিৎ। ত্বা। হবামহে।

পদব্যাখ্যা। মা—না। (সর্ব্বত্র এই অর্থ) নঃ—আমাদিগের (সর্ব্বত্র এই অর্থ) তোকে—পুত্রে। তনয়ে—পৌত্রে। আয়ুষি—জীবনে। গোষু—গোরুতে। অশ্বেষু—ঘোটকসমূহে। রীরিষঃ—হিংসা করিও। বীরান্—বীরগণকে। ভামিনঃ—ক্রোধিসকলকে। বধীঃ—বিনাশ করিও। হবিষ্মন্তঃ—ঘৃতযুক্ত। সদমিৎ—সর্ব্বদা। ত্বা—তোমাকে। হবামহে—হোম করিব অথবা আহ্বান করিব।

পদপরিবর্ত্তনম্। মা—নিষেধে। (সর্ব্বত্রৈব) নঃ অস্মাকং। (সর্ব্বত্র) তোকে—শিশৌপুত্রে। তনয়ে—বংশবিস্তারকে পৌত্রে। আয়ুষি জীবনে। গোষু—ধেনুষু। অশ্বেষু—তুরগেষু। রীরিষঃ—হিংসীঃ। বীরান্—বলবতঃ ভৃত্যান্ বা। ভামিনঃ—ভামশীলান্ কোপিতান্। বধীঃ—নাশয়। হবিষ্মন্তঃ—হবির্যুক্তাঃ (সন্তঃ) সদমিৎ—সদৈব। ত্বা—ত্বাং। হবামহে—আহ্বয়ামঃ। যাগার্থং ত্বামানেতুং প্রার্থয়ামঃ ইতি ভাবঃ।

অন্বয়ঃ। হে রুদ্র! নঃ তোকে তনয়ে মা রীরিষঃ নঃ আয়ুষি মা রীরিষঃ, নঃ গোষু অশ্বেষু মা রীরিষঃ। নঃ ভামিনঃ বীরান্ মা বধীঃ। (বয়ং) হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে।

মন্ত্রব্যাখ্যা। 'মা' সর্ব্বত্র নিষেধে, 'নঃ' অস্মাকং

ইত্যর্থে চ। হে রুদ্রদেব! অস্মাকং তোকে বালে পুত্রে তনয়ে পৌত্রে জীবনে গাভীষু ঘোটকেষু মা রীরিষঃ মা হিংসীঃ। (তোকে ইত্যাদৌ বিষয়ার্থে সপ্তমী, অথবা বিভক্তি-ব্যত্যয়েন তোকে 'তোকং' ইতি বিপরিণামঃ। সর্ব্বত্র সপ্তমীস্থানে দ্বিতীয়াং ব্যবস্থাপ্য তোকং মা রীরিষঃ মা বিনাশয় ইত্যেবংপ্রকারঃ সুগম-বোধঃ সম্পাদনীয়ঃ।) অস্মাকং ভামিনঃ কোপনান্ (ভাম ক্রোধ ইত্যস্মাৎ রূপং) বীরান্ বলবতঃ ভৃত্যান্ মা বধীঃ তেষাং বিনাশং ন সাধয়। কস্তেন মে উপকারঃ ভবেৎ? ইত্যাশঙ্কায়াংউত্তরমাহ, হবিষ্মন্তঃ সন্তঃ হবির্গৃহীত্বা সদমিৎ সর্ব্বদৈব বয়ং ত্বাং আহ্বয়ামঃ। হবির্ভাগং ত্বামেব দাস্যামঃ। ত্বদেক-শরণাবয়মিতি ভাবঃ।

বঙ্গার্থঃ। হে রুদ্র! পুত্রবিষয়ে আমাদের হিংসা করিও না। পৌত্রবিষয়ে—আমাদের হিংসা করিও না। জীবন-বিষয়ে আমাদের হিংসা করিও না। গোধন-বিষয়ে ও অশ্ব বিষয়ে আমাদের হিংসা করিও না। আমাদের কোপনস্বভাব বলবান্ ভৃত্য বা গৃহজনগণকে বিনাশ করিও না। আমরা হবি লইয়া সতত তোমাকে আহ্বান করিব।

আলোচনা। পূর্ব্বমন্ত্রের মত এইমন্ত্রে ও সমস্ত 'মা' পদের অর্থ 'না'। 'নঃ' পদের অর্থ—'আমাদিগের'। এই মন্ত্রে তোকে 'তনয়ে' 'আয়ুষি' 'গোষু' "অশ্বেষু" এই সপ্তম্যন্ত পদগুলির সপ্তমী বিভক্তি বিষয়ার্থে যেমন 'তোকে মা রীরিষঃ' পুত্রবিষয়ে হিংসা করিও না ইত্যাদি। মহীধরাচার্য্য বলেন, বিভক্তি ব্যত্যয় করিয়া ঐ সকল সপ্তমী স্থানে দ্বিতীয়া ব্যবহার করিয়া অর্থ—করিলে সুন্দর হয়। 'তোকং' 'তনয়ং' 'আয়ুঃ' 'গাং' 'অশ্বং' মা রীরিষঃ। অর্থাৎ পুত্র পৌত্র জীবন, গো, অশ্বদিগকে হিংসা করিও না। এক বিভক্তির স্থলে অন্য বিভক্তির প্রয়োগ বৈদিককালে বিরল ছিল না। এই মন্ত্রে পূর্ব্ব-মন্ত্রবৎ আমাদের পুত্র পৌত্র গরু ঘোড়া মারিও না বলা হইতেছে। আমাদের যে সব স্বজন বা ভৃত্য ক্রোধী এবং বলবান্, তাহারা হয়ত তোমার নিকট অপরাধী হইতে পারে কিন্তু তাহাদিগকেও বধ করিও না। এই অনুগ্রহের প্রতিদানরূপ আমরা সর্ব্বদাই যজ্ঞীয় হবির্ভাগ লইয়া তোমাকে আহ্বান করিব। ঘৃতাদি হব্য বস্তুর বিনিময়ে কুশল-কামনা রুদ্রাধ্যায়ে এই প্রথম। ।

নমো হিরণ্য-বাহবে সেনান্যে দিশাঞ্চ পতয়ে নমঃ, নমো বৃক্ষেভ্যঃ হরি-কেশেভ্যঃ পশূনাম্পতয়ে নমঃ, নমঃ শষ্পিঞ্জরায় ত্বিষীমতে পথীনাম্পতয়ে নমঃ, নমো হরিকেশায় উপবীতিনে পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ। ১৭

পদপাঠঃ। নমঃ। হিরণ্যবাহবে। সেনান্যে। দিশাং। চ। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। বৃক্ষেভ্যঃ। হরিকেশেভ্যঃ। পশূনাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। শষ্পিঞ্জরায়। ত্বিষীমতে। পথীনাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। হরিকেশায়। উপ-বীতিনে। পুষ্টানাং। পতয়ে। নমঃ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার। হিরণ্য-বাহবে—হিরণ্যবাহু রুদ্রদেবকে। সেনান্যে—সেনানায়ক রুদ্রকে। দিশাং—দিক্ সকলের। চ—এবং। পতয়ে—অধিস্বামীকে। নমঃ—নমস্কার। বৃক্ষেভ্যঃ—বৃক্ষ সকলকে।

হরিকেশেভ্যঃ—হরিদ্বর্ণ পত্র বিশিষ্ট (বৃক্ষকে)। পশূনাম্পতয়ে—পশুগণের অধিপতিকে। শষ্পিঞ্জরায়—শষ্পের মত পীত-রক্ত-বর্ণশালীকে। ত্বিষীমতে—দীপ্তিশালী রুদ্রকে। পথীনাং—পথসমূহের। পতয়ে—পালককে। হরিকেশায়—নীলবর্ণকেশবিশিষ্ট রুদ্রকে। উপবীতিনে—যজ্ঞোপবীতধারী রুদ্রকে। পুষ্টানাং—পুষ্টগণসমূহের। পতয়ে—অধীশ্বরকে। নমঃ—নমস্কার।

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারঃ অস্তু। হিরণ্যবাহবে—হিরণ্যবাহুশালিনে। সেনান্যে—সেনানায়কায়। দিশাং—ককুভাং। চ—অপিচ। পতয়ে—পালকায়। বৃক্ষেভ্যঃ—তরুভ্যঃ। হরিকেশেভ্যঃ—হরিতচ্ছদেভ্যঃ। পশূনাং—জীবানাং। পতয়ে—পালকায়। শষ্পিঞ্জরায়—শষ্পবৎপীতরক্তবর্ণায়। শষ্পেষপি বিদ্যমানায় বা। ত্বিষীমতে—দীপ্তিশালিনে। পথীনাং—মার্গানাং। পতয়ে—পালকায়। হরিকেশায়—জরারহিতায়।—উপবীতিনে—যজ্ঞোপবীতধারিণে। পুষ্টানাং গুণপূর্ণানাং। পতয়ে—স্বামিনে। নমঃ—নমস্কারঃ।

অন্বয়ঃ। হিরণ্যবাহবে সেনান্যে অপিচ দিশাং পতয়ে রুদ্রায় নমঃ। হরিকেশেভ্যঃ বৃক্ষেভ্যঃ নমঃ। পশূনাং পতয়ে শষ্পিঞ্জরায় ত্বিষীমতে পথীনাং পতয়ে চ নমঃ। হরিকেশায় উপবীতিনে পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। হিরণ্য-বাহবে (হিরণ্যং-আভরণরূপং বাহ্বোর্যস্য তস্মৈ ইতি মহীধরঃ।) স্বর্ণধারিণে; হিরণ্যশব্দঃ প্রশংসাপরঃ মহৎপর্য্যায়ঃ অত্র,—ইতি কেচিৎ, তন্মতে হিরণ্যবাহবে মহাবাহবে ইত্যর্থঃ। সেনান্যে সেনানায়কায় (সেনাঃ নয়তীতি সেনানীঃ তস্মৈ) দিশাং পতয়ে দিক্‌পালকায় (যঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু তিষ্ঠন্ তাস্তাঃ পালয়তীতি তস্মৈ।) বৃক্ষেভ্যঃ বৃক্ষাকারেভ্যঃ রুদ্রেভ্যঃ বৃক্ষরূপেণ অপি রুদ্র এব বর্ত্তন্তে ইতি ভাবঃ। হরিকেশেভ্যঃ—হরিত-পর্ণেভ্যঃ। (হরয়ঃ হরিতবর্ণাঃ কেশাঃ পর্ণরূপাঃ যেষাং তেভ্যঃ) পশূনাং জীবানাং পতয়ে স্বামিনে। শষ্পিঞ্জরায় বালতৃণবৎ-পীত-রক্ত-বর্ণায় টিলোপশ্ছান্দস ইতি মহীধরাচার্য্যঃ।) শষ্পেষপি বিদ্যমানায় (তৃণরূপেণাপি স এব রুদ্রঃ দ্যোততে ইতি ভাবঃ।) ত্বিষীমতে দীপ্তিশালিনে (ত্বিষির্দীপ্তিঃ অস্যাস্তি ত্বিষিমান্ সংহিতায়াং দীর্ঘঃ ইতি মহীধরঃ) পথীনাং মার্গানাং পতয়ে পালকায় (পথিশব্দো মার্গবাচী ইতি মহীধরাচার্য্যঃ।) হরিকেশায় নীলবর্ণকেশায় (জরা-রহিতায় ইতি মহীধরঃ) উপবীতিনে যজ্ঞোপবীত-ধারিণে (যঃ খলু রুদ্রঃ বৃক্ষরূপধরঃ অলকাদিকাঃ নির্ম্মলাঃ লতাঃ উপবীতবৎ কণ্ঠে ধারয়তি স যজ্ঞোপবীতী।) পুষ্টানাং গুণপূর্ণানাং নরানাং অধিপতয়ে নমস্কারঃ অস্তু।)

বঙ্গার্থঃ। যিনি হিরণ্যবাহু সেনানী রুদ্র তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যিনি দিক্‌সমূহের অধিপতি, যিনি হরিতপর্ণ বৃক্ষরূপে বিদ্যমান, যিনি পশু-(জীব) গণের পালক, শষ্পিঞ্জর ও দীপ্তিমান্। যিনি সমস্ত পথের শান্তি রক্ষা করেন, যিনি হরিতকেশ (বৃক্ষরূপে অলকাদি নির্ম্মল লতাসমূহকে উপবীতের ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করেন বলিয়া) উপবীতী, যিনি সমস্ত পুষ্ট বা গুণবৎ পুরুষের স্বামী, সেই রুদ্রদেবকে নমস্কার।

আলোচনা। এই মন্ত্রে রুদ্র-ভগবানের নানা শক্তি ও গুণের মহিমা এবং তাঁহার

বিভূতির পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। রুদ্রদেব হিরণ্যবাহু অর্থাৎ তাঁহার বাহুতে হিরণ্ময় আভরণসমূহ দেদীপ্যমান, অথবা তিনি মহাবাহু। সেনানী, বিশ্বস্থ ভাবৎ শাসকশক্তি বা বিরোধ-মূর্ত্তিস্বরূপ ভীষণভাবের পরিচালক তিনি, তাঁহার বাহুচ্ছায়ায় ও বাণবলে জগৎ রক্ষিত হয়, তাই তিনি সেনানী। দিক্‌সমূহের তিনি অধিপতি, অর্থাৎ যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই তিনি পালকরূপে বিদ্যমান। সর্ব্বব্যাপিনী রক্ষাশক্তি সর্ব্বদিকেই আপন অস্তিত্ব প্রচার করে। রুদ্রদেব বৃক্ষরূপে বিদ্যমান বলায় এই বিশ্বস্থ ভাবৎ বস্তু সেই ভগবান্ রুদ্রেরই বিভূতি,—এই অমূল্য তত্ত্ব এখানে স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে। যিনি হরিতপর্ণশালী স্থুল বৃক্ষরূপে ও সূক্ষ্ম বৃক্ষশক্তিরূপে বা সর্ব্বাভ্যন্তর বৃক্ষ-জীব-চৈতন্যরূপে বিরাজিত, বস্তুতঃ যিনি বৃক্ষের আন্তরদেবতা তাঁহাকে—সেই রুদ্রদেবকে নমস্কার জ্ঞাপন করা হইতেছে। যিনি পশুগণের অধিপতি, এইরূপ নির্দেশ করায় বোধহয় কি বিশিষ্টচেতন মানবরাজ্য, কি অস্পষ্টচেতন পশুরাজ্য, কি অচেতন জড়রাজ্য, সকলই বিশ্বময় রুদ্রদেবের মহাশক্তির বিভিন্ন বিকাশ। 'পশু' অর্থে মহীধর বুঝিয়াছেন 'জীব'। পাশুপত মতে তিন পদার্থ—শিব, পশু ও পাশ। অজ্ঞানময় সংসারাদি পাশ, জীব মায়িক সুতরাং পশু, পাশমুক্ত পরমেশ্বর শিবরূপ। মহীধর তাহাই বোধহয় গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মায়াপাশে বদ্ধ যাহারা তাহারা পশু বই আর কি? সে বন্ধন পশুদেহধারী জীবেও যেমন, মনুষ্যদেহবিশিষ্ট জীবেও তদ্রূপ। 'শষ্পিঞ্জর' শব্দে বুঝাযায় যিনি শষ্পরূপেও বিদ্যমান, অথবা শষ্পের অভ্যন্তরে যিনি জীবনরূপে বিরাজ করিতেছেন তিনিই শষ্পিঞ্জর। দীপ্তিমান্ প্রকাশস্বভাব। যিনি জগৎ বা জাগতিক বস্তুজাত প্রকাশ করেন, সেই দীপ্তিময় পরমদেবতাই রুদ্র। যিনি পথসমূহের পতি অর্থাৎ সমস্ত পথে যিনি শান্তিরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান আছেন, তিনি "পথীনাং পতিঃ।" হরিদ্বর্ণ-পত্রশালী তরুরূপে যখন রুদ্রদেব বিরাজ করেন, তখন তিনি উপবীতী হয়েন—অর্থাৎ তখন মূলশূন্য অলকাদি (সোনালতা) লতা ঐ বৃক্ষমূর্ত্তি রুদ্রের কণ্ঠদেশে উপবীতের মত বিরাজ করে। তিনি পুষ্টগণের অধিপতি' যাহা কিছু সুন্দর, সবল, সুস্থ, পুষ্ট, বিশিষ্ট, প্রকৃষ্ট—সে সকলেরই তিনি ঈশ্বর। গীতায় শ্রীভগবান্ নিজমুখে অর্জ্জুনকে অতি সুস্পষ্টভাবে এই কথা বলিয়াছেন "যদ্ যদ্ বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমৎ উর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্।" যাহা কিছু বিভূতি-সম্পন্ন, যাহা কিছু শ্রীযুক্ত, যাহা কিছু তেজঃ সম্পন্ন, সে সমস্তই তুমি আমার তেজের অংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। তাৎপর্য্যতঃ যাহা বিভূতি, শ্রী, তেজঃ—সমস্তই আমার বিভূতি, সৌন্দর্য্য ও তেজের আংশিক প্রকাশমাত্র বলিয়া অবধারণ করিবে। অতি প্রাচীনকালে বৈদিক ঋষির তত্ত্ব-দর্শনগভীর হৃদয়ে এই মহারহস্য আবির্ভূত হইয়াছিল। সর্ব্বভূতে ঈশ্বর—দর্শন ও ঈশ্বরে সর্ব্বভূত—দর্শন—এই সর্ব্বাত্মভাবে রুদ্রাধ্যায় আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ।

নমো বভ্লুশায় ব্যাধিনেঽন্নানাম্পতয়ে
নমো নমো ভবস্য হেত্যৈ জগতা-

ম্পতয়ে নমো নমো রুদ্রায়াততাযিনে ক্ষেত্রানাম্পতয়ে নমো নমঃ সূতায়াহন্ত্যে বনানাম্পতয়ে নমঃ। ১৮

পদপাঠঃ। নমঃ। বভ্লুশায়। ব্যাধিনে। অন্নানাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। ভবস্য। হেত্যৈ। জগতাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। রুদ্রায়। আততায়িনে। ক্ষেত্রানাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। সূতায়। অহন্ত্যৈ। বনানাং। পতয়ে। নমঃ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার। বভ্লুশায়—কপিলবর্ণ রুদ্রদেবকে। ব্যাধিনে—শত্রুনাশক রুদ্রকে। অন্নানাং—অন্ন বা ভক্ষদ্রব্যসমূহের। পতয়ে—পালককে। ভবস্য—সংসারের। হেত্যৈ—বিনাশককে। জগতাং—বিশ্বসমূহের। পতয়ে—রক্ষককে। আততায়িনে—যিনি সুবিস্তৃত ধনুর্ব্বাণ লইয়া গমন করেন তাহাকে। ক্ষেত্রানাং—ভূমিসমূহের অথবা শরীরগণের। পতয়ে—পালককে। সূতায়—সারথি বা রথচালককে। অহন্ত্যৈ—যিনি বিনাশ করেন না তাঁহাকে। বনানাং—বনসকলের। পতয়ে অধিকারীকে। নমঃ—নমস্কার।

পদপরিবর্ত্তনং। নমঃ—নমস্কারঃ অস্তু (সর্ব্বত্রৈবং)। বভ্লুশায়—কপিলবর্ণায়। ব্যাধিনে—রিপুনাশকায়। অন্নানাং—ভক্ষ্যানাং। পতয়ে—পালকায়। ভবস্য—সংসারস্য জন্মনঃ বা। হেত্যৈ—নিবারকায়। জগতাং—ব্রহ্মাণ্ডানাং। পতয়ে—রক্ষকায়। আততায়িনে—উদ্যতায়ুধায়। ক্ষেত্রানাং—দেহানাং। পতয়ে—অন্তর্য্যামিনে। সূতায়—সারথয়ে। অহন্ত্যৈ—অনাশকায়। বনানাং—অরণ্যানাং। পতয়ে—রক্ষকায়। নমঃ—নমস্কারোঽস্তু।

অন্বয়ঃ। বভ্লুশায় ব্যাধিনে অন্নানাম্পতয়ে ভবস্য হেত্যৈ জগতাম্পতয়ে আততায়িনে ক্ষেত্রানাং পতয়ে সূতায় অহন্ত্যৈ বনানাম্পতয়ে রুদ্রায় নমঃ অস্তু।

মন্ত্রব্যাখ্যা। বভ্লুশায় কপিলবর্ণায় (বিভর্ত্তিরুদ্রমিতি বভ্রুর্ব্বভ্রঃ তস্মিন্ শেতে স বভ্লুশঃ ইতি মহীধরাচার্য্যঃ।) ব্যাধিনে (বিধ্যতি শত্রূন্ ইতি ব্যাধী তস্মৈ) শত্রুপীড়কায় অন্নানাং অদনীয়ানাং সর্ব্বেষাং পালকায় (যঃ খলু রুদ্রঃ জগতোহিতার্থং সর্ব্বাণ্যন্নানি পালয়তি তস্মৈ) ভবস্য উৎপত্তের্জন্মনঃ জগতো বা হেত্যৈ আয়ুধায় সংসার-নিবারকায় (যঃ স্মৃতঃ অর্চ্চিতঃ আনন্দিতশ্চ ভক্তানাং জন্মান্তর-কোটীভ্রমণানি নিবারয়তি যো বা কোপিতঃ সর্ব্বং এব বিশ্বং নাশয়তি তস্মৈ রুদ্রায়) জগতাং ব্রহ্মাণ্ডানাং পতয়ে রক্ষকায় (যোঽষ্টমূর্ত্ত্যা জগদ্ রক্ষতি তস্মৈ) আততায়িনে উদ্যতাস্ত্রায় (যঃ আততেন ধনুষা অয়তি গচ্ছতি তস্মৈ) ক্ষেত্রানাং শরীরাণাং পতয়ে পালকায় পরিচালকায় বা (শ্রীগীতাসু শ্রীভগবতৈবোক্তং ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতদ্—যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।) অহন্ত্যৈ অনাশকায় সূতায় সারথয়ে (ন হন্তি ইত্যহন্তিঃ তস্মৈ সূতায়, সূতঃ রথমেব চালয়তি তাডয়ত্যশ্বান্, নতু প্রহরতি বিপক্ষান্ ইত্যস্য অহন্তৃত্বং সুপ্রথিতমেবেতি ভাবঃ) বনানাং পতয়ে অরণ্যপালায় রুদ্রায় নমঃ।

বঙ্গার্থঃ। যে রুদ্র বভ্লুশ অর্থাৎ কপিলবর্ণ, এবং যিনি ব্যাধী (শত্রুনাশক

বা ব্যাধির দেবতা)। যিনি অন্নসমূহের পালক, যিনি সংসার-নিবর্ত্তক ও জগৎ-পালক, যিনি শত্রুগণের প্রতি সর্ব্বদা উদ্যতাস্ত্র, যিনি সর্ব্বদেহে অন্তরস্থ থাকিয়া, দেহসমূহ রক্ষা করিতেছেন—যিনি বিনাশক নহেন, যিনি সারথিরূপে রণক্ষেত্রে বিদ্যমান, যিনি অরণ্যের রক্ষক, সেই রুদ্রদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

আলোচনা। 'বভ্লুশ' অর্থ—কপিল বা ফ্যাকাসে বর্ণ। দীর্ঘকাল রোগ-ভোগে রক্তশূন্য-প্রায় দেহের যে বর্ণ হয়, তাহাই বভ্লুশ বর্ণ। এখানে বলা হইতেছে, ঐ যে রক্তাল্পতাহেতুক বিবর্ণ জীবদেহ—উহাও রুদ্রবিভূতি। 'ব্যাধী' অর্থে মহীধর বলেন যিনি শত্রুবেধক। এই অর্থ 'বভ্লুশ' শব্দের নিকটে প্রযুক্ত হওয়ায় অনেকটা অসঙ্গত বোধ হয়। ব্যাধী—শব্দে কেহ বলেন, ব্যাধির অধিপতি বা স্রষ্টা,—ইহা অধিক সুসঙ্গত—কারণ, পূর্ব্বে ফ্যাকাসে বর্ণ রোগীর স্বরূপে রুদ্রের বর্ণনা করিয়া, পরে রোগ-স্রষ্টা স্বরূপে বর্ণনা করা সকধিক সঙ্গত। যিনি রোগীরূপে এবং রোগোৎপাদকরূপে বিদ্যমান, সেই রুদ্রকে নমস্কার করিব—এই রূপ ভাব। অন্নের অধিপতি রুদ্র। রুদ্রদেব মেঘাদিরূপে জীবের প্রধান অন্ন ওষধির পোষণসাধন করেন, সুতরাং তিনি অন্নরক্ষক। রুদ্র ভবহেতি, জন্মনিবারক বা বিশ্ববিনাশক। রুদ্র উপাসিত হইয়া, ভক্তগণের জন্মান্তর-গমন রোধ করেন, তাৎপর্য্য মুক্তি দান করেন; পক্ষান্তরে তিনিই সংহার-অস্ত্র ধারণ করিয়া, বিশ্ববিনাশ করেন। রুদ্র জগৎপতি—জগতের সমস্তই তাঁহার, অথবা সকলই তিনি। রুদ্রদেব আততায়ী উদ্যতাস্ত্র। সর্ব্বক্ষণেই বিশ্বের অমঙ্গল উপদ্রব আসুরভাব বিনাশের জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন। রুদ্র ক্ষেত্রগণের পতি—অর্থাৎ প্রতিদেহে জীবরূপে অবস্থিত। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন "ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।" হে অর্জ্জুন! এই দেহ 'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত হয়, এই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠাতারূপে বিদ্যমান থাকিয়া, যিনি ইহার রহস্য অবগত হন—অর্থাৎ ইহাতে তাদাত্ম্যাভিমান গ্রহণ করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষেত্রপতি। রুদ্রদেব অহন্তা সূত। রণকালে রথ-চালকের কার্য্য যিনি গ্রহণ করেন, সেই সারথিমূর্ত্তিও রুদ্রদেবতার বিভূতি। রুদ্রদেব যেমন বাণধারী শত্রুনাশক, তেমনি আবার অশ্বচালক সৌম্য অনাশক সারথি। সারথি রথচালনা করেন, অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করেন, কিন্তু শত্রুপ্রতি অস্ত্রাঘাত করেন না। এখানে বলা হইতেছে, তিনি উগ্র আততায়ী, আবার সৌম্য সারথি। নির্জ্জন অরণ্যের ও পরিপালক রুদ্রদেব। এই মন্ত্রে বিভিন্ন ভাবের প্রতিদ্বন্দিতার মধ্যে সর্ব্বত্রই 'রুদ্রসত্ত্ব' অনুভূত হয়—এই কথা বলা হইতেছে। বস্তুতঃ রুদ্রের বিশ্বব্যাপিত্ব ও অন্তর্য্যামিত্ব এখানে পরিস্ফুট।

নমো রোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাং পতয়ে নমো নমো ভুবন্তয়ে বারিবস্কৃতায়ৌষধীনাম্পতয়ে নমো নমো

মন্ত্রিণে বাণিজায় কক্ষানাম্পতয়ে নমোনম উর্চ্চৈর্ঘোযায়াক্রন্দয়তে পত্তীনাম্পতয়ে নমঃ। ১৯

পদপাঠঃ। নমঃ। রোহিতায়। স্থপতয়ে। বৃক্ষাণাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। ভুবন্তয়ে। বারিবস্কৃতায়। ওষধীনাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। মন্ত্রিণে। বাণিজায়। কক্ষাণাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। উচ্চৈর্ঘোযায়। আক্রন্দয়তে। পত্তীনাং। পতয়ে। নমঃ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার। রোহিতায়—লোহিতবর্ণকে। স্থপতয়ে—স্থপতি অর্থাৎ শিল্পিরাজকে। বৃক্ষাণাং—তরুসমূহের। পতয়ে—পালককে। ভুবন্তয়ে—ভূমণ্ডল-বিস্তারক রুদ্রকে। বারিবস্কৃতায়—বিবিধ ধনের উৎপাদককে। ওষধীনাং—ওষধি-সমূহের। পতয়ে—অধীশ্বরকে। মন্ত্রিণে—মন্ত্রিকে। বাণিজায়—বণিক্‌কে। কক্ষানাং—কক্ষগণের। পতয়ে—পালককে। উর্চ্চৈর্ঘোযায়—উচ্চরবকারীকে। আক্রন্দয়তে—রিপুগণের রোদনকারককে। পত্তীনাং—পদাতিগণের। পতয়ে—পালককে। নমঃ—নমস্কার করি।

পদপরিবর্ত্তনং। নমঃ—নমস্কারোঽস্তু। রোহিতায়—লোহিতবর্ণায়। স্থপতয়ে—বিশ্বকর্ম্মরূপেণ গৃহাদিকর্ত্রে। বৃক্ষাণাং—বনস্পতীনাং। পতয়ে—রক্ষকায় পালকায়। ভুবন্তয়ে—ভূমণ্ডলবিস্তারকায়। বারিবস্কৃতায়—ধনোৎপাদকায়। ওষধীনাং—ফলপাকান্তানাং। পতয়ে—অধীশ্বরায়। মন্ত্রিণে—মন্ত্রকুশলায়। বাণিজায়—বণিজে। কক্ষানাং—গুল্মাদীনাং তৃণানাং। পতয়ে—অধীশায়। উচ্চৈর্ঘো-যায়—মহাধ্বনিমতে। আক্রন্দয়তে—রিপূন্ রোদয়তে শত্রুরোদকায়। পত্তীনাং—সেনাবিশেষাণাং। পতয়ে—স্বামিনে। নমঃ—নমস্কারঃ অস্তু।

অন্বয়ঃ। রোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষানাং পতয়ে ভুবন্তয়ে বারিবস্কৃতায় ওষধীনাং পতয়ে মন্ত্রিণে বাণিজায় কক্ষানাং পতয়ে উচ্চৈর্ঘোযায় আক্রন্দয়তে পত্তীনাং পতয়ে রুদ্রায় নমঃ অস্তু।

মন্ত্রব্যাখ্যা। যোঽসৌ রুদ্রঃ রোহিতাদিরূপঃ তস্মৈ নম ইতি যোজনা। রোহিতায় লোহিতায় (রলয়োরভেদাৎ) রক্তবর্ণায় স্থপতয়ে গৃহাদি-রচয়িত্রে (কস্যচিন্মতে গৃহকারকাঃ খলু সর্ব্বদৈব ইষ্টকানাং রক্তরূপং পশ্যন্তি মনসিচ আলোচয়ন্তি, তত্র তেষাং হৃদয়ে অনিশমেব রক্তং রূপং বিভাতি, তেষাং হৃদয়জ্ঞঃ অসৌ রুদ্রোঽপি রক্তবর্ণ এব সুতরাং) বৃক্ষানাং ক্রমানাং অধীশ্বরায় ভুবন্তয়ে ভূবিস্তারকায় (ভুবং তনোতি ইতি ভুবন্তিঃ তস্মৈ) বারিবস্কৃতায় ধনোৎপাদকায় (বরিবঃ ধনং করোতীতি বরিবস্কৃৎ স এব বারিবস্কৃতঃ স্বার্থিকোঽন্ প্রত্যয়ঃ।) ওষধীনাং—গ্রাম্যারণ্য-ফলপাকান্তানাং (ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ ইতি স্মরণাৎ) পতয়ে পালকায়। মন্ত্রিণে আলোচন-মন্ত্রণ-কুশলায় বাণিজায় ব্যবহারকর্ত্রে বণিজে। কক্ষানাং বৃথা তৃণানি কক্ষাঃ—তেষাং। পতয়ে ঈশায়। উচ্চৈর্ঘোযায় উচ্চ-ধ্বনি-বিশিষ্টায় (উচ্চৈঃ মহান্ ঘোষঃ ধ্বনিঃ যস্য স উর্চ্চৈর্ঘোষঃ তস্মৈ) আক্রন্দয়তে রিপুরোদকায় (রিপূন্ আক্রন্দয়তি তাড়য়নাক্রোশয়তি যঃ স আক্র-

স্থুয়ন্ ৎমৈ) পত্তীনাং পদাতি-সেনা-সংস্থান-বিশেষানাং পতয়ে ঈশ্বরায় নমঃ। পত্তিলক্ষণকোক্তং ব্যাসেন,—একোরথো গজশ্চাশ্বাস্ত্রয়ঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ। এষঃ সেনানিবেশোহয়ং পত্তিরিত্যভিধীয়তে। ইতি।

বঙ্গার্থঃ। যিনি সুলোহিতবর্ণ স্থপতি ও বহুবিধ ধনের উৎপাদক, যিনি গ্রাম্য ও আরণ্য সর্ব্ববিধ ওষধির অধিপতি, যিনি মন্ত্রণাকুশল ও বণিজ্যানিপুণ, যিনি কক্ষ অর্থাৎ ঘাসসকলের অধীশ্বর, যিনি রিপুগণকে রোদন করান এবং যিনি উচ্চরবকারী, যিনি পত্তিনামক সেনাসংস্থানের রক্ষক পালক বা অধিষ্ঠাতা, সেই রুদ্রকে নমস্কার।

আলোচনা। এই মন্ত্রে ক্ষত্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তির বর্ণনা করা হইতেছে। ভগবান্ রুদ্রদেব শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, প্রভৃতি বৈশ্যশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েন, আবার তিনিই সংগ্রাম, পরমারণ, উচ্চ আর্ত্তনাদ প্রভৃতি ক্ষত্রবলের নিদর্শন প্রদর্শন করেন। রুদ্রদেব স্থপতি ও সুলোহিত, তিনি বৃক্ষগণের ঈশ্বর, ওষধিগণের পালক, কক্ষগণের মধ্যেও বিদ্যমান। এই বর্ণনা শিল্প ও কৃষির সংবাদ দান করে। স্থপতিবিদ্যার এই সুপ্রাচীন সময়ে এতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল যে, স্থপতির আশ্চর্য্য নির্ম্মাণচাতুর্য্যে বিশ্বশিল্পীর সত্তা অবলোকন করিয়া, তাহাকে স্থপতি-শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। রুদ্রদেবই স্থপতি হইয়া ইষ্টকাদির দ্বারায় সৌধনির্ম্মাণ করিতেছেন। তিনিই ভূমি-বিস্তারক হইয়া, ভূমিদ্বারা ইষ্টকাদি নির্ম্মাণ করিতেছেন। তিনিই বৃক্ষগণের রক্ষকরূপে বিদ্যমান থাকিয়া, কাষ্ঠ-শিল্পের নানাবিধ ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনিই ধান্য যব, গোধূম, মসুরাদি নানাপ্রকার ওষধির রক্ষণ পালন কার্য্যে নিযুক্ত. আবার তিনিই ধান্য-ক্ষেত্রাদির ধান্যলতাদির মধ্যস্থ 'কক্ষ' নামক (১) অনাবশ্যকীয় ঘাস সকলকে সংগ্রহ করিয়া, যথোচিত কার্য্যে ব্যবহার করেন। যিনি বণিগ্‌রূপে ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহার সম্পাদন করেন ও নানা ধন-রত্ন উৎপাদন করেন, অন্যদিকে যিনি রণক্ষেত্রে ভীষণতর গর্জ্জন করিয়া, শত্রুগণকে পরাভবপূর্ব্বক তাহাদিগের আকুল ক্রন্দনের কারণ হয়েন, যিনি একখানি রথ, একটী রথী, একটী গজ, তিনটী অশ্ব ও পাঁচটী পাদচারি-সৈনিক—এই সকলের সমাবেশরূপ 'পত্তি' নামক সেনাসংস্থানের পালক রক্ষক বা প্রাণস্বরূপ, সেই ভগবান্ রুদ্রকে যাজ্ঞিক নমস্কার করিতেছেন। প্রথমে শিল্প, তদনন্তর কৃষি, তৎপরে বাণিজ্য এবং অবশেষে রণসজ্জার বর্ণনা করায়, সর্ব্ববিধ ব্যাপারই রুদ্রদেবের বিভিন্নরূপ প্রকাশ ব্যতীত অপর কিছুই নহে ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে। এই রহস্য রুদ্রাধ্যায়ের সর্ব্বত্র অল্পাধিক-পরিমাণে বিবৃত হইয়াছে। শিল্পী কর্ষক, বণিক্, যোদ্ধা—সকলেই

(১) "যথোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষতি" যেমন নির্দ্দাতা অর্থাৎ যে কর্ষক ধান্যক্ষেত্র "নীড়ানী" দ্বারা "নীড়ায়," সে যেমন 'কক্ষ' বা বাজে ঘাস তুলিয়া লইয়া, ধান্যগুলিকে রক্ষা করে তদ্রূপ। উক্ত স্থলে 'কক্ষ' শব্দে ঘাস বুঝা যাইতেছে। ঐ গুলি না "নিড়াইলে" ধান্য-লতিকা পুষ্ট হইতে পারেনা।

রুদ্রমূর্ত্তি। তাৎপর্য্যতঃ সর্ব্ববিধ উত্তম, মধ্যম, অধম ব্যবসায় ও ব্যবসায়ীর অভ্যন্তরে ভগবান্ রুদ্রের সত্তা বৈদিক ঋষি জ্ঞান-লোচনে অবলোকন করিয়া, রুদ্রের বিশ্বব্যাপিনী সত্তার উদ্দেশে কোটী কোটী প্রণতি পরিজ্ঞাপনপূর্ব্বক আত্মানন্দে বিভোর হইতেছেন।

নমঃ কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে সত্বনাং পতয়ে নমো নমঃ সহমানায় নিব্যাধিন আব্যাধিনীনাং পতয়ে নমো নমো নিষঙ্গিণে ককুভায় স্তেনানাম্পতয়ে নমো নমো নিচেরবে পরিচরায়ারণ্যানাং পতয়ে নমঃ। ২০

পদপাঠঃ। নমঃ। কৃৎস্নায়তয়া। ধাবতে। সত্বনাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। সহমানায়। নিব্যাধিনে। আব্যাধিনীনাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। নিষঙ্গিনে। ককুভায়। স্তেনানাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। নিচেরবে। পরিচরায়। আরণ্যানাং। পতয়ে। নমঃ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার। কৃৎস্নায়তয়া—আকর্ণপূর্ণ-ধনুর্গ্রহণ সহকারে। ধাবতে—যিনি ধাবমান তাহাকে। সত্বনাং—প্রাণিগণের। পতয়ে—অধিপতি বা রক্ষককে। সহমানায়—যিনি অরিগণকে পরাস্ত করেন তাহাকে অথবা সহিষ্ণু রুদ্রকে। নিব্যাধিনে—যিনি প্রকৃষ্টরূপে শত্রুগণকে বিনাশ করেন তাহাকে। আব্যাধিনীনাং—সৈনিকগণের। পতয়ে—রক্ষককে। নিষঙ্গিনে—খড়্গাধারী রুদ্রদেবকে। ককুভায়—মহান্ রুদ্রকে। স্তেনানাং—চোরগণের। পতয়ে—অধিস্বামীকে। নিচেরবে—যে চুরির চেষ্টায় অনবরত ভ্রমণ করে সে 'নিচেরু' তাহাকে। পরিচরায়—হরণেচ্ছায় (মহীধরমতে আপণ-বাটিকাদিতে) "আনাচ্ কানাচে" ঘুরিয়া বেড়ায় যে তাহাকে। আরণ্যানাং—বনস্থ তস্করগণের। পতয়ে—পালককে। নমঃ—নমস্কার।

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারো হস্তু। কৃৎস্নায়তয়া—আকর্ণপূর্ণ-ধনুষ্টেন। ধাবতে—শীঘ্রং গচ্ছতে। সত্বনাং—শরণাগতানাং জীবানাং। পতয়ে—রক্ষকায়। সহমানায়—অরীণাং অভিভাবকায়। নিব্যাধিনে—শত্রুভেদকায়। আব্যাধিনীনাং—শূরসেনানাং। পতয়ে—পালকায় পরিচালকায় বা। নিষঙ্গিনে—খড়্গধরায়। ককুভায়—মহতে। স্তেনানাং—চোরাণাং। পতয়ে—স্বামিনে। নিচেরবে—অপহারবুদ্ধ্যা নিরন্তরং চরতে। পরিচরায়—আপণবাটিকাদৌ হরণেচ্ছয়া বিচরতে। আরণ্যানাং—বনচর-চৌরাণাং। পতয়ে—রক্ষকায়। নমঃ—নমস্কারো হস্তু।

অন্বয়ঃ। কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে সত্বনাং পতয়ে নমঃ। সহমানায় নিব্যাধিনে আব্যাধিনীনাং পতয়ে নমঃ। নিষঙ্গিণে ককুভায় স্তেনানাং পতয়ে নমঃ। নিচেরবে পরিচরায় আরণ্যানাং পতয়ে নমঃ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে আকর্ণপূর্ণধনুস্তয়া ত্বরিতং গচ্ছতে (কৃৎস্নং সমগ্রং আয়তং বিস্তৃতং অর্থাৎ ধনুঃ যস্য স কৃৎস্নায়তঃ তস্য ভাবঃ কৃৎস্নায়তত্তা তয়া। যুদ্ধে শীঘ্রং গচ্ছতে, শীঘ্রগতৌ সরতে র্ধাবাদেশঃ তলোপশ্ছান্দসঃ। যথা কৃৎস্নঃ সর্ব্বঃ আয়োবৃদ্ধঃ কৃৎস্নায়ত্তস্য ভাবঃ কৃৎস্নায়তা তয়া ধাবতে সর্ব্বলাভপ্রাপকত্বেন ধাবতে যত্র গচ্ছতি সর্ব্বেষ্টলাভং প্রাপ্নোতি

ইত্যর্থঃ ইতি মহীধরাচার্য্যঃ।) রুদ্রায় নমঃ। 'সত্বন্' শব্দঃ প্রাণিবাচী, সত্বানঃ প্রাণিনঃ তেষাং রক্ষকায়, সহতে হরীন্ অভিভবতি সহমানঃ, তস্মৈ নিতরাং বিধ্যতি ইতি শত্রূন্ ইতি নিব্যাধী তস্মৈ, আসমন্তাৎ বিধ্যতি ইত্যাব্যাধিন্যঃ শূরসেনাস্তাসাং পতয়ে পালকায় নমঃ। নিষঙ্গঃ খড়্গঃ সোঽস্যাস্তীতি নিষঙ্গী তস্মৈ, ককুভায় মহতে রুদ্রায় নমঃ। ককুভ ইতি মহন্নামসু পঠিতং নিঘণ্টু গ্রন্থে। স্তেনানাং গুপ্ত-চোরাণাং পালকায় নমঃ। নিরন্তরং অপহারবুদ্ধ্যা চরতীতি নিচেরুঃ তস্মৈ, পরিত আপণ-বাটিকাদৌ হরণেচ্ছয়া চরতীতি পরিচরঃ তস্মৈ, আরণ্য-চোরাণাং পালকায় নমঃ। (রুদ্রঃ লীলয়া চোরাদিরূপং ধত্তে, যদ্বা রুদ্রস্য জগদাত্মকত্বাৎ চোরাদয়ঃ রুদ্রা এব ধ্যেয়াঃ, যদ্বা স্তেনাদি শরীরে জীবেশ্বর-রূপেণ রুদ্রো দ্বিধা তিষ্ঠতি। তত্র জীবরূপং স্তেনাদিশব্দবাচ্যং তৎ ঈশ্বররুদ্ররূপং লক্ষয়তি যথা শাখাগ্রং চন্দ্রস্য লক্ষকম্ ইতি মহীধরঃ।)

বঙ্গার্থঃ। যে রুদ্র আকর্ণপূর্ণ ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক ধাবমান, যিনি শরণাগত প্রাণিগণের পালয়িতা, যিনি অরিগণকে অভিভূত করেন অথবা যিনি সহিষ্ণুগণের হৃদয়দেবতা। যিনি শত্রুনাশক বীরসৈন্যগণের পালক, যিনি খড়্গধারী মহান্, যিনি স্তেন, নিচেরু, পরিচর ও আরণ্যচোরবর্গেরও পালক বা অন্তরাত্মা সেই রুদ্রদেবকে অসংখ্য নমস্কার।

আলোচনা। 'কৃৎস্নায়তয়া' কথাটির মহীধরাচার্য্য দুই প্রকার অর্থ লিখিয়াছেন, কৃৎস্ন অর্থাৎ সমগ্র ধনু আয়ত বিস্তৃত হইয়াছে যাহার তিনি কৃৎস্নায়ত। তাহার ভাব কৃৎস্নায়তত্তা, তৎসহকারে 'কৃৎস্নায়তত্তয়া' এই শব্দের একটী 'ত' লোপ করিলে (বৈদিক প্রক্রিয়ানুসারে) 'কৃৎস্নায়তয়া' হয়। অন্য-রূপব্যাখ্যা,—কৃৎস্ন সকল আয় অর্থাৎ লাভ যাহার সে 'কৃৎস্নায়': তস্য ভাবঃ—'কৃৎস্নায়তা—তয়া 'কৃৎস্নায়তয়া' সর্ব্বলাভপ্রাপকত্ব সহকারে অর্থাৎ যেখানে গমন করেন, সেইস্থানে সকল ইষ্টলাভ প্রাপ্ত হন। 'সহমান' কথারও দ্বিবিধ অর্থ; যিনি সহমান অর্থাৎ সহিষ্ণু, তাৎ-পর্য্যন্তঃ সহিষ্ণুগণের হৃদয়ে যিনি অন্তরাত্মা-রূপে বিরাজ করিতেছেন, কিম্বা যিনি (সহতে হরীন্ অভিভবতি") অরিগণকে পরাজিত করেন। 'স্তেন' 'নিচেরু' পরিচর ও 'আরণ্য' ইহারা সকলেই তস্কর। মহীধরের মতে 'স্তেন' অর্থ গুপ্তচোর, নিচেরু যাহারা অপহারেচ্ছায় সর্ব্বদা বেড়ায়, পরিচর যাহারা চুরির চেষ্টায় আপণবাটিকাদিতে বিচরণ করে। 'আরণ্য' যাহারা বনে বাস করে, সুবিধামত লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করে। একজন অধুনাতন কালের পণ্ডিত বলিয়াছেন—'স্তেন' অর্থ সিঁধেল চোর। পরিচর অর্থ গাঁটকাটা। তাঁহার ব্যাখ্যার মূল প্রামাণিক, সন্দেহ নাই। এইমন্ত্রে ধনুর্দ্ধারী শরণাগত-রক্ষক শত্রুমারক সহিষ্ণু সেনাপালক খড়্গধারী মহান্, ও চোরগণের পালক রুদ্রকে নমস্কার করা হইতেছে। মহীধর বলিয়াছেন, রুদ্র স্বয়ং লীলায় চোরাদিরূপ ধারণ করেন। চোরের চৌর্য্য সেও রুদ্রের কার্য্য, কারণ সমস্ত জগতে তিনিই নানারূপে বিরাজমান। তিনিই চোর, তিনিই গৃহস্থ, তিনিই শাস্তা। রুদ্র জগদাত্মক। সুতরাং চোরকেও রুদ্ররূপে চিন্তা করিবে। কিম্বা

বস্তুতে ভগবদ্দর্শন শ্রেষ্ঠজ্ঞান, তাহাতে কাহারও সংশয় নাই। অন্যভাবে দেখা যায়, জগতের রহস্য দুই ভাব। এক জীব-ভাব, অন্য ঈশ্বর-ভাব। স্তেনাদির দেহেও রুদ্র এই দুইভাবে বিরাজিত। জীবভাব 'স্তেন' প্রভৃতি শব্দের বাচ্য এবং ঈশ্বরভাব ঐ শব্দ-সমূহের লক্ষ্য। যেমন "গাছের আগায় চাঁদ উঠিয়াছে" বলিয়া, গাছের আগার দ্বারা চন্দ্রকে লক্ষ্য করা হয়, তদ্রূপ "স্তেনাদি রুদ্র" বলায় স্তেনপ্রভৃতি দ্বারা জীবহৃদয়স্থ অন্তর্যামী ঈশ্বরস্বরূপ রুদ্র লক্ষিত হন। মোটের উপর 'স্তেন' 'পরিচর' প্রভৃতি শব্দের বাচ্য অর্থ জীব ও লক্ষ্য অর্থ পরমেশ্বর। এই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত এস্থানে সূচিত হইতেছে। তজ্জন্যই বেদবাণী মেঘমন্দ্রে ঘোষণা করিতেছেন 'রুদ্র নিচেরু—রুদ্র পরিচর।'

নমো বঞ্চতে পরিবঞ্চতে স্তায়ূনাম্পতয়ে নমো নমো নিষঙ্গিণ ইষুধিমতে তস্করাণাং পতয়ে নমো নমঃ সৃকায়িভ্যো জিঘাংসদ্ভ্যঃ মুষ্ণতাম্পতয়ে নমো নমো ঽসিমদ্ভ্যো নক্তঞ্চরদ্ভ্যো বিকৃন্তানাম্পতয়ে নমঃ। ২১

পদপাঠঃ। নমঃ। বঞ্চতে। পরিবঞ্চতে। স্তায়ূনাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। নিষঙ্গিণে। ইষুধিমতে। তস্করাণাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। সৃকায়িভ্যঃ। জিঘাংসদ্ভ্যঃ। মুষ্ণতাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। অসিমদ্ভ্যঃ। নক্তঞ্চরদ্ভ্যঃ। বিকৃন্তানাং। পতয়ে। নমঃ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার। বঞ্চতে—প্রতারককে। পরিবঞ্চতে—সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চনাশীলকে। স্তায়ূনাং—গুপ্তচোরগণের। পতয়ে—পালককে। নিষঙ্গিণে—খড়্গধারীকে। ইষুধিমতে—বাণাধারযুক্তকে। তস্করাণাং—প্রকাশ্য চোরগণের। পতয়ে—রক্ষককে। সৃকায়িভ্যঃ—বজ্রধারী রুদ্রগণকে। জিঘাংসদ্ভ্যঃ—রিপুঘাতক রুদ্রগণকে। মুষ্ণতাং—ক্ষেত্রাদিতে যাহারা ধান্য যবাদি অপহরণ করে তাহাদিগের। পতয়ে—অধিপতিকে। অসিমদ্ভ্যঃ—অসিধারী রুদ্রসকলকে। নক্তঞ্চরদ্ভ্যঃ—রজনীতে বিচরণকারীগণকে। বিকৃন্তানাং—ছেদন করিয়া যাহারা অপহরণ করে তাহাদিগের। পতয়ে—রক্ষককে। নমঃ—নমস্কার।

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারোঽস্তু। বঞ্চতে—প্রতারকায়। পরিবঞ্চতে—সর্ব্বতঃ বঞ্চকায়। স্তায়ূনাং—গুপ্তচোর-বিশেষানাং। পতয়ে—স্বামিনে পালকায় বা। নিষঙ্গিণে—খড়্গধরায়। ইষুধিমতে—তূণীরবতে। তস্করাণাং—প্রকটচৌরাণাং। সৃকায়িভ্যঃ—বজ্রভ্যঃ। জিঘাংসদ্ভ্যঃ—রিপুনাশকেভ্যঃ। মুষ্ণতাং—অপহর্ত্তৃবিশেষাণাং। পতয়ে—রক্ষকায়। অসিমদ্ভ্যঃ—তরবারিধারিভ্যঃ। নক্তঞ্চরদ্ভ্যঃ—নিশাচরেভ্যঃ রুদ্রেভ্যঃ। বিকৃন্তানাং—ছিত্বা যেঽপহরন্তি তেষাং। পতয়ে—পালকায়। নমঃ—নমস্কারোঽস্তু।

অন্বয়ঃ। বঞ্চতে পরিবঞ্চতে স্তায়ূনাং পতয়ে নমঃ। নিষঙ্গিণে ইষুধিমতে তস্করাণাং পতয়ে নমঃ। সৃকায়িভ্যঃ জিঘাংসদ্ভ্যঃ মুষ্ণতাম্পতয়ে নমঃ, অসিমদ্ভ্যঃ নক্তঞ্চরদ্ভ্যঃ বিকৃন্তানাং পতয়ে নমঃ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। বঞ্চতি প্রতারয়তি তস্মৈ, পরিসর্ব্বতো বঞ্চতি তস্মৈ (স্বামিনআপ্তো ভূত্বা ক্রমহারে কুত্রচিৎ তদীয়ং ধনমপহৃতে বঞ্চকঃ, সর্ব্বব্যবহারে ধনাপহরঃ পরিবঞ্চকঃ। ইতি মহীধরঃ) স্তেনানাং গুপ্ততস্করাণাং পতয়ে নমঃ। গুপ্তচোরাঃ দ্বিবিধাঃ রাত্রৌ গৃহে খাতাদিনা দ্রব্যহর্ত্তারঃ স্বীয়া এবানিশমজ্ঞাতাঃ হর্ত্তারশ্চ, পূর্ব্বে স্তেনা উত্তরে স্তায়বঃ। ইতি মহীধরাচার্য্যঃ। নিষঙ্গিনে খড়্গাবতে ইষুধিমতে বাণাধারবতে প্রকটচোরস্বামিনে চ নমঃ। সৃকাবিভ্যঃ বজ্রযুক্তেভ্যঃ (সৃক ইতি বজ্র নাম ইতি নিঘণ্টুশাস্ত্রে। সৃকেন বজ্রেন সহ যন্তি গচ্ছন্তীত্যেবং শীলাঃ সৃকাযিনঃ ইতি মহীধরঃ) জিঘাংসদ্ভ্যঃ নাশকেভ্যঃ শত্রূন্ হন্তুম্ ইচ্ছন্তি ইতি জিঘাংসন্তঃ তেভ্যঃ (হন্তেঃ সন্নন্তাৎ শতৃপ্রত্যয়ঃ ইতি মহীধরঃ।) মুষ্ণতাং—ক্ষেত্রাদিষু ধান্যাদ্যপহর্ত্তারঃ মুষ্ণন্তঃ তেষাং পালকায়। অসিমন্ত্যঃ করবালধারিভ্যঃনক্তঞ্চরদ্ভ্যঃ রাত্রিচরেভ্যঃ (নক্তং চরন্তঃ খড়্গাং ধৃত্বা রাত্রৌ বীথীনির্গত প্রাণিঘাতকাঃ তেভ্যঃ) বিকৃন্তানাং বিকৃন্তন্তি ছিন্দন্তি তে বিকৃন্তাঃ ছিত্বাপহরন্তঃ তেষাং পতয়ে নমঃ।

বঙ্গার্থঃ। যিনি বঞ্চক ও পরিবঞ্চক, যিনি স্তায়ুগণের অধিপতি, যিনি নিষঙ্গী ইষুধিমান্ ও প্রকট-তস্করগণের পালক, যিনি বজ্রধারী শত্রুনাশক সেই ক্ষেত্রস্থ ধান্যাদি চোরের অধীশ্বরকে, অসিধারীকে রাত্রিচরকে ও যাহারা ছেদন পূর্ব্বক দিবাভাগে প্রকাশ্যরূপে অপহরণ করে, তাহাদিগের পালককে নমস্কার করি।

আলোচনা। এই মন্ত্রে বঞ্চক, পরিবঞ্চক, স্তায়ু, তস্কর, মুষ্ণন্, প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে, তাহাদের অর্থ সাধারণের অধিগম্য নহে। ধনস্বামীর বিশ্বাসপাত্র হইয়া যে হঠাৎ কোনও কার্য্যে ধন অপহরণ করে, সে বঞ্চক আর যে ব্যক্তি সকল ব্যবহারেই অর্থ হরণ করে সে পরিবঞ্চক। স্তেন ও স্তায়ু দ্বিবিধ গুপ্তচোর। যাহারা রাত্রিতে খাত (সিঁদ) খনন করিয়া গৃহদ্রব্য হরণ করে তাহারা স্তেন, আর যাহারা নিজসংসৃষ্টলোক হইয়াও অজ্ঞাতে অহর্নিশ সামগ্রী হরণ করে তাহারা স্তায়ু। তস্কর অর্থ প্রকাশ্য চোর। নিষঙ্গ—খড়্গ ও ইষুধি—তূণ বা বাণাধার—এই উভয় উপকরণ যাহার আছে—সেই যোদ্ধৃস্বরূপ রুদ্রকে নমস্কার করা হইতেছে। "সৃকাবী" বজ্রধর, 'সৃক' বজ্রের অপরনাম ইহা নিঘণ্টু নামক অতি প্রাচীন বৈদিক অভিধানে আছে। মুষ্ণন্—যাহারা ক্ষেত্র, খল ও কুসূলাদি হইতে ধান্য-গোধূমাদি শস্য অপহরণ করে; তাহাদের পালক রুদ্রকে নমস্কার করিতেছেন। অসিধারী ও নক্তচর অর্থাৎ যিনি রাত্রিতে খড়্গ গ্রহণ করিয়া বীথীনির্গত প্রাণিগণের নিঘাতক সেই রুদ্রকে, ও যাহারা, ছেদন করিয়া অপহরণ করে তাহাদের রক্ষককে নমস্কার। এই মন্ত্রে নানা অস্ত্রধারী গুপ্ত ও প্রকাশ্য চোরগণের স্বরূপ ও তাহাদের অধিপতিরূপ রুদ্রদেবতাকে নমস্কার করা হইতেছে।

নমঃ উষ্ণীষিণে গিরিচরায় কুলুঞ্চানাম্পতয়ে নমো নম ইষুমদ্ভ্যো-

ধন্বায়িভ্যশ্চ বো নমো নম আতন্বানেভ্যঃ প্রতিদধানেভ্যঃ চ বো নমো নম আযচ্ছদ্ভ্যোঽস্যদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ। ২২

পদপাঠঃ। নমঃ। উষ্ণীষিণে। গিরিচরায়। কুলুঞ্চানাং। পতয়ে। নমঃ। নমঃ। ইষুমদ্ভ্যঃ। ধন্বায়িভ্যঃ। চ। বো। নমঃ। নমঃ। আতন্বানেভ্যঃ। প্রতিদধানেভ্যঃ। চ। বো। নমঃ। নমঃ। আযচ্ছদ্ভ্যঃ। হস্যদ্ভ্যঃ। চ। বো। নমঃ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার। উষ্ণীষিণে—উষ্ণীষ অর্থাৎ শিরোবস্ত্রধারীকে। গিরিচরায়—অনাবৃত মস্তকে যিনি গিরিতে বিচরণ করেন তাঁহাকে। কুলুঞ্চানাং—কুলঞ্চ অর্থাৎ যাহারা ছলে বলে কৌশলে অপরের ভূমি প্রভৃতি অপহরণ করে তাহাদিগের। পতয়ে—অধিপতিকে। ইষুমদ্ভ্যঃ—(কুলুঞ্চগণের দমনার্থ) বাণধারী রুদ্রগণকে। ধন্বায়িভ্যঃ—ধনুর্দ্ধারী রুদ্রগণকে। চ—ও। বো—তোমাদিগকে। আতন্বানেভ্যঃ—ধনুতে জ্যা আরোপণকারী রুদ্রগণকে। প্রতিদধানেভ্যঃ—যাহারা দুষ্টগণের দমনার্থ ধনুতে বাণ সন্ধান করিতেছেন সেই রুদ্রগণকে। চ—এবং। বো—তোমাদিগকে। আযচ্ছদ্ভ্যঃ—যাহারা ধনু আকর্ষণ করিতেছেন সেই রুদ্রগণকে। অস্যদ্ভ্যঃ—যাহারা শত্রুগণের উদ্দেশে বাণক্ষেপণ করিতেছেন সেই রুদ্রগণকে। চ—ও। বো—তোমাদিগকে। নমঃ—নমস্কার।

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারোঽস্তু। উষ্ণীষিণে—শিরোবেষ্টনবসনধারিণে। গিরিচরায়—পর্ব্বতচারিণে। কুলুঞ্চানাং—ছলেন পরস্বাপহারকানাং। পতয়ে—রক্ষকায়। ইষুমদ্ভ্যঃ—বাণধরেভ্যঃ। ধন্বায়িভ্যঃ—ধনুর্ধারিভ্যঃ। চ—অপরং। বো—যুষ্মভ্যং। আতন্বানেভ্যঃ—ধনুষি জ্যাং আরোপয়দ্ভ্যঃ। প্রতিদধানেভ্যঃ—ধনুষি বাণং সন্দধানেভ্যঃ। চ—অপি। বো—যুষ্মভ্যং। আযচ্ছদ্ভ্যঃ—ধনুরাকর্ষণকারিভ্যঃ। অস্যদ্ভ্যঃ—বাণক্ষেপকেভ্যঃ। চ—অপিচ। বো—যুষ্মভ্যং। নমঃ—নমস্কারোঽস্তু।

মন্ত্রব্যাখ্যা। উষ্ণীষং শিরোবেষ্টনবসনং অস্যাস্তীতি উষ্ণীষী (উষ্ণীষেণ শিরঃ প্রাবৃত্য গ্রামে স্বপহর্তুং প্রবৃত্তঃ উষ্ণীষীতি মহীধরাচার্য্যাঃ) তস্মৈ নমঃ। গিরিচরায়—গিরৌ চরতি গিরিচরঃ (অধস্তানাং বস্ত্রাদ্যপহর্ত্তুং পর্ব্বতাদি-বিষম-স্থানচারী ইতি মহীধরঃ) তস্মৈ নমঃ। কুলুঞ্চানাং কুং ভূমিং ক্ষেত্রাদিরূপাং লুঞ্চন্তি—হরন্তি কুলুঞ্চাঃ কুৎসিতং লুঞ্চন্তি কুলুঞ্চাঃ বা তেষাং রক্ষকায় নমঃ। ইদানীং রুদ্রানভিমুখীকৃত্য আহ—ইষুমদ্ভ্যঃ ইষবো বিদ্যন্তে যেষাং তে ইষুমন্তঃ তেভ্যঃ ধন্বায়িভ্যঃ—ধন্বনা ধনুষা সহ যান্তি গচ্ছন্তি ধন্বায়িনঃ তেভ্যঃ। হে রুদ্রাঃ ধনুর্ধারিভ্যঃ বো যুষ্মভ্যং নমঃ। (চকারো মন্ত্রভেদজ্ঞাপনার্থ ইতি মহীধরঃ) আতন্বানেভ্যঃ—আতন্বন্তি আরোপয়ন্তি জ্যাং ধনুষীত্যাতন্বানাঃ তেভ্যঃ। প্রতিদধানেভ্যঃ—প্রতিদধতে বাণং সন্দধতে ধনুষীতি সন্দধানাঃ তেভ্যঃ—বো যুষ্মভ্যং নমঃ। আযচ্ছদ্ভ্যঃ—আযচ্ছন্তি আকর্ষয়ন্তি ধনুংষি যে তে আযচ্ছন্তঃ তেভ্যঃ—অস্যন্তি ক্ষিপন্তি বাণান্ ইতি অস্যন্তঃ

তেভ্যঃ চ বো যুষ্মভ্যং নমঃ নমস্কারো হস্তু ইতি ভাবঃ।

অন্বয়ঃ। উষ্ণীষিণে গিরিচরায় কুলুঞ্চানাং পতয়ে নমঃ। হে রুদ্রাঃ—ইষুমদ্ভ্যঃ ধন্বায়িভ্যঃ চ বো নমঃ। আতন্বানেভ্যঃ প্রতিদধানেভ্যশ্চ বো নমঃ। আযচ্ছদ্ভ্যঃ অস্যদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ অস্তু।

বঙ্গার্থঃ। যিনি উষ্ণীষধারী ও গিরিচর এবং কুলুঞ্চগণের অধিপতি তাঁহাকে নমস্কার। (হে রুদ্রগণ!) বাণধারী ও ধনুর্দ্ধারী তোমাদিগকে নমস্কার। ধনুকে জ্যা আরোপণকারী ও বাণসন্ধানকারী তোমাদিগকে নমস্কার। ধনু আকর্ষণ ও বাণক্ষেপণকারী তোমাদিগকে পুনঃ২ নমস্কার করি।

আলোচনা। এই মন্ত্রে চোরভাব, সভ্য-ভাব, দূত ভাব এবং সৈনিক-ভাবের ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। রুদ্রকে উষ্ণীষধারী বলা হইয়াছে। মহীধরাচার্য্যের মতে যে গ্রাম্য-চোর মস্তকে কাপড় জড়াইয়া মুখ ঢাকিয়া অপ-হরণার্থ ভ্রমণ করে, সেই উষ্ণীষী। অপরে মনে করেন, বিচারসভার উষ্ণীষধারী সভ্য উষ্ণীষী। গিরিচর অর্থে পর্ব্বতচারী তস্কর। পক্ষান্তরে পর্ব্বতাদি শঙ্কট স্থান অতিক্রম-কারী যে দূত অপর রাজ্যে রাজবার্ত্তা বহন করে সে গিরিচর। কুলুঞ্চ 'ভূমি-চোর' 'কুং'-পৃথিবী ভূমি, 'লুঞ্চতি' হরণ করে যে সে কুলুঞ্চ। পক্ষান্তরে যিনি পরদেশ আক্রমণ করিয়া আয়ত্ত করেন, তিনি কুলুঞ্চ—রাজসেনা-ধ্যক্ষ। রুদ্রগণ ইষু ও ধনুর্দ্ধারী, তাঁহারা ধনুতে জ্যাযোজনা করেন, তাঁহারা বাণসন্ধান করেন, তাঁহারা ধনু আকর্ষণ করেন, বাণ-ক্ষেপণ করেন, সেই রুদ্রগণকে নমস্কার। এই বর্ণনা—যুদ্ধকালীন যোদ্ধার বর্ণনা। ভিন্ন অন্য কিছু নয়। চিন্তা করিলে মনে হয়—যিনি চোর, অথবা যিনি চোরের বিচারক, যিনি পার্ব্বত্যচোর বা দূত, যিনি ভূমিচোর বা বা ভূমিজয়ী ও যোদ্ধা সেই রুদ্রগণকে নমস্কার করা হইতেছে। জাগতিক বিভিন্ন ভাবের মূল উৎস এক সত্যস্বরূপ অনন্ত ভাবময় ভগবান্,—এই মহারহস্য-দ্বার এখানে উদ্ঘাটিত।

নমো বিসৃজদ্ভ্যো বিধ্যদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমঃ স্বপদ্ভ্যোজাগ্রদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমঃ শয়ানেভ্যঃ আসীনেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ তিষ্ঠদ্ভ্যো ধাবদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ। ২৩

পদপাঠঃ। নমঃ। বিসৃজদ্ভ্যঃ। বিধ্যদ্ভ্যঃ। চ। বো। নমঃ। নমঃ। স্বপদ্ভ্যঃ। জাগ্রদ্ভ্যঃ। চ। বো। নমঃ। নমঃ। শয়ানেভ্যঃ। আসীনেভ্যঃ। চ। বো। নমঃ। নমঃ। তিষ্ঠদ্ভ্যঃ। ধাবদ্ভ্যঃ। চ। বো। নমঃ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার। (সর্ব্বত্র এইরূপ) বিসৃজদ্ভ্যঃ—বাণত্যাগকারী রুদ্র-গণকে। বিধ্যদ্ভ্যঃ—শত্রু-মর্ম্মবেধকারি রুদ্র-গণকে। চ—এবং। বো—তোমাদিগকে। স্বপদ্ভ্যঃ—নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদ্রষ্টৃগণকে। জাগ্রদ্ভ্যঃ—জাগ্রতগণকে। চ—ও। শয়ানেভ্যঃ—সুষুপ্ত-গণকে—শয়নকারিগণকে। আসীনেভ্যঃ—উপবিষ্টগণকে। তিষ্ঠদ্ভ্যঃ—দণ্ডায়মানগণকে। ধাবদ্ভ্যঃ—ধাবমানগণকে। নমঃ—নমস্কার।

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারো হস্তু। বিসৃজদ্ভ্যঃ—বাণান্ মুঞ্চদ্ভ্যঃ। বিধ্যদ্ভ্যঃ—শত্রূন্ তাড়য়দ্ভ্যঃ। চ—অপিচ। স্বপ—

যুষ্মভ্যং। স্বপদ্ভ্যঃ—স্বপ্নং পশ্যদ্ভ্যঃ। জাগ্রদ্ভ্যঃ—জাগরণশীলেভ্যঃ। শয়ানেভ্যঃ—সুষুপ্তেভ্যঃ শয্যাশায়িভ্যঃ। আসীনেভ্যঃ—উপবিষ্টেভ্যঃ। তিষ্ঠদ্ভ্যঃ—স্থানশীলেভ্যঃ। ধাবদ্ভ্যঃ—ধাবমানেভ্যঃ।* নম ইতি শেষঃ।

অন্বয়ঃ। হে রুদ্রাঃ—বিসৃজদ্ভ্যঃ বিধ্যদ্ভ্যঃ চ যুষ্মভ্যং নমঃ। স্বপদ্ভ্যঃ জাগ্রদ্ভ্যশ্চ যুষ্মভ্যং নমঃ। শয়ানেভ্যঃ আসীনেভ্যশ্চ যুষ্মভ্যং নমঃ। তিষ্ঠদ্ভ্যঃ ধাবদ্ভ্যশ্চ যুষ্মভ্যং নমঃ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। রুদ্রান্ অভিমুখীকৃত্যেব অয়ং মন্ত্রঃ প্রবর্ত্ততে। হে রুদ্রাঃ বিসৃজদ্ভ্যঃ (বিসৃজন্তি—বিমুঞ্চন্তি বাণান্ অরিষু ইতি বিসৃজন্তঃ তেভ্যঃ) বিধ্যদ্ভ্যঃ শত্রুবেধকেভ্যঃ (বিধ্যন্তি—তাড়য়ন্তি শত্রূন্ ইতি বিধ্যন্তঃ তেভ্যঃ)—মুক্তেষ্বপি শরেষু কেষাঞ্চিৎ পাটবাভাবাৎ লক্ষ্যযোগো ন—ভবতীতি শঙ্কাশমনায় আহ,—রুদ্রাঃ ন কেবলং বিসৃজন্তঃ বিধ্যন্তোহপি। বো যুষ্মভ্যং নমঃ ইতি শেষঃ। স্বপদ্ভ্যঃ স্বপ্নাবস্থেভ্যঃ তেভ্যঃ—(স্বপিতীতি স্বপন্ তেভ্যঃ) জাগ্রদ্ভ্যঃ জাগরণশীলেভ্যঃ (জাগ্রতীতি জাগ্রন্তঃ তেভ্যঃ ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়োপলব্ধিঃ জাগরণং) শয়ানেভ্যঃ—শয্যাশায়িভ্যঃ (শি—শানচ্ কর্ত্তরি শয়ানঃ তেভ্যঃ অর্থাৎ সুষুপ্তেভ্যঃ—) আসীনেভ্যঃ উপবিষ্টেভ্যঃ—(আস উপবেশনে ইতস্মাৎ শানচ্ প্রত্যয়েন আসীন ইতি তেভ্যঃ) তিষ্ঠদ্ভ্যঃ স্থিতেভ্যঃ (তিষ্ঠন্তি গতিনিবৃত্তিমনুতিষ্ঠন্তি যে তে তিষ্ঠন্তঃ তেভ্যঃ দণ্ডায়মানেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) ধাবদ্ভ্যঃ ত্বরিতং গচ্ছদ্ভ্যঃ (ধাবতি ইত্যর্থাৎ ধাবন্তঃ তেভ্যঃ স্ব ধাতোঃ গত্যর্থকত্ব দ্রুতগমন-বোধনে ধাবাদেশঃ প্রসিদ্ধঃ বৈয়াকরণেষু) চ যুষ্মভ্যং নমস্কারোঽস্তু ইতি যোজনা।

বঙ্গার্থঃ। হে রুদ্রগণ! যে তোমরা বাণ ত্যাগ করিতেছ, শত্রুগণকে বিদ্ধ করিতেছ, যে তোমরা স্বপ্নদ্রষ্টাগণের অন্তরস্থ জাগ্রতগণের হৃদয়স্থ, সুষুপ্ত—ব্যক্তিগণের অন্তরস্থিত, যে তোমরা উপবিষ্টগণের হৃদয়ে আছ, দণ্ডায়মানগণ ও ধাবমানগণের হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করিতেছ সেই তোমাদিগকে নমস্কার করি।

আলোচনা। পূর্ব্বমন্ত্রে সৈনিকমূর্ত্তির যে অবস্থাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, তৎপরবর্ত্তিভাব ও জীবগত অপর নানা ভাব এ মন্ত্রে বর্ণিত হইতেছে। রুদ্রগণ বাণত্যাগ করেন এবং শত্রুগণকে বিদ্ধ করেন। বহুস্থলে বাণ ত্যক্ত হয়, কিন্তু লক্ষ বিদ্ধ হয় না। রুদ্রগণ তেমন নহেন, তাঁহাদের বাণ লক্ষ ভ্রষ্ট হয় না। স্বপ্ন, জাগরণ এবং সুষুপ্তি, এই তিন জীবভাব প্রসিদ্ধ। স্বপ্নে জীব বাহ্যবিষয়নিরপেক্ষ হইয়া অন্তঃকরণে সংস্কার—স্বরূপে অবস্থিত বিষয় গ্রহণ করে। জাগরণ সময়ে ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবিষয় গ্রহণ করে এবং সুষুপ্তিতে সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির উপরম সংঘটিত হয়। বেদান্তমতে সুষুপ্তিতে অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে। দার্শনিকেরা বলেন, জাগ্রৎ সময়ে মন ত্বগিন্দ্রিয়ে যুক্ত থাকে, স্বপ্নে মেধ্যানাড়ীর সহিত ও সুষুপ্তিতে পুরীতত নামক নাড়ীর সহিত সংযুক্ত থাকে। জীবের এই তিন ভাব। রুদ্রের ও এই তিন ভাব বর্ণিত হইতেছে। রুদ্র জীবহৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া জীবগত জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই

ভাবত্রয়ের অধিষ্ঠাতারূপে বিরাজ করেন,—ইহাই এখনকার রহস্য। জীবভাব জগদ্ভাবের আশ্রয়ে পরিদৃষ্ট ও পরিপুষ্ট। তৎপরে জীবের দেহোপাধি-গত ভাব উপবেশন, স্থিতি, গতি ও রুদ্রেরই ভাব, ইহা বলা হইতেছে। স্থিতি নিষ্ক্রিয় ভাব, উপবেশন ঈষৎ অঙ্গচালনের বা উদ্বোধনের ভাব, ধাবন ক্রিয়া-ভাব। শক্তি, ক্রিয়ারম্ভ ও কার্য্যাবস্থা এই ত্রিবিধ দেহোপাধিগত জীবভাব ও রুদ্রবিভূতি। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, রুদ্র সর্ব্বভাবময় সর্ব্বশক্তিময় সর্ব্বক্রিয়াশ্রয় সর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সকল সংসার স্থিতি-নাশাদি সাধন করিতেছেন। এই তথ্যে রুদ্রাধ্যায়ের আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ।

নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো ঽশ্বেভ্যোঽশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো নম আব্যাধিনীভ্যঃ বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো নমঃ উগণাভ্যস্তৃংহতীভ্যশ্চ বো নমঃ। ২৪

পদপাঠঃ। নমঃ। সভাভ্যঃ। সভাপতিভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ। নমঃ। অশ্বেভ্যঃ। অশ্বপতিভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ। নমঃ। আব্যাধিনীভ্যঃ। বিবিধ্যন্তীভ্যঃ। চ। বো। নমঃ। নমঃ। উগণাভ্যঃ। তৃংহতীভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার। সভাভ্যঃ—সভাসকলকে (তাৎপর্য্যতঃ সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়স্থ রুদ্রদেবকে) সভাপতিভ্যঃ—সভাপতিগণকে। চ—এবং। বঃ—হে রুদ্রগণ! তোমাদিগকে। অশ্বেভ্যঃ—তুরঙ্গম চালকদেবতাকে।) অশ্বপতিভ্যঃ—অশ্বসমূহের অধিপতিগণকে। আব্যাধিনীভ্যঃ—উগ্রমূর্ত্তি-দেবীগণ অথবা সেনাগণকে। বিবিধ্যন্তীভ্যঃ—যাহারা বিশেষ প্রকারে বিদ্ধ করে তাহাদিগকে। উগণাভ্যঃ—ব্রাহ্মীপ্রভৃতি মাতৃগণকে। তৃংহতীভ্যঃ—বিনাশ-সমর্থগণকে। নমঃ—নমস্কার।

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারোঽস্তু। সভাভ্যঃ—সভারূপেভ্যঃ রুদ্রেভ্যঃ। চ—অপি চ। বঃ—যুষ্মভ্যং। অশ্বেভ্যঃ—ঘোটকেভ্যঃ। অশ্বপতিভ্যঃ—ঘোটকানাং অধিপতিভ্যঃ। আব্যাধিনীভ্যঃ—সেনাভ্যঃ—উগ্রদেবতাভ্যো বা। বিবিধ্যন্তীভ্যঃ—বিশেষেণ হননস্বভাবাভ্যঃ। উগণাভ্যঃ—ব্রাহ্ম্যাদ্যাভ্যঃ মাতৃভ্যঃ। তৃংহতীভ্যঃ—হন্তুং সমর্থাভ্যঃ।

অন্বয়ঃ। হে রুদ্রাঃ! সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ যুষ্মভ্যং নমঃ। অশ্বেভ্যঃ অশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ। আব্যাধিনীভ্যঃ বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমঃ। উগণাভ্যঃ—তৃংহতীভ্যশ্চ বো নমঃ অস্তু।

মন্ত্রব্যাখ্যা। সভাভ্যঃ সভাস্থজনানাং হৃদয়স্থেভ্যঃ রুদ্রেভ্যঃ (সভারূপেভ্যঃ রুদ্রেভ্যঃ নমঃ; সভাদিষু রুদ্রদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেতি তাৎপর্য্যাৎ ইতি মহীধরাচার্য্যঃ) সভাপতিভ্যঃ সভায়াঃ রক্ষকেভ্যঃ অশ্বেভ্যঃ তুরগানাং হৃদিস্থেভ্যঃ—অশ্বপতিভ্যঃ অশ্বানাং স্বামিভ্যশ্চ (হে রুদ্রাঃ) যুষ্মভ্যং নমস্কারোঽস্তু। আব্যাধিনীভ্যঃ আ সমন্তাৎ বিধ্যন্তীত্যাব্যাধিন্যো দেব্যঃ সেনা বা তাভ্যো নমঃ বিবিধ্যন্তীভ্যঃ বিশেষেণ বিধ্যন্তি বিবিধ্যন্ত্যস্তাভ্যো বো নমঃ। উগণাভ্যঃ—উৎকৃষ্টাগণা ভৃত্যসমূহাঃ যাসাং তাঃ উগণাঃ ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ মাতরঃ তাভ্যঃ (উগ-

সর্গাত্ত্যলোপেন পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ) নমঃ। তৃংহতীভ্যঃ—তৃংহন্তি ঘ্নন্তি যাঃ তাঃ তৃংহত্যঃ হন্তুং সমর্থাঃ দুর্গাদয়ঃ তাভ্যো নমঃ (তৃহি হিংসায়াং ইত্যস্য রূপম্‌।

মন্ত্রার্থঃ। হে রুদ্রগণ! সভাস্বরূপ ও সভাপতিস্বরূপ তোমাদিগকে নমস্কার। অশ্ব ও অশ্বপতিস্বরূপ তোমাদিগকে নমস্কার। মারণস্বভাব উগ্রদেবীগণ অথবা সেনারূপ রুদ্রগণকে নমস্কার। ব্রাহ্মী কৌমারী প্রভৃতি মাতৃগণস্বরূপ রুদ্রগণকে এবং শত্রুনাশ-সমর্থ দুর্গাদিরূপ রুদ্রমূর্ত্তি-সকলকে নমস্কার করি।

আলোচনা। এই মন্ত্রে রুদ্রদেবতার উগ্রমূর্ত্তির বিভিন্ন বিকাশের বর্ণনা প্রদত্ত হইতেছে। এই মন্ত্রে যে (সভা) ও 'সভাপতি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা রণক্ষেত্রের অন্তর্গত শিবিরসভা ও তৎসভাধ্যক্ষকে বুঝাইতেছে। রুদ্রগণ সভাস্বরূপ ও সভাপতিস্বরূপ। তাৎপর্য্যতঃ রণক্ষেত্রান্তর্গত শিবির-সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ ও শিবিরাধ্যক্ষের হৃদয়ে যিনি উগ্ররূপে বিরাজ করিয়া তুমুল রণের পরামর্শ ও তৎকর্তৃত্ব পরিচালন করিতেছেন, সেই রুদ্রদেবকে নমস্কার করা হইতেছে। রণক্ষেত্রের অন্যান্য উপকরণরূপে রুদ্রদেবতার বর্ণনা করা হইতেছে। রণের প্রধান উপকরণ অশ্ব ও অশ্বপতি বা সাদী-সৈন্যও রুদ্রদেবের অপর মূর্ত্তি। আব্যাধিনী বেধকারিণী পদাতি-সেনা বা উগ্রদেবতা, ইহারা রণের অধিষ্ঠাত্রী ও রণবল। ইহারাও রুদ্রমূর্ত্তি। উগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মী কৌমারী ঐন্দ্রী প্রভৃতি মাতৃগণ। এই উগ্ররূপা মাতৃমূর্ত্তিসমূহ রুদ্রদেবের মূর্ত্তি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। তৃংহতী অর্থাৎ যাহারা শত্রুমারণে সমর্থা তাদৃশী উগ্রদেবী-মূর্ত্তি কালী, দুর্গা, বগলামুখী প্রভৃতি ও (কালী দুর্গা প্রভৃতি তৃংহতী—এই ব্যাখ্যা মহীধরাচার্য্যের সম্মত।) রুদ্রদেবতার মূর্ত্তি। রণের সভা, সভাপতি, রণোপকরণ অশ্ব, সাদী, পদাতিসেনা, রণদেবতা মাতৃগণ ও অন্য উগ্রদেবতা (দুর্গাদি) সমস্তই এক ভগবান্‌ রুদ্রের শক্তিবিকাশ মাত্র। এই তথ্য এমন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

নমো গণেভ্যঃ গণপতিভ্যশ্চ বো নমো নমঃ ব্রাতেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো নমঃ, গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমো নমঃ বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমঃ। ২৫

পদপাঠঃ। নমঃ। গণেভ্যঃ। গণপতিভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ। নমঃ। ব্রাতেভ্যঃ। ব্রাতপতিভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ। নমঃ। গৃৎসেভ্যঃ। গৃৎসপতিভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ। নমঃ। বিরূপেভ্যঃ। বিশ্বরূপেভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার (সকলস্থানে একই অর্থ।) গণেভ্যঃ—গণসকলকে। গণপতিভ্যঃ—গণ-নায়কসকলকে। চ—ও। বঃ—তোমাদিগকে। ব্রাতেভ্যঃ—ব্রাতসমূহকে। ব্রাতপতিভ্যঃ—ব্রাত-নায়কগণকে। গৃৎসেভ্যঃ—বিষয়-লম্পটগণকে। গৃৎসপতিভ্যঃ—গৃৎসগণের পালকগণকে। বিরূপেভ্যঃ—বিকৃত-রূপধারী ব্যক্তিসকলের হৃদয়স্থ রুদ্রগণকে। বিশ্বরূপেভ্যঃ—বিশ্বরূপ অর্থাৎ হয়গ্রীবাদি মূর্ত্তিসমূহকে। (নমস্কার করি।)

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারোহস্ত।—(সর্ব্বত্রৈবং।) গণেভ্যঃ—ভূত-বিশেষেভ্যঃ (দেবানুচরাঃ ভূতবিশেষাঃ গণাঃ তেভ্যঃ ইতি মহীধরঃ।) গণপতিভ্যঃ—গণনায়কেভ্যঃ। ব্রাতেভ্যঃ—সমূহেভ্যঃ। ব্রাতপতিভ্যঃ—ব্রাত-পালকেভ্যঃ। গৃৎসেভ্যঃ—বিষয়-লম্পটেভ্যঃ মেধাবিভ্যো বা। গৃৎসপতিভ্যঃ—গৃৎসপাল-কেভ্যঃ। বিরূপেভ্যঃ—বিকৃতরূপেভ্যঃ।—বিশ্ব-রূপেভ্যঃ—তুরঙ্গবদন-হয়গ্রীবাদিভ্য ইতি মহীধরাচার্য্যঃ।

অন্বয়ঃ। হে রুদ্রাঃ! গণেভ্যঃ গণ-পতিভ্যশ্চ যুষ্মভ্যং নমঃ। ব্রাতেভ্যঃ ব্রাতপতিভ্যশ্চ যুষ্মভ্যং নমঃ, গৃৎসেভ্যঃ গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমঃ; বিরূপেভ্যঃ বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমঃ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। গণেভ্যঃ গণাঃ খলু সমূহা জনসংঘাঃ—তেভ্যঃ, গণপতয়ঃ সমূহ-নায়কাঃ তেভ্যশ্চ হে রুদ্রাঃ যুষ্মভ্যং নমঃ। অত্র মহীধরেন চিন্তিতং, গণাঃ দেবানুচরা ভূতবিশেষাঃ গণপতয়শ্চ তেষাং পালকাঃ ইতি। অত্র নব্যানাং মতং,—গণাঃ জনসংঘাঃ জনসংঘ-জনানাং হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপেণ রুদ্রাঃ বর্ত্তন্ত এব, গণানাং নায়কাশ্চ গণপরি-চালকতয়া রুদ্রাএব ইতি। ব্রাতাঃ—দুর্ব্বলা সংস্কারবিহীনাঃ—তেভ্যঃ ব্রাতেভ্যঃ তৎ-প্রধানেভ্যশ্চ যুষ্মভ্যং নমঃ। ব্রাতাঃ নানা-জাতীয়ানাং সঙ্ঘাঃ ব্রাতপালকাশ্চ ব্রাত-পতয় ইতি মহীধরাচার্য্যঃ। গৃৎসাঃ—গৃধ্যন্তি বাঞ্ছন্তি যে তে বিষয়াকৃষ্টচিত্তাঃ মেধা-বিনো বা ইতি মহীধরঃ। তেভ্যঃ তৎ-পালকেভ্যশ্চ বো নমঃ। বিরূপেভ্যঃ ছিন্ন-নাস-কৃত্তকর্ণাদিভ্য ইতি নবীনাঃ। মহী-ধরস্তু বিকৃতং রূপং যেষাং তে বিরূপাঃ নগ্নমুণ্ডজটিলাদয় ইত্যাহুঃ। বিশ্বরূপেভ্যঃ জগদ্রূপেভ্যঃ রুদ্রেভ্যঃ জগদিদং রুদ্রানাং এব রূপং। রুদ্রাএব জগদ্রূপেণ দৃশ্য-মানা ইতি ভাবঃ! মহীধরমতে তু বিশ্বং সর্ব্বং নানাবিধং রূপং যেষাং তে বিশ্বরূপাঃ তুরঙ্গবদন-হয়গ্রীবাদয় স্তেভ্যঃ ইতি যুষ্মভ্যং নমস্কারোহস্তু ইতি যোজনা।

বঙ্গার্থঃ। হে রুদ্রগণ! গণস্বরূপ ও গণপতিস্বরূপ তোমাদিগকে নমস্কার। ব্রাত ও ব্রাতপতিস্বরূপ তোমাদিগকে নমস্কার। গৃৎস ও গৃৎসপতিস্বরূপ তোমাদিগকে নম-স্কার। বিরূপ ও বিশ্বরূপ তোমাদিগকে নমস্কার।

শ্রী——ভারতী

ক্রমশঃ

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৫শ বর্ষ, ১৫শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। আশ্বিন। ১৩১৫ সাল, ১৮৩০ শকাব্দা।

এস মা!

(আগমনী।)

ফুল্ল নীলাম্বর কিবা মনোহর
কিবা মনোহর শরতনিশি,
কিবা মনোহর তারকানিকর
কিবা মনোহর চাঁদের হাসি!
কিবা মনোরম ধবল বরণ
রাশি রাশি চূর্ণ-জলদ-মালা,
মৃদুল সমীরে ভেসে ভেসে ধীরে
শশীতারা সনে করিছে খেলা!
মরি কি সুন্দর শ্যামল বরণ—
সারি সারি শোভে পাদপচয়,
কিবা মনোহর পাদপ বেড়িয়া
পুষ্পিতা ললিতা লতিকা রয়।
স্থলপদ্ম যুঁই সেফালি বকুল
কিবা মনোহর লোহিত জবা,
ফুটেছে ফুটেছে করবী মালতী
গোলাপ কমল কি মনোলোভা!

গুন্ গুন্ গানে মাতি মধুপানে
ভ্রমর-ভ্রমরী ভ্রমিছে ফুলে,
যতেক বিহগ আগমনী-গীত
গাহিছে হরষে পরাণ-খুলে।
তুলিয়ে লহরী কল কল স্বরে
চাঁদের কিরণ মাখিয়া গায়,
সাগর উদ্দেশে প্রফুল্ল হৃদয়ে
হাসিয়া নাচিয়া তটিনী ধায়।
স্বন্ স্বন্ স্বনে গাহিয়া কি গীত
কি যেন ইঙ্গিতে ডাকিয়া কা'রে
হৃদয় জুড়ান স্নিগ্ধ সমীরণ
কিবা মনোহর বহিছে ধীরে!
কৌমুদী-বসনা সরসী-মাঝারে
হাসিছে কুমুদ প্রফুল্লমুখী,
প্রভাকর-মুখ না হেরে কমল
বিরহে সে রহে মুদিয়া আঁখি।

তবু সে ডাকিছে নীরব ভাষায়
জগৎ-মাতায় 'এস মা' ব'লে,
'এস দয়াময়ি!' ডাকে কুমুদিনী
ডাকিছে সরসী হিল্লোলে দু'লে।
'এস মা! এস মা!' ডাকিতেছে শশী
'এস মা! এস মা!' ডাকিছে তারা,
'এস মা' ডাকিছে— তরু-লতা ফুল
'এস' গায় পাখী পাগলপারা।
'এস মা! এস মা!' ধ্বনিছে পবন
'এস মা' বলিয়ে মধুর স্বরে,
চলেছে তটিনী; 'এস মা! এস মা!'
ডাকে চরাচর হরষ-ভরে।
সাজি নানা সাজে প্রকৃতি-সুন্দরী
পরিয়া সুন্দর জ্যোছ্না-বাস,
'এস এস দেবি'; ডাকিছে মধুরে
অধরে না ধরে মধুর হাস।
আপনি জননী বিষাদিনী ধরা
আজি ডাকে হর্ষে 'এস মা' ব'লে,
ডাকে ধনবান্ 'এস মা' 'এস মা'
'এস মা' কাঙ্গাল ডাকে দলেদলে।
সম্বৎসর-দুঃখ- কালিমা মুছিয়া
যতেক কাঙ্গালী হরষে ধায়,
নব আশ বুকে নব ভাস্ মুখে
পরি নববাস ডাকে—মা আয়।
জগতের মাতা আসিবে ধরায়
তাই কি প্রকৃতি পরেছে সাজ?
দেবী বসুন্ধরা হাসিয়া হাসিয়া
তাই কি 'মা' ব'লে ডাকিছে আজ?
আনন্দ-রূপিণী জগৎ জননী
হাসি মুখে এস ভারত-ভূমে,
নিজে হেসে এসে হাসাও জগত
দীনা পীড়িত তাপিত জনে।

দুর্ভিক্ষ-দলিত ভারত ভিতরে
নিরন্নের মুখে 'হা অন্ন' রব;
এস মহাদেবি অন্নপূর্ণারূপে
নাশহ তাদের সে উপদ্রব।
দুর্ব্বল হৃদয়ে এস শক্তিময়ি!
সাহসে মাতাও দুর্ব্বল প্রাণ,
মহাভয়ে ভীত যাদের হৃদয়
'অভয়' তাদের কর মা দান।
বিদ্যারূপে এস মূর্খের হৃদয়ে,
ধর্ম্মরূপে এস পাপীর প্রাণে,
ভক্তিহীন ঘোর মরুময় হৃদে
বহাও প্রবাহ ভকতি-দানে।
শ্রীহীন দরিদ্র- গৃহেতে এস মা!
হ'য়ে অচঞ্চলা রমারূপিণী
শোক-নিপীড়িত তাপিত হৃদয়ে
এস শান্তিময়ি! সান্ত্বনা তুমি।
পতিত-পাবনী জগত-জননী
পতিত ভারতে উদ্ধার কর,
বিঘ্নবিনাশিনী ধর দশভুজে
দশবিধ মহাপ্রহরণ ধর।
বরাভয়দাত্রী এস মা! এস মা!
দেবী দশভুজা সিংহবাহিনী,
অমঙ্গলময় এ ভারতভূমে
এস মা! কল্যাণরূপিণী তুমি!
ফুল্ল চরাচর ফুল্ল নীলাম্বর
প্রফুল্ল হৃদয়ে চন্দ্রমা হাসে;
ফুল্ল নিশিথিনী প্রফুল্ল ধরণী
ফুল্ল পাখী গায় আপন বাসে।
প্রফুল্ল হৃদয়, মৃদুমন্দ বয়
সুগন্ধ সমীর শরত-কালে,
কিবা মনোহর ডাকে চরাচর
এ ফুল্ল নিশায়—'এস মা!' ব'লে।

সাক্ষী ।

প্রমাণ ব্যতীত প্রমেয়-সিদ্ধি হয় না। কি ব্যবহারক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি কর্কশ তর্ক-সঙ্কুল দার্শনিকক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই প্রমাণ-বলে প্রমেয়-নিশ্চয় করা হয়। বর্ব্বর ব্যক্তি বিনা বিচারে, বিনা প্রমাণে, বিনা সন্দেহে সরলভাবে বস্তুতত্ত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিলেও, তত্ত্বজ্ঞ প্রামাণিক পরীক্ষক প্রমাণ ব্যতীত একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না। ব্যবহারক্ষেত্রের প্রমাণ দ্বিবিধ, লৌকিক ও অলৌকিক। অলৌকিক বা দিব্যপ্রমাণের পরিচয় হিন্দুপত্রিকার পাঠক-বর্গ পাইয়াছেন। লৌকিক প্রমাণ সাধারণতঃ ত্রিবিধ—"প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতম্।" লিখিত (লেখ্য বা দলীল) ভোগ ও সাক্ষিগণ—এই তিন প্রকার লৌকিক প্রমাণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অন্যতম প্রমাণ "সাক্ষী" সম্বন্ধে—কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

সাক্ষী একাদশ প্রকার। এই একাদশবিধ সাক্ষী স্থূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত হয়। এক-ভাগ কৃতসাক্ষী, অন্যভাগ অকৃত-সাক্ষী। ব্যবহার-সাগর-পারদৃশ্বা মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন,

"একাদশবিধঃ সাক্ষী শাস্ত্রে দৃষ্টো মনীষিভিঃ।
কৃতঃ পঞ্চবিধো জ্ঞেয়ঃ ষড়্‌বিধোঽকৃত ইষ্যতে।"

মনীষিগণ একাদশপ্রকার সাক্ষীর কথা বলিয়াছেন,—তাঁহার মধ্যে পঞ্চ প্রকার সাক্ষী কৃতসাক্ষী নামে অভিহিত হয়, আর ষড়্‌বিধ সাক্ষী অকৃতসাক্ষী নামে পরিচিত। 'কৃত' অর্থাৎ যাহাকে দলীলে সাক্ষী মান্য করা হইয়াছে, আর "অকৃত" অর্থ যাহাদিগকে সাক্ষী মান্য করার প্রয়োজন নাই; নিজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াই তাহারা বাধ্য হইয়া, সকল ব্যাপার অবগত হইতে পারে। বাদী প্রতিবাদী—যে কেহ তাহাদিগকে সাক্ষী মান্য না করিলেও তাহারা সাক্ষী।

কৃতসাক্ষী পাঁচ প্রকার যথা,—লিখিত-সাক্ষী, স্মারিত-সাক্ষী, যদৃচ্ছাভিজ্ঞ-সাক্ষী, গূঢ়-সাক্ষী ও উত্তর-সাক্ষী। ভগবান্ নারদ বলিয়াছেন,—

"লিখিতঃ স্মারিতশ্চৈব যদৃচ্ছাভিজ্ঞ এবচ।
গূঢ়শ্চোত্তরসাক্ষী চ সাক্ষী পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ।"

লিখিত-সাক্ষী কাহাকে বলে, তাহা মহর্ষি কাত্যায়ন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"অর্থিনা স্বয়মানীতো যো লেখ্যে সন্নিবেশ্যতে।
স সাক্ষী লিখিতো নাম।"

যে সাক্ষী অর্থী দ্বারা আনীত হইয়া, স্বেচ্ছায় দলীলে সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত হয়, সে লিখিত-সাক্ষী। তাৎপর্য্যতঃ—দলীলে নাম স্বাক্ষর করিয়া যে ব্যক্তি স্বজ্ঞান-বিশ্বাসানুমতে সাক্ষিত্ব গ্রহণ করে, সেই লিখিত সাক্ষী। স্মারিত-সাক্ষীর লক্ষণ মহামুনি কাত্যায়ন লিখিয়াছেন,—

"যস্তু কার্য্যপ্রসিদ্ধ্যর্থং দৃষ্টৈব কার্য্যং পুনঃ পুনঃ।

"স্মার্য্যতে হ্যর্থিনা সাক্ষী সঃ স্মারিত ইহোচ্যতে।"

যে ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশে আগমন করিয়া, অর্থিপ্রত্যর্থীর কার্য্য দর্শন করে, কিন্তু দলীলে নাম লিখিয়া সাক্ষিত্ব গ্রহণ করে না, সে যদি পরবর্ত্তি-কালে অর্থাৎ মোকর্দ্দমার সময় দলীল দর্শন করিয়া, পুনঃ পুনঃ স্মরণশক্তির অনু-শীলন দ্বারা, পূর্ব্বনিষ্পন্ন ব্যাপার যথাবৎ বর্ণনা করিয়া, কার্য্যতঃ সাক্ষিত্ব গ্রহণ করে, সে স্মারিতসাক্ষী। যদৃচ্ছাভিজ্ঞ-সাক্ষী—যে অর্থিপ্রত্যর্থীর কার্য্য বা ঘটনা অবগত আছে, অথচ কেহ তাহাকে সাক্ষী হইতে আহ্বান করে নাই বা পত্রে তাহার নামও লিখিত হয় নাই, কিন্তু সে প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া সাক্ষী হইয়াছে। অর্থী ও প্রত্যর্থীর কথা গোপনে যে শুনে, সে গূঢ়-সাক্ষী। মনে করা যাউক্, একব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে প্রয়োজনমত হঠাৎ কিঞ্চিৎ ঋণ প্রদান করিয়াছে, তাহার সংবাদ কেহ জানেনা। পরে অধমর্ণের আকার-ইঙ্গিত গতি-বিধিতে তাহার প্রতি সন্দেহ হওয়ায়, ধনী এই ঘটনার সাক্ষী সংগ্রহ করিবার এক অপূর্ব্ব কৌশলজাল বিস্তার করিল। সাধারণ-সমক্ষে অধমর্ণের নিকট প্রার্থনা করিলে, হয়ত সে অস্বীকার করিতে পারে, কিন্তু গোপনে স্বয়ং উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ ঋণ-সম্বন্ধে আলাপ করিলে, তাহাতে অধমর্ণের অস্বীকৃত হইবার আশঙ্কা কম, এই জন্য উত্তমর্ণের কৌশল-সৃষ্টি। উত্তমর্ণ, অধমর্ণকে লইয়া একগৃহে প্রবেশ করিয়া, ঋণ-সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিল। অভিপ্রেত সাক্ষী গোপনে অবস্থান করিয়া, উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিল। সেই কথোপ-কথনে অধমর্ণ, উত্তমর্ণের নিকট স্বীয় ঋণ স্বীকার করিয়া, পরিশোধের সময় (ওয়াদা) নির্দ্দেশ করিল। সাক্ষী, গোপনে এই রহস্য অবগত হইয়া, যথাকালে ধর্ম্মাধি-করণে অর্থীর (ফরিয়াদার) প্রার্থনা প্রমাণিত করিল। এই গোপন-শ্রোতা গূঢ়সাক্ষী। মহর্ষি-কাত্যায়ন-বিরচিত ব্যবহার-শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে,—

"অর্থিনা স্বার্থসিদ্ধ্যর্থং প্রত্যর্থিবচনং স্ফুটং।
যঃ শ্রাবিতঃ স্থিতোগূঢ়ঃ গূঢ়সাক্ষী স উচ্যতে।"

অতি অল্পসংখ্যক স্থানেই গূঢ়সাক্ষীর সম্ভাবনা হয়। উত্তর-সাক্ষীর লক্ষণ-নির্ব্বচনে ব্যবহারতত্ত্ব-নিষ্ণাত মহামুনি কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—

"সাক্ষিণামপি যঃ সাক্ষ্যং উপর্য্যুপরি ভাষতে।
শ্রাবণাৎ শ্রবণাৎ বাপি স সাক্ষ্যুত্তর-সংজ্ঞিতঃ।"

যে সাক্ষিগণের উপরি সাক্ষ্য প্রদান করে, সে উত্তর-সাক্ষী। একজন সাক্ষীর নিকট প্রসঙ্গক্রমে শ্রবণ করিয়া, উত্তর সাক্ষী সংবাদ অবগত হইতে পারে, কিম্বা সাক্ষী তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বলিতেও পারে। এরূপভাবে পরম্পরায় প্রকৃত বৃত্তান্ত যাহারা অবগত থাকে এবং আদালতে আবশ্যক-মতে ফরিয়াদীর দ্বারা প্রার্থিত হইয়া সাক্ষ্য

প্রকাশ করে, তাহাদিগকে উত্তর-সাক্ষী নামে অভিহিত করা যায়।

আচার্য্য-প্রবর নারদমুনি ছয় প্রকার অকৃত-সাক্ষীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"গ্রামশ্চ প্রাড়্বিবাকশ্চ রাজা চ ব্যবহারিণাম্।
কার্য্যেষ্বধিকৃতো যঃ স্যাৎ অর্থিনা প্রহিতশ্চ যঃ। কুল্যাঃ কুলবিবাদেষু বিজ্ঞেয়াস্তেঽপি সাক্ষিণঃ।

গ্রামপতি, বিচারক বিপ্র, রাজা, কার্য্যাধিকৃত (কেহ কেহ বলেন "কার্য্যাধিকৃত" অর্থ "কর্ম্মচারী"। অপর কেহ বলেন, যাহাকে প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে,—বর্ত্তমানকালের "আম্‌মোক্তার জাতীয়" সেই ব্যক্তিকে 'কার্য্যাধিকৃত' বলা যায়) অর্থিদ্বারা প্রহিত (যাহাকে অর্থী(আবেদনকর্ত্তা ফরিয়াদী) নিজের প্রতিভূস্বরূপে স্থির করিয়াছে সেই ব্যক্তি—অর্থাৎ যে জামীন আছে, তাহাকে "অর্থিদ্বারা প্রহিত" বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, অর্থীর আত্মীয় বা অপর কোনও ব্যক্তি যদি কার্য্য সম্পাদনের সময় তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য্য করেন, তিনি 'অর্থিদ্বারা প্রহিত।' এ ব্যাখ্যায় কার্য্যাধিকৃতের সঙ্গে পার্থক্য থাকে না।) ও কুলপ্রধান—ইহারা অকৃত-সাক্ষী। গ্রামপতি বা গ্রামাধ্যক্ষ গ্রামের যাবৎকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তাঁহার গোচরে সব কার্য্য হইবে, সুতরাং তিনি ঋণ-গ্রহণাদির তত্ত্ব অবগত থাকিবেন। প্রাড়্বিবাকই মুখ্যতঃ বিচারক, তিনি পূর্ব্বনিষ্পাদিত ঘটনা জানেন। ধর্ম্মাধিকরণে যাহার মীমাংসা হইয়াছে, তাদৃশ ব্যাপারে পরবর্ত্তিকালে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনিই প্রধান সাক্ষী। রাজার গোচরে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, তৎকার্য্যের জন্য অথবা বিধান-প্রবর্ত্তন-সন্দেহে রাজাও সাক্ষী হইবেন। প্রতিনিধির প্রতি কার্য্য-সম্পাদনের ভারার্পণ করায়, তৎকার্য্যে তাহার সাক্ষিত্ব যুক্তিযুক্ত। অর্থি-প্রহিত, অর্থির দায়িত্বে সমস্ত কার্য্য অবগত হন, কাজেই তিনি সাক্ষী। কুলপ্রধানের কুলবিবাদের মীমাংসা করিবার অধিকার থাকায়, অধিকাংশ কার্য্যেই তিনি সাক্ষিত্ব লাভ করিতে বাধ্য হন। 'কুল্য' অর্থ কুলপ্রধান বা 'মণ্ডল'। কেহ কেহ মনে করেন 'কুল্য' অর্থ তদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ। এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে বলা যায়, কুলসম্ভূতগণের বিবাদে, তদ্বংশীয় যে সকল ব্যক্তির উহা অবগত থাকা একান্ত অবধারিত, তাহারা সকলেই সুবিধা ও সম্ভবমতে সাক্ষীস্বরূপে গৃহীত হইতে পারিবে। "প্রাড়্বিবাক" বলাতে, সভ্য ও রাজ-লেখক অকৃত-সাক্ষী হইবে—এরূপ বুঝিতে হইবে। রাজা রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন,—অর্থী ও প্রত্যর্থী স্ব স্ব পক্ষীয়গণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত থাকিয়া, স্ব স্ব বক্তব্য বলিতেছেন,—প্রাড়্বিবাক প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া, উভয় পক্ষের কার্য্য-রহস্য পরিস্ফুট করিতেছেন,—এইরূপ সভায় সভ্যগণ উপবিষ্ট থাকিয়া স্বীয় স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতেছেন এবং বিচারের ন্যায়ান্যায় পরীক্ষা করিতেছেন; রাজ-লেখক নিবিষ্টচিত্তে দৃঢ়হস্তে সমস্ত লিখিতেছেন। এরূপাবস্থায় যাহা কিছু প্রকাশ্য ঘটনা সংঘটিত

হইতেছে, তৎসমস্তই অপরের ন্যায় সভ্য ও লেখকেরও গোচরে নিষ্পাদিত হইতেছে। অতএব, যেমন প্রাড়্‌বিবাক ও রাজা সাক্ষী, তদ্রূপ লেখক ও সদস্যগণও সাক্ষীস্বরূপে বর্ণিত হইতে পারেন। মহর্ষি নারদের ব্যবহারশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—

"লেখকঃ প্রাড়্‌বিবাকশ্চ সভ্যা-
শ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ।
নৃপে পশ্যতি তৎকার্য্যং সাক্ষিণঃ
সমুদাহৃতাঃ।"

রাজা যখন ব্যবহার দর্শন করিবেন, তখন প্রাড়্‌বিবাক, লেখক ও সভ্যবর্গ 'সাক্ষী' নামে কথিত হইবে।

কিরূপ ব্যক্তি সাক্ষীরূপে বিবেচিত হইবে, এই বিষয়ে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য স্বপ্রণীত সংহিতায় লিখিয়াছেন—

"তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ
সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তোধনা-
ন্বিতাঃ।
ত্র্যবরাঃ সাক্ষিণোজ্ঞেয়াঃ শ্রৌত-
স্মার্ত্তক্রিয়াপরাঃ।
যথাজাতি যথাবর্ণং সর্ব্বে সর্ব্বেষু
বা স্মৃতাঃ।"

তপঃসম্পন্ন, দানশীল, সৎকুলোৎপন্ন, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রাণ, সরল, পুত্রযুক্ত, ধনশালী, শ্রৌত (বেদবিহিত) ও স্মার্ত্ত (স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত) কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখিতে হইবে। সাক্ষীর সংখ্যা তিনের কম না হয়। অধিক যত হয়, আপত্তি নাই। বাদী ও প্রতিবাদী যে জাতি, সেই জাতীয় ব্যক্তিকেই তাহারা সাক্ষী মান্য করিবে। যদি স্বজাতি সাক্ষী না পাওয়া যায়, তবে সকলজাতীয় সাক্ষীই সকলে গ্রহণ করিতে পারিবে। পুরুষের কার্য্যে পুরুষ সাক্ষী হইবে। স্ত্রীগণের ব্যবহারে স্ত্রীগণ সাক্ষিত্ব লাভ করিবে। সাক্ষী মান্য করিবার সময়, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, পরিণামে অপ্রীতিকর ঘটনার আধিক্য সংঘটিত হয় না। চরিত্রবান্, ধার্ম্মিক, সৎকুলোদ্ভূত ও সরলস্বভাব সত্য-বাদী ধনশালী ব্যক্তিকে সাক্ষী মান্য করিলে, তাঁহার নিকট অন্যায়-ব্যবহার ও মিথ্যাকথন প্রভৃতির আশঙ্কা থাকে না। মানুষ নানা কারণে অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। হীন চরিত্র-ব্যক্তি শিক্ষা-সমুদ্রের পর পারে উত্তীর্ণ হইলেও, সে বিশ্বাসের পাত্র নয়। অসৎকুলোৎপন্ন ব্যক্তির চরিত্রে দৃঢ়তা ও হৃদয়ে মহত্ত্ব থাকা অনেক সময় অসম্ভব হয়। সৎকুলজাত লোক সহজে সৎশিক্ষা এবং সৎ-সঙ্গ লাভ করিতে সক্ষম হয়। ধর্ম্মপ্রাণ মানব জগতের অলঙ্কার। যে ধর্ম্মকে প্রাণে প্রাণে ভাল বাসিয়াছে, সে কখনও মিথ্যাসেবাদ্বারা আত্মাকে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করে না। সাক্ষীগণ পুত্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন কালের সরলবিশ্বাসী মনুষ্য প্রাণান্তেও পুত্রের নামে শপথ করিয়া, কিম্বা পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া, মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হইত না। হায়! সেই সরল-বিশ্বাসের অমূল্য রত্নে আমরা ক্রমশঃ বঞ্চিত হইতেছি। ধনাভাবে লোকে কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন দেয়। ধনবান্ লোক ধনের প্রত্যাশায়,

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়েও ধনলোভে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখা যায়। বেদ ও স্মৃতি-বিহিত যাগ এবং আচারাদির অনুষ্ঠানে যে ব্যক্তি রত, সে পারলৌকিক পুণ্যপাপে বিশ্বাস করে। তাহার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া, ভয়াবহ নরক-মার্গের অর্গল উন্মুক্ত করার সম্ভাবনা কোথায়? নিজ-জাতীয়ের মধ্যে সাক্ষী মানিতে হইবে, এই বিধান, আর্য্য-সমাজের সুপ্রাচীন গ্রামসংস্থিতির গুপ্ততত্ত্ব প্রচার করে। একজাতীয় ব্যক্তিবর্গ এক পল্লীতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলে, স্বজাতি-গণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরস্থ অপর-জাতীয় ব্যক্তিকে সাক্ষী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা অনেকটা অস্বাভাবিক। গ্রামসংস্থানের এ রীতি যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং অনুকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। মহর্ষি বলিতেছেন—

"সর্ব্বে সর্ব্বেষু বা স্মৃতাঃ।"

সর্ব্বজাতীয় লোকই সুবিধা ও সম্ভব-মতে সকল-জাতীয়ের কার্য্যে সাক্ষী হইবে।

অতঃপর যাহারা সাক্ষী হইতে পারিবে না—এরূপ ব্যক্তিগণের তালিকা প্রদত্ত হইতেছে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"স্ত্রীবাল-বৃদ্ধ-কিতব-মত্তোন্মত্তাভি-শস্তকাঃ।
রঙ্গাবতারি-পাষণ্ডিকূটকৃদ্বিকলে-ন্দ্রিয়াঃ।
পতিতাপ্তার্থ-সম্বন্ধি-সহায়-রিপু-তস্করাঃ;
সাহসী দৃষ্টদোষশ্চ নির্ধূতাদ্যাস্ত্ব-সাক্ষিণঃ।"

স্ত্রীগণকে সাক্ষী রাখিবেনা। নিতান্ত বালক ও অতিবৃদ্ধ [জড়প্রায়] ব্যক্তিও সাক্ষিত্বের অযোগ্য। 'কিতব' জুয়াখেলাপ্রিয়, 'মত্ত' মদ্যপানে বিকৃতচিত্ত; 'উন্মত্ত' গ্রহাবিষ্ট বা ভূতাবিষ্ট, 'অভিশস্ত' ব্রহ্মহত্যাদি পাপে অভিযুক্ত, 'রঙ্গাবতারী' নট বা চারণাদি। 'পাষণ্ডী' বেদবিরুদ্ধাচারী, 'কূটকৃৎ' জালিয়াৎ, 'বিকলেন্দ্রিয়' অন্ধবধির প্রভৃতি। 'পতিত' মহাপাপের অনুষ্ঠান করায় সমাজকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। 'আপ্ত' বাদী বা প্রতিবাদীর নিকট-আত্মীয়, 'অর্থসম্বন্ধী' অধমর্ণ বা খাতক। 'সহায়' সমব্যবসায়ী অর্থাৎ যাহার সহিত ভাগে কারবার করা যায়। 'রিপু' শত্রু, 'তস্কর' চোর, 'সাহসী' ডাকাইত বা ঠেঙ্গাড়ে, 'দৃষ্টদোষ' যে মিথ্যাবাদী বলিয়া আদালতে স্থিরীকৃত হইয়াছে। 'নির্ধূত' নির্ব্বাসিত অথবা কুকার্য্যকারী বলিয়া বন্ধুগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। এই সকল ব্যক্তি সাক্ষী হইবার অযোগ্য। ধর্ম্মাধিকরণে সত্যপ্রকাশ করিবার জন্য সাক্ষী রক্ষার ব্যবস্থা, কিন্তু যদি সাক্ষী মিথ্যা বলে, তবে তাহা দ্বারা বিবাদে সত্যনির্ণয় হইতে পারে না। এইজন্য যাহাদের দ্বারা সত্য নির্ণয়ের সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ ব্যক্তিমণ্ডলীকে সাক্ষী শ্রেণী হইতে বাহিরে রাখাই কর্ত্তব্য।

পুরুষগণের কার্য্যে স্ত্রীদিগকে সাক্ষী মান্য করা সমাজস্থিতির বিরোধী। স্ত্রীজাতি প্রকৃতি-কোমলা, তাহাদিগকে রাজদ্বারে উপস্থিত করার, তাহাদের চিত্তভঙ্গ হইতে পারে। শিশুগণ হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, অতি-বৃদ্ধ প্রায়শঃ বাহ্যজ্ঞান-বর্জ্জিত। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ—ইহাদের চিত্তের দৃঢ়তা না থাকায়,

শঙ্কায় কি বলিতে কি বলিবে, তাহার স্থিরতা নাই। 'জুয়া খেলোয়াড়' বলিলে তৎকালে অসৎস্বভাব লোক বুঝা যাইত। যাহারা জুয়া খেলিত, তাহারা বহুস্থানে মদ্যপায়ী, বারবনিতারত ও চোর হইত। ইহারা চরিত্রহীনতা বশতঃ অর্থলোভে বা মদ্য পাইলে মিথ্যা বলিতে পারে। মাতালের দ্বারা সত্য-নির্ণয়ের আশা কোথায়? উন্মাদগ্রস্তের যথাবৎ স্মরণ থাকেনা, কাজেই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর-দানকালে স্মৃতিভ্রংশ হইলে, তাহার নিকট সত্য পাওয়া যাইবে না; বিশেষতঃ মত্ত ও উন্মত্ত উভয়েই পূর্ব্বাপর-সঙ্গতি রাখিয়া কথা বলিতে পারে না। অভিশপ্ত মহাপাপী। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, মহাপাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে, সে যে মিথ্যাকথনে ভীত হইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? রঙ্গাবতারী নটচারণাদি নানাদেশ পর্য্যটন করে, তাহাদের প্রয়োজন-সময়ে পাওয়ার আশা থাকে না। অপর, তাহারা পরগুণকীর্ত্তন বা পরতোষণকার্য্যে রত থাকায় তাহাদের চরিত্রের মহত্ব নষ্ট হয়। সুতরাং, সর্ব্বদা তাহাদের উপর বিশ্বাসস্থাপন করা যায় না। পাষণ্ডী ধর্ম্ম-বিশ্বাসহীন, তাহারা যে সত্যকে ভালবাসিবে, ইহা সম্ভব মনে হয় না। জালিয়াৎ কুকর্ম্মীর অগ্রগণ্য, সে সত্যপ্রিয় হইবে কিরূপে? বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তির সমক্ষে কোনও কার্য্য নিষ্পন্ন হইলেও সে তাহা যথাবৎ বুঝিতে পারে না। অন্ধ, সমস্ত শুনিলেও দেখিতে পায় নাই বলিয়া এক বুঝিতে অপররূপ বুঝিয়াছে; বধির, দেখিলেও শ্রবণশক্তি হীন হওয়ায় কোনও কথার সংবাদ রাখেনা। ইহারা সম্মুখস্থ কার্য্যের সর্ব্বাংশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এরূপাবস্থায় ইহাদের সাক্ষী করা অসঙ্গত। পতিত ব্যক্তির প্রতি সমাজের বিশ্বাস নাই, কাজেই সে সাক্ষী হয় না। নিকট-আত্মীয়, আত্মীয়ের স্বার্থানুরোধে পক্ষপাতী হইয়া মিথ্যা বলিতে পারেন, সুতরাং তাহার সাক্ষিত্ব অন্যায়। অধমর্ণ, উত্তমর্ণের নিকট অনুগ্রহ-লাভের প্রত্যাশায়, অপরের সম্বন্ধে উত্তমর্ণের অনুকূলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে। কর্ম্মচারী প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য মিথ্যা বলিতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা সুলভ। অংশী, অপর অংশীর অনুকূলে মিথ্যা বলিতে পারে। শত্রু সাক্ষী হইলে সত্যের অপলাপ করাই সম্ভব, সুতরাং সে বর্জ্জনীয়। তস্কর স্বভাবনীচ, সে সত্যকথনে একেবারেই অনভ্যস্ত। সাহসী, যাহারা বলপূর্ব্বক হরণ ও হত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করে। তাহারা দানব-প্রকৃতি দস্যু। তাহাদের কাছে মিথ্যার সমাদর, সত্যের সংহার। দৃষ্টদোষ ব্যক্তি একবার মিথ্যাবাদীরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে; পুনর্ব্বার যে সে সেই অভিনয় করিবে—তাহাতে অসম্ভব কি? স্বজনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তি কখনই 'গুণসাগর' নহে, অবশ্যই অশেষ দোষের আকর। তাহাকে সাক্ষী মান্য করায় কোনও ইষ্টসিদ্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য-নির্ণয়ের আশা সুদূর-পরাহত।

মহর্ষি নারদ অসাক্ষীদের একটি তালিকা দিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশিত হইতেছে।

"অসাক্ষ্যপি হি শাস্ত্রেষু দৃষ্টঃ পঞ্চবিধো বুধৈঃ।
বচনাৎ দোষতো ভেদাৎ স্বয়মুক্তির্ম্মৃতান্তরঃ।"

অসাক্ষী (যাহারা সাক্ষী হইতে পারে না) পঞ্চবিধ। প্রাচীন শাস্ত্র-বচনে যে সকল লোকের সাক্ষিত্বে বাধা দেওয়া হইয়াছে, সেই এক প্রকার, যাহারা দোষী, তাহারা অন্য একবিধ, সাক্ষিগণের ভেদ উপস্থিত হইলে, তাহারা অসাক্ষী হইবে,—সেই অপর এক প্রকার এবং স্বয়মুক্তি ও মৃতান্তর এই পাঁচ প্রকার। প্রাচীন শাস্ত্রে আছে—

"শ্রোত্রিয়াঃ তাপসা বৃদ্ধাঃ যে চ প্রব্রজিতাদয়ঃ।
অসাক্ষিণস্তে বচনাৎ নাত্র হেতুরুদাহৃতঃ।"

শ্রোত্রিয় (বেদনিরত) তাপস (তপোনিষ্ঠ) বৃদ্ধ ও সন্ন্যাসীরা অসাক্ষী, ইহার হেতু কথিত হয় নাই। বৃদ্ধ অশক্তিবশতঃ অসাক্ষী। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, বনচর তাপস ও বেদরত শ্রোত্রিয়ের সাক্ষিত্ব লাভের অবকাশ কোথায়? সমাজ ইহাদিগকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত, বোধ হয় সেইজন্য ইহাদিগকে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত করিতে চাহে নাই। ইহাদের অভিসম্পাতের ভয়েও 'হেতু' না বলা যাইতে পারে। যে কারণেই হউক, এই মাননীয় ধর্ম্মধন ব্যক্তিগণ অসাক্ষী। দোষী বলিয়া যাহারা অসাক্ষী, তাঁহাদের নাম—

"স্তেনাঃ সাহসিকাঃ চণ্ডাঃ কিতবাঃ বঞ্চকাস্তথা।
অসাক্ষিণস্তে দুষ্টত্বাৎ ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।"

চোর, ডাকাইত, ক্রোধী, জুয়াড়ু ও প্রবঞ্চকগণ সাক্ষী হইবে না, কারণ তাহারা দুষ্টলোক, তাহাদের মধ্যে সত্য থাকিতে পারে না। ভেদ-প্রযুক্ত অসাক্ষী—

"সাক্ষিণাং লিখিতানাঞ্চ নির্দ্দিষ্টানাঞ্চ বাদিনা।
তেষামেকোঽন্যথাবাদী ভেদাৎ সর্ব্বে ন সাক্ষিণঃ।"

বাদী যদি একই বিষয় পাঁচজন ব্যক্তিদ্বারা প্রমাণ করাইতে ইচ্ছুক হইয়া, পাঁচ জন সাক্ষী মানে,—সেই পাঁচজনের মধ্যে একজন বাদীর প্রতিকূলে বলিলে, সেই সাক্ষীরা "ভেদ-সম্পন্ন" হইয়াছে অর্থাৎ সাক্ষীদিগকে অপরে ভাগাইয়া লইয়াছে—জানিয়া, বাদীপক্ষ, সকলকেই 'অসাক্ষী' মনে করিয়া, পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন সাক্ষী মানিতে পারেন। এস্থলে আদালত বাদীর কার্য্যের প্রতিবাদ করিবেন না। একজন অন্যথাবাদী হওয়ায়, অপর সকলের প্রতি ভেদ-শঙ্কায় তাহাদিগকেও 'অসাক্ষী' বলা অসঙ্গত নহে। কেহ কেহ এস্থলে ব্যাখ্যা করেন যে, একজন সাক্ষী মিথ্যাবাদী হইলে, অপর সকল সাক্ষীকেও আদালত "অসাক্ষী" রূপে গণ্য করিবেন। এরূপ ব্যাখ্যা সুসঙ্গত নহে। কারণ, একজন বিরুদ্ধবাদী হইলে, অপর সকলকে ত্যাগ করিবার অধিকার আদালতের নাই; যেহেতু তাহারা তদবধি আদালতের সমক্ষে মিথ্যাবাদীরূপে প্রমাণিত হয় নাই। বাদী, তাহাদের প্রতি

সন্দেহ করিতে পারেন। অন্যথাবাদী সাক্ষীর সহিত অপর সাক্ষীর সম্বন্ধ বা সমশ্রেণীতা তিনি অবগত থাকিতে পারেন। একজন সাক্ষী বিরুদ্ধ বলিলে, যদি আদালত অপর সাক্ষীগুলিকে ত্যাগ করেন, তবে বাদীপক্ষের উপায়ান্তর থাকে না। এ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে, সাক্ষীগুলি 'নিজের লোক' হওয়া দরকার, নচেৎ অপর যে কেহ বিরুদ্ধ বলিতেই পারে। যে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষী দিতে চায়, কিন্তু তাহাকে কেহ সাক্ষী মানে নাই, সে স্বয়মুক্তি।

"স্বয়মুক্তিরনির্দ্দিষ্টঃ স্বয়মেবৈত্য যো বদেৎ।
সূচীত্যুক্তঃ স শাস্ত্রেষু ন স সাক্ষিত্ব-মর্হতি।"

বাদীদ্বারা যে ব্যক্তি সাক্ষীরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষ্য দিতে চায়, শাস্ত্রে তাহাকে "সূচী" বলে, সে সাক্ষী হইতে পারে না। লোকে সাক্ষী মানিলেও সাক্ষী দিতে সম্মত হয় না, আর যে না মানিলেও দেয়, তাহার চরিত্র ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিলে তাহাকে 'অসাক্ষী' বলাই বিধান-সঙ্গত। মৃতান্তর সাক্ষী নহে। বাদী বা প্রতিবাদী মরিলে, যদি মোকর্দ্দমার পরিচালনা না হয়, তবে যে প্রকৃত সাক্ষী সেও সাক্ষীরূপে গণ্য হয় না। এই সাক্ষী 'মৃতান্তর' নামে কথিত হয়। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইলে, অর্থাৎ আবেদনের পর যদি বাদীর মৃত্যু হয়, অথবা প্রতিবাদীর মৃত্যু হওয়ায় বাদী মোকর্দ্দমা না চালান, তখন সাক্ষী মানিবে কে বা কাহাকে? কাজেই সাক্ষী অসাক্ষী হন। যদি মুমূর্ষু ব্যক্তি পুত্র বা আত্মীয়গণকে বলিয়া যান যে,—'এই সকল লোক সাক্ষী আছেন, ইহাদিগের দ্বারা প্রমাণ করিও'। আর তাহারা মোকর্দ্দমার পরিচালন করে, তবে অর্থ-ব্যবহারে সেই সাক্ষীগণের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে। এই বিধান বন্ধকাদি স্থলে। নারদ বলিয়াছেন—

"মৃতান্তরোঽর্থিনি প্রেতে মুমূর্ষু-শ্রাবিতাদৃতে।"

মৃতান্তর অসাক্ষী, কিন্তু যদি মুমূর্ষু অর্থী তাহার কথা পুত্রাদিকে শুনাইয়া যায়, পরে মোকর্দ্দমা চলে, তবে সে অসাক্ষী হইবে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাক্ষী তিনটীর কম না হয়। এখন বলা যাইতেছে উপযুক্ত ব্যক্তি একজন হইলেও তাঁহার-দ্বারা সাক্ষিত্ব নির্ব্বাহিত হইতে পারে। ব্যবহার-গুরু মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"উভয়ানুমতঃ সাক্ষী ভবত্যে-কোঽপি ধর্ম্মবিৎ।"

বাদী প্রতিবাদী উভয়েই যদি এক ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিকে সাক্ষীস্বরূপে মনোনীত করে, তবে সেই একমাত্র সাক্ষী আদালত গ্রহণ করিবেন। "একোঽপি" একজনও সাক্ষী হইবে—বলায় বুঝা যায়, "দুইজন" সাক্ষী হইবেই। পূর্ব্বে তিন ও ততোধিক-সংখ্যক সাক্ষী হইবে বলা হইয়াছে, এখন "একজন" ও "দুইজন" সাক্ষীর কথা বলা হইল। পূর্ব্বোক্ত সাক্ষিগণ (তিন বা ততোধিক) শ্রৌত-স্মার্ত্ত-ক্রিয়া-পরায়ণ, "দুই জন" বা "একজন" সাক্ষী "ধর্ম্মবিৎ"।

ক্রিয়াপরায়ণ তিনজন বা তদধিক-সংখ্যক লোক উভয়ানুমোদিত না হইলেও সাক্ষী হইতে পারে, আর ধর্ম্মবিৎ" দুই" বা "এক-জন" লোকও উত্তরপক্ষের অনুমোদিত হইলে সাক্ষী হইবে।

মনে হইতে পারে, এত বাছিয়া লইতে গেলে "ঠগ্ বাছিতে গাঁ উজাড়"। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত সাক্ষী সর্ব্বদা পাওয়া দুষ্কর। হয়ত অবস্থা-বিশেষে আদৌ পাওয়া যায় না। কাজেই মহর্ষি কোনও কোনও ব্যবহারে সাক্ষিঘটিত বিধানের শৈথিল্য ব্যবস্থা করিতেছেন। মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"সর্ব্বঃ সাক্ষী সংগ্রহণে চৌর্য্য-
পারুষ্য-সাহসে।"

সংগ্রহণ অর্থাৎ স্ত্রীসংগ্রহ বলাৎকারাদি। চৌর্য্য, বাক্পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য, সাহস মনুষ্যমারণাদি। এই সকল কার্য্যে সকলেই সাক্ষী হইতে পারে। বস্তুতঃ, এই সকল ব্যাপারে সাক্ষীর দোষগুণ বিচার করিবে না! যখন উদ্যত-দণ্ড ঘাতুকের হস্তে দুর্ব্বল ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, সে সময়ে আর ধর্ম্মজ্ঞ সাক্ষীর অনুসন্ধানের সময় থাকে না। যাহারা এই ঘটনার স্থলে বা পার্শ্বে উপস্থিত ছিল, যাহারা ইহা অবগত আছে, তাহারাই সাক্ষী হইতে পারে। ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় সাক্ষীর গুণ-চরিত্র বিচারের অবসর কোথায়? চুরি, ডাকাইতি, হাঙ্গামা, জখম, হত্যা, বলাৎকার প্রভৃতি হলে, যাহারা ঘটনা অবগত আছে, তাহারাই সাক্ষী; ধর্ম্মাধিকরণে তাহাই গৃহীত হইবে।

আদালতে সাক্ষীগণের কার্য্য সম্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

'সাক্ষিণঃ শ্রাবয়েৎ বাদি-প্রতি-
বাদি-সমীপগান্।'[১]

বাদী ও প্রতিবাদীর সমক্ষে রাজ-সভায় সাক্ষীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিতেছেন—

"সভান্তঃ সাক্ষিণঃ সর্ব্বান্ অর্থি-
প্রত্যর্থি-সন্নিধৌ।
প্রাড়্বিবাকো নিযুঞ্জীত বিধি-
নানেন সান্ত্বয়ন্।
দেব-ব্রাহ্মণ সান্নিধ্যে সাক্ষ্যং পৃচ্ছে-
দৃতং দ্বিজান্।
উদঙ্মুখান্ প্রাঙ্মুখান্ বা পূর্ব্বাহ্নে
বৈ শুচিঃ শুচীন্।"
"আহূয় সাক্ষিণঃ পৃচ্ছেৎ নিয়ম্য
শপথৈঃ ভৃশং।
সমস্তান্ বিদিতাচারান্ বিজ্ঞা-
তার্থান্ পৃথক্ পৃথক্।'[১]

সভামধ্যে অর্থী ও প্রত্যর্থীর সম্মুখে সাক্ষীগণকে উত্তরাভিমুখ বা পূর্ব্বাভিমুখ করিয়া, পূর্ব্বাহ্ন-সময়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। সাক্ষীগণকে শপথ-পূর্ব্বক বলাইবে। ব্রাহ্মণ সাক্ষী হইলে, তাহাকে সত্যে শপথ করাইবে। ক্ষত্রিয়কে অস্ত্র ও বাহনে এবং বৈশ্যকে পশু, বীজ ও কাঞ্চনাদিরত্নে ও শূদ্রকে সর্ব্ব-পাতকে শপথ করাইবে। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

"সত্যেন শাপয়েৎ বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং
বাহনায়ুধৈঃ।

গো-বীজ-কাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং
সর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ।"

শপথকালে ব্রাহ্মণকে প্রাড়্‌বিবাক বলিবেন "যদি তুমি অন্যথা বল, তোমার সত্য বিনষ্ট হইবে।" ক্ষত্রিয়কে বলিবেন, 'তোমার আয়ুধ নিষ্ফল হইবে ও বাহন হীন-বল হইবে।' বৈশ্যকে বলিবেন, "তোমার পশুদল বিনষ্ট হইবে, তোমার বীজ-সকল অঙ্কুর-শূন্য হইবে ও রৌপ্য-স্বর্ণাদি দ্রব্য নষ্ট হইবে।" শূদ্রকে বলিবেন, "তোমার সর্ব্ব-পাতক হইবে।"

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে—

"সুকৃতং যৎ ত্বয়া কিঞ্চিৎ জন্মান্তর-
শতৈঃ কৃতং।
তৎসর্ব্বং তস্য জানীহি যং পরা-
জয়সে বৃথা।"

প্রাড়্‌বিবাক সাক্ষীকে বলিবেন "তুমি শত জন্মে যে সুকৃত করিয়াছ, অধুনা মিথ্যা কথা বলিয়া অনর্থক যাহাকে পরাজিত করিতেছ, সেই সমস্ত সুকৃত তাহারই হইবে।

সাক্ষীরা বিচারালয়ে উপনীত হইলে, যদি প্রতিবাদী কোনও সাক্ষীর এমন দোষ উল্লেখ করে, যাহাতে সে সাক্ষী-শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইতে বাধ্য হয়,—তখন বিচারক সেই দোষের যথার্থতা পরীক্ষা করিবেন। আচার্য্যেরা বলিয়াছেন—

"অসাধয়ন্ দমং দাপ্যঃ দূষণং
সাক্ষিণাং স্ফুটং।
ভাবিতে সাক্ষিণোবর্জ্যাঃ সাক্ষি-
ধর্ম্ম-বহিষ্কৃতাঃ।"

সাক্ষীর দোষ প্রতিবাদী প্রমাণ করিবেন। যদি প্রতিবাদী উপযুক্ত প্রমাণ দিতে অক্ষম হন, তবে তিনি দণ্ডভাগী। যদি সাক্ষীর দোষ প্রমাণীকৃত হয়, তখন সেই সাক্ষীর নাম কাটিয়া দিয়া, তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।

সাক্ষীগণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা সুস্থভাবে স্বভাবমতে যাহা বলে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

"স্বভাবেনৈব যদ্‌ব্রূয়ুঃ তদ্‌গ্রাহ্যং
ব্যবহারিকম্।"

পুনঃ পুনঃ কূট প্রশ্নদ্বারা সাক্ষীকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। যে সাক্ষীকে বিরুদ্ধ-বাদী মনে করা যায়, তাহারই জন্য কেবল কূট-প্রশ্নের ব্যবস্থা ছিল। অন্য সাক্ষীর সহজ সরল বাক্য শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। আচার্য্য বলিতেছেন—

"স্বভাবোক্তং বচস্তেষাং গ্রাহ্যং যৎ
দোষ-বর্জ্জিতম্।
উক্তেহপি সাক্ষিণো রাজ্ঞা ন
প্রষ্টব্যাঃ পুনঃ পুনঃ।

সাক্ষী সহজে যাহা বলে, সেই বাক্য যদি নির্দ্দোষ হয়, তবে তাহাই রাজা গ্রহণ করিবেন। সাক্ষী কোনও বিষয় বলিলে পর তদ্বিষয়ে তাহাকে রাজা বা বিচারক বারম্বার প্রশ্ন করিবেন না। সর্ব্বত্রই কূট-প্রশ্নের অবতারণা করিতে হইলে, বিশেষ প্রতিভা-শালী সাক্ষী ব্যতীত অপর সকলেরই সত্য-কথনে ব্যাঘাত ঘটে। নানা কূট-প্রশ্নে সাক্ষী যখন বিচলিত হয়, তখন তাহার প্রতিভাক্ষয় হওয়ায়, সে পরিশ্রান্ত

সত্যও সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না।

ঋণ-বিবাদে যে সাক্ষী, ঘটনা জানিয়া, রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া এবং প্রাড়্‌বিবাকের দ্বারা পুনঃ পুনঃ শ্রাবিত হইয়াও উত্তর প্রদান করে না, তাহাকে রাজা দণ্ড দিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দৃষ্ট হয়—

"অব্রুবন্ হি নরঃ সাক্ষ্যং ঋণং সদশবন্ধকং।
রাজ্ঞা সর্ব্বং প্রদাপ্যঃ স্যাৎ ষট্-চত্বারিংশকেঽহনি।"

যে সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে নাই, তাহার নিকট হইতে রাজা ৪৫ দিনের পরে অধমর্ণের সমস্ত ঋণ ও তাহার দশাংশ-পরিমাণ দণ্ড-স্বরূপে আদায় করিবেন।

যে ব্যক্তি ঘটনা জানিয়াও সাক্ষী হইতে চায় না, সে মিথ্যা-সাক্ষীর দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। যোগীশ্বর বলিতেছেন—

'ন দদাতি হি যঃ সাক্ষ্যং জানন্ অপি নরাধমঃ।
স কূট-সাক্ষিণাং পাপৈঃ তুল্যো দণ্ডেন চৈব হি।'

যে নরাধম যথার্থ ব্যাপার জানিয়াও দুরাত্মতাবশতঃ সাক্ষ্য প্রদান করে না, সে কূট-সাক্ষীর সহিত সমান পাপী ও সমান দণ্ডার্হ। মিথ্যা-সাক্ষী দণ্ডভাগী। যদি মোকর্দ্দমার বিচার শেষ হইলে জানা যায় যে—সাক্ষী মিথ্যাবাদী, তবে ঐ বিচার সমাপ্ত হইলেও অসমাপ্ত মনে করিতে হইবে। মানব-ধর্মশাস্ত্রে আছে—

"যস্মিন্ যস্মিন্ বিবাদে তু কৌট-সাক্ষ্যং কৃতং ভবেৎ।
তত্তৎ কার্য্যং নিবর্ত্তেত কৃতঞ্চাপ্য-কৃতং ভবেৎ।"

যে যে মোকর্দ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদত্ত হইবে, সেই সেই মোকর্দ্দমার পুনর্ব্বিচার প্রয়োজন হইবে। মিথ্যা-সাক্ষীদ্বারা সিদ্ধান্তিত বিষয় প্রকৃত পক্ষে অমীমাংসিতই থাকে।

কূট-সাক্ষীর দণ্ডপ্রসঙ্গে মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডনীয়াঃ কূটকৃৎ সাক্ষিণস্তথা।
বিবাদাৎ দ্বিগুণং দণ্ডং বিবাস্যো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।"

যে ব্যক্তি অর্থাদি প্রলোভনদ্বারা সাক্ষী ভাগাইয়া লয়, আর যাহারা অর্থাদি গ্রহণ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, রাজা তাহাদিগকে দণ্ড দিবেন। যে কূটকারী ও যাহারা কূট-সাক্ষী, তাহারা সকলেই সমান অপরাধী। কূট-সাক্ষীগণের দণ্ডের পরিমাণ—

'বিবাদাৎ দ্বিগুণং দণ্ডং।'

যে বিবাদে পরাজিত হইলে যাদৃশ দণ্ডের ব্যবস্থা, সেই বিবাদে (মোকর্দ্দমায়) মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। আর ব্রাহ্মণ যদি কূট-সাক্ষ্য দেন, তবে মোকর্দ্দমার গুরুত্ব অনুসারে তাহাকে নগ্ন করা, (নেংটা করিয়া কাপড় কাড়িয়া লইয়া অপমান করা) তাঁহার গৃহ ভঙ্গ করা (ভিটাছাড়া করা) এবং নির্ব্বাসিত (দেশ ছাড়া) করা

কর্ত্তব্য। 'বিবাসন শব্দের' অর্থ ত্রিবিধ—নগ্নীকরণ, গৃহভঙ্গ ও নির্ব্বাসন। অবস্থানুসারে এই ত্রিবিধ ব্যবস্থাই চলিবে। ইহা সাধারণ নিয়ম।"

যে কারণে সাক্ষী মিথ্যা বলিল, তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিলে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। মহর্ষি মনু বলিতেছেন,—

'লোভাৎ সহস্রং দণ্ড্যঃ স্যাৎ
মোহাৎ পূর্ব্বং তু সাহসং।
ভয়াৎ দ্বৌ মধ্যমৌ দণ্ডৌ মৈত্র্যাৎ
পূর্ব্বং চতুর্গুণং।
কামাৎ দশগুণং পূর্ব্বং ক্রোধাত্তু
ত্রিগুণং পরং।
অজ্ঞানাৎ দ্বে শতে পূর্ণে বালিশ্যাৎ
শতমেব তু।'

লোভপ্রযুক্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, সহস্র-পণ স্বর্ণ দণ্ড, মোহবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে, প্রথমসাহস (২৭০ পণ স্বর্ণ) ভয়প্রযুক্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, মধ্যমসাহসের দ্বিগুণ (মধ্যমসাহস ৫৪০ পণ তাহার দ্বিগুণ ১০৮০ পণ অর্থাৎ উত্তমসাহস) মিত্রতাবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, প্রথমসাহস চতুর্গুণ (প্রথমসাহস ২৭০ তাহার চতুর্গুণ ১০৮০ পণ) কাম-হেতু মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায়, প্রথমসাহসের দশগুণ ও ক্রোধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ফলে উত্তম-সাহসের ত্রিগুণ (উত্তম সাহস ১০৮০ পণ তাহার ত্রিগুণ ৩২৪০ পণ) দণ্ড বিহিত হইবে। অজ্ঞতাবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দানের দণ্ড দুইশত পণ, বালিশতাপ্রযুক্ত মিথ্যা কথনে সাক্ষীর শত পণ দণ্ড হইবে।

অনেকবার মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে, ব্রাহ্মণের নির্ব্বাসন-দণ্ড ও অপর জাতির প্রাণদণ্ড। মনু বলিয়াছেন,—

'কৌটসাক্ষ্যং তু কুর্ব্বাণান্ ত্রীন্
বর্ণান্ ধার্ম্মিকো নৃপঃ।
প্রবাসয়েৎ দণ্ডয়িত্বা ব্রাহ্মণং তু
বিবাসয়েৎ।'

মিথ্যা-সাক্ষী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে রাজা বিনষ্ট করিবেন। আচার্য্য বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন,—

'প্রবাসয়েৎ মারয়েৎ 'প্রবাসন' শব্দস্য অর্থশাস্ত্রে মারণে প্রয়োগাৎ।'

প্রবাসন শব্দের অর্থ মারণ। ব্যবহার-শাস্ত্রে এইরূপ অর্থই গৃহীত হইয়া থাকে।

সাক্ষীরা যাহার প্রতিজ্ঞা সত্য বলিয়া প্রমাণ করে, তাহার জয় ও যাহার প্রতিজ্ঞার বিপরীত বলে, তাহার পরাজয় হয়। মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবহারাধ্যায়ে সাক্ষিপ্রকরণে লিখিয়াছেন,—

'যস্যোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যাং প্রতিজ্ঞাং
স জয়ী ভবেৎ।
অন্যথাবাদিনো যস্য ধ্রুবস্তস্য
পরাজয়ঃ।

সাক্ষী যাহার পক্ষসমর্থন করে সে জয়ী, আর যাহার পক্ষসমর্থন করে না, তাহার পরাজয় হয়। যেখানে সাক্ষীরা কোনও বিষয় স্মরণ করিয়া বলিতে পারে না, সেখানে সাক্ষী ব্যতীত অন্য প্রমাণের দ্বারা সারনির্ণয় করিতে হইবে।

যদি সাক্ষীগণের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে কিরূপে নির্ণয় করিতে হইবে,—এতৎসম্বন্ধে আচার্য্যের উক্তি—

'দ্বৈধে বহুনাং বচনং সমেষু গুণিনাং তথা।
গুণিদ্বৈধে তু বচনং গ্রাহ্যং যে গুণবত্তমাঃ।'

যদি সাক্ষীরা দ্বিবিধমত প্রকাশ করে, তবে বহু লোকে যে মত প্রকাশ করিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি উভয়মতই সম-সংখ্যক সাক্ষীদ্বারা সমর্থিত হয়, তখন যাহারা গুণশালী, তাহাদের মতই গ্রাহ্য হইবে। যদি সাক্ষীগণ সকলেই গুণশালী হয়, তবে তাহার মধ্যে যেদিকে অধিক-গুণবান্ লোক থাকে, সেই মতই গ্রাহ্য। তদনুসারে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, একতর পক্ষের অনুকূলে অথবা সম্ভব স্থলে উভয় পক্ষের অনুকূলে ব্যবহার (মোকদ্দমা) সমাপন করিবে।

সাক্ষীসম্বন্ধে অপর বক্তব্য সময়ান্তরে প্রকাশ করিব।

শ্রী——ভারতী
প্রতাপকাটী
যশোহর।

পূর্ব্ব-জন্ম।

১। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মজ সংস্কার হইতে যে বর্ত্তমান জন্ম সূচিত হইয়াছে, ইহার কোন প্রমাণ ও ন্যায়-সঙ্গত যুক্তি নাই। কোন্ যুক্তি আশ্রয় করিয়া উহা প্রমাণ করা যাইতে পারে? আর্য্যদর্শন ও পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান, ন্যায়যুক্তি আশ্রয় করিয়াই মীমাংসা করিয়াছেন যে, এই বিশ্বে কোন বস্তুর একবারে নাশ (ধ্বংস) নাই, সকল দ্রব্যই সেই এক মূলাশক্তি (The Energy) প্রভাবে একবার আবির্ভাব একবার তিরোভাবপ্রাপ্ত হইতেছে; কোনও বস্তুর অত্যন্ত অভাব হয় না। যখন কোন বস্তুর তিরোভাব (নাশ) হয়, তখন সেই বস্তু সেই অবস্থা হইতে আর এক অবস্থায় যায়; এইরূপে ঐ মূলাশক্তির প্রভাবে তাহার মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন (ক্রিয়া বা প্রচলন) প্রতিক্ষণে চলিতেছে; এই পরিবর্ত্তনই জগতের (যাহা যায়, একভাবে থাকে না) ও জীবের স্থূল-শরীরের মৃত্যু (নাশ)। এই জগৎ বলিতে—'গম' ধাতুর চলায়মান অর্থ ধরিয়া, বস্তুমাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল প্রমাণ হয়। হিন্দু-শাস্ত্র, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের কত পূর্ব্বে এই জগৎ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্রেই মূলাশক্তির প্রচলন বা কম্পন (সাংখ্যের অভিমান) হইতে বিকাশ পাইয়াছে, (The whole universe is physical manifestation of the Energy) স্থির করিয়াছেন দেখ। এখন এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটি পরমাণু হইতে মানব অবধি (ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত) সকলে বারবার যাইতেছেন ও আসিতেছেন নাকি? অতএব আর বলিতে পার না যে, জীবের পূর্ব্ব-জন্ম নাই। বেশ, আমাদের পূর্ব্ব-অস্তিত্ব ঐ যুক্তিতে থাকা সিদ্ধ হইল, কিন্তু পূর্ব্ব-জন্মের বিষয় আমাদের স্মরণ থাকে না কেন? ইহার উত্তরে—

বল দেখি যে, আমাদের ইহ-জন্মের যৌবন-কালে মস্তিষ্কাদি সকল ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিকাশ হইলেও অনেক ঘটনা মনে রাখিতে পারি না কেন? একবারে বিস্মৃত হই কেন? এতদুত্তরে অবশ্যই বলিবে যে, কোন অন্তরায় (অশক্তি) বা কোন নূতন শক্তি- (বা কোন নূতন ভাবাবেশ-) বশতই ভুলিয়া যাই। সেইরূপ বিশেষ অন্তরায় (অশক্তি) বা কোন নূতন শক্তি (বা কোন নূতন ভাব) হইতে আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সকল বিষয় বিস্মৃত হই এবং দীর্ঘকাল ও বহু বাসনা (পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার-বীজের বহুত্ব) পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি-বিভ্রমের অন্য হেতু। ইহজন্মেই দীর্ঘকালে ও বহু কর্ম্মজ সংস্কার হইতেও চিত্ত বিভ্রান্ত হয়। চিন্তাশীল ধীর ব্যক্তি মাত্রেই নিজ নিজ ইহ-জন্মের সমস্ত ঘটনাবলী (প্রত্যেক দিবসের) স্মরণ করিলে, এই বিস্মৃতির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আবার এই চিত্তের অন্তরায় (অশক্তি—চিত্তমল) ধারণা-ধ্যানাদি (অষ্টাঙ্গ-যোগ) অনুষ্ঠান দ্বারা দূর হইলে, কোন এক সংস্কারবীজে সংযম করিলে, পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়। ইহার ফল অনুষ্ঠানদ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পার, এখানে তর্ক যুক্তি নাই। হিন্দু-শাস্ত্রে অনেক 'জাতিস্মরে'র উল্লেখ আছে। ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য ভারতী তাঁহার অতীত জন্মের উজ্জ্বল ছবি স্মরণ করিয়া, দিবারাত্র (ভগবদ্‌বিরহে) অশ্রুজলে ভাসিতেন। ভগবান্ গৌতম-বুদ্ধেরও অতীত জন্মের জ্ঞান হইয়াছিল।

২। মনে কর, ইহজীবনেই আমরা অনেক সময়ে (মূর্চ্ছা, স্বপ্ন ও ভাবাবেশে) অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, তাহার পরক্ষণে কিছুই স্মরণ করিতে পারি না; এরূপ বিস্মৃতির কারণ কি স্থির করিবে? তোমাকে বলিতেই হইবে যে, ঐ ঘটনার সময় আমাদের ইন্দ্রিয়াদি মস্তিষ্ক অবধি যেরূপভাবে অবস্থিত ছিল, তাহার পরক্ষণে বা এখন তাহা নাই; ঐ সময় কোন নূতন শক্তি আসিয়াছিল, এখন তাহার তিরোভাব হইয়াছে, তাই ঐ ঘটনা বিস্মৃত হইয়াছি। সহজাবস্থায় ইহ-জীবনের যখন বহু ঘটনা ভুলিয়া যাই, তখন নানা অন্তরায়- (বাধা-) প্রভাবে অতীত জীবনের বিষয় ভুলিয়া যাইব—কোন্ বিচিত্র কথা। এটি অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, আমাদের বর্ত্তমান জীবনে কোন কোন মানুষে, কোন মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা বা তাড়িত-শক্তি-সঞ্চারক (mesmeriser) স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া, তাহার অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি অধিকার করতঃ অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। ঐ প্রেতাবেশ বা তাড়িত-শক্তি-সঞ্চারিত অবস্থায় আবেশক আবিষ্ট ব্যক্তিকে কাগজ খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন সন্দেশ খাইলে'? উত্তরে আবিষ্ট ব্যক্তি বলিল, "অতি উত্তম সন্দেশ," ইত্যাদি অনেক অপূর্ব্ব ঘটনা দেখিতে পাইবে। ঐ আবিষ্ট ব্যক্তির সেই একই আমিত্ব, সেই একই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর বর্ত্তমান, প্রত্যক্ষ হইতেছে, অথচ সে অপর ব্যক্তির ন্যায় বলিতেছে যে, "সত্যই আমি সন্দেশ খাই-তেছি"। এই সকল ঘটনা দেখিয়া অবশ্যই

বলিতে হইবে যে, উহার বাহ্য শরীরাদির কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও, ভিতরে ভিতরে উহার অস্মিতা ('আমার ভাব' বা দেহাভিমান) বদলাইয়া গিয়াছে (change of personality)। আবার আবেশক স্বীয় শক্তি তুলিয়া লইলে, সে ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হয়। কেহ কেহ বলেন, যদি ঈশ্বর ইহজন্মে আমাদের অতীত জন্মের পাপ-পুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার দেন, তাহা আমাদের স্মরণ না থাকায়, সে দণ্ড ও পুরস্কার দেওয়া না দেওয়া সমান কথা;—এই কারণে পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করি না। পূর্ব্বজন্ম উড়াইয়া দিবার ইহা প্রধান যুক্তি। ইহার আনুষঙ্গিক আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি কথা আছে। এই পূর্ব্বপক্ষ নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। ইহার উত্তর—এক কথায় এই যে, সকল আস্তিকগণ (ঈশ্বরবাদীগণ) ঈশ্বরের যে 'স্বরূপ' নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার সম্যক্ ধারণা ও অনুভূতি (introspection) হইলে, আর তাঁহাকে ঐরূপ দণ্ড ও পুরস্কারদাতা (ঈশ্বর) বলিয়া ভ্রান্তি আসিবে না। সকল আস্তিকের ও প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিকের মতেই এই বিশ্ব-সংসারের যিনি মূল কারণ, তিনি "একই" এবং সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ব-শক্তি-সমষ্টি, অধিকন্তু ইহার সহিত সর্ব্ব আস্তিকগণ তাঁহাকে জ্ঞানময় (omniscient) আখ্যা দিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিক যে "সর্ব্ব-শক্তি-সমষ্টি" পদ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার মধ্যে ঐ 'জ্ঞানময়' পদও পড়িল, কারণ ঐ জ্ঞানও একটি শক্তি (চিৎ শক্তি) মধ্যে পরিগণিত হয়। এখন বল দেখি যে, ঐরূপ একমাত্র পূর্ণশক্তিমান্ অচল গম্ভীর ধীর শুদ্ধ বুদ্ধ ঈশ্বরের, দণ্ডধারী রাজা বা সম্রাটের মত সচলতা [চিত্তবিক্ষেপ] হইতে পারে কি যে, তিনি আমাদের পূর্ব্বজন্মের পাপ-পুণ্যের জন্য সদা ব্যস্ত হইয়া চলায়মান চিত্তে দণ্ড-পুরস্কার ব্যবস্থা করিতেছেন? রাজা বা বাদ্‌সার সচল বিক্ষিপ্ত চিত্ত আছে, তাই তিনি তাঁহার প্রজার দণ্ড-পুরস্কার [নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই] ব্যবস্থা করিয়া থাকেন না কি? তোমাদের প্রতিপাদ্য ঐরূপ একমাত্র পূর্ণ মূল কারণে [ঈশ্বরে] বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও স্বার্থ নাই, থাকিলে তিনি শাস্তি ও পুরস্কার বিধান করিতেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

[পঞ্চম অধ্যায়]

প্রভু ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম বা কর্ম্মের ফল সংযোগ করেন না। স্বভাব বা প্রকৃতি [নিজ সংস্কার-কর্ম্ম] হইতেই ঐ সব হইতেছে। বিভু কাহাকেও পাপ বা পুণ্য করান না। জীব অজ্ঞানে আবৃত; সেই অজ্ঞানতা হেতুই মোহগ্রস্ত হয়। অজ্ঞান-সংস্কার প্রভাবেই জীব তাপিত হইয়া, নানাবিধ কর্ম্ম করিতেছে ও তৎফল-ভোগার্থ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে।

ঐ দেখ আর্যশাস্ত্র সেই ঈশ্বরের কি স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"ওঁ ঈশানস্তাপনাশং নিরতিশয়বিবোধাত্ম-
কোপাধিরূকং

নিত্যৈশ্বর্য্যস্য চিত্রং ভুবনময়মলং যস্য সম্বোধনেন।
কৈবল্য-স্থানযুক্তং গুণ-মলরহিতং তং কৃপা-কল্পবৃক্ষং
শ্রদ্ধা-বীর্য্য-প্রজাত-স্মৃতি-মুদিত-হৃদো ধীমহি শ্রেয়সে নঃ॥

যিনি ঈশান, তাপনাশক, নিরতিশয় বিবোধাত্মক উপাধিযুক্ত, যাঁহার নিত্য ঐশ্বর্য্য-সকলকে ত্রিভুবনরূপ চিত্রও সম্যক্ বুঝাইতে সমর্থ নহে; সেই কৈবল্যযুক্ত, গুণমলরহিত, কৃপাকল্পবৃক্ষ ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা-বীর্য্য-প্রজাত-স্মৃতি-মুদিত-হৃদয় আমরা আমাদের পরমার্থের জন্য ধ্যান করি।"

তোমার কৃত ভালমন্দ উভয়বিধ কার্য্যেই তিনি মধ্যস্থ (উদাসীন) অতএব সদা তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে বিরাজমান আছেন। তোমার পূর্ব্ব-জন্মকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ ইহ-জন্মে স্মরণ থাক্ বা নাই থাক্, তাহাতে ঐ পূর্ব্ব-জন্মের বাধ হইবে কেন? আমাদের কৃত কর্ম্মের (ক্রিয়ার) পরিণাম [সংস্কার-বীজ] হইতে এই শরীর; সুতরাং সেই পূর্ব্ব-স্মৃতি (এই পাপ করিয়াছিলাম, তাহার দোষে এই জন্মে এই দুঃখ ভোগ করিতেছি, এই পুণ্য করিয়াছিলাম, তাহার গুণে এই সুখভোগ করিতেছি ইত্যাদি স্মরণ) না থাকায় ঐ ক্রিয়া-পরিণামের (সংস্কার-বীজের) বাধ হইবে কেন?

৩। মরণত্রাস হইতেও পূর্ব্বজন্ম থাকা প্রমাণ হয় অর্থাৎ পূর্ব্বশ্রুত, দৃষ্ট এবং অনুভূত দুঃখের স্মরণ হইলেই প্রাজ্ঞ মানব হইতে অজ্ঞ সদ্যোজাত শিশু (সদ্যোজাত শিশু কেন? কীটাণু অবধি সকল প্রাণীই) মরণভয়ে ভীত হয়;—এই মরণভীতিই অভিনিবেশ। এই অভিনিবেশের সংস্কার জীবের মর্ম্মে অনুবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, দীর্ঘকালের বহুকর্ম্মজ অভ্যাস হইতেই আমাদের সংস্কার জন্মায়,—আর এই সংস্কার বীজরূপে চিত্তে আহিত থাকে, অর্থাৎ মনে অঙ্কিত হইয়া যায়; তাই অনেক কার্য্যে আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও আমরা স্বতঃ বাধ্য হইয়া, পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ সেই সকল কার্য্য করি। এই যুক্তির সত্যতা মানব মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অতএব এই যুক্তিবলে প্রমাণ হয় যে, আমরা [সকল জীবই] পূর্ব্ব অভ্যাস বশত অর্থাৎ অনেক বার জন্মিয়া মরিয়াছি, তাই ইহ জন্মে না মরিলেও কোন একটি সামান্য শারীর-দুঃখ [ব্যাধি] দেখিলেই মরণভয় [অভিনিবেশ] হয়; সুতরাং ইহা দ্বারা পূর্ব্ব-জন্ম থাকা সিদ্ধ হইতেছে।

কোন একটি সদ্যোজাত শিশুর হস্ত প্রথমে প্রদীপশিখার উপরে ধরিলে সে ভীত হইবে না; কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি তাহার হস্ত ঐ প্রদীপশিখায় ধরা যায়, সে ভয়ে আর তথায় হাত দিতে দিবে না, সরাইয়া লইবে; এই ভয়ের হেতু কি পূর্ব্ব-দাহজনিত অনুভব নহে? সকল জীবের অভিনিবেশও [মরণভয়ও] ঐরূপ পূর্ব্বসংস্কারজ। এক্ষণে ধীর বিজ্ঞ পাঠক ও শ্রোতা এই অভিনিবেশ বিষয়টী অনুচিন্তন করিলেই পূর্ব্ব জন্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ কেহ মূর্খ, কেহ পণ্ডিত, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র,

কেহ পথের ভিখারী, কেহ বা প্রাসাদ-বাসী সম্রাট্ ইত্যাদি জীব-জগতের নানা বিচিত্রভাব দেখিয়াও পূর্ব্বজন্ম থাকা সিদ্ধ হয়।* যদি পূর্ব্বপক্ষ কর যে, ঈশ্বর ঐরূপ নানাভাবে জীবজগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই সৃষ্টিবৈচিত্র্য হইয়াছে; তাহা বলিতে পার না। যেহেতু সকল ঈশ্বরবাদীই তাঁহাকে নিরপেক্ষ ও পরম-করুণাময় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঐরূপ নিরপেক্ষ করুণাময় ঈশ্বর কি বিচিত্র সৃষ্টির রচনা করিয়া, জীবকে নানাবিধ ক্লেশ দিতে পারেন? যদি বল আপনা আপনি ঐ সৃষ্টি-বিচিত্রতা হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না। কারণ, 'আপনা আপনি' অর্থেই পদার্থের স্ব স্ব ভাবের [যাহার ভিতরে যাহা নিহিত আছে] অভিব্যক্তি; এই স্ব স্ব ভাবই জীবমাত্রের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম-কৃত কর্ম্মের সংস্কারবীজ। এই সংস্কারবীজ হইতেই ঐ সৃষ্টি-বৈচিত্র্য [অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্রতা]। অতএব ইহা দ্বারাও পূর্ব্বজন্ম প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীসেবানন্দ স্বামী
কাপিলাশ্রম।

* সৃষ্টির বৈচিত্র্য বা কর্ম্মফলের বৈচিত্র্য হইতে পূর্ব্ব-জন্ম সিদ্ধ হয়। পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই কেহ প্রতিভাসম্পন্ন, কেহবা মূর্খ হইয়া জন্মে। প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় যে—মানসিকবৃত্তির অনুশীলন না করিলে, তাহার বিকাশ [development] হয় না। কিন্তু অনেকের জীবনে দেখা যায় যে, তাঁহারা অল্পবয়সেই প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া জন্মিয়া থাকেন। অন্য সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহাদের কোন কোন চিত্তবৃত্তি কত প্রখর! নেপোলিয়নের জীবনে দেখা যায় যে, যুদ্ধপ্রণালী-বিষয়ে তাঁহার কত দূর প্রতিভার বিকাশ ছিল। প্রসিদ্ধ বৃদ্ধ সেনাপতিগণ অল্পবয়স্ক নেপোলিয়নের উপদেশ সসম্ভ্রমে পালন করিতেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, নেপোলিয়নের যুদ্ধানুরাগ-বৃত্তির ও যুদ্ধ-জয়কৌশলবৃত্তির অনুশীলন পূর্ব্বজন্মেই হইয়াছিল। অনেকে আবার বংশগত গুণ-সংক্রমণ বা [Hereditary course] মত লইয়া বলেন যে, বংশের গুণ সন্তানে বর্ত্তে। কিন্তু তাঁহারা বলুন,—নেপোলিয়ন কোন সেনাপতির সন্তান? তিনি একজন সামান্য আইন-ব্যবসায়ীর পুত্র। অতএব, সকল স্থানে বংশগত নিয়ম খাটে না। জন্মান্তর-বাদ-গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই।

ভরত-চরিত।

যে উদার-চরিত রাজর্ষির চিরস্মরণীয় নামে পুণ্যভূমি ভারতের পরিচয়, যে নরচন্দ্রমার বিমলযশোজ্যোৎস্নায় একদিন এই কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বাঙ্গ সুধৌত ও ধবলিত হইয়াছিল, যে মহাত্মার অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী কর্ম্মগতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল, সেই ভক্তাধিক ভক্ত পরমযোগী জ্ঞানের চরমকাষ্ঠা-প্রাপ্ত নৃপতি ভরতের জীবনবৃত্ত সংক্ষেপে এ প্রবন্ধে বিবৃত হইবে।

পৌরাণিক-মতে বসুমতী সপ্তদ্বীপা। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ নামক সুবিশাল ভূমিখণ্ডে পুরাকালে অগ্নীধ্র নামক নরপতি রাজত্ব করিতেন। অগ্নীধ্রের নয় পুত্র। নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল। রাজা অগ্নীধ্র স্বীয় রাজ্য জম্বুদ্বীপ নয়ভাগে বিভক্ত করিয়া,

নবপুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন, ইহাদের প্রত্যেকের নামে তত্তদ্‌ ভূখণ্ডের নামকরণ হইয়াছিল। নাভিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ এই নব অংশে সুবিস্তৃত জম্বুদ্বীপ বিভক্ত হইয়া, উত্তরকালে প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্ররাজ্যে পরিণত হয়। রাজা নাভির তনয় ঋষভদেব। এই মহাত্মার শত পুত্র, তন্মধ্যে জ্ঞানে গুণে, শক্তিতে ভক্তিতে, ঋদ্ধিতে সিদ্ধিতে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহামনা যজ্ঞা দাতা শরণ্য ঋষভদেব জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তপস্যার্থে বনে প্রস্থান করিলেন। মহনীয়মহিম রাজর্ষি ভরতের নামে অদ্যাপি এই পুণ্যদেশ "ভারতবর্ষ" অর্থাৎ "ভরতের দেশ" বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

"ততশ্চ ভারতং বর্ষং এতল্লোকেষু গীয়তে।
ভরতায় যতঃ পিত্রা দত্তং প্রতিষ্ঠতা বনম্।"

ভরতের পিতা ঋষভদেব বনে গমন করিবার সময় ভরতকে এই রাজ্য সমর্পণ করিয়া যান, সেই হেতু এই দেশ ভারতবর্ষ নামে জগতে গীত হয়।

রাজা ভরত যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি অশেষ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শেষজীবনে পুত্রের প্রতি রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া, শালগ্রাম নামক পুণ্যময় পত্তনে তপঃসাধনেচ্ছায় প্রস্থান করিলেন। শালগ্রামে রাজর্ষি ভরত সুদীর্ঘকাল তীব্র তপস্যায় অতিবাহিত করিলেন। সে সময় তিনি মূর্ত্তিমান্‌ বৈরাগ্য, বপুষ্মান্‌ ত্যাগ, আকারবান্‌ সংযম ও ধৈর্য্যের ন্যায় বিবেচিত হইতে লাগিলেন। যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান, সমাধির সেবা ও আশ্রমোচিত আচারের অনুসরণ পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার কর্ম্মময় জীবন নৈষ্কর্ম্ম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

মানবের সাধনা যত তীব্রতা লাভ করুক্‌ না কেন, কখনও বিধাতার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারে না। সুবিশাল বারিনিধি উত্তীর্ণ হইয়াও লোকে স্বল্পায়তন পল্বলে নিমজ্জিত হয়। রাজ্যৈশ্বর্য্য, পুত্রস্নেহ, পত্নীপ্রেম, প্রকৃতি-পুঞ্জের উৎকট অনুরাগ—যাঁহাকে বৈরাগ্যের বন্ধুরপথে পদচারণা করিতে বাধা দিতে সক্ষম হয় নাই, এক অজ্ঞাত অকিঞ্চিৎকর অলক্ষ্যসূত্রে তাঁহার পবিত্রজীবন পতনের দিকে আকৃষ্ট হইল। রাজর্ষি ভরত একদা বেগবতী পার্ব্বত্য-নদীতে স্নানাদি কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক সন্ধ্যাদিতে রত ছিলেন। অলক্ষ্যে অপরপার্শ্বে আসন্নপ্রসবা হরিণবনিতা জলপান করিতেছিল। হরিণী বেদনাতুরা, মন্থরগমনা ও ক্ষামকণ্ঠা, সে অনন্য-মনে জলপানে ব্যস্তা। অকস্মাৎ বজ্রধ্বনির ন্যায় ভীষণ সিংহগর্জ্জনে দিগ্‌দিগন্ত বিকম্পিত হইল। সুঘোর শব্দে গিরিদরী ধ্বনিত হইল! অল্পবল অরণ্যচরজীব অনিষ্টপাত আশঙ্কায় অরণ্যানীমধ্যে আত্মসম্বরণের বাসনায়, জলসমীপ হইতে অত্যুচ্চ স্থানে আরোহণ করিবার ইচ্ছায়, প্রাণপণে লম্ফ প্রদান করিল। এই অবিচারিতপূর্ব্ব আকস্মিক অঙ্গসঞ্চালনে হরিণীর গর্ভচ্যুতি সংঘটিত হইল! ঐ গর্ভচ্যুত হরিণপোতক পার্ব্বত্য

প্রবাহিণীর প্রবলবেগে বাহিত হইতে লাগিল। গর্ভ প্রচ্যুতি ও অত্যুচ্চাক্রমণ দোষে হরিণী নিতান্ত নিপীড়িতা হইয়া, অধোদেশে পতিত হইল। জীর্ণবসনের ন্যায় উপেক্ষণীয় জ্ঞানে অসমর্থ মৃগীদেহ পরিত্যাগ করিয়া, তাহার প্রাণ অনন্তে ধাবমান হইল। এই হৃদয়ার্দ্রকারী শোচনীয় ঘটনার আবির্ভাবে ভরতের সাধনার ভঙ্গ হইল। অসহায় মৃগ-শিশুর প্রাণবিপত্তি দর্শনে ভরতের তপঃ-শোধিত অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল। পার্ব্বত্যনদীর উদ্দাম প্রবাহের শক্তপদাঘাত হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ভরত হরিণশিশুকে স্রোতের কবল হইতে রক্ষা করিয়া, তীরে আনয়ন করিলেন এবং স্বীয় পর্ণগৃহে লইয়া তাহাকে পোষণ করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে মৃগ উল্লম্ফন, ধাবন, চরণা-দিতে সুপটু হইয়া উঠিল। ভরতের নিষ্কাম হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে আকাঙ্খা ও স্নেহের ক্ষুদ্র রাজত্ব সংস্থাপিত হইল। সাধনার সময় সংক্ষিপ্ত হইল এবং মৃগচর্য্যার কাল বিস্তৃতি লাভ করিল। মৃগ সত্রাস হৃদয়ে আশ্রমে সমাগত হইলে, ভরত শঙ্কিতচিত্তে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। শার্দ্দুল-নখাঘাত ভয়ে হরিণশিশু যেমন শঙ্কাযুক্ত থাকিত, ভরত তদপেক্ষা অধিক চিন্তিত থাকিতেন। বিধাতার সূক্ষ্ম অভিসন্ধির রহস্যোদ্ধার করিতে মানব কখনই পারগ নহেন। ভরত আজ বিশাল রাজ-সংসার ত্যাগ করিয়া, একমাত্র মৃগশিশুকে লইয়া সংসারী। সাধনার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল। ভরত ক্রমে ভগবচ্চিন্তাবিমুখ হইয়া মৃগধ্যানপরায়ণ হইলেন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে—মৃগমূর্ত্তি তাঁহার অন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল। ভরত যদি যোগী হন, তবে মৃগ তাহার যোগাবলম্বন ধ্যেয়। ভরতকে যদি সাধক বলা যায়, তবে মৃগ তাঁহার সাধনার ধন। ভরতকে যদি ভক্ত বলা হয়, তবে মৃগ তাহার ভগবান্। ভরত যদি সংসারী হন, তবে মৃগ তাহার সংসার-সর্ব্বস্ব। ভরত যদি রোগী হন, তবে মৃগ তাহার রসায়ন। ভরত যদি কর্ম্মী হন, তবে মৃগচর্য্যা তাহার কর্ম্ম। ভরত যদি ধার্ম্মিক হন, তবে মৃগই মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম।

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে, একদা ভরতের জীবলীলার অবসান-সময় সমাগত হইল। ভরতের ললাটে মৃত্যুর মলীমস কান্তির আবির্ভাব হইল। নেত্র-যুগল জ্যোতিহীন, ইন্দ্রিয়গণ শিথিল-প্রায় ও মন বিহ্বল হইল। দশম-দশায় উপনীত ভরতের সমক্ষে সেই প্রাণাধিক মৃগপোতক! পশুহৃদয়েও কৃতজ্ঞতার স্থান আছে;—মৃগ তাহার হৃদয়ের সুগভীর কৃতজ্ঞতার প্রমাণ-স্বরূপ অবিরল নয়নজল বর্ষণ করিতে লাগিল। ভরত তেজঃশূন্য উদাস-দৃষ্টিতে মৃগের মুখের দিকে তাকাইয়া অন্তর্যাতনায় দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। সমাধি-সংস্কৃত চিত্তক্ষেত্রে আজ মোহ ও স্নেহের তুমুল তৃণাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া, অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। মৃগমূর্ত্তি দেখিতে ২ মৃগ-চিন্তামগ্ন ভরতের দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপক্ষী পলায়ন করিল।

শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।'

যে যেরূপ চিন্তা করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করে, সে তদ্ভাব-ভাবিত-চিত্ততাহেতুক সেই সেই জাতি লাভ করে। জীবগতি ভগবদ্ভক্তি-বুদ্ধির অনুগামিনী। ভরতের বৈরাগ্য, সাধনা, অর্চ্চনা, তপঃ, জপ কিছুই দেহবন্ধন শিথিল করিতে সক্ষম হইল না। ভরত সুবর্ণশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, সুখলিন লৌহশৃঙ্খলে নিগড়িত হইলেন। ভরত ভগবদ্ভক্তি সফল করিবার আগ্রহে মৃগজন্ম গ্রহণ করিলেন। হায়! ভরতের এত ত্যাগ—যোগ—সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফলতা লাভ করিল। কেন এমন হইল? জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানবিৎ মহর্ষি কপিল বলিয়াছিলেন,—

"অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ।"

যাহা সাধনার অনুকূল নহে, অথবা যাহা যোগের সাধন নহে, তাদৃশ পদার্থের চিন্তা করা বন্ধ আনয়ন করে, যেমন রাজর্ষি ভরত যোগের অসাধনের (মৃগশিশুর) চিন্তা করায় বদ্ধ হইয়াছিলেন। ভরত যদি ভগবদ্রূপে চিত্তনিবেশ করিয়া, জীবলীলা শেষ করিতেন, তিনি কখনই এরূপ শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইতেন না।

ভরত মৃগ হইলেন বটে, কিন্তু সাধনার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইলেন না। তিনি 'জাতিস্মর' মৃগ হইলেন। যাহার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় থাকে, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে জাতিস্মর নামে অভিহিত করেন। পূর্ব্বজন্মের বিড়ম্বনা—যোগভ্রংশন—মৃগজন্মলাভ—অধঃপতন—সমস্তই তাহার স্মৃতিপথের গোচর থাকায়, ভরত মৃগ-জীবনেও সংসার-বিরক্ত হইয়াছিলেন। মৃগরূপী ভরত সংসারের মোহমায়ায় আবদ্ধ থাকা ঘোরতর পাপের বিষয় বলিয়া স্থির করিয়া, মৃগী-মাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বস্মৃতির কৃপাপ্রদত্ত সেই শালগ্রামে গমন করিয়া, শুষ্ক পর্ণ ও নীরস তৃণাদি ভক্ষণ-পুরঃসর ক্লেশ-সহিষ্ণুতার অনুশীলন করিতে লাগিলেন এবং নীরবে নিয়ত শ্রীভগবানের চরণে কাতর ভাবে পাপ মৃগ-লীলার অবসান কামনা করিতে থাকিলেন। জাতিস্মর মৃগের আকুল ক্রন্দনে ভগবানের আসন টলিল, তাঁহার করুণাদৃষ্টি মৃগের প্রতি নিপতিত হইল। মৃগ-জন্ম-নিষ্পাদক কর্ম্মের সংক্ষয় সংঘটিত হইল।

"তত্রচোৎসৃষ্টদেহোঽসৌ জজ্ঞে জাতিস্মরো দ্বিজঃ।
সদাচারবতাং শুদ্ধে যোগিনাং প্রবরে কুলে।"

ভরত শালগ্রাম নামকস্থানে মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া, দ্বিজরূপে সদাচারবান্ শুদ্ধ যোগিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান বিলুপ্ত না হওয়ায়, ভরত সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন ও আত্মায় সর্ব্বভূত-দর্শনরূপ মহাশিক্ষার অনুশীলন দ্বারা সুনির্ম্মল তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় দেদীপ্যমান রহিলেন। পূর্ব্বাধীত বেদ-বেদান্ত স্মরণ থাকায়—

"ন পপাঠ গুরুপ্রোক্তং কৃতোপনয়নঃ শ্রুতং।
ন দদর্শ চ কর্ম্মাণি শাস্ত্রাণি জগৃহে ন চ।"

উপনয়নের পর গুরুপ্রোক্ত বেদ পাঠ করিলেন না, শাস্ত্রগ্রহণ ও কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেন না। ভরতের হৃদয় হইতে বর্ণাশ্রমজনিত অভিমান পলায়ন করিয়াছিল। বেদ ও অপর অনুষ্ঠানশাস্ত্রে ও বর্ণ ও চতুরাশ্রমীর ধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে, যাহার

জাত্যভিমান ও আশ্রমাভিমানের নিবৃত্তি ঘটিয়াছে, তাহার পক্ষে বৈদিক বা স্মার্ত্ত-কর্ম্মের অধিকারও নাই, তিনি বিধিনিষেধের অতীত। ভরত অনাদৃত অবজ্ঞাত জড়প্রায় ভাবে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

"উক্তোঽপিবহুশঃ কিঞ্চিজ্জড়বাক্যমভাষত।
তদপ্যসংস্কার-যুতং গ্রাম্যবাক্যোক্তিমৎ শ্রিতম্।
অপধ্বস্তবপুঃ সোঽথ মলিনাম্বর-ধৃগ্ দ্বিজঃ।
ক্লিন্নদন্তান্তরঃ সর্ব্বৈঃ পরিভূতঃ স নাগরৈঃ ॥"

পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও ভরত জড়বৎ অস্পষ্টবাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন, তাহার বাক্য ব্যাকরণ-সংস্কার-বিহীন, এবং গ্রাম্য-শব্দ-প্রচুর ও অস্পষ্টোচ্চারিত হইত। তিনি সর্ব্বদা মলিন-দেহ মলিনবস্ত্রধারী থাকিতেন, তাহার দন্তসমূহের অন্তর ভাগ (ফাঁক্) ক্লেদপূর্ণ অপরিচ্ছন্ন ছিল, তিনি নাগরগণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত ও তিরস্কৃত হইতেন। সম্মাননা বা সৎকার সমাধি-সাধনের অন্যতম অন্তরায় অবগত হইয়া তিনি, সৎকার পরীহার-পূর্ব্বক তিরস্কারের তিরস্করিণীর অন্তরালে আত্মরক্ষা করিতেন। যাহাতে লোকে তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া তাঁহার চিত্ত-দৈন্য উৎপাদনে সক্ষম না হয়। তজ্জন্য তিনি নিজেকে জড় ও উন্মত্তরূপে প্রদর্শন করিতেন। শাক, বন্যফল, কদন্ন, ক্ষুদ্র-তণ্ডুল যখন যাহা প্রাপ্ত হইতেন, উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বিচার না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে ভক্ষণ করিতেন।

এরূপাবস্থায় বহু দিবস অতিবাহিত হইলে, ভরতের পিতৃ-বিয়োগ সংঘটিত হইল। ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতৃব্য [ভ্রাতৃপুত্র-] গণ ভরতের দ্বারা ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করাইতে লাগিলেন। জগতের জীব স্বার্থের সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতৃপুত্র-গণ ভরতকে ভৃত্যবৎ কার্য্য করাইতে লাগিলেন,—বিনিময়ে ভরতের উদরান্নের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। ভরত নিজগৃহে পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তিতে 'পেটেভাতে' ভৃত্যভাব গ্রহণ করিলেন।

"স তুক্ষশীনাবয়বো জড়কারী চ কর্ম্মণি।
সর্ব্বলোকোপকরণং বভূবাহার-বেতনঃ ॥"

বলীবর্দ্দের ন্যায় স্থূল-দেহ কার্য্যে জড়বৎ (ব্যুৎপত্তিশূন্য) গৃহজনগণের উপকরণ সদৃশ ভরত আহারমাত্র বেতনে স্বগৃহে ভৃত্যত্ব লাভ করিলেন। কার্য্যতঃ সংস্কারবিহীন জড়প্রায় ভরতের স্বগৃহে ভৃত্যত্বই চরম ব্যবস্থা নহে। অতঃপর রাজকুলে ভরত 'বিষ্টি' পদবী লাভ করিবেন।

ভরতের জন্মভূমি সৌবীর দেশ। তৎ-কালে সৌবীর রাজ্যে রহূগণ নামক নরপতি শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন। রাজা রহূগণ জ্ঞানপিপাসু সদাচার নৃপতি ছিলেন। তিনি তত্ত্ব-শিক্ষার উদ্দেশে তৎ-কালীন সিদ্ধসম্রাট্ মহামুনি কপিলদেবের ইক্ষুমতী-নদী-তীরস্থ আশ্রমে গমন করিতে-ছিলেন। রাজা দূরপথে শিবিকারোহণে যাইতে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর আকস্মিক কারণে একজন শিবিকাবাহক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। পথি মধ্যে এই আকস্মিক আপৎপাতে রাজা নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পদাতিকগণকে বাহক অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। প্রধান

পদাতিক (ক্ষত্তা বা দারোয়ান্) স্বল্প দূর গমনের পরই জড়ভরতের দর্শন লাভ করিল। তৎকালে প্রথা ছিল—

"সায়ং প্রাতর্যদা সন্ধ্যাং যে বিপ্রাঃ নো উপাসতে।
তান্ স্বেষু ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মসু যোজয়েৎ।"

যে সকল দ্বিজ সায়ং সময়ে ও প্রাতঃকালে নিয়মিতরূপে সন্ধ্যা উপাসনা করে না, ধর্ম্মরক্ষক রাজা তাহাদিগকে শূদ্রকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। জড়-ভরতের সন্ধ্যা, অর্চ্চনা কিছুই নাই, সুতরাং তিনি রাজার 'বিষ্টি' যোগ্য বিবেচিত হইলেন।

"তং তাদৃশমসংস্কার-বিপ্রাকৃতি-বিচেষ্টিতং।
ক্ষত্তা সৌবীররাজস্য বিষ্টিযোগ্য মমন্যত।"

সংস্কারশূন্য বিপ্রাকার ও বিপ্রচেষ্ট ভরতকে সৌবীর রাজার দারোয়ান্ বিষ্টিযোগ্য মনে করিলেন। বিষ্টি অর্থ বেগার অর্থাৎ বিনা বেতনে যাহারা কার্য্য করিতে বাধ্য। ভরতের ভাগ্যলেখে চিরদিনই বিষ্টিত্বের বিধান আছে। যখন তীব্র বিরাগী সংসার-ত্যাগী, তখন কর্ম্মফলে আসক্তি না থাকায় তিনি বেগার, যখন মৃগ-জন্মে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতেছিলেন, তখনও নূতন ফলপ্রদ কর্ম্মের উৎপত্তি না হওয়ায় কেবল সঞ্চিতের ক্ষয়মাত্র জীবনের প্রয়োজন থাকায় তিনি বেগার, আবার যখন বিপ্রজন্মে পেটেভাতে গৃহকর্ম্ম করিতেছিলেন তখনও তিনি বেগার, আবার অধুনা রাজশিবিকাবাহকরূপেও ভরত বিষ্টি বা বেগার সাজিয়াছেন।

ভরত অন্যান্য বাহকগণের সঙ্গে স্কন্ধে শিবিকা ধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ভরত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত সঞ্চিত অপকর্ম্মের ক্ষয়ের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় নাই—জানিয়াই অনুদ্বিগ্নচিত্তে ফলভোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ভরত জড়গতি ছিলেন, তীব্রবেগে যাইতে পারিতেছিলেন না। অপর বাহকগণ দ্রুতবেগে গমন করিতেছিল, ইহাতে শিবিকা বিষমতা প্রাপ্ত হইতেছিল। রাজা বাহকবর্গের নিকট শিবিকার বিষমগতির কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা বলিল, এই নবাগত স্থূলবপু বাহক সত্বর গমনে অসমর্থ, সেই জন্য এইরূপ হইতেছে। রাজা ভরতের প্রতি বলিলেন,—

"কি শ্রান্তোঽস্যল্পমধ্বানং ত্বয়োঢ়া শিবিকা মম।
কিমায়াসসহো ন ত্বং পীবানসি নিরীক্ষসে।"

ওহে! তুমি কি পরিশ্রান্ত হইয়াছ? তাহা সম্ভব নহে, কারণ অত্যল্প পথ তুমি আমার শিবিকা বহন করিয়াছ, অথবা তুমি কি ক্লেশ-সহিষ্ণু নও, তাহাও অসম্ভব, যেহেতু তোমাকে স্থূলকায় ও বলবান্ দেখাইতেছে। রাজার কথায় ভরত প্রত্যুত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন। ভরত বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় উত্তর দিলেন,—

"নাহং পীবান্ নচৈবোঢ়া শিবিকা ভবতো ময়া।
ন শ্রান্তোঽস্মি নচায়াসঃ সোঢ়ব্যোঽস্তি মহীপতে!"

হে রাজন্! আমি স্থূল নহি, তোমার শিবিকা আমার দ্বারা বাহিত হইতেছে না, আমি শ্রান্ত নহি, আমার সহনীয় আয়াসও নাই।

রাজা বলিলেন—

"প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে পীবান্ অদ্যাপি শিবিকা স্থয়ি।
শ্রমশ্চভারোদ্বহনে ভবত্যেব হি দেহিনাং।"

অর্থাৎ তোমার বাক্য প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। তুমি যে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ, তাহা প্রত্যক্ষ। এখনও তোমাতে শিবিকা বিদ্যমান অর্থাৎ তুমি শিবিকা স্কন্ধে ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছ। মানবগণের ভারবহনে শ্রমবোধ হইয়া থাকে, ইহাও সর্ব্বসম্মত; সুতরাং তোমার বাক্য বিশ্বাস করি কিরূপে ?

ভরত, রাজার তত্ত্ব-জ্ঞানাভাব দর্শনে করুণাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন, মহারাজ ! আপনি কি দেখিতেছেন ? তাহা আগে বিবেচনা করুন। আমি শিবিকা বহন করিতেছি, শিবিকা আমাতে সংস্থিত,—এ সকল কথার কিছুই সত্যতা নাই। আপনি মনোযোগ সহকারে আমার বাক্যাবলী শ্রবণ করুন্। ভূমিতে পাদদ্বয়ের অবস্থিতি, পাদদ্বয়ের উপর জঙ্ঘার অবস্থান, জঙ্ঘাদ্বয়ে উরু প্রতিষ্ঠিত, তাহার উপর উদর অবস্থিতি করিতেছে, বক্ষঃস্থল, বাহুদ্বয় ও স্কন্ধ উদরে সংস্থিত। স্কন্ধে শিবিকা সংস্থিতা—ইহাতে আমার ভারবোধ হইবে কেন ? ঐ শিবিকার অভ্যন্তরে ঐ আপনার দেহ অবস্থিত, এই দেহ ভূতসঙ্ঘাত মাত্র। দেহ কর্ম্মাধীন, কর্ম্মপ্রবাহে ইহার সঙ্কলন ও বিয়োজন সংঘটিত হয়। আমি আত্মস্বরূপ, দেহের উদয় বা বিলয়ের সহিত আত্মার সম্পর্ক নাই। আত্মা চিরনিত্য কূটস্থ অবিকৃত চিন্ময়। আত্মার হ্রাসবৃদ্ধি বা উপচয়-অপচয় নাই। অতএব আমি 'স্থূল' এ বাক্য অসত্য। স্থূলতা কৃশতা দেহধর্ম্ম, আমি দেহ নহি, সুতরাং উহা আমার প্রতি প্রয়োজ্য নহে। ভূমি, পাদ, জঙ্ঘা, কটি, উরু, জঠর ও স্কন্ধে যথাক্রমে অবস্থিতা শিবিকা আমাতে স্থিত বলা যায় না, কারণ উহারা দেহের অবয়ব, আমি দেহাতিরিক্ত। যখন আত্মা প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পদার্থশ্রেণী হইতে বিভিন্ন, তখন ইহাদের আয়াসে আমার আয়াস সহ্য করিতে হইবে কেন ?

তত্ত্বশিক্ষার্থী রাজা রহূগণ কদম্বমূলে আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ভরতের বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে গদগদ হইল। তিনি অবিলম্বে শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া, ভরতের পদমূলে পতিত হইয়া কহিলেন প্রভো ! শিবিকা ত্যাগ করুন্, আমার প্রতি কৃপা করুন্। ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায়—খনিমধ্যস্থ অসংস্কৃত মণির ন্যায় আপনি এই হীন-বেশে কি জন্য কোন্ মহাভাগ আগমন করিয়াছেন ? পরিচয় প্রদানে আমাকে চরিতার্থ করুন্। ভরত বলিলেন, রাজন্ ! 'আমি কে' ? ইহা বলিবার সাধ্য নাই। আত্ম-স্বরূপ বাক্যের গোচর নহে। সংসারে আগমন ভোগার্থ; ভোগের কারণ ধর্ম্মা-ধর্ম্ম। রাজা বলিলেন, মহাশয় ! আপনার বাক্য অমূল্য, কিন্তু যে আমি বিদ্যমান আছি, তাহা বলা যাইবে না কেন ? বিদ্য-মান বস্তুর কথন অসাধ্য কি প্রকারে ? অহং (আমি) এই শব্দদ্বারা আত্মা কথিত হন না—ইহা কিরূপ ? ভরত উত্তর করি-লেন, আত্মাতে যে 'অহং'-প্রত্যয়, তাহা অবিদ্যাদোষ বশতঃ হইয়া থাকে। উহা ভ্রান্তি মাত্র, কারণ—

"জিহ্বা ব্রবীত্যহমিতি দন্তৌষ্ঠৌ তালুকং নৃপ !
এতে নাহং যতঃ সর্ব্বে বাঙ্নিষ্পাদনহেতবঃ।"

"অহং" এই বাক্য জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ ও তালু ইহাদের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ইহারা কেহই "আমি" নহে, যেহেতু ইহারা 'আমি'-বাক্যনিষ্পাদনের হেতু। যদি বল, বাগিন্দ্রিয়ই 'আমি', তাহাও সত্য নহে, কারণ ইন্দ্রিয়-গণ জ্ঞানের করণ, আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা। পাণিপাদ প্রভৃতি আত্মা হইতে ভিন্ন, সুতরাং দেহে আত্মবুদ্ধি ভ্রম। দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিত্ব না থাকায় 'আমি' 'তুমি' ইত্যাদি

প্রয়োগ ভ্রমাত্মক। আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই। সমস্ত দেহক্ষেত্রে একমাত্র সর্ব্বব্যাপী চিদ্রূপ আত্মা বিরাজমান। বিশ্লেষণ করিলে, জগতে 'নাম' ও 'রূপ' ব্যতীত অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য প্রভৃতি ঔপাধিক সংজ্ঞা মাত্র। তুমি প্রজার নিকট রাজা, পত্নীর নিকট পতি, পুত্রের নিকট পিতা, পিতার নিকট পুত্র,—বস্তুতঃ এ সব ঔপাধিক নাম, তুমি আত্মস্বরূপ। রাজন্ তুমি মস্তক, পাদ ও উদর প্রভৃতি নহ, ইহারাও তোমার নহে। একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা কর—তুমি কে?

এইরূপ বহু উপদেশ প্রদানের পর ভরত, রাজার নিকট ঋভু-নিদাঘের প্রাচীন কাহিনী ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বোপদেশ সমাপন করিলেন। রাজা রহূগণ ভরতের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। ভেদবুদ্ধির কুহেলিকা নয়ন যুগল হইতে অপসৃত হইল। বিমল জ্ঞানদীপ্তির উল্লাসে রাজার অন্তরের অন্তস্তলের অন্ধকাররাশি অপনীত হইল।

রাজর্ষি ভরত বিপ্রজীবনে প্রারব্ধ কর্ম্ম-পরিক্ষয়ের পরে বিদেহ ভাব প্রাপ্ত হইলেন।

"সচাপি জাতিস্মরণাপ্তবোধস্তত্রৈব জন্মন্যপবর্গমাপ।"

পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগরূক থাকায় ভরতের আত্মজ্ঞানে মালিন্যস্পর্শ হয় নাই। পবিত্রজ্ঞানচর্চ্চায় ভরত সেই ব্রাহ্মণ-জীবনেই অপবর্গ প্রাপ্ত হইলেন। অগাধ সচ্চিৎ-আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া চরমশান্তি লাভে কৃতার্থ হইলেন। সংসারের তীব্র দুঃখ-জ্বালা, ভীষণ উৎপাতপাত, কদর্য্য কদর্থনা, তাঁহার ভজন-রসাস্বাদনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হইল না। তিনি অপুনর্ভব লাভ করিলেন। শ্রুতি বলিতেছেন—

"ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি।

শ্রী——ভারতী
প্রতাপকাটী
যশোহর।

সাংখ্যীয় প্রবন্ধ।

সত্য ও তাহার অবধারণ।

১। পদার্থ বা নিয়ম সম্বন্ধীয় বাক্য যথার্থ হইলে, তাহাকে সত্য বলা যায়।

পদার্থ সম্বন্ধীয় বাক্য যথা—ঘট আছে; আকাশ নীল। নিয়ম সম্বন্ধীয় বাক্য যথা—অগ্নি দহন করে।

যথার্থ অর্থে "যাহা কথিতরূপে আছে" বা "যাহা কথিতরূপ হইয়া থাকে"।

'সত্য পদার্থ', 'সত্য নিয়ম', 'ইহা সত্য' ইত্যাদি ব্যবহার হইতে জানা যায় যে, সত্য-শব্দ গুণবাচী বা বিশেষণ। উহার দ্বারা 'কথিতের সমান রূপে থাকা' এই গুণ বুঝায়।

যোগ-ভাষ্যকার সত্যের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—"সত্যং যথার্থে বাঙ্মনসী" অর্থাৎ মনের বিষয় ও বাক্যের বিষয় (অর্থ) যদি যথাভূত হয়, তবে তাহা সত্য।

এই লক্ষণই কিছু ভিন্নভাবে উপরে উক্ত হইয়াছে। কারণ সত্য-সাধন ও অভিধেয় সত্য ঠিক এক নহে।*

বস্তুত সত্য পদার্থ সাধারণত শব্দময় চিন্তাসাধ্য এবং তাদৃশ চিন্তার সহিত অবিনাভাবী। "ঘট", "নীল" প্রভৃতি পদার্থ শব্দ (নাম) ব্যতীতও মনের দ্বারা চিন্তিত হইতে পারে, কিন্তু "অমুকত্র ঘট আছে" বা "ঘট নাই" এইরূপ সত্য পদার্থ ঐ বাক্য ব্যতীত (সংকেত ব্যতীত)

* বাক্য ও মনকে দৃষ্ট, অনুমিত বা শ্রুত বিষয়ের অনুরূপ করা এবং বঞ্চিত, ভ্রান্ত ও নিরর্থক (প্রতিপত্তিবন্ধ্য) বাক্য প্রয়োগ না করার নাম সত্য-সাধন। আর প্রমিত বিষয়ের যথাবৎ অভিধান—অভিধেয় সত্য। প্রমাণের উৎকর্ষে অভিধেয় সত্যের উৎকর্ষ হয়।

চিন্তিত হয় না। সত্যের অভিধেয় বিষয় কেবল পদার্থ নহে, কিন্তু বাক্যার্থ।

সত্য পদার্থ বাক্যময় চিন্তা বলিয়া সত্য ও বোধ এক নহে। বোধ বাক্য-শূন্যও হইতে পারে, যোগশাস্ত্রে তাহাকে নির্বিতর্ক ধ্যান বলে। কিন্তু বাক্যশূন্য সত্য পদার্থ বুদ্ধ হইতে পারে না। বাক্য-শূন্য বোধ হইলে, তৎকালে তাহা সত্য বা মিথ্যা পদার্থের (পদের অর্থের) দ্বারা অনু-বিদ্ধ হইবার যোগ্য নহে। অর্থাৎ "ইহা সত্য" এরূপ ভাব হইলেই বাক্য আসিবে। সত্য ও বোধ্য এক নহে। সত্য বলিলে বোধ্যের গুণ-বিশেষ বুঝায়। †

সত্য ও সত্তা বা ভাব এক নহে, কারণ সত্তা ও অসত্তা উভয় পদার্থই সত্যের বিষয় হইতে পারে। 'ঘট নাই' এরূপ বাক্যও সত্য হইতে পারে। ‡

২। যথার্থতা দ্বিবিধ, আপেক্ষিক ও কূটস্থ ; অতএব সত্যও দ্বিবিধ, আপেক্ষিক সত্য ও কূটস্থ সত্য।

৩। যাহার অবস্থান্তর হয়, তদ্বিষয়ক সত্যে (সত্যের জ্ঞানে) কোন এক বিশেষ অবস্থার অপেক্ষা থাকে বলিয়া, তাহা আপেক্ষিক সত্য।

† অযথার্থ জ্ঞান (এক বস্তুকে অন্য জ্ঞান) বিষয়ক বাক্যের অর্থ মিথ্যা। চক্ষুর দোষে একজন দুইটা চন্দ্র দেখিল। দেখিয়া বলিল—"চন্দ্র দুইটা"। ইহা মিথ্যা ; কিন্তু সে যদি বলিত—"দুইটা চন্দ্র দেখিতেছি" তবে তাহার বাক্য সত্য হইত। সমস্ত জ্ঞানই গ্রহণ ও গ্রাহ্য সাপেক্ষ, কিন্তু আমরা প্রায়ই গ্রহণ-শক্তিকে লক্ষ্য না করিয়া, গ্রাহ্যের সত্যতা ভাষণ করি। "ঘট আছে" ইহা সত্য হইলে—'আমি গ্রহণ ও গ্রাহ্যের অবস্থা-বিশেষে ঘট আছে জানিয়াছি' এই বাক্যার্থ প্রকৃত পক্ষে সত্য শব্দ বাচ্য। তাহা সংক্ষেপ করিয়া 'ঘট আছে' বলা যায়। একাধিক ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে অধিকাংশ ব্যক্তির দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ হয় ও বিশুদ্ধ অনুমানের দ্বারা যাহা প্রমিত হয়, তাহাই সাধারণতঃ অদুষ্ট প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় ও তদ্বিষয়ক বাক্য সত্য নামে অভিহিত হয়।

‡ "যাহার অভাব কল্পনা করিতে পারি না, তাহা সত্য" এরূপ এক সত্যের লক্ষণ আছে। তাহা ঠিক নহে। যাহার অভাব কল্পনা করিতে পারি না, তাহার নাম ভাব। ভাব ও সত্য এক পদার্থ নহে।

"যাহার অন্যথা কল্পনা করিতে পারি না তাহা সত্য" ইহাও সত্যের সম্যক্ লক্ষণ নহে। যাহার অন্যথা কল্পনা করিতে পারি, তাদৃশ বস্তুকেও সত্য বলিয়া আমরা অহরহ ব্যবহার করি।

বস্তুত 'সত্য' শব্দ বাক্যার্থ-বিশেষ-বাচী, দ্রব্য-বিশেষ-বাচী নহে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সাধারণ মনুষ্যেরা বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য শব্দের দ্বারা চিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু মূক বা পশুরা তাহা না করিতে পারে। তাহারা অন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য এবং কার্য্যের সংস্কার-পূর্ব্বক চিন্তা করিতে পারে। সাধারণ ব্যক্তি যেরূপ বাক্যের দ্বারা সত্য বিষয় জ্ঞাপন করে, মূকেরা হস্তাদি চালন করিয়া সেইরূপ জ্ঞাপন করে। শব্দ যেরূপ অর্থের সংকেত, হস্তাদির কার্য্যও সেইরূপ অর্থের সংকেত হইতে পারে। তাহাদের সংস্কার দ্বারাও চিন্তা হইতে পারে। 'আছে' এই শব্দ এবং হস্ত-চালনা-বিশেষ একই ভাব বুঝায়। অতএব বাক্-কার্য্যের ন্যায় অন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যের দ্বারাও সত্য বুঝা সম্ভব। 'আছে' এই শব্দের দ্বারা আমাদের যে অর্থ বোধ হয়, এড়মূকের হস্ত-চালনার দ্বারা সেই অর্থ বোধ হয়। আমাদের মনে যেরূপ শব্দার্থের সংকেত সকলের সংস্কার আছে, এড়মূকের হস্তাদি চালনাও তাহার সংকেতরূপ অর্থের সংস্কার সকল আছে। অতএব শব্দ ব্যতীত সত্য চিন্তা হয় না,—ইহা সাপবাদ মুখ্য নিয়ম বুঝিতে হইবে।

"চন্দ্র রূপার থালার মত" ইহা এক আপেক্ষিক সত্য। এই সত্য-জ্ঞানের জন্য দ্রষ্টা ও চন্দ্রের ২৪০০০০ মাইল দূরে অবস্থান-রূপ অবস্থার অপেক্ষা আছে। অন্য অবস্থায় (নিকট বা দূর হইতে বা যন্ত্রাদির দ্বারা বা অন্য কোনও অবস্থায়) চন্দ্র দেখিলে, চন্দ্র অন্যরূপ দৃষ্ট হইবে। তাদৃশ বহু চন্দ্র-জ্ঞানের কোনটাও অসত্য নহে। ঠিক যেরূপ অবস্থায় যাহা জ্ঞাত হয়, তাহা তাদৃশ অবস্থায় সেইরূপই জ্ঞাত হইবে। অতএব "চন্দ্র রূপার থালার মত" "চন্দ্র পর্ব্বতময়" "চন্দ্র পরমাণু-সমষ্টি" ইহারা সবই সত্য। ঐরূপ এক এক প্রকার জ্ঞানের জন্য এক এক প্রকার অবস্থার অপেক্ষা থাকে বলিয়া, উহাদের নাম আপেক্ষিক সত্য। আপেক্ষিক সত্যের প্রতিপাদ্য পদার্থ বহুরূপে অর্থাৎ বিকারশীলভাবে প্রতীত হয়।

সাংখ্যীয় সৎকার্য্য-বাদানুসারে অসতের ভাব ও সতের অভাব নাই; আর অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্তই আছে এবং উপযুক্ত অবস্থা ঘটিলে, তাহাদের সর্ব্বকালে উপলব্ধি হয়। সুতরাং সাংখ্যীয় দৃষ্টিতে সমস্ত ভাবপদার্থই আপেক্ষিক সত্যরূপে ব্যবহার্য্য হইতে পারে।

৪। আপেক্ষিকতার নিষেধ অর্থাৎ বিকারের (অবস্থান্তরের) নিষেধ করিয়া যে সত্যের বোধ হয়, তাহা কূটস্থ সত্য। যথাযোগ্য ভাববাচক পদসমূহের দ্বারাও কূটস্থ সত্যের উল্লেখ হয়।

"নির্গুণ আত্মা আছে" "দ্রষ্টা দৃশিমাত্র" ইত্যাদি কূটস্থ সত্যের উদাহরণ।

৫। অসংখ্য বাক্যকে সত্য বলা যাইতে পারে, তজ্জন্য সত্য অসংখ্য।

যদি চ সত্য পদার্থ নহে, কিন্তু বাক্যার্থ-বিশেষ, তথাপি পদার্থ মাত্রকে সত্য বলিলে, বুঝিতে হইবে যে, উহ্য বাক্যবৃত্তি অনুসারে তাহাকে সত্য বলা হইয়াছে। "ঘট একটি সত্য" এরূপ বলিলে "ঘট আছে" এই বাক্য-বৃত্তি উহ্য থাকে।

আপেক্ষিক সত্য।

৬। যাহাকে 'বিষয়ের বা জ্ঞান-শক্তির অবস্থা-বিশেষে সত্য' এইরূপে নিয়ত করিয়া বা ঐ নিয়ম উহ্য করিয়া সত্য বলা হয়, তাহাই আপেক্ষিক সত্য। সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থকে ঐরূপেই সত্য বলা যায়। যেমন 'রূপ আছে' ইহা সত্য। কিন্তু চক্ষুষ্মানের নিকটই উহা সত্য। "চন্দ্র শশধর" ইহা সত্য, কিন্তু তাহা দূরত্ব বিশেষে অবস্থিত চক্ষুর পক্ষেই সত্য। 'মৈত্র সুকুমার' মৈত্রের বাল অবস্থায় তাহা সত্য। অতএব সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থই আপেক্ষিক সত্য।

৭। জ্ঞেয় ভাবের অবস্থা দ্বিবিধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ধারণার যোগ্য অবস্থা ব্যক্ত এবং ধারণার অযোগ্য অবস্থা অব্যক্ত। ক্রিয়া ব্যক্ত অবস্থার এবং শক্তি অব্যক্ত অবস্থার উদাহরণ।

সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থ বিকারশীল অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে বোধগম্য হয়। আর ইন্দ্রিয়ের (জ্ঞান-শক্তির) অবস্থাভেদেও তাহারা ভিন্নরূপে বোধগম্য হয়। অর্থাৎ স্বগত অথবা জ্ঞানশক্তির অবস্থা-ভেদে সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বোধগম্য হয়।

অতএব তাহাদের সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের কোনওটিকে সম্পূর্ণ বা নিরপেক্ষ সত্য বলা যাইতে পারে না। তাহারা (জ্ঞেয় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল) অবস্থা-সাপেক্ষ বা আপেক্ষিক সত্য রূপেই ব্যবহার্য্য।

৮। আপেক্ষিক সত্যের ব্যাপকতার তারতম্য আছে। অধিকতর ব্যাপী অবস্থা-সাপেক্ষ যে সত্য, তাহাই অধিকতর ব্যাপী সত্য।

উদাহরণ যথা—পৃথিবীতে কে বাস করিয়া থাকে?

উঃ। চৈত্র মৈত্র আদিরা। ইহা সত্য বটে, কিন্তু "মনুষ্য, গো, অশ্বাদিরা পৃথিবীতে বাস করিয়া থাকে" ইহা অধিকতর ব্যাপী

সত্য। আর "প্রাণীরা পৃথিবীতে বাস করিয়া থাকে" ইহা আরও ব্যাপী সত্য।

প্রথম উদাহরণ কেবল বর্ত্তমান-ব্যক্তি-সমবেত। দ্বিতীয়টী বর্ত্তমান-জাতি-(সুতরাং সর্ব্বব্যক্তি) সমবেত। তৃতীয় ভূত, বর্ত্তমান ও ভাবী সমস্ত জাতি-(সুতরাং নিঃশেষ-ব্যক্তি) সমবেত।

বস্তু বিষয়ক * ব্যাপকতম সত্য সকলের দ্বারা, জ্ঞেয় পদার্থ বুঝার নাম তত্ত্বত বা তাত্ত্বিক সত্যানুসারে বুঝা। তাহাই বোধের উৎকর্ষ।

কূটস্থ সত্য।

৯। কূটস্থ সত্যের বিষয় (বিশেষ্য) অবস্থা-ভেদ-শূন্য বা অবিকারী। অতএব সমস্ত বিকারবাচক বিশেষণের নিষেধ করিয়া কূটস্থ সত্য উক্ত হয়।

আর কূটস্থ সত্যের বিষয় সাক্ষাৎ করিতে হইলে, বিকারশীল জ্ঞানশক্তিকে নিরোধ করিতে হয়।

কূটস্থ সত্যের বিষয় কেবল নির্গুণ দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা পুরুষ। সুতরাং পুরুষ বিষয়ক সত্য সকল কূটস্থ সত্য। পুরুষ বহু হইলেও সমস্তই সর্ব্বতস্তুল্য। সুতরাং একই কূটস্থ-সত্য-লক্ষণ সর্ব্বপুরুষব্যাপী।

স্মরণ রাখা উচিত যে, শুদ্ধ 'পুরুষ পদার্থ' কূটস্থ সত্য নহে, কিন্তু 'পুরুষ আছেন' ইত্যাদি রূপ বাক্যার্থই কূটস্থ সত্য। পুরুষের অস্তিত্ব শুদ্ধত্বাদি প্রজ্ঞার বিষয়, সুতরাং সত্য; কিন্তু 'স্বরূপ পুরুষ' প্রজ্ঞার বিষয় নহেন। তিনি প্রজ্ঞাতা, বিষয়ী। পুরুষ প্রমেয় নহেন, কিন্তু 'শুদ্ধ নিত্য পুরুষ আছেন' ইহা প্রমেয়। প্রমাণের নিরোধের দ্বারা পুরুষে স্থিতি হয়। 'পুরুষস্থিতি' এই পদার্থমাত্র, সত্য নামক বিশেষণের বিশেষ্য নহে। তদ্বিষয়ক বক্তব্য বিষয়ই সত্য হইতে পারে।

সত্যের অবধারণ।

১০। প্রমাণের দ্বারা (প্রত্যক্ষাদির দ্বারা) প্রমিত বিষয়ই সত্য বলিয়া অবধারিত হয়।

সমাধি-নির্ম্মল প্রমাণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তজ্জন্য যোগজ প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা বা সত্যম্ভরা।

১১। গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ ও অভিনিবেশ † এই পঞ্চ প্রকার মানস ক্রিয়া দ্বারা প্রমাণ সিদ্ধ হয় ও তৎপূর্ব্বক সত্য অবধারিত হয়। সত্যাবধারণ পূর্ব্বক ইষ্টানিষ্ট কর্ত্তব্যাবধারণ হয়।

১২। বহুর মধ্যে যাহা সাধারণ ভাব, তদ্বিষয়ক সত্যের নাম তাত্ত্বিক সত্য বা তত্ত্ব। তত্ত্ব জাতি বা সামান্য মাত্র নহে, কারণ জাতি বৈকল্পিক পদার্থও হয়, কিন্তু সামান্য উপাদান-স্বরূপ ভাব-পদার্থই তত্ত্ব।

তাত্ত্বিক সত্য অতাত্ত্বিক অপেক্ষা অধিক-

---

* বৈশেষিকদের সামান্য বা জাতি এবং সাংখ্যের তত্ত্ব এক নহে। কারণ 'জাতি' অবস্তু বিষয়ক হইতে পারে। সাংখ্যের 'তত্ত্ব' সাক্ষাৎকার-যোগ্য ভাব পদার্থ।

† গ্রহণ—আগন্তুক জ্ঞান। ধারণ—সংস্কার বা অনুভূত বিষয়কে ধরিয়া রাখা। উহ—ধৃত বিষয়কে স্মরণ বা মনে উঠান। অপোহ—উত্থাপিত বিষয়ের মধ্যে অপ্রয়োজনীয়গুলিকে বাদ দেওয়া। এইরূপ মানস-প্রক্রিয়ার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞান-পূর্ব্বক পদার্থ-স্বরূপে অভিনিবেশ ও তৎপরে কর্ত্তব্যাদি নিশ্চয় হয়।

গ্রহণ—reception, ধারণ—retention, উহন—recollection, অপোহন—abstraction. তত্ত্বজ্ঞানকে conception of universals বলা যাইতে পারে, কিন্তু তদতীত ভাবকেও উহা বুঝাইতেছে। অভিনিবেশকে conceptuality or conceptive state বলা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণে ইহারা যুগপত্তের ন্যায় ঘটে; অনুমানে কচিৎ তদ্রূপ নাও ঘটে।

তর ব্যাপী অর্থাৎ দীর্ঘতর কাল ও বৃহত্তর দেশ ব্যাপিয়া স্থিতিশীল।'

"অমুক অমুক বর্ণ আছে" ইহা অতাত্ত্বিক সত্য "রূপধর্ম্মক তেজভূত আছে" ইহা তত্তুলনায় তাত্ত্বিক সত্য।

১৩। আপেক্ষিক ও কূটস্থ তত্ত্ব বা তাত্ত্বিক সত্য সকল আর্থিক বা পারমার্থিক হইতে পারে।

লৌকিক অর্থবিষয়ক সত্য আর্থিক আর ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরমার্থ-বিষয়ক সত্য পারমার্থিক।

১৪। অতঃপর অবধারিত সত্য সকল উদাহৃত হইতেছে।

আপেক্ষিক। আর্থিক।*

(ক) পদার্থ বিষয়ক—ঘট পটাদি আছে (অতাত্ত্বিক) অম্লজানাদি ঘটাদির উপাদান (তাত্ত্বিক)। শক্তি আছে ইহা তাত্ত্বিক অব্যক্ত সত্য।

(খ) নিয়ম বিষয়ক—অগ্নি দহন করে, জলে পিপাসা বারণ হয়, (অতাত্ত্বিক) শব্দাদিরা স্পন্দন হইতে হয় (তাত্ত্বিক)। শক্তি হইতে ক্রিয়া হয় (অব্যক্ত)।

আর্থিকের মধ্যে এই কয়টী সার সত্য :—

ঘট পটাদি ও তাহাদের অমুক অমুক উপাদান (অম্লজানাদি) আছে।

তাহারা সুখ ও দুঃখ প্রদান করে।

তন্মধ্যে দুঃখপ্রদ বিষয় হেয় ও দুঃখ প্রতিকার্য্য এবং সুখপ্রদ উপাদেয় ও সুখ সাধনীয়। †

এই কয়টি মূল আর্থিক সত্য অবধারণপূর্ব্বক মানবগণ অর্থ সাধনে ব্যাপৃত।

আপেক্ষিক। পরমার্থিক।

পদার্থ বিষয়ক। ব্যক্ত :—

(ক) অতাত্ত্বিক—ঘট, পট, রাগ দ্বেষ ইত্যাদি আছে।

(খ) তাত্ত্বিক :—

(১) ঘট, পট, অম্লজান, উদ্‌জান আদি অসংখ্য বাহ্য দ্রব্যের (ভৌতিকের) মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চভাব সাধারণ। অতএব তাহাদের উপাদান শব্দ-লক্ষণ দ্রব্য (আকাশ), স্পর্শ-লক্ষণ দ্রব্য (বায়ু), রূপ-লক্ষণ দ্রব্য (তেজঃ), রস-লক্ষণ দ্রব্য (অপ্), ও গন্ধ-লক্ষণ দ্রব্য (ক্ষিতি) ইহারা ভূত তত্ত্ব।

ভূত-তত্ত্ব বিষয়ক সত্য পারমার্থিকের প্রথম সত্য।

(২) শব্দ স্পর্শাদি গুণের যাহা অতি সূক্ষ্ম অবস্থা, যাহাতে উপনীত হইলে শব্দাদির নানাত্ব অপগত হইয়া কেবল শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র, রূপমাত্র, রসমাত্র ও গন্ধমাত্র জ্ঞান গম্য হয় বা হইবে, তাহার নাম তন্মাত্র। তন্মাত্র বিষয়ক সত্য দ্বিতীয় তাত্ত্বিক সত্য। ‡

---

* আর্থিকের মধ্যে কূটস্থ সত্য নাই।

† দুঃখ হেয়, কিন্তু দুঃখের সাধন সব সময় হেয় হয় না এবং সুখ উপাদেয় হইলেও সুখের সাধন সব সময় উপাদেয় হয় না বলিয়া এবং বিপর্য্যয় বশত অর্থলিপ্সু মানবের অশেষবিধ দুঃখ হয়।

‡ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, শব্দাদি-জ্ঞানে প্রতি সেকেণ্ডে বহুবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্পন্দিত হয়। প্রত্যেক স্পন্দন আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু প্রত্যেক স্পন্দনই এক এক মানস-ক্রিয়ার উৎপাদন করে। অর্থাৎ তাহারা শব্দাদি জ্ঞানের অণু অংশ। তাদৃশ অণু জ্ঞানাংশের নাম তন্মাত্র। যোগোক্ত কৌশলে তাহা সাক্ষাৎকৃত হয়। তখন রূপাদি জ্ঞান কেবল কালব্যাপী বা ধারাস্বরূপ বোধ হয়। সাধারণত শব্দ জ্ঞান অনেকটা ঐরূপ বোধ হয়। জ্ঞানের ঐ অণু অংশ যে কালে বোধ হয়, তাহার নাম ক্ষণ। যোগভাষ্যকার বলেন, পরমাণুর অবস্থান্তর বিবেকের কালক্ষণ। সুতরাং ক্ষণাবচ্ছিন্ন জ্ঞানই (শব্দাদির) পরমাণু। অবয়ব ভেদ-জ্ঞানের

যতদিন চক্ষুরাদি থাকিবে, ততদিন এই (ভূত ও তন্মাত্র) বাহ্য সত্যদ্বয় অবধারিত হইবে। চক্ষুরাদির থাকারূপ ব্যাপী অবস্থা সাপেক্ষ বলিয়া, এই তত্ত্ব দ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী বা ব্যাপক বাহ্য সত্য। অপর সমস্ত বাহ্য সত্য এতদপেক্ষা সংকীর্ণ অচিরস্থায়ী অবস্থা সাপেক্ষ, সুতরাং ইহারা প্রতীয়মান গ্রাহ্যবিষয়ক চরম সত্য।

(৩) যে সকল শক্তি দ্বারা বাহ্য পদার্থ ব্যবহার করা যায়, তাহাদের নাম বাহ্য করণ শক্তি। তাহারা ত্রিবিধ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও প্রাণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয় জানা যায়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা চালন করা যায় ও প্রাণের দ্বারা ধারণ করা যায়। ইহা গ্রহণ-বিষয়ক প্রথম সত্য।

(৪) জ্ঞান ইচ্ছা আদি গুণযুক্ত পদার্থের নাম অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ গ্রহণ বিষয়ক দ্বিতীয় সত্য। *

শব্দ স্পর্শাদি জ্ঞানের বাহ্য হেতু যাহাই হউক্, বস্তুত তাহারা অন্তঃকরণের এক প্রকার ভাব বা বিকার স্বরূপ। ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা অন্তঃকরণ শব্দাদি গ্রহণ করে, অতএব ইন্দ্রিয়ও অন্তঃকরণের দ্বার বা বহিরঙ্গ স্বরূপ। সুতরাং বিষয় ও ইন্দ্রিয় বস্তুত অন্তঃকরণেরই বিকার অর্থাৎ অন্তঃকরণই তাহাদের উপাদান।

বিষয় ও ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণের অন্তর্গত বলিয়া, অন্তঃকরণ তত্ত্ব তত্তদপেক্ষা ব্যাপকতর সত্য।

(৫) অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল মূলত ত্রিবিধ। জ্ঞানবৃত্তি, চেষ্টাবৃত্তি ও ধারণবৃত্তি। ইহার বহির্ভূত কোন বৃত্তি হইতে পারে না।

জ্ঞানবৃত্তি সকলে প্রকাশ অধিক; ক্রিয়া (পরিণামরূপ) এবং স্থিতি (অস্ফুটতা) অপেক্ষাকৃত অল্প পাওয়া যায়। চেষ্টাবৃত্তিতে ক্রিয়া অধিক এবং প্রকাশ (চেষ্টার অনুভবরূপ) ও নিয়মরূপ স্থিতি অপেক্ষাকৃত অল্প। ধারণবৃত্তিতে স্থিতি গুণ প্রধান; এবং প্রকাশ (সংস্কারের বোধ) ও অস্ফুট ক্রিয়া (অপরিদৃষ্ট পরিণাম) অল্পতর।

অতএব সর্ব্বজাতীয় বৃত্তিতে এক প্রকাশশীল পদার্থ, এক ক্রিয়াশীল পদার্থ ও এক স্থিতিশীল পদার্থ এই তিন পদার্থ পাওয়া যায়।

প্রকাশশীল পদার্থের নাম সত্ত্ব, ক্রিয়াশীলের নাম রজঃ ও স্থিতিশীলের নাম তম।

অতএব সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন পদার্থ (ত্রিগুণ) অন্তঃকরণের (সুতরাং গ্রাহ্য ও গ্রহণের) মূলতত্ত্ব।

ত্রিগুণ-তত্ত্বই গ্রাহ্য ও গ্রহণ বিষয়ক চরম সত্য। †

জন্য একাধিক ক্ষণের আবশ্যক বলিয়া, পরমাণুর অবয়ব বিবেক্তব্য নহে, শব্দাদি পরমাণু গ্রহণ ও গ্রাহ্যের সন্ধিস্থল।

* বস্তুত ধারণ-প্রধান মন, ক্রিয়াপ্রধান অহংকার এবং প্রখ্যা-প্রধান বুদ্ধি, এই তিন তত্ত্বের সাধারণ নাম অন্তঃকরণ। জ্ঞানাদি সমস্ত বৃত্তিই, স্থিতি-প্রধান অবস্থা বা শক্তিস্বরূপ মন হইতে ক্রিয়াপ্রধান অহংকারের দ্বারা প্রকাশ-প্রধান বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। বাহ্যেন্দ্রিয়ের তত্ত্বও ত্রিবিধ যথা,—জ্ঞানেন্দ্রিয়তত্ত্ব কর্ম্মেন্দ্রিয়তত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্ব।

† বাহ্য ও আন্তর জগতে ইহা অপেক্ষা অধিক জানিবার কিছু নাই এবং জানিবার উপায়ও নাই। পরমর্ষি কপিলের দৃষ্ট এই সত্য পূর্ণেন্দু যেরূপ গ্রহাদিকে নিষ্প্রভ করিয়া বিরাজিত হয়, সেইরূপ মানবের জ্ঞান-গগনস্থিত অন্যান্য তত্ত্বকে নিষ্প্রভ করিয়া বিরাজিত আছে। ত্রিগুণ পাশ্চাত্যদের noumenon মাত্র নহে, কারণ তাহারা স্পষ্টরূপে বোধ্য; আর phenomenon মাত্রও নহে, কারণ তাহারা সমস্ত phenomena তে অন্বিত ও তাহারা বিশ্লিষ্ট ভাব। তাহারা substance or unknowable substratum নহে। সুতরাং

ভূত, ইন্দ্রিয়, মন আদি থাকিলে ত্রিগুণ-তত্ত্বও থাকিবে। সর্ব্ব জ্ঞেয় পদার্থের সামান্য বা মূল অবস্থা বলিয়া ত্রিগুণের জ্ঞান ব্যাপকতম অবস্থাসাপেক্ষ। সুতরাং ত্রিগুণের অপলাপ কল্পনীয় নহে। তজ্জন্য ত্রিগুণ নিত্য সত্য।

ত্রিগুণের দ্বিবিধ অবস্থা ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অন্তঃকরণাদি ধারণাযোগ্য অবস্থা ব্যক্ত। সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ বিকারশীল। বিকার অর্থে এক ভাবের লয় ও অন্যভাবের উৎপত্তি।

যাহার কারণ ব্যক্ত তাহার লয় কতক ধারণাযোগ্য হয়। কিন্তু অন্তঃকরণ আমাদের ধারণাযোগ্য ব্যক্তির চরম সীমা সুতরাং বিকারশীল অন্তঃকরণ লয় হইলে ‡ তদবচ্ছিন্ন ত্রিগুণের অবস্থা সম্পূর্ণ ধারণার অযোগ্যতা বা অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়।

উপরোক্ত সত্য সকল পারমার্থিক পদার্থ বিষয়ক। পারমার্থিক নিয়ম-বিষয়ক সত্যের মধ্যে এই গুলি প্রধান ও তাত্ত্বিক :—

(১) অনাগত দুঃখ হেয়, সমস্ত জ্ঞেয়ই অনাগত দুঃখকর।

(২) অবিদ্যা দুঃখের মূল হেতু।

(৩) অবিদ্যার অভাবে দুঃখের অভাব হয়।

(৪) বিবেকখ্যাতিরূপ বিদ্যা অবিদ্যার অভাবকরণের উপায়।

পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা Phenomenalism, Nominalism প্রভৃতি যত প্রকার ism লইয়া মাথা ঠুকাঠুকি করেন, উহারা তাহার অন্তর্গত নহে। উহা জ্ঞেয় পদার্থ-মাত্রের চরম মৌলিক বিশ্লেষ। যে যাহা বলুক সমস্ত উহার অন্তর্ভূত।

‡ বৃত্তিস্বরূপ অন্তঃকরণের লয় ও উদয় প্রতিক্ষণেই হইতেছে, কিন্তু অলাতচক্রের ন্যায় ব্যক্তাবস্থাই অভঙ্গরূপে প্রতীত হয়। সমাধি বলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিলে, অব্যক্তাবস্থায় স্ফুট উপলব্ধি হয়।

কূটস্থ সত্য।

কূটস্থ সত্য কেবল পারমার্থিক। পরমার্থ (দুঃখের সম্যক্ নিবৃত্তি) সিদ্ধ হইলে কূটস্থের উপলব্ধি হয়।

কূটস্থ পদার্থ আছে, কিন্তু কূটস্থ নিয়ম নাই। কারণ সমস্ত নিয়মই সাপবাদ। নিরপবাদ নিয়ম বক্তব্য (বাক্যের বিষয়) নহে।

কূটস্থ পদার্থ বিষয়ক এই সত্যগুলি প্রধান :—

(১) জ্ঞেয় বা দৃশ্যের অতীত জ্ঞাতৃ-পুরুষ আছেন।

(২) তিনি সর্ব্ব চিন্তার সদাই দ্রষ্টা বলিয়া একরূপ বা কূটস্থ।

(৩) তাহার কোনও উপাদান ও নিমিত্তকারণ প্রমেয় নহে বলিয়া তাহার উৎপত্তি ও লয় কল্পনীয় নহে।

(৪) তাহার একত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাহার সংখ্যার অবধি প্রমিত হয়না বলিয়া, তাহারা অসংখ্য সত্য। *

শ্রীহরিহরানন্দ আরণ্য।

* ত্রিগুণের ন্যায় কূটস্থ সত্য চিৎ পাশ্চাত্যদের phenomenon or noumenon নহে। Phenomena বিকারী noumena অপ্রকাশিত-স্বরূপ। পুরুষ সেরূপ নহে। Noumenon ও phenomenon উভয় পদার্থই দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা। দৃশ্য বিশ্লেষ করিয়া যেরূপ ত্রিগুণে উপনীত হওয়া যায়, দ্রষ্টৃভাবকে বিশ্লেষ করিয়া সেইরূপ মূল জ্ঞ পদার্থে উপনীত হওয়া যায়।

১৫শ বর্ষ। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। ৭ম ও ৮ম সংখ্যা।

১৮৩০, ১৩১৫।

গ্রাহক মহাশয়গণ!

বর্ত্তমান বর্ষের দেয় মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

হিন্দু-পত্রিকা।

(ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

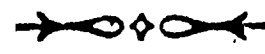
শকাব্দা ১৮৩০।

পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য অবশ্য স্বীয় স্বীয় গ্রাহক-নম্বর দিবেন।

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৫শ বর্ষ, ১৫শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। কার্ত্তিক। ১৩১৫ সাল, ১৮৩০ শকাব্দা।

প্রাচীন-ভারতে বিচার।

যখন প্রাচীন-ভারতে হিন্দুজাতি শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, তখন রাজদ্বারে পরপীড়িত প্রজার প্রার্থনা কিরূপে শ্রুত ও বিচারিত হইত, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য।

ব্যবহারের হেতু ও বিষয় সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় লিখিত আছে—

"স্মৃত্যাচার-ব্যপেতেন মার্গেণা-
ধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহার-পদং
হি তৎ।"

কোনও ব্যক্তি স্মৃতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও সদাচার-বিগর্হিত ভাবে অপরের দ্বারা নিপীড়িত হইয়া, যদি তৎপ্রতীকারার্থে রাজ-সমীপে আবেদন করে, তবে তাহা ব্যবহারের বিষয় হয়।

স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

"বাক্-পাণি-পাদ-চাপল্যং বর্জ্জয়েৎ"

বাক্, হস্ত ও চরণের চপলতা পরিত্যাগ করিবে। বাগিন্দ্রিয়ের চপলতা—পরুষ ও মিথ্যা-বাক্য-কথন, হস্তের চপলতা—প্রহারাদি দ্বারা পরপীড়া উৎপাদন, পাদচপলতা—পাদাঘাত পাদ-প্রদর্শন প্রভৃতি। যদি কেহ কাহাকেও কুবচন বলে, প্রহার বা পদাঘাত করে, তবে সে স্মৃতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধভাবে অন্যের ধর্ষণা করিল। এস্থানে যদি ধর্ষিত ব্যক্তি রাজদ্বারে অপকথন, প্রহার ও পদাঘাতের প্রতীকার প্রার্থনায় আবেদন করে, তবে তাহা বিচার্য্য বিষয় হইবে। এইরূপ সামাজিক আচার-বিরুদ্ধ ভাবে কাহারও প্রতি অত্যাচার করিলে, তাহাও বিচারের বিষয় হয়।

ব্যবহার চতুষ্পাদ। ব্যবহারের প্রথম পাদ বা অংশ—ভাষা, প্রতিজ্ঞা বা আবেদন। দ্বিতীয় পাদ উত্তর (জবাব।) তৃতীয় পাদ ক্রিয়া—সাক্ষী-পরীক্ষাদি। চতুর্থ পাদ সাধ্য-সিদ্ধি বা জয়পরাজয়।

অভিযোগ প্রথমতঃ দুই প্রকার; এক শঙ্কাভিযোগ, অপর তত্ত্বাভিযোগ। নারদ-সংহিতায় লিখিত আছে—

"অভিযোগস্তু বিজ্ঞেয়ঃ শঙ্কাতত্ত্বা-
ভিযোগতঃ।
শঙ্কাঽসতাং তু সংসর্গাৎ তত্ত্বং
হোঢ়াভিদর্শনাৎ।

অপরাধের যথার্থতা অবধারণ করিয়া, এবং অপরাধের আশঙ্কা করিয়া, এই দুই স্থলে অভিযোগ হয়। এক ব্যক্তিকে প্রসিদ্ধ তস্করগণের সংসর্গে বহু সময় বাস করিতে দেখিয়া, তাহাকেও তস্কর মনে করিয়া,তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, তাহা শঙ্কাভিযোগ। আর এক জনের ঘরে অনুসন্ধান করিয়া হোঢ়া (বামাল) অর্থাৎ অপহৃতদ্রব্য পাইয়া, তৎ-প্রমাণ-বলে তাহাকে চোর মনে করিয়া, তাহার নামে যে অভিযোগ উপস্থিত করা যায়, তাহাই তত্ত্বাভিযোগ। তত্ত্বাভিযোগ দ্বিবিধ, বিধিরূপ ও নিষেধাত্মক। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

"ন্যায্যং স্বং নেচ্ছতে কর্ত্তুং অন্যায্যং
বা করোতি যঃ।

নিজের কর্ত্তব্য করিতে ইচ্ছা করে না, এবং অন্যায্য কর্ম্ম সম্পাদন করে,—এই দ্বিবিধ তত্ত্বাভিযোগের অবস্থা। কর্ত্তব্য কার্য্যের অকরণ অভাবরূপ সুতরাং প্রতিষেধাত্মক, অকর্ত্তব্যের সম্পাদন ভাবরূপ সুতরাং বিধ্যা-ত্মক। যে অন্যায় করে, তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা দরকার, আর যে ন্যায্য কর্ম্ম করে না, তাহাদ্বারা সেই কার্য্য করান প্রয়োজন। ইহাই সাধারণতঃ ব্যব-হারের ফল। নিপীড়িত একতর পক্ষের আবেদন অনুসারে ব্যবহার প্রবৃত্ত হয়,—ইহা সাধারণনিয়ম। বহুস্থলে ইহার ব্যতিক্রম হইবে। এমন অনেক অপরাধ আছে, যাহা স্বয়ং রাজা বা রাজপুরুষগণ অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিবেন। ইহাকে "নৃপাশ্রয়-ব্যবহার" বলে। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

ব্যবহার-শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—

"কালে কার্য্যার্থিনং পৃচ্ছেৎ প্রণতং
পুরতঃ স্থিতং।
কিং কার্য্যং কা চ তে পীড়া
মাভৈষীঃ ব্রূহি মানব!
কেন কস্মিন্ কদা কস্মাৎ পৃচ্ছে-
দেবং সভাগতং।
এবং পৃষ্টঃ স যৎ ব্রুয়াৎ সসভ্যৈ-
র্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
বিমৃশ্য কার্য্যং ন্যায্যং চেৎ আহ্বা-
নার্থমতঃ পরং।
মুদ্রাং বা নিঃক্ষিপেৎ তস্মিন্ পুরুষং
বা সমাদিশেৎ।"

বিচারক বিচারার্থে অবধারিত সময়ে, প্রণত পুরঃস্থিত বিচারার্থীকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—"হে মানব! ভীত হইওনা, বল তোমার

এখানে কি কার্য্য আছে? তোমার কি পীড়া উপস্থিত হইয়াছে? কাহার দ্বারা কোন স্থানে কোন সময়ে কিজন্য তুমি নিপীড়িত হইয়াছ?" সভাগত বিচারার্থী মানব এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া যে উত্তর প্রদান করিবে, তদনুসারে কার্য্য হইবে। রাজা, সভ্য ও ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক যদি কার্য্য 'ন্যায়' বলিয়া মনে করেন, তবে অত্যাচারী ব্যক্তির আহ্বানের জন্য আবেদনের গুরুত্ব অনুসারে 'মুদ্রা' বা 'পুরুষ' প্রেরণ করিবেন। মুদ্রা ধাতু-দ্রব্যের বা প্রস্তরের উপরে রাজমুদ্রাঙ্কিত আহ্বান-পত্র। তাহাতে আসামীকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। আর 'পুরুষ' অর্থাৎ পদাতিক যাইয়া আসামীকে ধরিয়া আনিবে। মুদ্রা ও পুরুষ বর্ত্তমানকালের 'শমন' ও 'ওয়ারেণ্টে'র মত। শমন-দ্বারা আসিতে আহ্বান করা হয়, মুদ্রাদ্বারাও তাই। পুরুষ অপরাধীকে ধৃত করে, ওয়ারেণ্টেরও তাহাই ফল। আবেদন বা এজাহার করিবার পরে, মোকর্দ্দমা চলিতে পারে কি না—এই বিষয়ে সভ্যগণের সহিত রাজার পরামর্শ ও তদনুসারে মোকর্দ্দমা গ্রহণ বা পরিত্যাগ প্রাচীন প্রথা। বর্ত্তমান কালেও উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে, কোনও মোকর্দ্দমা গ্রহণের যোগ্য কি না, এ বিষয়ে বিচার পূর্ব্বক মোকর্দ্দমা গৃহীত হয়। মনে করা উচিত, আমরা যে রাজসভার বিচারের কথা বলিতেছি, তাহাও উচ্চতম আদালতের কথা। রাজসভা তাৎকালিক উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণ। প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিতা সভা, অপ্রতিষ্ঠিতা সভা, মুদ্রিতা সভা, শ্রেণীসভা, কুলসভা, গণসভা প্রভৃতি বহু অধস্তন বিচারালয় ছিল। ইহার কোনটীও গ্রামে, কোনওটী নগরে, কোনওটী কেন্দ্রে, কোনওটী প্রয়োজন মত সর্ব্বত্র স্থাপিত হইত। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

আসামিগণকে আনয়ন করা সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আছে। ব্যবহারশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

"অকল্প-বাল-স্থবির-বিষমস্থ-ক্রিয়াকুলান্।
কার্য্যাতিপাতি-ব্যসনি-নৃপকার্য্যোৎসবাকুলান্।
মত্তোন্মত্ত-প্রমত্তার্ত্তান্ ভৃত্যান্ নাহ্বানয়েৎ নৃপঃ।
ন হীনপক্ষাং যুবতীং কুলে জাতাং প্রসূতিকাং।

অকল্প অর্থাৎ আসিতে অসমর্থ, বাল শিশু, স্থবির বৃদ্ধ, বিষমস্থ শঙ্কটপতিত, ক্রিয়াকুল যে পরকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অবকাশশূন্য, কার্য্যাতিপাতী—যে তখন আসিলে তাহার কার্য্য বিনষ্ট হয় পরে আসিলে কার্য্য রক্ষা হয় সে, ব্যসনী ব্যসনশীল, নৃপকার্য্যাকুল রাজকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত, গ্রহাবেশাদিদ্বারা মত্ত, উন্মাদরোগ-গ্রস্ত, প্রমত্ত—মদ্যপানাদিদ্বারা অব্যবস্থিত চিত্ত, আর্ত্ত রোগাদিকাতর, এবং ভৃত্যবর্গ—ইহাদিগকে রাজা আহ্বান করিবেন না। তাৎপর্য্য—ইহারা স্বয়ং না আসিয়া, প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিতি জানাইতে পারে। সৎকুলসম্ভূতা হীনাবস্থা যুবতী রমণী ও প্রসূতি-নারীকে রাজা আহ্বান করিবেন না।

স্বল্প অভিযোগে এই প্রথা। গুরুতর অভিযোগে দেশ, কাল বিবেচনা করিয়া, রাজা

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণকেও যানাদি দ্বারা আনয়ন করিবেন।

"কালং দেশঞ্চ বিজ্ঞায় কার্য্যাণাঞ্চ বলাবলে।
অকল্পাদীন্ অপি শনৈঃ যানৈরাহ্বানয়েৎ নৃপঃ।

যেখানে দেখা যায়, কাল অতিক্রম করিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, অথবা যেখানে বিলম্ব করা সঙ্গত হয় না—মনে করা যায়, কিম্বা যেখানে অপরাধ এত গুরুতর যে, তাদৃশ অপরাধীকে আনয়ন করিতে সময়াতিপাত করা অসঙ্গত, সেখানে অসমর্থ, রোগী, উন্মত্ত, যুবতী নারী প্রভৃতি সকলকেই রাজা যান দ্বারা (চতুর্দ্দোলাদি দ্বারা) আহ্বান করিবেন অর্থাৎ আনাইবেন। অবস্থানুসারে বনচর সন্নাসীগণকে পর্য্যন্ত হাজির করিতে হইবে।

"জ্ঞাত্বাভিযোগং যেঽপি স্যুর্বনে প্রব্রজিতাদয়ঃ।
তানপ্যাহ্বানয়েৎ রাজা গুরুকার্য্যেষু অকোপয়ন্।"

অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, বনচর সন্নাসীদিগকেও রাজা আনয়ন করিবেন। কিন্তু যাহাতে সন্ন্যাসীগণ কোপযুক্ত না হন, সেদিকে লক্ষ্য করিবেন।

প্রয়োজনানুসারে অবস্থা-বিশেষে 'আসেধ' অর্থাৎ হাজতের বিধানও প্রচলিত ছিল। নারদ-সংহিতায় দেখা যায়—

"বক্তব্যেঽর্থে হ্যতিষ্ঠন্তং উৎক্রামন্তং চ তদ্বচঃ।
আসেধয়েদ্বিবাদার্থী যাবদাহ্বানদর্শনম্।"

যে আসামী বক্তব্য বিষয় অনুসরণ করে না, এবং যে বাক্য অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে, (তাৎপর্য্যাধীন যাহার তদ্রূপ করার সম্ভাবনা আছে) তাহাকে বিচারকাল পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। এই আসেধ কার্য্য-বিশেষে নানা জাতীয় ছিল। নারদ-সংহিতায় আছে—

"স্থানাসেধঃ কালকৃতঃ প্রবাসাৎ কর্ম্মণস্তথা।
চতুর্ব্বিধঃ স্যাদাসেধঃ নাসিদ্ধন্তং বিলঙ্ঘয়েৎ।"

কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান অর্থাৎ বন্দি-গৃহাদিতে রাখিয়া দেওয়া স্থানাসেধ। অবধারিত কাল পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তিকে প্রতিদিন অর্থাৎ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে বাধ্য করা—কালকৃত আসেধ। প্রবাসাসেধ—অপরাধী, বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবাসে দূরদেশাদিতে গমন করিতে পারিবেনা, বাটীতে রাজরথীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে পারিবে—এইরূপ ব্যবস্থা করা। কর্ম্মাসেধ দুই জাতীয় ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার এই যে, বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপরাধীকে কতকগুলি কার্য্য করিতে নিষেধ করা হইত, সেই সমস্ত কর্ম্ম হইতে অপরাধী স্বতন্ত্র থাকিত। যেমন ভূমি-বিবাদে একজন কর্ষক ভূমিতে চাষ দিতেছে, অপরে আপত্তি করিয়া রাজদ্বারে গমন করিয়াছে। সে স্থানে নিষ্পত্তি

পর্য্যন্ত রাজাজ্ঞায় 'চাষ' বন্ধ থাকিবে, ইহা কর্ম্মাসেধ। অপর একরূপ কর্ম্মাসেধ শঙ্কাভিযোগে ব্যবহৃত হয়। কোনও ব্যক্তির দোষ সুন্দররূপে প্রমাণিত হইল না, কিন্তু সে ব্যক্তির দ্বারা তাদৃশ দোষ ঘটনার সম্ভাবনা যথেষ্ট,—এরূপ স্থলে তাহার জন্য কর্ম্মাসেধের ব্যবস্থা হইতে পারে। যেমন সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত এইরূপ কার্য্য করিয়াছে প্রকাশ পাইলে, সন্দিগ্ধ অপরাধীর প্রতি অধিকতর দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে, এরূপ নির্দ্দেশ করা কর্ম্মাসেধ। ইহা বিচারের পরবর্ত্তী। কেহ কেহ কালকৃত আসেধকেও বিচারের পরবর্ত্তী বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কালকৃত আসেধ, নিয়মিত কালের জন্য কারাগৃহে অবরুদ্ধ করা—এক প্রকার দণ্ড। অকল্প, বালক প্রভৃতির প্রতি আসেধ-ব্যবস্থা নাই। তাহাদের প্রতিনিধিই বিচার শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন। কেবল দণ্ড ভোগের সময় নিজেদের করিতে হইত। কোনও কোনও সময় তাহাও নাকি প্রতিনিধি দ্বারা চলিত! এরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়! কিন্তু ব্যবহার-গ্রন্থে তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হই না।

প্রতিবাদী বা অভিযুক্তের উপস্থিতির পর বিচার-কার্য্যের আরম্ভ হইবে।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় আছে—

"প্রত্যর্থিনোঽগ্রতোলেখ্যং যথাবেদিত মর্থিনা।
সমা-মাস-তদর্দ্ধাহর্নামজাত্যাদিচিহ্নিতম্।"১

প্রতিপক্ষের সম্মুখে পূর্ব্ববাদী যেরূপ আবেদন করিয়াছিল, তাহা যথাবৎ লিখিতে হইবে। তাহাতে সম্বৎসর, মাস, দিন, বেলা, নাম, জাতি প্রভৃতি লিখিত থাকিবে। ইহারই নাম পূর্ব্বপক্ষ, ভাষা বা প্রতিজ্ঞা। বর্ত্তমান কালে ইহার নাম আরজী। এই আবেদন প্রথমে ভূমিতে বা কাষ্ঠ ফলকে বা প্রস্তর-পৃষ্ঠে পাণ্ডু লেখা দ্বারা লিখিতে হইবে। পরিশেষে সংশোধন করিয়া, পত্রে (কাগজে) উঠাইতে হইবে। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রাড়্বিবাকোঽভিলেখয়েৎ।
পাণ্ডুলেখ্যেন ফলকে পশ্চাৎ পত্রে বিশোধিতং।"

আরজী সংশোধন কতদিন পর্য্যন্ত করা যায়, তৎসম্বন্ধে মহর্ষি নারদের উক্তি—

"শোধয়েৎ পূর্ব্ববাদন্তু যাবন্নোত্তরদর্শনম্।
অবষ্টব্ধস্যোত্তরেণ নিবৃত্তং শোধনং ভবেৎ"

যতক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তর (জবাব) না দেওয়া হয়, ততক্ষণ আরজী শোধন করা যায়। জবাবের পর আর আরজী সংশোধন চলিতে পারে না।

আবেদন করিবা মাত্রই যে তাহা রাজদ্বারে 'প্রতিজ্ঞা'রূপে গৃহীত হইবে, তাহা নহে। সকল আবেদন গৃহীত হয় না। ব্যবহার-শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

"অপ্রসিদ্ধং নিরাবাধং নিরর্থং নিষ্প্রয়োজনম্।

অসাধ্যং বা বিরুদ্ধং বা পক্ষাভাসং
বিবর্জ্জয়েৎ।"

অপ্রসিদ্ধ, নিরাবাধ, নিরর্থ, নিষ্প্রয়োজন, অসাধ্য, বিরুদ্ধ পূর্ব্বপক্ষ পরিত্যাগ করিবে। এই গুলি পূর্ব্বপক্ষ নহে, পক্ষাভাস। যদি কেহ আবেদন করে যে 'আমার শশশৃঙ্গ ঐ ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে', তাহা আদালতে গৃহীত হইবেনা। কারণ 'শশশৃঙ্গ' নামক কোনও পদার্থ প্রসিদ্ধ নাই। নিরাবাধ—অর্থাৎ যাহাতে বাধা দেওয়া অসম্ভব। যেমন "আমার দ্বারস্থ আলোকসাহায্যে সে রাস্তায় দাঁড়াইয়া পড়িতেছে" এখানে ইহা নিরাবাধ, কারণ আলোক যতদূরে বিসর্পিত হয়, ততদূরে লোকে তাহা দ্বারা কার্য্য করিতে পারে; ইহাতে বাধা দেওয়া যায় না। নিরর্থ—যাহার অর্থ হয় না, যেমন 'কখচছপঠতণ'। নিষ্প্রয়োজন—যেমন "অমুক আমার বাটীর সম্মুখে জলসত্র স্থাপন করিয়াছে।" ইহাতে বাধা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অসাধ্য—যাহা সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা সাধন করা যায় না, যেমন "অমুক আমাদিগকে চোক্ ঠারিয়াছে।" ইহা সাধন করা অসম্ভব, কারণ এরূপ স্থলে সাক্ষী প্রমাণ রাখা ঘটে না। বিরুদ্ধ—যাহা সম্ভব হয় না। যদি কেহ আবেদন করে যে "ঐ বোবা লোকটী আমাকে তিরস্কার করিয়াছে।" তাহা অসম্ভব, কেননা বোবায় কথা বলিতে পারে না। যে কথা বলিতে পারে না, তাহারই নাম মূক বা বোবা। এই সকল আবেদন আদালত গ্রহণ করিবেন না।

পূর্ব্বপক্ষের পর দ্বিতীয় অংশ উত্তর।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"শ্রুতার্থস্যোত্তরং লেখ্যং পূর্ব্বাবেদক-সন্নিধৌ।"

প্রত্যর্থী আর্জী অবগত হইলে পর, পূর্ব্ববাদীর সমক্ষেই তাহার নিকট উত্তর চাওয়া হইবে। প্রতিবাদী যে উত্তর দিবে, তাহা যথাবৎ লিখিয়া রাখিবে। উত্তর কিরূপ হইবে, তাহা আচার্য্য বলিতেছেন,—

"পক্ষস্য ব্যাপকং সারং অসন্দিগ্ধমনাকুলং।
অব্যাখ্যাগম্যং ইত্যেতৎ উত্তরং তদ্বিদো বিদুঃ।"

পক্ষ-ব্যাপক অর্থাৎ পূর্ব্ববাদীর আবেদনের নিরাকরণে সমর্থ, সার ন্যায্য, অসন্দিগ্ধ সন্দেহরহিত, অনাকুল যাহা পূর্ব্বাপর-বিরুদ্ধ নহে, অব্যাখ্যাগম্য যাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয় না—তাহাই যথার্থ উত্তর। পূর্ব্বপক্ষ "আমার দশ টাকা চুরি করিয়াছে" এখানে যদি উত্তর দেওয়া যায় "চুরি করি নাই" তাহা যথার্থ উত্তর নহে। কারণ, তাহা দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ নিরাকৃত হইল না। "দশ টাকা চুরি করি নাই" বলিলেই পূর্ব্বপক্ষের নিরাকরণ হয়। অপর গুলি সম্বন্ধে ও ঐরূপ।

উত্তর চারি প্রকার। মহর্ষি কাত্যায়ন লিখিয়াছেন।

"সত্যং মিথ্যোত্তরং চৈব প্রত্যবস্কন্দনং তথা।
পূর্ব্ব-ন্যায়-বিধিশ্চৈবং উত্তরং স্যাৎ চতুর্বিধং।"

সত্য উত্তর, মিথ্যা উত্তর, প্রত্যবস্কন্দন, পূর্ব্বন্যায় এই চতুর্ব্বিধ উত্তর। সত্য উত্তর—অভিযোগের বিষয় স্বীকার করা। শাস্ত্রে আছে—

"সাধ্যস্য সত্যবচনং প্রতিপত্তি-
রুদাহৃতা।"

সাধ্য অর্থাৎ দাবী সত্য বলিয়া স্বীকার করা সত্য উত্তর। ইহার আর এক নাম প্রতিপত্তি। কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

"অভিযুক্তোঽভিযোগস্য যদি
কুর্য্যাদপহ্নবং।
মিথ্যা তত্তু বিজানীয়াৎ উত্তরং
ব্যবহারতঃ।"

অভিযুক্ত যদি অভিযোগের অপহ্নব করে, তবে তাহা ব্যবহারে মিথ্যোত্তর বলিয়া জানিবে। মিথ্যা উত্তর চতুর্ব্বিধ। শাস্ত্রে আছে—

'মিথ্যৈতৎ নাভিজানামি তদা তত্র
ন সংস্থিতিঃ।
অজাতশ্চাস্মি তৎকালে ইতি
মিথ্যা চতুর্ব্বিধা।"

প্রথম মিথ্যা উত্তর "অভিযোগ মিথ্যা" ২য় "আমি এ অভিযোগের বিষয় জানিনা।" ৩য় "তৎসময়ে আমি সেখানে ছিলাম না।" ৪র্থ "আমি সে সময় জন্ম গ্রহণ করি নাই।"

প্রত্যবস্কন্দন—অভিযোগ স্বীকারপূর্ব্বক কারণান্তর দ্বারা তাহার নিরাকরণ। এতৎ-সম্বন্ধে মহর্ষি নারদ বলিতেছেন—

"অর্থিনা লিখিতোযোঽর্থঃ প্রত্যর্থী
যদি তং তথা।
প্রপদ্য কারণং ব্রূয়াৎ প্রত্যবস্ক-
ন্দনং স্মৃতং।"

পূর্ব্বপক্ষের যাহা দাবী, প্রতিপক্ষ যদি তাহা স্বীকার করিয়া, অন্য কারণের উল্লেখ করে, তবে প্রত্যবস্কন্দন উত্তর হয়। যেমন বাদী আবেদন করিল "আমার পঞ্চাশ টাকা লইয়াছে, তাহা পাইবার প্রার্থনা"—প্রতিবাদী উত্তর দিল, "হাঁ টাকা লইয়াছি বটে, কিন্তু ২ মাস পূর্ব্বে তাহা পরিশোধ করিয়াছি"। এতাদৃশ উত্তরের নাম প্রত্য-বস্কন্দন। প্রাঙন্যায় বা পূর্ব্বন্যায়—যেমন কোনও ব্যক্তি রাজদ্বারে আবেদন করিল, "ঐ ব্যক্তি আমার, এক শত টাকা ধারে, তাহা পাইবার প্রার্থনা।" প্রতিবাদী প্রত্যু-ত্তর দিল, "বাদী একবার আমার নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উহার পরাজয় হইয়াছে।" এখানে পূর্ব্বকালীন 'জয়পত্র' দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে যে, ঐ মোকর্দ্দমা পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া-ছিল এবং তাহাতে বাদী পরাজিত হইয়াছে। জয়পত্র অথবা সাক্ষিদ্বারা (বিচারক, সভ্য প্রভৃতিরা এখানে সাক্ষী) বাদীর পরাজয় ও প্রতিবাদীর জয় প্রমাণ করিতে হইবে। এই সকল উত্তর যথাবৎ লিপী-বদ্ধ করা হইবে। তাহার পর বিচারক ও সভ্যগণ আলোচনা করিবেন, যে, এই মোকর্দ্দমায় কোন পক্ষের উপর কি প্রমাণের ভার পড়িবে। তদনুসারে প্রমাণ দিতে বলিবেন।

বিচারের তৃতীয় অংশ—ক্রিয়া বা সাক্ষী-প্রমাণাদি দেওয়া

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"ততোঽর্থী লেখয়েৎ সদ্যঃ প্রতি-
জ্ঞাতার্থসাধনং।"

তাহার পর বাদী (স্থলবিশেষে প্রতিবাদীর উপর প্রমাণের ভার পড়ে) নিজের প্রতিজ্ঞাত অর্থ বা প্রার্থিত বিষয়ের সাধন নির্দ্দেশ করিবেন অর্থাৎ সাক্ষী বা লেখ্যাদির তালিকা প্রদান করিবেন। "অর্থী" শব্দের অর্থ—যাহার উপর প্রমাণের ভার পড়িবে তিনি। প্রাঙ্ন্যায়-স্থলে প্রমাণের ভার প্রধানতঃ প্রতিবাদীর উপর, সুতরাং সেখানে তিনিই অর্থী। মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন—

প্রাঙ্ন্যায়-কারণোক্তৌ তু প্রত্যর্থী
নির্দ্দিশেৎ ক্রিয়াং।'

'মিথ্যোক্তৌ পূর্ব্ববাদী তু প্রতি-
পত্তৌ ন সা ভবেৎ।'

প্রাঙ্ন্যায় এবং কারণ-উত্তরে (প্রত্যবস্কন্দনে) প্রত্যর্থী অর্থাৎ প্রতিবাদী প্রমাণ দিবেন। মিথ্যোত্তরে বাদী প্রমাণ দিবেন। প্রতিপত্তি বা অভিযোগ স্বীকার করিলে, প্রমাণের অপেক্ষা নাই। যিনি কিছু প্রমাণ করিতে চাহেন, তিনিই সাক্ষ্যাদি উপস্থিত করিবেন। যাহার কিছু প্রমাণ করিতে ইচ্ছা নাই, কেবল উত্তর মাত্র দিতে চাহেন, তিনি সাক্ষী প্রভৃতি উপস্থিত করিবেন না।

বিচারের চতুর্থ অংশ—সাধ্যসিদ্ধি। প্রমাণ গ্রহণ করিয়া,যদি বিচারক মনে করেন যে, এই প্রমাণের দ্বারা আবেদিত বিষয়—অভিযোগ সত্য-রূপে প্রমাণিত হইতে পারিয়াছে, তবে বাদীর জয় অবধারণ করিবেন। অন্যথায় অর্থাৎ সাক্ষিপ্রভৃতি দ্বারা অপরাধ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে, বিপরীত অর্থাৎ বাদীর পরাজয় ঘটিবে।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"তৎসিদ্ধৌ সিদ্ধিমাপ্নোতি বিপ-
রীতমতোঽন্যথা।

প্রমাণের সিদ্ধি (নিষ্পত্তি) হইলে, তদ্দ্বারা বাদী সাধ্য-সিদ্ধি-স্বরূপ জয় লাভ করিবে, অন্যথায় পরাজিত হইবে।

যেখানে 'সংপ্রতিপত্তি' বা 'অঙ্গীকার' উত্তর হইবে—তাদৃশস্থলে ক্রিয়া অর্থাৎ প্রমাণ-প্রদান ও সাধ্যসিদ্ধি এই দুই অংশ থাকিবে না। ব্যবহারকে পূর্ব্বে চতুষ্পাদ বা চতুরংশ বলা হইয়াছে, ইহা সংপ্রতিপত্তি ব্যতীত অন্যস্থলে বুঝিতে হইবে।

অনেকে মনে করেন, সংপ্রতিপত্তি-স্থলে ক্রিয়া না থাকুক্ সাধ্যসিদ্ধি আছে, কারণ স্বীকার দ্বারাই সাধ্যের সিদ্ধি ঘটিতেছে। এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। প্রমাণ দ্বারা যাহার সিদ্ধি করিতে হয়, তাহার নাম সাধ্য। যেখানে প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়োজন নাই, সেখানে সাধ্যও নাই, তাহার সিদ্ধিও নাই। সে স্থলের পূর্ব্বপক্ষ স্বতঃসিদ্ধ, উত্তর দ্বারা তাহার সিদ্ধতা প্রকাশ করা হইতেছে মাত্র। প্রমেয়, প্রমাণের অপেক্ষা করে। প্রামাণ্যে বিবাদ হইলেই প্রমাণ দিতে হয়। সংপ্রতিপত্তিস্থলে প্রামাণ্যে বিবাদ নাই। বাদী যাহা চাহেন, প্রতিবাদী তাহাতে অনুমোদন করেন। এখানে বস্তুতঃ বিবাদেরই অস্তিত্ব নাই। আর্য্য-ধর্ম্মাধিকরণের অপরাপর প্রথা অবসরে আলোচিত হইবে।

শ্রীকেদারনাথ ভারতী মীমাংসাতীর্থ।
ভারতীকুটীর, প্রতাপকাটী
যশোহর।

বেদ।

১।• আর্য্যজাতির মধ্যে যে "আগম" (বেদ) প্রথম ধ্বনিত হয়, সেই "বেদ" = বিদ + চে অল্ অর্থে জানা, বিশিষ্টরূপে বা মর্ম্মে মর্ম্মে জানা। কি জানা? না—বস্তুর স্বরূপ জানা। এই জানা পদার্থভেদে দ্বিবিধ, বাহ্য ও আন্তর জ্ঞান। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাহ্য-বিষয় (মহাভূতাদি ও ভৌতিক পদার্থ), এবং অন্তঃকরণ ও আন্তর বিষয় (সুখ, দুঃখ, মোহ, ইচ্ছা, দয়া, প্রকৃতি, পুরুষ) সংযোগে যে জ্ঞান হয়, তাহাই বাহ্য ও আন্তর পদার্থের জ্ঞান। বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয় সংযোগে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা চালিত জ্ঞান; যেহেতু বাহ্য দ্রব্যমাত্রেই শক্তির চলন বা কম্পন। (পাশ্চাত্য ঈশ্বর অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকও এই মতটি অনুমোদন করেন)।

এই প্রচলন দ্বারাই প্রতিক্ষণে বাহ্য দ্রব্য বদলাইয়া যাইতেছে। উক্ত প্রমাণের দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞান যদি পদার্থের বাহ্য-স্বরূপ-জ্ঞান হইয়াও পরিবর্ত্তনশীল জ্ঞান হয়, তবে ঐ বিদ ধাতুর অর্থ ধরিয়া, পদার্থ-সকলের স্বরূপজ্ঞান কাহাকে বলিব? না—স্থির শুদ্ধ-সত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ত্ব) দ্বারা সমাধিতে বস্তুর (কি বাহ্য কি আন্তর পদার্থের) যে স্থির জ্ঞান হয়, তাহাই পদার্থ-সকলের স্বরূপ বা তত্ত্ব। এই তাত্ত্বিক জ্ঞান সর্ব্বদেশে সর্ব্ব-কালে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নিকটেই সমানভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ বাক্যই "আগম" (বেদ = শ্রুতি)। যদি তুমি ঐ সৎ আদি বাক্য বাছিয়া লইতে পার, তাহা হইলে কোন মতের সহিতই ভেদ দেখিতে পাইবেনা। ঐ বেদোক্ত ২।৪টি পদার্থের সকল মতের সহিত একতা দেখাইতেছি, ইহাতে বুঝিতে পারিবে যে, সকল মত প্রকৃত প্রস্তাবে এক। নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের স্ব স্ব ধর্ম্ম ও সাধন সম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকিলেও যাহা মূল ধর্ম্ম (বেদোক্ত ধর্ম্ম), তাহা প্রত্যেক মানবের নিকটেই এক ভাবে প্রতিভাত হইতেছে। **ঐ মূল-বেদোক্ত মোক্ষ-ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে, তুমি নিজের সহিত সকল প্রাণীর সমান উপমা ধারণ করিবে, অর্থাৎ তোমার প্রতি অন্যে যে ব্যবহার করিলে, তাহা তুমি ভালবাস না, যাহাতে তোমার বাহিরে [স্থূল শরীরে] ও অন্তরে [মনে] ক্লেশ হয়, তাহা তুমি অন্যের (সকল প্রাণীর) প্রতি আচরণ করিবে না; সকল প্রাণীকে আপনার মত দেখিবে। ইহাই সার্ব্বভৌতিক ধর্ম্ম।** এই ধর্ম্ম = ধৃ + যে — মন্ অর্থে ধারণ; কি ধারণ? বস্তুর মজ্জাগত গুণ-ধারণ। প্রত্যেক মানুষের (মানুষ কেন, জীবের) মজ্জাগত গুণ কি? না—চিচ্ছক্তি (যেমন অগ্নির মজ্জাগত গুণ দাহিকাশক্তি)। **এই চিচ্ছক্তি হইতে সকল মানব ও জীবের প্রতি সমান উপমা ধারণা করা অথবা সকল প্রাণীকে নিজের মত দেখাই মূল ধর্ম্ম।** বস্তুমাত্রের এই মজ্জাগত গুণই "সার্ব্বভৌতিক ধর্ম্ম" পদ-বাচ্য। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই; যেহেতু বস্তুমাত্রের এই মজ্জাগত গুণ হইতেই বা • জড় পদার্থেও

এই চিৎ-ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। জৈবিক যন্ত্র-যুক্ত জীবের সহিত তুলনায় ভূতাদিকে অপেক্ষা-কৃত জড়-ভাবাপন্ন বলা হয়। এই চিচ্ছক্তি-বলেই আমরা পদার্থ বিচার করি, আপনাকে আপনি অনুভব করি (concious of my-self)। এই চিচ্ছক্তি না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কে জানিত? ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ কে বিচার করিত? কে বলিত—এটী প্রস্তর, জড় পদার্থ ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মই বেদের সনাতন-ধর্ম্ম—জানিবে। প্রত্যেক মানবের ইহা অনু-মোদিত, এমন কি প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিকও এই সনাতন ধর্ম্ম (সকল প্রাণীকে নিজের মত দেখা) মানিয়া চলেন।

২। ধর্ম্মবিশ্বাস কথাটী অনেকেই অন্ধবিশ্বাস বলিয়া উড়াইয়া দেন, বস্তুতঃ বিশ্বাস কি অন্ধ? আগম, অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই ত্রিবিধ প্রমাণের কোনটী না কোনটী আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরবিশ্বাস হইলে, তাহা সংশয়-রহিত নিশ্চয়-জ্ঞান হইবে; এই নিশ্চয়-জ্ঞানই বিশ্বাস (মনের একাগ্রবৃত্তি) অতএব এই বিশ্বাস কেমন করিয়া অন্ধ হইল? ঈশ্বরের কোন এক ভাব-ব্যঞ্জক রূপের বা নামের বা গুণের চিত্তে স্থিরজ্ঞান (অর্থাৎ চিত্ত-চাঞ্চল্য-রহিত ঐকাগ্র্য) হইলেই চিত্ত সমাহিত হয়, আর এই সমাহিত চিত্তেই অবিকারী স্থিরজ্ঞান (বেদ) প্রতিভাত হইয়া, যাবতীয় পদার্থের স্বরূপানুভব হয়। অনুষ্ঠান দ্বারা এই বিষয়টী প্রত্যক্ষ করিতে হয়। আর একটী বিষয়ে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একতা দেখ, সকল সম্প্রদায়ই উপাসনা কালে হয় ঈশ্বরের নাম, না হয় রূপ (কোন মূর্ত্তি বা জ্যোতি), না হয় কোন গুণ (যেমন ঈশ্বর করুণাময়) চিন্তা করিবেনই। এই নাম বা রূপ বা গুণ ভিন্ন উপাসনা হইতে পারে না; যতক্ষণ উপাসনা, ততক্ষণই নাম, রূপ ও গুণ। আর এই নাম, রূপ ও গুণ মাত্রেই সসীম; (finite) অর্থাৎ যতদিন তোমার উপাসনা থাকিবে, ততদিন সাকার = (finite নাম, রূপ ও গুণ) তোমার চিত্তে অঙ্কিত থাকিবে। তুমি নামে নিরাকার-উপাসক বলিয়া নিজেকে জানিলেও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে (বিচারচক্ষে) তুমি সাকার-উপাসক হইতেছ; এখানেও নিরাকার সাকার সকল সম্প্রদায় মধ্যেই উপাসনা-ভাবের একতা দেখ *। আর একটী বিষয়ে সকলের একতা দেখাইতেছি, সকল সম্প্রদায় 'মুক্তি' বলিয়া যে একটী পদ ব্যবহার করেন, তাহা লাভ করা সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। যথা—মুচ ধাতুর অর্থ মোচন (মুচ + ভাবে – ক্তি) ধরিয়া কিসের মোচন? না—দুঃখের, এই দুঃখ বলিতে শারীরিক ও মানসিক, হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত ত্রিবিধ (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক) দুঃখই আসিতেছে, তাহার মধ্যে পাপ ও নরকাদির সকল যন্ত্রণাই থাকিল। আর এক বিষয়েরও একতা দেখাইতেছি, আর্যশাস্ত্রে জীব, আত্মা ও ব্রহ্ম বলিয়া যে তিনটি প্রধান বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা প্রকারান্তরে নিরাকারবাদী খৃষ্টানও স্বীকার করিয়াছেন, যথা—Father, son and Holy

* যখনই নাম, রূপ ও গুণের অতীত আত্মতত্ত্বানুভব (তত্ত্বজ্ঞান) হইবে, তখনই উপাসনা নাই। ইহাই প্রকৃত নিরাকার পদ-বাচ্য। আর্যশাস্ত্র গৌরবার্থে এই নির্গুণ আত্মার স্তুতিকে নির্গুণ-উপাসনা বলিয়াছেন।

ghost, হিন্দু বলেন, ঐ জীব (son) ও আত্মা (Holy ghost) এবং ব্রহ্ম (Father) একই। ইস্‌লাম সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোন মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে, "আনেল্ হক্ মন্‌সুর" (I am the God mansoor) ঐ সকল মতই হিন্দুর জীব, আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য। সকল আস্তিক মতেই একবাক্যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত আছে, এবং তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে সত্য, দয়া, অহিংসাদি পালন করিয়া পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, সকল বাদীই তাহা মানিয়া আসিতেছেন। এখন্ বুঝিতে হইবে যে, যাহা প্রকৃত "আগম" (বেদ) তাহা একই। কোথায়ও কোন বাদীর সহিত তাহার মতভেদ নাই, তবে মানুষের বুদ্ধির মলিনতা দোষেই বিবাদ ও ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সিদ্ধির (স্বমত চালাইবার) জন্যই ঐ বিবাদ ও মতভেদ দৃষ্ট হয়। আর এক কারণ, মূলতঃ প্রকৃত তত্ত্বের ভেদ না থাকিলেও প্রাকৃতিক নিয়মে এক এক দেশের সংস্থান ও জলবায়ু এবং মানবের প্রকৃতি গত ভেদ হইতে যেরূপ খাদ্য, আচার-ব্যবহার অনুকূল হয়, মানব সেই রূপই আচরণ করিয়া থাকে। সাধন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেও যে যৎকিঞ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা ঠিক্ সেই নিয়মেই হইয়াছে।

৩ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, "আগম" বা "বেদ" বলিতে নানা টিকাটিপ্পণী সহিত গ্রন্থরাশি (ছাপা বা হস্ত লিখিত পুস্তকাদি) নহে। বিদ ধাতুর অর্থ লইয়া, পদার্থ মাত্রের স্বরূপের যে অবিকৃত জ্ঞান (যাহা সদাকাল) সকল মানবের নিকটে একভাবেই বর্ত্তমান আছে; ঐ জ্ঞান বস্তুর মজ্জাগত গুণের তত্ত্ব-জ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মানুষের গভীর হৃদয় প্রদেশে (বুদ্ধিতত্ত্বে) নিহিত আছে। যাহা পুরাকালে আর্যগণদ্বারা গীত ও শ্রুত হইত। মানব ক্রমে মন্দ-সত্ত্ব (স্মৃতিশক্তিহীন হওয়ায় পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণদ্বারা ছন্দোবদ্ধ শ্লোকাকারে উহা লিখিত (নানা টিকাদি সহিত) হইয়াছে। ক্রমে নানা আচার্য্যের দ্বারা নানা ভাবে যজ্ঞাদি হিংসাপূর্ণ গ্রন্থাকারে লিখিত হইয়া, নানাভেদ লক্ষিত হইতেছে। যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলামাদি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ঐ আগম (Revelation) হইতে পদার্থতত্ত্বের (ধর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, ঈশ্বরানুরাগ, মুক্তি, ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বর ও বিশ্বের মূল উপাদান প্রভৃতির) একতা দেখিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও, তাহা হইলে স্বীয় স্বীয় হৃদয়-গহ্বরে বিচার-ইন্ধন দ্বারা জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর; ঐ সত্য জ্ঞানাগ্নির উজ্জ্বলা-লোকে সকল বাদির বিরুদ্ধ মতের অন্ধকার দূর হইবে। সকলই এক দেখিতে পাইবে। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কেই স্বমতের বিরুদ্ধবাদী মনে হইবে না। সকল সমাজ ও ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি আসিবে। ২৪৪৮ ও ৪২০ বর্ষ পূর্ব্বে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ ও ভগবান্ কৃষ্ণ-চৈতন্য উপদিষ্ট "সর্ব্ব-জীবে দয়া" ও প্রগাঢ় ভালবাসা আসিবে, এবং সেই পরমেশ্বরে পরানুরক্তি হইবে। আর যদি ঐ জ্ঞানাগ্নির চরম জ্যোতি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে এই বিশ্ব সংসারে আত্ম-পর ভেদবুদ্ধি একবারে উঠিয়া যাইবে, সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান হইবে, জগৎ জুড়িয়া জগন্নাথকে দেখিবে।

ইহাই সাংখ্য ও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অভেদাত্ম-জ্ঞান।

৪। এখন সংশয়—আমরা পদার্থের অসংখ্য জাতিভেদ দেখিতে পাই কেন? না—সেই মূল উপাদানশক্তি (সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি) হইতে গুণের অসংখ্য বিভাগ (প্রচলন) হয়, এই অসংখ্য বিভাগ বা প্রচলন হইতে অসংখ্য পদার্থ হইয়াছে; এবং প্রতি মানবের বুদ্ধি ও অহঙ্কারের (ভাবের ধর্ম্মকর্ম্মের) ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা দেখিতে পাই। আমরা বলি বটে যে, সকল হিন্দুর, সকল বৌদ্ধের, সকল খৃষ্টানের, সকল ইসলাম্ প্রভৃতির এক প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান, কিন্তু তাহা নহে, ঐ প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি মোটের উপরে এক মতাবলম্বী হইলেও বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রত্যেকের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মভেদ আছে। মনে কর, এক ধর্ম্মমন্দিরে এক সময়ে এক মতের উপাসক (হিন্দু বা বৌদ্ধ বা জৈন বা খৃষ্টান বা ইসলাম্) ঈশ্বরোদ্দেশে একই স্তুতি সমস্বরে গান করিতেছেন, অথচ তাঁহাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমরা এই স্তুতির কে কি অর্থ অনুচিন্তন করিতেছ, বুঝিতেছ ও দেখিতেছ (যদি ঐ পদ সকলের বাহিরে দেখিবার কিছু বিষয় থাকে)? যদি প্রত্যেকে সরল ভাবে (নিজ নিজ মনের ভাব গোপন না করিয়া) উত্তর দেন, দেখিবে যে, ঐ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তার একতা নাই, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়াছেন, কেহ কিছু ভাবিতেছেন, দুই জন ব্যক্তির কচিৎ তুল্য ভাব লক্ষিত হইবে। এইরূপ হয় কেন? এক ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলেই এক স্তুতি একই সময়ে এক স্থানে এক ভাবে সমস্বরে ধ্বনিত করিতে করিতে সমভাব প্রাপ্ত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চলিয়া পড়েন কেন? ইহাতে হয় বল, সকলে সমভাবে মনঃসংযোগ করেন নাই, ইচ্ছা পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা করিয়াছিলেন; আর না হয় বল, উঁহাদের মূলে প্রত্যেক ব্যক্তির গুণ কর্ম্ম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আছে, তাই সকলে স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। প্রথম পক্ষ বলিতে পার না, কারণ এক ভাবে মনোনিবেশ করিবার জন্যই এক সময়ে এক ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া, সকলেই একই স্তোত্র গান করিতেছেন। অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঐ দ্বিতীয় হেতু (সকলের মূলে গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ) হইতেই প্রতি ব্যক্তির ভাবের স্বতন্ত্রতা হইয়াছিল। স্বভাবই (আপনঃআপন ভাবই) বলবৎ। এই স্বভাব (স্ব স্ব গুণ-কর্ম্ম) হইতে যত মানুষ তত প্রকারের ভাব (ধর্ম্মকর্ম্মের) সংস্থান আছে। এই জন্য হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বেদে নানা মত দেখিতে পাও; যখন যে আচার্য্যের যেরূপ বুদ্ধিভেদ (গুণের সমাবেশ) হইয়াছে, তিনি সেইরূপ নিজ মত বিধিবদ্ধ করিয়া চালাইয়া গিয়াছেন। এইরূপ মতভেদ [উক্ত কারণে] কেবল হিন্দুর কেন? বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলাম্ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। ভিন্ন ভিন্ন গুণ-কর্ম্ম যে উহার কারণ, সে পক্ষে আর কোন সংশয় রহিল না। পূর্ব্বে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, যে ধর্ম্ম মহাভারতে ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-দর্পণে যদি প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়

নিজ নিজ মুখ দেখেন, তাহা হইলে সকল সম্প্রদায়ই পরস্পরকে ভালবাসিতে ও সহানুভূতি করিতে বাধ্য হইবেন, এবং মূলধর্ম্ম একই দেখিতে পাইবেন।

৫। এখন সংশয় তুলিতে পার যে, মূলে প্রাকৃতিক নিয়মে যদি মানবের গুণ, কর্ম্ম ভিন্ন হইল, তাহা হইলে আর্যশাস্ত্রোক্ত দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার বাদ যাইতেছে? হঠাৎ এই সংশয় আসে বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে, সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে। কার্য্যের হেতু অনাদি বিদ্যমান থাকিলে, তাহার কার্য্যও অনাদি বিদ্যমান থাকিবে; অর্থাৎ বিশ্ব সংসার সেই মূল কারণ হইতে লয় বিকাশ (ব্যক্তাব্যক্ত-) প্রণালীতে প্রবাহরূপে (ধারাবাহিকরূপে) অনাদি কালই আছে ও চলিতেছে, অতএব মানবও তাহার গুণকর্ম্মও অনাদি। এই কর্ম্মমাত্রেই কর্ত্তার (যে করে তাহার) অধীন, অর্থাৎ পুরুষকৃতিই (কর্ম্মই) পুরুষকার, আর ভূত জন্মের পুরুষকৃত কর্ম্মই বর্ত্তমান জন্মে দৈব বা অদৃষ্ট। শাস্ত্রে অদৃষ্ট [যাহা দেখা যায় না অর্থাৎ অতীত ও অনাগত কালে যাহা আছে, আর তাহাই দৈব,] এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অদৃষ্ট বা দৈব (পুরুষের অতীত জন্মের কর্ম্মসকলের সংস্কার) মানবের বর্ত্তমান জন্মের চেষ্টা ও কর্ম্মের হেতু বলিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের (স্বভাবের) দ্বারা মানবের গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ আছে—বলা হইয়াছে। আবার বর্ত্তমান জন্মের পুরুষকার ও সঞ্চিত (বহু অতীত জন্মের কর্ম্ম, যাহার ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই) কর্ম্মের মিলন হইতে ভাবি জন্ম সূচিত হইবে; এই নিয়মে তাহাকেও প্রাকৃতিক নিয়ম বা স্বভাব বলা যাইবে। এইরূপ ধারাবাহিকভাবে সকল জীব ও তাহার কর্ম্ম ও গুণ চলিয়াছে। এই কর্ম্ম সকল হইতে মানবচিত্তে সংস্কারবীজ সঞ্চিত হয়, এই বীজ হইতে জন্ম, তির্য্যগাদি যোনি, নিরয় ও স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তি হয়। এই কারণে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, সংস্কার [বাসনা] ও কর্ম্মের ক্ষয়েই নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হয়। যোগাদিদর্শনেও এই একই কথা, চিত্তবৃত্তিশূন্য (নিরোধ সমাধি) না হইলে কৈবল্যমুক্তি হয় না। সকলেরই একমত, তবে আমাদের বুদ্ধিভেদে পৃথক্ পৃথক্ মত বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা থাকিলেও বাধ্য হইয়া ঐ নৈসর্গিক নিয়মের অধীন, অগত্যা মানব পরাধীন (প্রাক্তনাধীন)।

শ্রীসাংখ্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী,
কাপিলাশ্রম।

আমিত্বের প্রসার।

(স্বদেশ-প্রীতি)।

মানবাত্মা সর্ব্বদাই পূর্ণত্বের দিকে ধাবমান; ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, সসীম হইতে অসীমে যাওয়াই মানবাত্মার স্বভাব। স্বভাবভ্রষ্ট হইলেই মানবাত্মার বিপরীত গতি দৃষ্ট হয়। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিত্তবৃত্তির বিকাশ হয়। এবং চিত্তবৃত্তির বিকাশের সহিত আমাদের কার্য্যক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত হয়। একজন অজ্ঞ কৃষকের চিন্তা তাহার স্বীয় পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আর বড় বেশী হইলেই তাহার স্বগ্রামের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা কখনও কখনও তাহার মনে উদিত হয়। যে সমুদায় বিষয়ের

সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, সে সব-বিষয় লইয়া সে কখন মাথা ঘামায় না। অন্যান্য গ্রামের হিতাহিতের সে বড় একটা ধার ধারে না। স্বদেশ বৎসলতা কি, সে তাহা জানে না। এক পরিবার বা এক গ্রামের লোকের হিতাহিত যেরূপ পরস্পর সংস্পৃষ্ট, সমগ্র দেশের হিতাহিতও যে ঐরূপ পরস্পর সংস্পৃষ্ট—এ বিষয়ে তাহার কোন জ্ঞান নাই। শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে আবার ঐ অজ্ঞ কৃষকই স্বদেশকে স্বগৃহের ন্যায় ভালবাসিতে থাকে, এবং তখন স্বদেশের প্রতি-ব্যক্তিই তাহার স্বপরিবারস্থ ব্যক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। স্বগ্রামের লোক ভাল-বাসিতে হইলে, স্বপরিবারের লোককে ভাল-বাসা চাই। স্বদেশের লোক ভালবাসিতে হইলে, স্বগ্রামের লোককে ভালবাসা চাই। স্বদেশের লোকের প্রতি ভালবাসা হইলে, অন্যদেশের লোকের প্রতি ক্রমে ভালবাসা হয়। স্বগ্রাম-প্রীতির সহিত যেরূপ স্বদেশ-প্রীতির কোন বিরোধ নাই, তদ্রূপ স্বদেশপ্রীতির সহিত পৃথিবীস্থ অন্যান্য মানবের প্রতি প্রীতির সহিত কোন বিরোধ নাই। এ সমুদায়ই আমিত্বের প্রসারের ক্রম-বিকাশ মাত্র। পৃথিবীস্থ সমুদায় মানবের হিতাহিত এতই ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ, যে কোন দেশের অধিবাসীরাই আপনাদিগের অনিষ্ট সাধন না করিয়া—অপর দেশের অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন না। স্বার্থ ও পরার্থে—বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। অজ্ঞেরাই কেবল স্বার্থে ও পরার্থে ভেদ দেখে। ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ দ্বেষ হিংসাদি দ্বারা আত্মোন্নতি-সাধন হয়না, জাতীয়-জীবনেও তদ্রূপ। এক দেশের অধিবাসী-দের মধ্যে কেহ বিপন্ন হইলে, যেরূপ সেই দেশের অপর অধিবাসীদের সাহায্য করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ—এক দেশের অধিবাসীদের বিপদে অন্য দেশের অধিবাসীদেরও সাহায্য করা কর্ত্তব্য। সমগ্র মানব-জাতিতে যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ আছে—এ সত্য—যতদিন মানবের হৃদয়ঙ্গম না হইবে, ততদিন স্বার্থসংঘর্ষ বিদুরিত হইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় স্বীয় উন্নতিসাধন এরূপ-ভাবে করিবেন, যেন তাহাতে অপরের উন্নতি-পথ রুদ্ধ না হয়। অপরের উন্নতি-পথ রুদ্ধ করিয়া—স্বীয় উন্নতিসাধন করা যায়না। যদি কোন এক দেশ—অন্য দেশের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, স্বীয় উন্নতিসাধন করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সে তাহাতে কখনও অভ্যুদয়ভাগী হইতে পারে না। যে সমুদায় সনাতন নিয়ম দ্বারা বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে, পরার্থ-বিরোধী স্বার্থ তাহার অন্তর্ভূত নহে।

হিন্দুর শিক্ষা বা ব্রহ্মচর্য্য।

জীবের জীবত্ব-বিকাশের পূর্ণ পরিণতির সামঞ্জস্য না ঘটিলে, তাহার জীবজন্মই বৃথা। জড়-জগতের ক্রম বিকাশের সঙ্গে যেমন তাহার উন্নতির শতমুখী গতি স্বতঃই ঊর্দ্ধগামিনী, সেইরূপ স্বল্পস্থায়ী মানব-জীবনেরও ক্রম-বিকাশ সৃষ্টি-কৌশলের অবশ্যম্ভাবী ফল।

মানব জীবনে আত্মোন্নতি 'না ঘটিলে মানুষের প্রকৃত মনুষত্বের বিকাশ ঘটে না।' আত্মো-ন্নতির মূলে শিক্ষা ও সংস্কার। মানবের শিক্ষা প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের সুসম্পন্ন হয়। শিক্ষার বিস্তৃতি

বা প্রসরের তারতম্যে পূর্ণ আর অপূর্ণ-ভাবে এই শিক্ষা দ্বিবিধ। পুরাকালের হিন্দুজাতি শিক্ষার বিস্তৃতি বা প্রসর পরিবর্দ্ধিত করিতে যেমন পারিতেন এবং বুঝিতেন, তেমন বোধ হয় অপর কোন জাতি এখনও পারেন নাই। বর্ত্তমান ভবিষ্যতের জন্মদাতা, সুতরাং হিন্দুজাতির শম-প্রধান শিক্ষায় অপর জাতির যথার্থ অধিকার জন্মিবার আশা—বহু সময় অসঙ্গত মনে হয়। হিন্দুগণ শিক্ষার পূর্ণত্ব সম্পাদন জন্য অতি বাল্য হইতে যে প্রকার সুনিয়ম এবং সংযম-সাধনের প্রচলন করিয়াছিলেন—তাহা মানবজাতির প্রতি বিশ্বপাতার মঙ্গলাশীর্ব্বাদের ফল—মনে করা যাইতে পারে। ঐ নিয়মসমূহ "ব্রহ্মচর্য্য" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম বিরাট্, তাই তাঁহার বিরাট্ সাধনায় শিক্ষার কঠোরতা, চিত্ত-সংযম ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠা আবশ্যক।

শিক্ষা স্বরূপ তপস্যা করিতে হইলে মানবকে বিলাস বিদ্বেষ পরিহারপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় দমন ও চিত্ত শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয়। বস্তুতঃ পরার্থপর, সংযমী, সহিষ্ণু এবং দূরদর্শী না হইতে পারিলে, শিক্ষারূপ তপস্যা কখনও পূর্ণ হয় না। পুরাকালের হিন্দুর শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল,—অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অনুশীলনদ্বারা জ্ঞানশক্তি লাভ। জড়-জগতের বিশ্লেষণমূলক শিক্ষা ইহার অঙ্গীভূত ছিল। কেবল মাত্র জড়-বিজ্ঞানের শিক্ষা পূর্ণ হইলে, প্রাচীন হিন্দু শিক্ষার পূর্ণত্ব বোধ করিতেন না। বস্তুতঃ পুরাকালের হিন্দুগণ শিক্ষা, জ্ঞান সমস্তই এক অনন্ত অমৃত সত্যতত্বের উদ্দেশে নিয়োজিত করিতেন। এই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য-সাধন-জন্য হিন্দু ঋষিগণ আজীবন কঠোর তপস্যা করিয়াছেন এবং বংশধরগণের জন্যও তাহা সঞ্চিত রাখিয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষার প্রথম হইতেই ভোগ-বিরাগ, ইন্দ্রিয়-সংযম, সহিষ্ণুতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি গুণগুলি শিক্ষা দিতেন,—কারণ তাঁহারা প্রকৃত মানুষ গঠন করিতে চাহিতেন। শিক্ষার অনুশীলন দ্বারা হৃদয় এবং আত্মার যথার্থ স্বাস্থ্য ও দার্ঢ্য সংসাধন করিয়া, তবে তাঁহারা বংশধরদিগকে এই অনন্ত ঘাত-প্রতিঘাত-সঙ্কুল আবর্ত্তময় কার্য্য-ক্ষেত্রে সংসার-সংগ্রাম করিতে পাঠাইয়া দিতেন। হিন্দুসন্ততিবর্গও বাল্য-শিক্ষার গুণে এই অশেষ জ্বালাযন্ত্রণাময় জগতের মধ্যে, এক একজন মহাযোগীর মত অনাসক্ত-চিত্তে সংসারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া, গৃহস্থা-শ্রমের অবশ্যকরণীয় কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর মূল রহস্য অনু-সন্ধান করিতে হইলে, আমরা প্রথমত দেখিতে পাই যে—শরীর, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনের অনুকূল প্রথা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া জগন্মঙ্গল-রূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর হিন্দুর শিক্ষাবিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দেবপ্রতিম পুণ্যহৃদয় ঋষিগণের পাদ-মূলে যে অমূল্য উপদেশ-রত্ন বিস্তৃত আছে, উহা কুড়াইয়া অদ্য আমরা ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকের নিকট উপহাররূপে উপস্থিত করিতেছি।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে যথা—

১। 'সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ ॥'

অর্থাৎ নিজ তপস্যা পরিবৃদ্ধির জন্য ব্রহ্ম-চারী ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে॥

২। 'বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনং॥'

মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, রস এবং স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় বিলাস ও প্রাণিহিংসা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।

৩। 'অভ্যঙ্গ মঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্র ধারণং।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনং॥'

আভরণ করিয়া তৈলমর্দ্দন, নেত্রাঞ্জন, পাদুকা ধারণ, ছত্র গ্রহণ, এবং কাম, ক্রোধ লোভ ও নৃত্য-গীত-বাদ্য—ব্রহ্মচারী ইহা পরিত্যাগ করিবেন।

৪ 'ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্ব্রতী।'

ব্রহ্মচারী একজনের অন্নে জীবন ধারণ করিবে না; ভিক্ষাব্রত পালন করিবে—অর্থাৎ আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া এক স্থানেই আহার-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে না—উদ্যোগী হইয়া নিত্য নূতন আহার্য্য সংগ্রহ করিবে। আবার এই সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৪ শ্লোকে আছে যে—

৫। 'হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ'

গুরুর নিকটে গুরু হইতে শিষ্যের পরিচ্ছদ হীন হইবে। বস্তুতঃ মনু-সংহিতার এই অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ক অনেক উপদেশ আছে যথা—

৬। 'দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতং।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥'

পাশাখেলা—পরনিন্দা, মিথ্যা কথা, বৃথা বাগ্‌জাল-বিন্যাস, পরের অপকার, স্ত্রীসঙ্গ এবং সাধারণ স্ত্রীগণের প্রতি কামদৃষ্টি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

ইত্যাদিরূপ অনেক অমূল্য উপদেশ ব্রহ্মচারীর জন্য মনুসংহিতায় উল্লিখিত আছে—কিন্তু সমস্ত উদ্ধৃত করিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তাই গুটি কয়েক শ্লোক উদ্ধার করিয়া বুঝিলাম যে, ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা এক মহতী সাধনা, ইহাতে দৃঢ় সংযম, ত্যাগশিক্ষা ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়সংযমাদি সুনিয়মগুলির পূর্ণরূপ অনুশীলন না করিলে, ব্রহ্মচারী কখনই কঠোর শিক্ষা-তপস্যা পূর্ণ করিতে সক্ষম নন।

দেহ, মন এবং আত্মার সমুদায় শক্তি একীভূত না হইলে, কেহ কখন বাঞ্ছিত ফললাভের আশা করিতে পারে না। পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ ব্যতীত কে কবে খনি হইতে মণি তুলিতে পারিয়াছে? এই কার্য্যক্ষেত্রে মানব বস্তুতঃ কার্য্যেরই দাস, কিন্তু সেই কার্য্য আবার শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কারের উপর—নির্ভর করে। এই জন্য শিক্ষার প্রথম আভাসই ব্রহ্মচারী-জীবনে সুসম্পন্ন হয়।

পুরাকালে শিক্ষার স্বর্ণযুগ বিদ্যমান ছিল—হায়! তাহা এখন স্বপ্নযুগে পরিণত! বর্ত্তমানে শিক্ষার একদেশদর্শিতা দোষে, এ শিক্ষা প্রকৃত মনুষ্য গঠন করিতে অক্ষম, তাই ইহাকে সম্পূর্ণ শিক্ষা মনে করা বিষম ভ্রান্তি। পূর্ব্বে সংযত ব্রহ্মচারী আচার্য্যের আবশ্যকীয় সামগ্রী-সম্ভার সংগ্রহ করিতে নিরত থাকিয়া, শরীর-সঞ্চালন, আদেশ পালনের আনন্দ এবং জাগতিক জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতেন। গুরুগৃহে ছাত্র পরিশ্রমী সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবুদ্ধি হইত। দৈহিক বল, মনের বল এবং আত্মশক্তির স্ফুরণ তাহাদের সংঘটিত হইত। কিন্তু এই বিংশ-শতাব্দীতে এখন আর শিষ্য আচার্য্যগৃহে থাকে না বা গুরুর আদেশ অনুসারে জীবনের

কার্য্যাবলী সুনিয়মিত করে না। শারীরশ্রম ত দূরে,—এখন বহু স্থলে বিদ্যার্থী পদব্রজে বিদ্যালয়ে গমনও অপকর্ম্ম মনে করে। নানা যানের শ্রম বাড়িয়াছে, ব্রহ্মচারীরা কিন্তু শ্রম-সহিষ্ণুতা ত্যাগ করিয়াছে! রৌদ্রের বা বৃষ্টির প্রকোপ না থাকিলেও ছাত্রের হস্তে মূল্যবান্ রেসমী ছত্র স্থান পায়! গন্ধ, মাল্য—অনেক স্থানে পূর্ণরূপ আধিপত্য লইয়াছে। অনেক ছাত্র এখন পরিচ্ছদ-পরিপাট্য লইয়াই মহা-ব্যস্ত! এখন অনেকের ভাল বুট, সিল্ক-সার্ট, হাওয়ার চাদর—এক কথায় বরবেশ নইলে স্কুলের পরিচ্ছদই হয় না। ইহাতেও বিলাসিতার শেষ হয় না, বহু মূল্য রুমাল, দৃষ্টিশক্তিসম্বে শোভাসম্পাদক সোনার চশমা—বুকে ফুল ঝুলানও আছে। পরিচ্ছন্নতা ও বিলাসিতা এক বস্তু নহে, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। নৃত্য, গীত, বাদ্যে—বর্ত্তমান বিদ্যার্থীগণের উচ্চ আসন। আবার আজকাল রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনেই ছাত্র-জীবনের অধিকাংশ সময় অতীত হয়। এরূপে ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা ক্ষয় করা প্রার্থনীয় নয়। আমরা একথা বলিনা, যে বর্ত্তমানে আদৌ শিক্ষা হয় না। একদেশদর্শী শিক্ষার প্রসাদে আমরা জড়-বিজ্ঞানের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছি বটে, কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে ক্রমে দরিদ্র হইতেছি। আত্মার অমরত্ব ক্রমে ভুলিতেছি; মনে করা উচিত, উহাই হৃদয়-বলের মূলমন্ত্র।

পুরাকালে শিক্ষা আরম্ভ করিবার অগ্রে যে সকল নিয়ম অনুষ্ঠেয় হইত, তাহা মনুসংহিতার পূর্ব্ব-উদ্ধৃত শ্লোকগুলির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তথাপি পরে আমরা সংহিতা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। মনে করিতে পারেন যে, ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম যদি কঠোরতায় প্রতিষ্ঠিত হইল, তবে কি জগৎ হইতে কোমলতা উঠিয়া যাইবে? আমরা বলি যে না, তাহা হইতে পারে না। এই জগৎ কঠিনে কোমল এবং কোমলে কঠিন—এই নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছে। এই যে স্বচ্ছতোয়া তরঙ্গিণীর মধুর জলের উপর বাসন্তী সান্ধ্য-সমীরান্দোলিত তরঙ্গ-খেলা—অনন্ত অসীম নীল আকাশের গায় তারকোজ্জ্বল-বিভাসিত মধুর স্নিগ্ধ কৌমুদী-কিরণ—এ কোমলতায় কি মানুষ মুগ্ধ হইবে না?—কে বলে হইবে না। হিন্দুর পূর্ব্ব-শিক্ষাপ্রণালী বা ব্রহ্মচর্য্যের মূল লক্ষ্য—ঐ সমস্ত সৌন্দর্য্যের সার অংশ। ব্রহ্মচর্য্যের গূঢ় উদ্দেশ্যও ইহার অনুকূল। জগতের নিত্য-দৃষ্ট সৌন্দর্য্যতরঙ্গের উপর মানব-হৃদয়ের তরঙ্গ-রেখা তরঙ্গায়িত। এই আপাতদৃশ্য বৈষম্য-বিজড়িত অথচ সম্পূর্ণ সাম্যময় বিশ্বরাজ্যে কোমলতা কঠোরতা নিত্য-সহচরী। প্রস্তর-স্তূপের নিকট মধুরদৃশ্য কুসুম আর কোমল-মাংসপিণ্ডময় দেহে কঠিন অস্থি—উভয়ই আছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত ব্রহ্মচারী বা তত্ত্বদর্শী, তাহাকে এই দুই বিষয়ের মহাধ্যানে ধ্যানস্থ হইতে হইবে। হিন্দু ব্রহ্মচারী তাই ঐ দুই বস্তুর ধ্যানে সিদ্ধকাম। এই জন্য ঋষি-তপস্বীগণের তপোবনে হরিণ-হরিণীর ক্রীড়া—কোকিল-কূজন—লতিকাদলের ললিত কান্তি। ব্রহ্ম-চারী যে ঐ উভয়বিধ দৃশ্যের জন্য সমচক্ষু, তাহার একটি উদাহরণ দিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। রঘুবংশের এক স্থানে আছে যে—পূর্ণ-ব্রহ্মচারী লক্ষণ সীতাকে তপোবনে রাখিয়া

আসিলে, বাল্মীকি তাঁহাকে গর্ভিণী দেখিয়া সুস্থ করিবার জন্ত বলিতেছেন—

"পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্ সংবর্দ্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ স্তনন্ধয়প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্॥"

১৪ সর্গ, ৭৮ শ্লোক।

অর্থাৎ হে জানকি! তুমি যখন তোমার শক্তির অনুরূপ জলকলসী লইয়া, আশ্রমের বালবৃক্ষগণের মূলে জল সিঞ্চন করিয়া, তাহাদের বৃদ্ধি সাধন করিতে থাকিবে, তখন স্তন্যপায়ী শিশুর প্রতি যে প্রসূতির এক অপূর্ব্ব প্রীতি—তাহা তুমি তোমার সন্তান হইবার অগ্রেই অনুভব করিতে পারিবে! আহা! এরূপ জাগতিক কোমলতা ও কঠোরতার মহামহিমময় সাম্য কি আর কোথায়ও আছে? এরূপভাবে যদি জগতের সমস্ত কোমলতার ধ্যান করিতে কেহ সক্ষম হয়েন, তবে তিনি সংযমী ব্রহ্মচারী ব্যতীত আর কেহ নহেন। যে হৃদয় কঠোরতার নিম্নস্তরে পড়িয়াছে, সেই হৃদয়ই আবার কোমলতার উচ্চ স্তরে উঠিবে, ইহাই নিয়ম। পথশ্রান্ত কাতর পথিকের নিকট শীতল জলের যত মধুরতা, অন্তের নিকট তত নহে। ব্রহ্মচারীর শুষ্ক হৃদয়ে কোমলতার স্নিগ্ধ-মাধুর্য্য পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। এই জন্য মুনি ঋষির আশ্রমে ফলফুলের উদ্যান—হরিণ-হরিণীর ক্রীড়া—তরঙ্গিণীর কলধ্বনি প্রতিনিয়ত পরিশ্রুত। ভাই আধুনিক নিয়মপ্রিয় পাঠক! একবার ব্রহ্মচারীর চক্ষে জগতের সৌন্দর্য্য দেখ দেখি—কত মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারিবে! তোমার নিকট তখন এই যন্ত্রণাময় জগৎ অনন্ত-সুখের আলয় ভিন্ন আর কিছু বোধ হইবে না! তাই বলিতে ছিলাম যে, ব্রহ্মচারীর নিকট—ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বির নিকট মানবীয় শিক্ষার যেরূপ প্রসার এবং সমাপ্তি হয়, অন্তের নিকট তত নহে।

ব্রহ্মচারীর দেহ-মন সুস্থ রাখিবার জন্ত মনুসংহিতায় আরও কতকগুলি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"সূর্য্যেণ হ্যভিনির্ম্মুক্তঃ শয়নোঽভ্যুদিতশ্চ যঃ।
প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণোযুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা॥"

২য়, ২২১।

সূর্য্যের উদয়-অস্ত যে ব্রহ্মচারীর শয়ন সময় ঘটে, তাহার জন্ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিলে মহাপাপ হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান এবং সূর্য্যাস্ত-সময়ে শয়ন না করা—যে উত্তম-কল্প, ইহা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আদেশ।

"উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব সম্বিশেৎ।"

২য়, ১৯৪।

গুরুর শয্যাত্যাগের অগ্রে শিষ্যকে উঠিতে হইবে এবং শয়নের পর শয়ন করিতে হইবে।

হায়! এখন এই সকল নিয়মের কোনটিও নাই। আজ আর সেরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি নাই, সেরূপ গুরুশিষ্যও নাই। আবার শিষ্যের শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যের জন্ত ব্যবস্থা আছে যে—

"দূরাদাহৃত্য সমিধং সংনিদধ্যাদ্বিহায়সি।
সায়ম্প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ তাভিরগ্নিমতন্দ্রিতঃ॥"

২য়, ১৮৬।

পরিশ্রমপূর্ব্বক দূর হইতে যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া শুষ্ককরতঃ, তাহা দ্বারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় অগ্নিতে হোম করিবে। বস্তুতঃ শারীরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্ত দূর-পথ-ভ্রমণ যেমন শ্রেষ্ঠ

ব্যায়াম, সেরূপ আর কিছুই নহে। যতরূপ ব্যায়াম আছে, তাহার মধ্যে ভ্রমণের ন্যায় কিছুই নহে—ইহা বর্ত্তমানের ব্যায়ামবিৎ পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছেন! মনু সংহিতায় এই অর্থে কার্য্য এবং ব্যায়াম দুই নির্দ্দিষ্ট আছে। আবার অন্যরূপ ব্যবস্থাও আছে যথা—

"উদকুম্ভং সুমনসোগোশকৃন্মৃত্তিকাকুশান্।
আহরেদ্ যাবদর্থানি ভৈক্ষঞ্চাহরহশ্চরেৎ॥

জলকলস, গোময়, কুশ, পুষ্প, মৃত্তিকা প্রভৃতি আচার্য্যের সমুদায় আবশ্যকীয় দ্রব্য আহরণ করিবে এবং প্রতিদিন ভিক্ষা করিবে—অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহ করিবে। ইহা ছাড়া শিষ্য ব্রহ্মচারীকে দৈহিক বলবৃদ্ধির জন্য অন্যবিধ স্ফূর্ত্তিজনক উপদেশও দেওয়া হইত যথা—

"একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মচারী যেরূপ সেরূপ বিছানায় শয়ন করিবে, কদাচিৎ রেতঃস্খলন করিবে না। ইচ্ছাক্রমে ঐ কার্য্য করিলে, তাহার ব্রত পণ্ড হইবে। একরূপ ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে। ব্রতধারী ব্রহ্মচারী গুরুকুলে ছত্রিশ বর্ষ অথবা তাহার অর্দ্ধেক কিম্বা অধিক, অভাবে চারি অংশের একাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। যিনি যে বেদের যে শাখীয়, তাহাকে অগ্রে তাহা শিক্ষা করিয়া, পরে অপর বেদের একটি কি দুইটি শাখা শিক্ষা করিতে হইত। এইরূপে শিক্ষা পূর্ণ করিয়া, তাহার পর গৃহী হইয়া, আজীবন সুনিয়মে জীবনযাপন করিতে হইত। বস্তুতঃ হিন্দু-শিষ্যের শিক্ষাকালে, তাহার দেহ, মন এবং আত্মার উৎকর্ষ লাভ হইলে, তিনি সংসারে প্রবেশ করিতেন। প্রথমে ছাত্রকে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে উন্নীত করিবার জন্য শিক্ষক বলিতেন যে—

"আচম্য প্রয়তোনিত্য মুভে সন্ধ্যে সমাহিতঃ।
শুচৌদেশে জপন্ জপ্যমুপাসীত যথাবিধি॥"

পবিত্রভাবে অভিনিবেশসহ আচমন করতঃ পবিত্র স্থানে দুই সন্ধ্যা সাবিত্রী উপাসনা করিবে। এই সব উপদেশে ও অনুষ্ঠানে শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবন ক্রমশঃ উন্নত হইয়া, উচ্চ স্তরে গিয়া পর্য্যবসিত হইত। তাহার পর ক্রমবিকাশের গুণে হৃদয়ের শিক্ষা পাইয়া ছাত্র—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আচার্য্য, জ্ঞানী ব্যক্তি, এমন কি একদিনের একটি উপদেশের শিক্ষককে পর্য্যন্ত ভক্তির চক্ষে দেখিত।

"অল্পং বা বহুবা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।
তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া॥"

অল্প হউক, আর বেশী হউক, যে ব্যক্তি একদিন ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্য করিবেন, তাহাকে গুরুর ন্যায় পূজা করিতে হইবে। আহা! কালের কি গতি! এখন হিন্দু ছাত্র পিতা, মাতা, শিক্ষক প্রভৃতিকে ভক্তি করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে মূর্খ নির্ব্বোধ ও অক্ষম মনে করিতে দ্বিধা করে না। প্রাণীহিংসা ব্রহ্মচারীর পক্ষে অতি দূষ্য যথা—'প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনং' এইরূপে হৃদয়-শিক্ষা পূর্ণ হইলে, তাহার ফল কার্য্যে অনুভব করা পর্য্যন্ত হইত যথা—.

"যং মাতা পিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে॥
তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমন্তপ উচ্যতে।
নতৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ॥"

পিতা, মাতা—সন্তানের জন্য যে কঠোরতা সহ্য করেন, পুত্রের সাধ্য নাই যে তাহা শত-বর্ষেও পরিশোধ করে। পুত্রের পক্ষে—ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাচারীর পক্ষে পিতা, মাতা ও আচার্য্যের জন্য তাহাদের প্রিয় কার্য্য নিত্য অনুষ্ঠেয়। ইহারা সন্তুষ্ট হইলে, সর্ব্বকার্য্য সর্ব্বতপস্যা সিদ্ধ হয়। এই তিন জনের শুশ্রূষাই তপস্যা। ইহারা যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই আচরণীয়। ইহাদের আদেশ ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম অনাচরণীয়। এই সকল উপদেশ অবলম্বন জন্য পুরাণকার ঋষিগণ উপাখ্যান পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। মহাভারতে কৃতবোধ এবং তপদেব নামক ব্রাহ্মণের গল্প তাহার উদাহরণ।

হিন্দু শিক্ষা প্রণালীর এই সকল অমূল্য উপদেশ-বলেই এক সময় ভারতের শিক্ষার্থীগণ মহাবিরাট্ ব্রহ্মের কঠোর সাধনায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এইজন্য পূর্ব্ব আর্য্যগণের আচরিত ধর্ম্ম-উপাখ্যান এত প্রচারিত। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীদ্বারা না হয় দেহের শিক্ষা, না হয় হৃদয় বা আত্মার শিক্ষা! আমরা বর্ত্তমানে শিক্ষার নামে কুশিক্ষার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত! দৈহিকশিক্ষা এখন যাহা প্রচারিত আছে, উহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী কি না, তাহাও একবার আলোচ্য। আমরা এখন উদর-পূরণ-বিদ্যার সামান্য কিছু অনুশীলন করিতে গিয়া, পূর্ব্বের সেই কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছি! "ফুটবল" খেলায় না হয় ভাবী জীবনের শারীরিক শক্তি-প্রকাশের উপায়, না হয় উপস্থিত শিক্ষার পথ প্রসার। বিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, সংসারে প্রবেশ করিলে, প্রায়ই শুনিতে পাই, দুর্ব্বলতা আর অজীর্ণজনিত "অম্লরোগ"। বাল্য হইতে নিয়ত কার্য্য করণ-শীল অথচ ব্যায়াম শূন্য হইয়া, আমরা দুর্ব্বল-প্রকৃতি হইয়া উঠিতেছি। পূর্ব্বে বিদ্যাশিক্ষার সময় ব্যায়াম এবং গুরুর আদেশমত কার্য্য-সম্পাদন প্রভৃতি দ্বারা দৈহিক-শক্তির উন্নতি করিয়া, বীর অবতার হইয়া শিক্ষার্থীগণ সংসারে প্রবেশ করিতেন।

পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্ম-নিরত ছিল—তাই প্রত্যা-হিক সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে অতিপ্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া, ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ-জন্য মুক্তসমীরণে বীরশক্তি লাভ করিত। এখন তাহা নাই। স্কুল কলেজে দুই চারি খানা ধর্ম্মপুস্তক পড়িলে কিছু ধর্ম্মশিক্ষা হয় না। ধর্ম্ম বড় কঠিন বস্তু, উহার শিক্ষাও কঠিন। আজীবন আচার-অনুষ্ঠান ব্রত-নিয়ম করিয়া, যাহা সাধনা করা যায় না, তাহা কি কখন সহজেই শিক্ষা হয়? পূর্ব্বে আচার্য্য-গৃহ হইতে গৃহীর গৃহ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের "শিক্ষা-নবিশি" চলিত। গৃহধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্য চলিত যথা—

"অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ।"

অর্থাৎ দার-পরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রমে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিবেনা। যথা—

"স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা—সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ।

দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখন স্বর্গ সুখ ও নিত্যসুখ আশা করিতে পারে না। যিনি নিত্য-সুখ এবং অক্ষয়-স্বর্গ আশা করেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্য-সম্পন্ন হইয়া গৃহস্থাশ্রম পালন করিবেন।

হিন্দু এইরূপ শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া, জগতের অধ্যাত্মরাজ্যে এক অতি মহতীকীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন। আমরা অদ্যাপি যাঁহার গুণে জগতের লোকের নিকট বলিয়া থাকি যে,

"হিন্দু ভিন্ন অপর কেহ ধর্ম্মের পূর্ণমূর্ত্তি ধারণা করিতে পারে নাই।" হায়! আমরা সেই দেবজন-সেবিত হিন্দুর বংশধর, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুত্ব হারাইয়া, কেবল হিন্দুর রক্ত মাংস-চর্ম্ম লইয়া; হিন্দুর দেশে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক হইয়া বাস করিতেছি।

ভাই হিন্দু! তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের শিক্ষা-প্রণালী কি আবার তোমরা অবলম্বন করিবে না? তোমাদের পূর্ব্ব প্রণালীর আবার অনুষ্ঠান না করিলে, তোমাদেরই দেশে তোমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। হিন্দুর শিক্ষাপ্রণালীর গৌরব অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতও স্বীকার করেন। তাই তাঁহারা স্কুলবোর্ডিং প্রভৃতিতে গুরু-শিষ্যের একত্র-বাস-প্রথা প্রচলিত করিতেছেন। আর তোমরা, সেই হিন্দুর রক্ত লইয়া, তাহা বিস্মৃত হইতেছ। আর বিপথে যাইওনা।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য,
মাগুরা।

হিন্দুরাজা সীতারাম রায়।

উপসংহার।

বাঙ্গের শেষ স্বাধীন স্বনামখ্যাত হিন্দু-ভূপতি মহাত্মা রাজা সীতারাম রায়ের জীবন-বৃত্তান্ত যতদুর অবগত হওয়া যায়, তৎসমুদায়ই বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণ তৎ প্রতিষ্ঠিত মহম্মদ-পুরস্থ বর্ত্তমান দেববিগ্রহগুলির মন্দির, সেবা, ভোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষেপে কিছু প্রকাশ করিয়া, এই প্রস্তাব হইতে অবসর গ্রহণ করিবার আশা আছে।

পুণ্যাত্মা রাজা সীতারাম প্রতিষ্ঠিত মহম্মদ-পুরের দেববিগ্রহগুলির মন্দিরাদির বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিলেই দর্শকের মনে স্বভাবতঃ শোক, বিষাদ ও দুঃখের ছায়া যুগপৎ উপস্থিত হয়। প্রত্যেক মন্দিরেরই জীর্ণ দশা। ৺দশ-ভুজা দেবী—নানাবিধ কারুকার্য্য খচিত পাকা খিলান "যোড় বাঙ্গলায়" অবস্থিত ছিলেন। মধ্যে এই মন্দিরটী ভগ্ন হওয়ায় প্রায় ২০ ২২ বৎসর গত হইল "যোড় বাঙ্গলার" পরিবর্ত্তে অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপরেও বৃক্ষাদি জন্মিতেছে। মন্দির রক্ষার্থ বিশেষ যত্নবান্ না হইলে, ইহার দীর্ঘ-স্থায়িত্ব আশা করা যায় না। এই দেবীর প্রাঙ্গণের অন্য তিন দিকে যে পাকা "যোড় বাঙ্গলা" ও মন্দির ছিল, তন্মধ্যে পশ্চিম দিকে শিল্প কার্য্য সুশোভিত মনোহর মন্দিরটীর ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে, অন্য কয়েকটীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। এই প্রবন্ধে যে সমস্ত অট্টালিকা ও মন্দিরের বিষয় লিখিত হইল, সে সকলই চিত্তরঞ্জক ও খিলান বুঝিতে হইবে।

৺দশভুজা দেবীর মন্দিরের পশ্চিম দিকেই ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের অষ্টকোণবিশিষ্ট গোলাকার দ্বিতল মন্দির ও প্রাঙ্গণ। রাজা সীতারামের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেই অদ্যাপি ৺লক্ষ্মী-নারায়ণ চক্র বিরাজ করিতেছেন। রাত্রিতে বিগ্রহটীকে উপরের প্রকোষ্ঠে শয়ন করাইয়া রাখা নিয়ম। মন্দিরটীর উপরিভাগে বৃক্ষাদি জন্মায় ও মন্দির রক্ষার্থ উপযুক্ত যত্ন ও চেষ্টা না করায়, ইহার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে যে—সামান্য বৃষ্টিপাতেই ছাত ভেদ করিয়া, মন্দিরাভ্যন্তরে জল পতিত হয়। মন্দিরটী স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব হইতে সামান্য মনোযোগপূর্ব্বক বৃক্ষাদির অঙ্কুরোৎপাটন করিয়া দিলে, অদ্যাপি সম্ভবতঃ মন্দিরটী সুন্দর

অবস্থায় থাকিত। অধুনা এই মন্দিরটীর সত্বরই সংস্কার আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণ একবার সংস্কার করা হইলে, আরও দীর্ঘকাল মন্দিরটী স্থায়ী হইতে পারে। ৺লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহের প্রাঙ্গণস্থিত অন্য অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। পশ্চিম দিকের অট্টালিকাটীর নিম্নের মহাল অদ্যাপি ভাল অবস্থায় আছে; উপরের মহালটী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে ও তদুপরি বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে।

রাজবাড়ীর উপরিস্থ অত্যুচ্চ সুন্দর দোল-মঞ্চটীও স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে ও জঙ্গলে আবৃত। দোলমঞ্চোপরি উঠিবার জন্য পশ্চাদ্ভাগে একটী সিড়ি ছিল, তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। দোলমঞ্চটীরও ভগ্ন দশা; কয়েক স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভিত্তি হইতে ইষ্টকাদি স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। এই দোল-মঞ্চটীর সংস্কার না হইলে, সম্ভবতঃ কিছু দিন পরে অধিক পরিমাণে ভগ্ন হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে।

৺দশভূজা দেবী ও ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের মন্দিরের পুরোভাগেই পাকা সুবৃহৎ পুষ্করিণী—অথবা রাজা সীতারামের গুপ্ত কোষাগার। এই পুষ্করিণীর নিম্নদেশ ও চারি ধার ইষ্টক দিয়া পাকা করিয়া বান্ধান। ইহার চতুষ্পার্শ্বে আবার শ্রেণীবদ্ধ ইষ্টকস্তম্ভ সজ্জিত ছিল, সেই সকল ইষ্টকস্তম্ভ রাত্রিতে আলোক-মালায় বিভূষিত হইত; তাহাতে পুষ্করিণীটীর সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইত। এক্ষণ ইষ্টক-স্তম্ভগুলির চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত প্রায়। বান্ধাঘাট ও স্থানে স্থানে পুষ্করিণীটীর ধার ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই জলেই দেবসেবার কার্য্য সম্পন্ন ও পার্শ্ববর্ত্তী লোকসমূহের বিশেষ উপকার হইতেছে। পুষ্করিণীটী এক্ষণ পঙ্কে পরিপূর্ণ, জলের উপরিভাগে শৈবালাদি জন্মিয়াছে; চৈত্র বৈশাখ মাসে খুব সামান্য জল থাকে। এই পুষ্করিণী সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার পঙ্কোদ্ধার করাইয়া দিলে, স্থানীয় মহৎ উপকার-লাভ ও একটী সুদৃশ্য পুণ্যকীর্ত্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়। সত্বর পঙ্কোদ্ধার না করাইলে, সম্ভবতঃ দেবসেবার জলের বিশেষ অভাব হইবে। ৺দশভূজা দেবীর প্রাঙ্গণের সম্মুখভাগে আর একটী পুষ্করিণী এরূপ জঙ্গলে আবৃত যে—তদুপরি গো, মেষ প্রভৃতি জন্তুগণ অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে। মহম্মদপুরে এরূপ জঙ্গলাবৃত জলাশয় অনেক রহিয়াছে, তাহাদের উল্লেখ অনাবশ্যক। উল্লিখিত দুইটী পুষ্করিণী দেবোদ্দেশে খনিত ও উৎসর্গিত। বিশেষতঃ পাকা বান্ধা পুষ্করিণীটী একটী দর্শনীয় কীর্ত্তি বলিয়াই লিখিত হইল।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে—মহম্মদপুর রাজধানীর অন্তর্গত রাজবাড়ীর এক মাইল পশ্চিম কানাইনগর নামক স্থানে রাজা সীতা-রামের প্রতিষ্ঠিত গোপকুল পরিবেষ্টিত গোপ-কুলাধিপতি ৺হরেকৃষ্ণ রায় (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি) নানাবিধ শিল্পকার্য্য খচিত, সৌধ-মালা পরিশোভিত ও উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন পঞ্চরত্ন মন্দিরে বিরাজিত আছেন। এই মন্দিরে প্রাচীন স্থপতি-বিদ্যার যথেষ্ট নিপুণতা দৃষ্ট হয়। দুঃখের বিষয় এই যে—৺হরেকৃষ্ণ রায় বিগ্রহের প্রকাণ্ড বাড়ী ও মন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে, মনে স্বভাবতঃ এক অনির্ব্বচনীয় অভূতপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হয়। পঞ্চরত্ন মন্দিরের দুইটী রত্ন বা চূড়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, অন্য

তিনটী চূড়ারও ভগ্নাবস্থা। মন্দিরটীর এরূপ জীর্ণদশা যে সামান্য বারি বর্ষণে মন্দিরাভ্যন্তরে অবস্থান করা যায় না। যে প্রকোষ্ঠে ৺হরেকৃষ্ণ রায় বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানটীতে কেবল সৌভাগ্যবশতঃ জল পতিত হয় না। মন্দিরটী ক্রমশঃ ভগ্নদশাগ্রস্ত হইতেছে; ইষ্টকাদি মন্দির হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে; কয়েকটী স্থান ফাটিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়াও গিয়াছে। সহসা কোন আগন্তুকের মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস হয় না। ইহার অন্য তিন দিক সুরম্য হর্ম্ম্যে সুসজ্জিত ছিল। উত্তর দিকের অট্টালিকাটী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, মধ্যে সংস্কার করা হইয়াছে; এই মন্দিরে ৺বনদেবজী বিগ্রহ বিদ্যমান আছেন। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের সুন্দর মন্দির দুইটী ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে, উপরে ও ভিতরে বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে। প্রাচীরাদি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে ইষ্টক রাশি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে; চতুর্দ্দিক ভয়ানক নিবিড় জঙ্গলে আবৃত। এই বিগ্রহের দোলমঞ্চটী ভগ্ন হইয়া একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে।

বিগত ১৩০৮ সালে এই বিগ্রহকে মহম্মদপুরে ৺রামচন্দ্র বিগ্রহের মন্দিরের কোণৈকদেশে আনিয়া রাখিবার জন্য নাটোর রাজধানী হইতে স্থানীয় প্রধান কর্ম্মচারী অর্থাৎ নায়েব মহাশয়ের প্রতি আদেশ হয়। জনপদস্থ ভদ্র লোক ও কানাইনগর-নিবাসী গোপগণ এই আদেশ জানিতে পারিয়া, "বিগ্রহটী স্থানান্তরিত হইলে কীর্ত্তিমান্ রাজা সীতারামের একটী প্রধানা ও মহতী কীর্ত্তি চিরদিনের জন্য লোপ পায়। হঠাৎ এতদিনের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ স্থানচ্যুত হইলে জনপদে অনেক দৈব অনিষ্টের আশঙ্কা আছে ও বিগ্রহটী অন্য স্থানে নীত হইলে পার্শ্ববর্ত্তী গোয়ালা প্রজাগণ তাহাদের পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গিয়া বাস করিবেক, তাহাতে আয় সম্বন্ধে ক্ষতির সম্ভাবনা"—ইত্যাদি কারণ দর্শাইয়া সেবাইত নাটোরাধিপতি মহারাজা বাহাদুরের নিকট বিনীতভাবে উপর্যুপরি কয়েকবার আবেদন করায়, অবশেষে সেই আদেশ রহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মন্দির সংস্কারের কোন বন্দবস্ত অদ্যাপি হয় নাই।

অনেক বিদেশীয় ব্যক্তি ও গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ মহম্মদপুরে আগমনপূর্ব্বক রাজা সীতারামের রাজবাড়ী ও তদীয় কীর্ত্তি কলাপ সন্দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রুতিপরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে—কিছুদিন পূর্ব্বে যশোহর জেলার পূর্ব্বতন মাজিষ্ট্রেট্ কালেক্টর মহামতি মিষ্টার্ জে, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বাহাদুর কার্য্যব্যপদেশে মহম্মদপুরে উপস্থিত হইয়া, রাজা সীতারামের রাজবাড়ী ও মন্দিরাদি দর্শন করিয়া, অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন এবং সীতারামের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তৎপ্রণীত যশোহরের ইতিহাসে লিপীবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনিই নাকি ৺হরেকৃষ্ণ রায় বিগ্রহের মন্দির ও বাড়ীর ভগ্নাবস্থা দেখিয়া, অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সংস্কারার্থ গভর্ণমেণ্টে আবেদন করেন; তদনুসারে ন্যায়বান্ দয়ালু গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন ইঞ্জিনিয়ার্ মন্দিরাদি সংস্করণের ব্যয় নির্দ্ধারণার্থ মহম্মদপুরে উপনীত হয়েন। ইত্যবসরে নাটোর রাজধানীতে—এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, সেবাইত মহারাজা বাহাদুরের পক্ষ হইতে সত্বর এই মন্দিরাদি সংস্কার করিয়া দিতে স্বীকৃত হওয়ায়, দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট সে-

প্রস্তাবে সম্মত হয়েন; ইঞ্জিনিয়ারটীও তাঁহার গন্তব্য স্থানে গমন করেন। এই প্রবাদ সম্পূর্ণ সত্য কি না—নিশ্চিত জানা যায় না। যদি ইহা প্রকৃত হয়—তবে কাগজ পত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, কার্য্যতঃ কিছুই দেখা যায় নাই ক্রমে ক্রমে মন্দিরটী একেবারে বাসের অনুপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। হায়! রাজা সীতারামের এত আদরের ও যত্নের মন্দিরাদির আজ এতদুর দুরবস্থা যে—একবার মনঃসংযোগপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে, অশ্রুবেগ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে! এই মন্দিরটীর আশু সংস্কার অত্যাবশ্যক, নচেৎ অচিরেই সম্পূর্ণ ভগ্ন দশায় পতিত হইবে।

৺হরেকৃষ্ণ রায় বিগ্রহের পুষ্করিণীটী ঘন জঙ্গলে আবৃত, পূর্ব্ব হইতে সামান্য যত্নপূর্ব্বক জঙ্গলগুলি পরিষ্কার করাইয়া দিলে, সম্ভবতঃ জল ভাল থাকিত। ইহার উপর যত্ন না থাকায় জল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে ও শৈবালাদি জলদ জঙ্গলে সম্পূর্ণ আবৃত আছে। সেই গুলি পরিষ্কারপূর্ব্বক জল তুলিয়া আনাও সহজ-সাধ্য নয়। দেবসেবার জল অন্যত্র হইতে আনীত হয়। অদ্যাপি ইহাতে সমস্ত সময়েই জল থাকে। জঙ্গল সমূলে বিনাশপূর্ব্বক পঙ্কোদ্ধার করাইয়া দিলে, এই জলে দেবসেবার কার্য্য সুন্দর রূপে চলিতে পারে এবং পার্শ্ববর্ত্তী লোকের জলকষ্ট নিবারিত হয়।

এরূপ শ্রুতিগোচর হয় যে—৺হরেকৃষ্ণ রায় বিগ্রহের নিষ্কর সম্পত্তি বেশী, অথচ তাঁহারই প্রকাণ্ড বাড়ী ঘন জঙ্গলে আবৃত হওয়ায় ব্যাঘ্র, শার্দ্দূল, বরাহ প্রভৃতি বন্য জন্তুর আবাসস্থান হইয়াছে! মন্দিরটীর যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা! দোলমঞ্চটী ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছে ও পুষ্করিণীটীর জল অব্যবহার্য্য।

এই মন্দিরের এক মাইল দক্ষিণে গোপালপুর গ্রামে ৺বুড়াশিব নামক একটী বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবাদিদেব মহাদেব আশুতোষ, মহাযোগী, মৃত্যুঞ্জয় ও শ্মশানবাসী—বলিয়াই বোধ হয় এই বিগ্রহের অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। রাজা সীতারাম একটী উচ্চ সুদৃশ্য মনোমুগ্ধকর মন্দিরে এই শিবলিঙ্গটী স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। কালের অপ্রতিহত প্রভাবে মন্দিরটী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, তন্নিকটে একখানা খড়ের গৃহে বিগ্রহটীকে কিছু দিন রাখা হইয়াছিল। গত ১৩০৮ সালে সেই খড়ের চালা তুলিয়া দিয়া, তথায় একখানা টীনের ঘর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাকা মন্দিরে অবস্থান ইঁহার ভাগ্যে আর জুটিয়া উঠে নাই। মন্দিরগুলির অবস্থা সামান্যতঃ লিখিত হইল, যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি এইগুলি একবার দর্শন করেন, তবে তিনিই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন।

বিগ্রহঠাকুরদের সেবা ও পর্ব্বাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বে কতকটা প্রকাশ করা হইয়াছে; নিম্নে বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষরূপে লিখিত হইতেছে। পুণ্যাত্মা রাজা সীতারাম এরূপ নিষ্কর ভূমি-সম্পত্তি বৃত্তিদান ও বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে—তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলির সেবা, ভোগ ও রাজবাড়ীর পর্ব্বোৎসবাদি রীতিমত সুসম্পন্ন হইতে পারে এবং প্রত্যেক দেবমন্দিরে অতিথি, অভ্যাগত ও সাধু সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া, ভোগের প্রসাদে সন্তোষ-চিত্তে জঠরানল নিবৃত্তি করিতে পারেন। কস্মিন্ কালেও মহম্মদপুরে অতিথি অভ্যাগত জনের অভুক্ত না থাকিতে হয়, ইহাই তাঁহার আন্তরিক উদ্দেশ্য

ছিল। অধুনা তাহার অনেক ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বের সেই নামটি মাত্র আছে, কার্য্যতঃ খুব সামান্যই রহিয়াছে।

স্থানীয় অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় যে—রাজা সীতারামের পরে নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা ও মহারাজ্ঞীদিগের রাজত্ব কালে মহম্মদপুরের গৌরব অনেকাংশে রক্ষিত হইত। বিশেষতঃ স্বর্গীয়া প্রাতঃস্মরণীয়া দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা পুণ্যশীলা রাণী ভবানীদেবী মহম্মদপুরের লুপ্তপ্রায় গৌরব পুনর্ব্বার বৃদ্ধি করিয়া তুলেন। তাঁহার রাজত্বকালে যাহাতে মহম্মদপুরের কোন অংশে অবনতি না ঘটে ও দেবসেবাদি পূর্ব্বনিয়মে সম্পাদিত হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তৎপরে ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে থাকে—বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অবনতি। আমরা বর্ত্তমান মহারাজের দৃষ্টিপাত প্রার্থনা করি।

বিগ্রহগুলির নিকট দৈনিক যে ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে, সেই ভোগের প্রসাদ অতিথি-অভ্যাগত ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ব্যয়িত হইবার নিয়ম—পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে। জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে দ্বিপ্রহরে ও রাত্রিতে ভোগের সময় যত অতিথিই উপস্থিত হউন না কেন, ভোগের প্রসাদে সকলেরই স্বচ্ছন্দে উদর পূর্ণ হইত। মধ্যে মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসীও দেব-মন্দিরে অবস্থান করিতেন। মহারাজ-ষ্টেটের স্থানীয় কোন কর্ম্মচারীরই এই প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় জঠরানল নিবৃত্তি করিবার নিয়ম ছিল না; সম্ভবতঃ অদ্যাপি রাজধানীর সেরূপ কোন আদেশ নাই। স্থানীয় লোকে এরূপও বলেন যে—যেদিন অতিথি-অভ্যাগতের সংখ্যা কম হইত ও প্রসাদ উদ্বৃত্ত থাকিত, সে দিন পার্শ্ববর্ত্তী জনপদস্থ লোকদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক প্রসাদ বিতরণ করা হইত। এই প্রসাদ-গ্রহণের স্থানীয় নাম "বেগার দেওয়া"। অদ্যাপি কেহ কোন বিগ্রহের বাড়ীতে গিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আসিলে বলেন "বেগার দিতে গিয়াছিলাম"। আজ কাল যেরূপ ভোগের বন্দোবস্ত ও নিয়মাদি প্রচলিত, তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় ভোগের প্রসাদে উদরতৃপ্তির আশা অতিথিগণের পক্ষে সুদুরপরাহত। আমরা এ বিষয়েও মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

রাজা সীতারামের প্রতিষ্ঠিত ৺দশভুজা, ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ও ৺হরেকৃষ্ণ রায় বিগ্রহের স্বতন্ত্র পাকা ভোগমন্দির ছিল। এক্ষণ সেগুলি ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, ৺দশভুজা দেবী ও লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত করার জন্য একখানা খড়ের ভোগঘর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই উভয় বিগ্রহের একত্র ভোগ প্রস্তুত হয়। কেবল ৺দশভুজা দেবীর ভোগের মৎস্য—উক্ত ঘরের ভিতর স্বতন্ত্র স্থানে পৃথক্ রন্ধন হয়। ৺হরেকৃষ্ণ রায় বিগ্রহেরও পাকা ভোগমন্দিরের পরিবর্ত্তে খড়ের ভোগগৃহ রহিয়াছে। ৺হরেকৃষ্ণ রায় ও ৺বনদেবজীর ভোগ একত্র প্রস্তুত হয়। গোপালপুরে ৺বুড়াশিবের কোন ভোগ দিবার নিয়ম নাই। ৺দশভুজাদেবী ও লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের একত্রে এবং ৺হরেকৃষ্ণ রায় ও বনদেবজীর এক সঙ্গে দ্বিপ্রহরে /৫ পাঁচসের ও রাত্রিতে অর্দ্ধসের ময়দাহিসাবে—অর্থাৎ চারি বিগ্রহের দ্বিপ্রহরে দশসের চাউল ও রাত্রিতে একসের ময়দার নিত্য ভোগের বন্দোবস্ত এক্ষণ রহিয়াছে। উক্ত চাউলের দ্বারা প্রত্যেক বিগ্রহের পূজার নৈবেদ্য ও ভোগ এবং ভোগের পায়সাদি সম্পন্ন

হইয়া থাকে; অন্যান্য উপকরণের পরিমাণও তদনুরূপ। অধিকন্তু মহম্মদপুর রাজবাড়ীর উপরিস্থ বিগ্রহ ঠাকুরদের ভোগের প্রসাদ বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ বিতরিত হয় না। অনেক সময় অতিথি ও প্রসাদ-প্রার্থীজন নিরাশ-চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে, শুনিতে পাওয়া যায়।

কানাই নগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায় বিগ্রহের ভোগের প্রসাদ অদ্যাপি অতিথি অভ্যাগত-দিগের জন্য ব্যয়িত হয়। অনেক সময় প্রসাদ-প্রার্থী ব্যক্তিগণ মহম্মদপুরে বিগ্রহ ঠাকুরদের বাড়ীতে গেলে, ব্যর্থমনোরথ হইতে হইবে ভাবিয়া, মহম্মদপুরে না গিয়া, কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীতে গমনপূর্ব্বক সন্তোষ-চিত্তে ভোগের প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হয়েন। দেব-প্রসাদ অতি আদরণীয় বলিয়া অনেক দেবভক্তজনও ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। স্থিরচিত্তে সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হয় যে—পুণ্যশ্লোক খ্যাতনামা রাজা সীতারাম "সর্ব্বদেবময়োঽ-তিথিঃ" এই মহদ্বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

রাজা সীতারামের রাজবাড়ীতে ৺জগ-দ্ধাত্রী ও ৺কার্ত্তিকেয়-পূজা ব্যতীত হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত শাক্ত ও বৈষ্ণব মতানুযায়ী প্রায় সমস্ত নিত্যপর্ব্বই সম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে অধিকাংশ পর্ব্বই উপযুক্ত ব্যয় সহকারে আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইত। বর্ত্তমানে ৺রথযাত্রা, ৺দুর্গোৎসব, ৺দোলযাত্রা ও ৺বাসন্তী পূজা উপলক্ষে কিছু ব্যয় হইয়া থাকে এবং নিকটস্থ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতিকে বিগ্রহ ঠাকুরদের বাটীতে প্রসাদ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। অন্য পর্ব্বাদি এরূপ নিয়মে সম্পন্ন হয় যে—স্থানীয় লোকে তাহা প্রায় জানিতেও পারেন না—অর্থাৎ নিয়ম রক্ষা করা হয় মাত্র। এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

এতদ্ব্যতীত ৺দশভূজা দেবীর প্রতি অমা-বস্যায় একটী বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। রাজা সীতারামের সময় হইতে প্রতি অমা-বস্যার পূজায় একটী ছাগ বলিদানের নিয়ম প্রচলিত ছিল; প্রবাদ আছে যে—প্রসাদা-কাঙ্ক্ষী কোন ব্রাহ্মণ অথবা প্রসাদ-ভক্ত সমাগত কোন অতিথির সন্তোষ সাধনার্থ স্থানীয় ভদ্রলোকগণের যে কেহ প্রার্থনা করিলে, এই ছাগ-প্রসাদ তাঁহাকে দিবার ব্যবস্থা ছিল। মহম্মদপুর রাজসমাজস্থ ব্রাহ্মণগণ দেবল ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক রন্ধন-করা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আহার করেন না বলিয়াই এই ছাগ-প্রসাদ এই নিয়মে বিতরিত হইত।

প্রায় ৭। ৮ বৎসর গত হইল—নাটোর রাজধানী হইতে জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী (মুন্সী) রাজ-কার্য্যবশতঃ মহম্মদপুরে ৺বৃত্তির কাছারীতে আগমনপূর্ব্বক কিছু দিন অবস্থান করেন। তিনিই নাকি এই চিরন্তনী মহতী প্রথা রহিত করিয়া, উক্ত ছাগ-প্রসাদ দেবীর ভোগে দিবার আদেশ প্রদান করেন। তদ-বধি এই ছাগ-প্রসাদ দেবীর ভোগে দেওয়া হইত এবং প্রসাদ-প্রার্থীদিগের জন্য সেই দিন অন্ন-ভোগের পরিমাণও কিছু বেশী ছিল। বর্ত্তমানে এই ছাগ বলিদানও রহিত হইয়াছে।

৺দুর্গোৎসবের নবমী পূজার দিন দেবী দনুজদলনী, আদ্যাশক্তি, পরমা প্রকৃতি, চিন্ময়ী মহামায়ার সন্তোষ সাধনার্থ রাজা সীতারামের সময় হইতে একটী মেষ ও মহিষ বলিদানের নিয়ম

ছিল। শুনাযায়, বিগত ১৩০৮ সালে সেবাইত নাটোরাধিপতি মহারাজা বাহাদুরের পক্ষ হইতে এই মেষ ও মহিষ এবং উল্লিখিত ৺দশভূজা দেবীর প্রতি অমাবস্যায় পূজায় ছাগ বলিদান রহিত করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য তদুপযুক্ত মূল্যদ্বারা অন্য কোন বিশেষ ভোগাদির ব্যবস্থা হয় নাই। স্থানীয় ভদ্রলোকবৃন্দ মহারাজ বাহাদুরের নিকট এ সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে কয়েকবার আবেদন করায় কোন ফল লাভ হয় নাই। আমাদের মনে হয়, আবেদন মহারাজের গোচর হয় নাই। ২০০ শত বৎসরের অধিক কাল এই বলিপ্রথা প্রচলিত। নাটোরের মহারাজগণ বৈষ্ণবমতাবলম্বী হইয়াও এতদিন এই প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই; বরং মহম্মদপুরের রাজবাড়ীর পূজা, বলি ইত্যাদিতে কোন বাধা বিঘ্ন না ঘটে, তৎপক্ষে নাটোর-মহারাজ-ষ্টেটের বিশেষ যত্ন ও দৃষ্টি ছিল। এরূপ শ্রুতিগোচর হয় যে, মহম্মদপুরে ৺বৃত্তির কাছারীতে ৺দীননাথ বক্সী মহাশয় নায়েব থাকা কালীন একবার ৺দুর্গোৎসবের সময় মহিষ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় তিনি নাটোর রাজধানীতে লিখেন যে—মহিষ পাওয়া সুকঠিন, অতএব রাজধানীর আদেশ হইলে মহিষের মূল্য দ্বারা স্বতন্ত্র ভোগের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তদানীন্তন মহারাজ্ঞী এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, তৎক্ষণাৎ নায়েব মহাশয়ের উপর কঠোর আদেশ প্রদান করেন যে—মহিষ যথাসময়ে মা মহিষ-মর্দ্দিনীর নিকট বলিদান করিতেই হইবে; তাহাতে যত টাকাই ব্যয় হউক্ না কেন, রাজষ্টেট্ তাহা দিতে কুণ্ঠ হইবেন না। আরও আদেশ করেন যে, যদি যথাসময়ে দেবীর নিকট মহিষ বলিদান করা না হয়, তবে নায়েবকে পদচ্যুত করা হইবে। অবশেষে নায়েব মহাশয় বহু কষ্টে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, মহিষ সংগ্রহপূর্ব্বক নবমী পূজার দিন মা জগজ্জননী, বরাভয়প্রদায়িনী, সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী দশভূজা দুর্গা দেবীর সন্তোষাভিলাষে যথাবৎ বলিপ্রদান করেন। নবমী পূজার দিন এই মহিষ বলিদান দর্শন-মানসে মহম্মদপুর-রাজবাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হইত; কারণ মহম্মদপুরের চতুষ্পার্শ্বে ১৩।১৪ ক্রোশের মধ্যে কোথায়ও মহিষ বলিদান করা হয় না। বর্ত্তমানে ৺দুর্গোৎসব, ৺শ্যামা ও ৺বাসন্তী পূজার সময় প্রত্যেক পূজায় একটী করিয়া ছাগ ও চৈত্রসংক্রান্তিতে ৺নীল পূজা উপলক্ষে একটী ছাগ ও একটী মেষ বলিদানের প্রথা প্রচলিত আছে।

অধুনা দেবসেবার অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। সময়ের পরিবর্ত্তনও ইহার অন্যতম কারণ। পূর্ব্বের অবস্থার সহিত তুলনা করিতে গেলে, এক্ষণ কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আনুপূর্ব্বিক সমস্ত লিখিতে গেলে, প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি হইয়া পড়ে—ভয়ে প্রধান কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল।

রামসাগর প্রভৃতি জলাশয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু রামসাগরে বর্ত্তমান সময়ে সামান্য পরিমাণ শৈবালাদি জলজ জঙ্গল দেখা যাইতেছে, এক্ষণ হইতে উহা দূরীকরণের চেষ্টা না করিলে, অচিরকাল মধ্যে রামসাগর জলজ জঙ্গলে আবৃত হইবার সম্ভাবনা। রামসাগর যেমন রাজা সীতারামের একটী প্রধান জলকীর্ত্তি, তেমন স্থানীয় লোকের জীবনস্বরূপ, অর্থাৎ স্থানীয় লোকের জলকষ্ট নিবারণের উপায় এই একটিমাত্র দীর্ঘিকা এক্ষণ রহিয়াছে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে—৺কার্ত্তিকেয়পূজার

সময় রামসাগরে ৺কার্ত্তিকেয়ের মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি বিসর্জ্জিত হইয়া থাকে,—তাহাতে অন্যূন পাঁচ ছয় শত মণ মৃত্তিকা প্রতি বৎসর রাম-সাগরে পতিত হয়। বিগত ১৩০৮ সালে প্রবন্ধলেখক এই কার্ত্তিকেয়মূর্ত্তি রামসাগরে বিসর্জ্জিত হইলে, রামসাগরের অনেক অনিষ্ট হয় বলিয়া, উহা রহিত-করণ-মানসে নাটোরাধিপতি মহারাজবাহাদুরের নিকট আবেদন করায়, মহারাজ বাহাদুর রামসাগরে কার্ত্তিকেয়-মূর্ত্তি বিসর্জ্জন-প্রথা রহিত করিয়া দিয়া, স্থানীয় মহোপকার সাধন করিয়াছেন। গত বৎসর হইতে রামসাগরে কার্ত্তিকেয়মূর্ত্তি বিসর্জ্জন-প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে।

রাজা সীতারামের জীবন চরিত ও তৎ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলির মন্দির, সেবা, ভোগ ইত্যাদির বর্ত্তমান অবস্থা যথাসাধ্য প্রকাশিত হইল। বঙ্গবাসী মাত্রেরই রাজা সীতারামের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত; তিনি বঙ্গের ও হিন্দুরগৌরব-রক্ষার্থ ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে স্বহস্তে ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ণ হিন্দুরাজ্য সংগঠন করিয়া চিরকীর্ত্তি স্থাপনা পূর্ব্বক প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহার যশঃসৌরভ নিম্নবঙ্গের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। রাজ্য-মধ্যে অনেক স্থানে রাজা সীতারামের গৌরব-প্রদীপ এক্ষণও প্রজ্জ্বলিত। তাঁহার কীর্ত্তিগুণেই মহম্মদপুর পরিচিত ও গৌরবান্বিত। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ সন্দর্শনপূর্ব্বক অনুধাবনা করিয়া দেখিলে, সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে—পরোপকার, জলাশয়-খনন, দেবমন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি নিষ্কর সম্পত্তি দান—ইত্যাদি বহুবিধ সৎকার্য্যই তাঁহার পুণ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। রাজা সীতারাম যেমন সৎসাহসী, স্বাধীনচেতা, বীরাগ্রগণ্য, তেমন দয়া-দাক্ষিণ্য, উদারতা ইত্যাদি সদ্গুণেও বিভূ-ষিত ছিলেন। এক্ষণ তদীয় কীর্ত্তিগুলি দীর্ঘ-স্থায়ী হইলে, আরও অনেক কাল তাঁহার যশঃসূর্য্য বঙ্গবাসীর হৃদয়াকাশে সমুদিত থাকিবে। রাজা সীতারাম বহুদিন অনিত্য মায়াময় ভবধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিধামে গিয়া, শান্তিময়ের কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ ও চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। কুটিলকালচক্রের পরিবর্ত্তনশীল আবর্ত্তনে তদীয় জীবনবৃত্তান্তও বিলুপ্তপ্রায়। একমাত্র কীর্ত্তিবলেই তিনি অদ্যাপি বাঙ্গালীর গৌরবের ধন ও ইতিহাসের সমালোচ্য কীর্ত্তিগুণেই মানব ইহধাম পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার নাম, যশঃ, খ্যাতি, গৌরব ইত্যাদি চিরস্থায়ী হয়;—তাই কবি বলিয়াছেন—

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥"

শ্রীবরদাকান্ত দেব।
(মহম্মদপুর।)

শঙ্কর-গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

অতঃপর নৈমিষকাননবাসী ব্রাহ্মণগণ নিবিষ্টচিত্তে সূত-মুখ হইতে "বিরজা" দীক্ষা শুনিতে লাগিলেন। সূত কহিলেন—হে ব্রাহ্মণ-গণ! অগস্ত্য রামচন্দ্রকে কহিলেন—

"এবং চেচ্ছরণং যাহি পার্ব্বতীপতিমব্যয়ং।
স চেৎ প্রসন্নো ভগবান্ বাঞ্ছিতার্থং প্রদাস্যতি॥

দেবৈরজেয়ঃ শক্রাদ্যৈর্হরিণা ব্রহ্মণাপি বা ।
স তে বধ্যঃ কথং বা স্যাৎ শঙ্করানুগ্রহংবিনা ॥
অতস্ত্বাং দীক্ষয়িষ্যামি বিরজামার্গমাশ্রিতঃ ।
তেন মার্গেন মর্ত্ত্যত্বং হিত্বা তেজোময়োভব ॥
যেন হত্বা রণে শত্রূন্ সর্ব্বান্‌কামানবাপ্স্যসি ।
ভুক্ত্বা ভূমণ্ডলে চান্তে শিবসাযুজ্যমাপ্স্যসি ॥”

অর্থাৎ—হে রঘুপতি! যদি মনে শত্রু-বিজয় ইচ্ছা থাকে, তবে অব্যয় পার্ব্বতীপতি মহাদেবের শরণাপন্ন হও; তাহা হইলে নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারিবে। সেই দেবদেব আশুতোষ অপ্রসন্ন হইলে, কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্রাদি দেবগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কেহই দশাননকে বিনাশ করিতে পারিবে না। শঙ্করের অনুগ্রহ ব্যতীত কখনও তুমি তাহাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হইবে না। আমি এই কারণেই তোমাকে “বিরজা” মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চাহিতেছি।

তুমি এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মর্ত্ত্যতা-পরিহারপূর্ব্বক পরম তেজোময় হইয়া—অরাতি বিনাশ করতঃ পূর্ণকাম হইবে এবং এই ভূমণ্ডলে অনন্ত সুখ-শান্তি লাভ করিয়া অন্তে শিবসাযুজ্য লাভ করিতে পারিবে।

মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের এই মহাচিত্তবিনোদক বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র মহাহৃষ্ট অন্তঃকরণে মুনিসত্তমকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ শোক বিসর্জ্জন করিয়া পুলকিত হৃদয়ে কহি-লেন—

“কৃতার্থোঽহং মুনে জাতো বাঞ্ছিতার্থঃ সমাগতঃ
পীতাম্বুধিঃ প্রসন্নস্ত্বং যদি মে কিমু দুর্ল্লভং ॥
অতস্ত্বং বিরজাদীক্ষা ব্রূহিমে মুনিসত্তম ॥”

হে মুনে! আমি আপনার অনুগ্রহে কৃত কৃতার্থ হইলাম। আমার সিদ্ধি যেন আমার সম্মুখে উপস্থিত বোধ হইতেছে; সুতরাং আমারে বিরজা দীক্ষা প্রদান করুন। আপনি যখন ইচ্ছায় এই অসীম সমুদ্র গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন এবং সেই আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আর আমার দুর্লভ কোন বস্তুই নাই। শ্রীরাম চন্দ্রের এই কথা শুনিয়া অগস্ত্য উত্তর করিলেন—

হে রঘুকুলতিলক! শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী, অষ্টমী কিম্বা একাদশীতে আর্দ্রা নক্ষত্র যোগে সোমবার হইলে, বিরজা দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। সেই বায়ু, যম, অগ্নি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের জনক এবং আরাধ্য শিবকে পরাৎপর পরমেশ্বর অথবা পরাৎপরতর অনাদি সনাতন জানিয়া, ধ্যানশক্তি দ্বারা অগ্নি সংযোগে* অবসথ্যাগ্নিকে পৃথগ্‌রূপে বিশোধন করিয়া জগৎকাণ্ডের মূল যে পঞ্চভূত, তাহাকে সংযত করিবে। আর গুণাধিক্রমে মাত্রাশূন্য অথবা এক, দ্বি, ত্রি, চারি কি পঞ্চমাত্রা অনুসারে দ্বাদশাত্মক ব্যবস্থিত নিয়মে সংস্থাপিত করিয়া পবিত্র ভাবে অমৃত স্বরূপ হইয়া পাশুপত ব্রত আচরণ করিবে, যথা—

“শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা বিশেষতঃ ।
একাদশ্যাং সোমবারে আর্দ্রায়াং বা সমারভেৎ ॥
যং বায়ুমাহুর্যং রুদ্রং যমাগ্নিং পরমেশ্বরং ।
পরাৎপরতরং তত্ত্বং পরাৎপরতরং শিবম্ ॥
ব্রহ্মণো জনকং বিষ্ণোর্বহ্নের্বায়োঃ সদাশিবং ।
ধ্যাত্বা চাবসথ্যাগ্নিঞ্চ বিশোধ্যচ পৃথক্ পৃথক্ ॥
পঞ্চভূতানি সংযম্য ধ্যাত্বা গুণবিধি ক্রমাৎ ।
মাত্রাঃ পঞ্চ চতস্রশ্চ ত্রিমাত্রা দ্বিস্ততঃপরং ॥
একমাত্রমমাত্রং বা দ্বাদশান্তং ব্যবস্থিতং ।
স্থিত্যা স্থাপ্যামৃতো ভূত্বা ব্রতং পাশুপতং চরেৎ ॥”

* গার্হস্থ্যাগ্নি ।

হে রামচন্দ্র! প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, আমি পাশুপত ব্রত আচরণ করিব, এই সংকল্প করিয়া নিজ নিজ শাখার মত অনুযায়ী অগ্নি স্থাপন করিবে। স্নানান্তে পবিত্র হইয়া, শুক্লবস্ত্র, শুক্ল যজ্ঞ-উপবীত, শুক্লমাল্য এবং অনুলেপন ধারণ করিয়া উপবাসী থাকিবে। প্রাণাপান প্রভৃতি বায়ুর যোগে বিরজা মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে এবং সমিধ, ঘৃত, চরু প্রভৃতি দ্রব্যগুলি একমনে সংগ্রহ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংস্থাপন করিবে। তাহার পর আপন আত্মার অগ্নি অর্থাৎ তেজ সমাহরণ পূর্ব্বক "যাতে অগ্ন" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মার্জ্জনপূর্ব্বক অঙ্গ স্পর্শ করিবে। ভস্মই অগ্নির বীর্য্য; সুতরাং ভস্ম গ্রহণ করিলে জ্ঞানীরা মহাপাতক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া ভস্মের উপর শয়ন করেন, তিনি পাতকরাশি হইতে মুক্তি লাভ করতঃ শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। যথা—

"ইদং ব্রতং পাশুপতং করিষ্যামি সমাসতঃ।
প্রাতরেব তু সঙ্কল্প্য নিধায়াগ্নিং স্বশাখয়া॥
উপোষিতঃ শুচিঃ স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ স্বয়ং।
শুক্লযজ্ঞোপবীতশ্চ শুক্লমাল্যানুলেপনং॥
জুহুয়াদ্বিরজামন্ত্রৈঃ প্রাণপানাদিভিস্ততঃ।
অনুরাগান্তমেকান্তঃ সমিধাজ্যচরূন্ পৃথক্॥
আত্মন্যগ্নিং সমারোপ্য যাতে অগ্নেতি মন্ত্রতঃ।
ভস্মাদায়োগ্নিরিত্যাদ্যৈর্ব্বিমৃজ্যাঙ্গানি সংস্পৃশেৎ॥
ভস্মচ্ছন্নো ভবেদ্ বিদ্বান্ মহাপাতকসম্ভবৈঃ।
পাপৈর্ব্বিমুচ্যতে সত্যমুচ্যতে চ ন সংশয়ঃ॥
বীর্য্যমগ্নের্যতো ভস্মং বীর্য্যবান ভস্মসংযুতঃ।
ভস্মস্নানরতো বিপ্রো ভস্মশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
এবং কুরু মহাভাগ শিবনাম সহস্রকং॥
ইদন্তু সংপ্রদাস্যামি তেন সর্ব্বার্থমাপ্স্যথ॥"

হে মহাভাগ! তুমিও এই রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, তোমাকে আমি শিবের সহস্র নাম প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাদ্বারা ইচ্ছামত ফল লাভ করিতে পারিবে।

অতঃপর সূত বলিলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য রামচন্দ্রকে বলিলেন—হে রামচন্দ্র! তুমি এইক্ষণ বেদাঙ্গ নামক শিব সহস্রনাম গ্রহণ কর। ইহাদ্বারা প্রতিনিয়ত শিবসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

"ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈ শিবনাম সহস্রকং।
বেদসারাভিধং নিত্যং শিবপ্রত্যক্ষকারকং॥"

আর দিবানিশি শিবের এই সহস্র নাম জপ কর। তাহা হইলে ভগবান্ পশুপতি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া "পাশুপত" নামক মহাস্ত্র প্রদান করিবেন। তুমি তাহাদ্বারা শত্রু বিনাশ করিয়া প্রিয়তমা পত্নী জনকনন্দিনীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিবে। যথা—

"উক্তঞ্চ তেন রাম ত্বং জপনিত্যং দিবানিশং।
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ মহাপাশুপতাস্ত্রকং।
তুভ্যং দাস্যতি তেন ত্বং শত্রূন্ হত্বাপ্স্যসি প্রিয়াং॥"

এই মহা অস্ত্রের গুণে তুমি সমুদ্র শোষণ করিতে পারিবে। পার্ব্বতীপতি শঙ্কর এই অস্ত্রের প্রভাবে এই চরাচর জগৎ সংহার করিয়া থাকেন। হে রাম! সেই অস্ত্রের অভাবে তোমার পক্ষে দানববিজয় (রাক্ষস জয়) করা নিতান্ত দুরূহ। অতএব তাহা লাভ করিবার জন্য শঙ্করের শরণাপন্ন হও। যথা—

"তস্যৈবাস্ত্রস্য মাহাত্ম্যাৎ সাগরং শোষয়িষ্যসি।

সংহারকালে জপতামস্ত্রং তৎ পার্ব্বতীপতেঃ॥
তদলাভে দানবানাং জয়স্তব সুদুর্লভঃ।
তস্মাল্লব্ধুং তদেবাস্ত্রং শরণং যাহি শঙ্করম্॥"

(ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উপরিভাগে শঙ্কর-গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে রাঘব সংবাদে "বিরজা দীক্ষা নিরূপণং" নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।)

এই ত হইল শঙ্করগীতায় বিরজা দীক্ষা। এই দীক্ষার গুণে ভার্য্যাবিয়োগকাতর রামচন্দ্র পরমবৈরী রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন একটি কথা আছে ? আমরা যখন আমাদের হিন্দু জাতির সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রের সার-সংগ্রহ শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করি, তখন অর্জ্জুনকে সমরে নিয়োগ করিতে মহাযোগা-চার্য্য পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়া, পরিশেষে "ধর্ম্মযুদ্ধ" এই কথাটি বলিয়া নিষ্কাম তত্ত্বে উপদিষ্ট করিয়াছিলেন, দেখিতে পাই। গীতার প্রাধান্য বা বিশেষত্ব সেই স্থান হইতে আরম্ভ হয়—কিন্তু এই "শঙ্করগীতা" হইতে আমরা চর্ব্বিতচর্ব্বণ কতকগুলি উপ-দেশ পাই ভিন্ন গীতার ন্যায় ওরূপ সর্ব্ব-জাতীয় সর্ব্বধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গের সার উপদেশ পাই কই ?—সেস্থানে কৌরববিজয় ধর্ম্ম ও দেশ-রক্ষার মূল বলিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ—আর এই স্থানে রাবণবিজয় ব্যক্তিগত লাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। * তথাপি শঙ্করগীতার প্রচারক ঋষি হউন, আর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ঠাকুরই হউন, ইহাকে যোগশাস্ত্রের অঙ্গ বলিতে এবং পরম পবিত্র উপনিষদ্ বলিতে ছাড়েন নাই। বস্তুতঃ এই সকল প্রক্ষিপ্ত গীতাগুলির মূল ভিত্তি কি সেই "মহাগীতা" নহে ? যাহা হউক, আমরা অনুবাদক,—প্রচারক নই; যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, তিনি সেইরূপ ভাবে এই শঙ্কর-গীতার অভিপ্রায় গ্রহণ করিবেন, ইহাই নিবেদন। এই গীতাখানি আকারে নিতান্ত কম নহে। আগামীতে এই গীতার আর একটি উৎকৃষ্ট অংশ "শিব প্রভাব" নামক শিক্ষার অনুবাদ প্রকাশ করা যাইবে।

আমার একটি নিবেদন আছে; হিন্দু পত্রিকার পাঠকগণ যদি শঙ্করগীতার মুদ্রিত কোন পুস্তক দেখিয়া থাকেন, তবে তাহার একখণ্ড পুস্তক অথবা প্রাপ্তিস্থানের সংবাদ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে দিয়া বাধিত করিবেন—আমি আমাদের গৃহস্থিত তুলটে লেখা পুঁথির সমস্ত স্থান ভালরূপ পড়িতে পারিতেছিনা, তাই এই অনুবাদের স্থানে স্থানে গোলযোগ ঘটিতেছে।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।
(মাগুরা—যশোহর)

---

* রামচন্দ্রের ব্যক্তিগত লাভ উপলক্ষ্য ধরিলেও, ফলিতার্থে দেশগত—সমগ্রভারতগত লাভই সংসাধিত হইয়াছিল। রাবণের উপ-দ্রবে ত্রিলোক ত্রাসিত হইয়াছিল, ইহা পুরাণ-শাস্ত্রে পরিবর্ণিত। রামচন্দ্রও ত্রেতার যুগাবতার; সুতরাং ধর্ম্মস্থাপন, সাধুত্রাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ, ভগবদবতারের এই (গীতা-বর্ণিত) উদ্দেশ্যত্রয় রাবণবধেও সিদ্ধ হইয়াছিল; সুতরাং "শঙ্করগীতা" (তর্কস্থলে) উপগীতা বা অনার্ষ-গ্রন্থ ধরিয়া লইলেও, শাস্ত্রীয় তাত্ত্বিকতায় গৌর-বান্বিত, সন্দেহ নাই।

(হিং পঃ সঃ)

সাধুগীতি।

(১)

এই দেখ দেখ প্রভু! কি হয়ে গিয়েছে
তুষারধবল সেই পরাণ আমার,
যবে ইহা পেয়েছিনু, আহা মরি মরি!
কি ছিল ইহার জ্যোতি, সুগন্ধ ইহার।
দেবভূমি নন্দনের,
চন্দনচর্চ্চিত বায়,
সে বিমল শুভ্র জ্যোতি,
আদরে মাখিয়া গায়;
যবে হত প্রবাহিত হৃদয়ে আমার,
সে দিনের কথা প্রভু! কি কহিব আর
কত আশা মনে মনে হইত সঞ্চার,
হব সুখী দিয়ে পদে, অঞ্জলী ইহার।

(২)

কিন্তু এবে ভাগ্যদোষে, ছিন্ন ভিন্ন-ম্লান
অমল কমল তুল্য ফুল্ল সেই প্রাণ।
ভাগ্য বশে অবশেষে শেষ লেশ তার,
ছাই ভস্ম যাহা আছে, পূতিগন্ধসার!
কাঁপে দুর দুর হিয়া,
এবে তাই দয়াময়!
দিব আমি ফিরাইয়া
কেমনে ও রাঙা পায়?
বিবিধ-সংসার-তাপ-দগ্ধ হৃদয়ের যত
অতৃপ্ত কামনা-ক্লিন্ন ছাই ভস্ম রাশি।
তাই ভাবি ও অতুল রাতুল শ্রীপদে
ভস্মাঞ্জলি দানে তোমা কেমনে বা তুষি?

(৩)

বহুরূপী ব্যাঘ্র ছয় বসিয়া শিয়রে,
বাজায় মোহন, বাঁশী তারা অনিবার;
এমনি পাগল ক'রে উঠায় পরাণে,
শুনেনা আমার কথা পরাণ আমার।
লুঠিতে অমরাবতী,
হরিতে ইন্দ্রের সতী
তাদের মন্ত্রণা শুনে
পাগল পরাণ ধায়,
বুদ্ধিমান বলে প্রভু! প্রাণে ফিরাইতে,
বিবেক প্রহরীটিরে দিয়াছিলে সাথে,
আমার কপাল দোষে প্রতিভা তাহার
এতই মলিন প্রভু! কি বলিব আর!

(৪)

ইন্দ্রিয়নিচয় মোর তার সহচর,
চারিভিতে সাধে যত কামনা তাহার
না রাখে যমের ডর, বিবেক তাড়না,
কিছুই মানে না প্রভু! দোহাই রাজার!
হাতে হাতে প্রতিফল
ভোগ করি অহরহ,
দগ্ধীভূত এবে প্রভু!
হয়েছে প্রাণের দেহ,
আছে মাত্র অবশেষ, ছাই ভস্ম যত,
তাই এবে দয়াময়! ভাবনা-নিরত;
তোমারি সৃজিত ইহা, তুমি না রাখিলে,
তাপদগ্ধ বিশ্বে তার গতি কোথা মিলে?
তোমার সৃজিত প্রাণ
তোমারি শীতল পায়
যদি না রাখিবে প্রভু!
তবে আর "দয়াময়"
নামে বিশ্বে কি বিশ্বাসে রটিবে ঘোষণা?
বিশ্বাসে আশ্বাস বিনা জগৎ রবে না।
তাই বলি শ্রীচরণ-তলে দয়াময়!
দিয়া ঠাঁই, কর শান্ত ব্যাকুল হৃদয়।

শ্রীঅটলবিহারী দাস।

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৫শ বর্ষ, ১৫শ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ। ১৩১৫ সাল, ১৮৩০ শকাব্দা।

মাতৃ-ভুমির সেবা।

হিন্দু বঙ্গবাসীগণ চিরকালই ধর্ম্মের অনুগত। অধর্ম্মের দ্বারা কোন ব্যক্তি বা সমাজ কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না বা কখনও করে নাই। কতকগুলি বিকৃত মস্তিষ্ক ভ্রান্ত যুবকের কার্য্যাবলী দ্বারা সম্প্রতি বঙ্গদেশ কলঙ্কিত হইতেছে। যাহাতে নরহত্যা প্রভৃতি পাপ বঙ্গদেশ কলঙ্কিত না করিতে পারে, তজ্জন্য সকলেরই বদ্ধ পরিকর হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য সাধু হইলেও, কেহ অসদুপায়ের অনুমোদন করিতে পারে না।

কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টীয়ান—জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে—সকলের নিকট আমাদের এই বিনীত নিবেদন যে তাহারা আমাদের দেশের, আমাদের মাতৃ ভুমির সুশান্তি সংরক্ষণে বদ্ধ পরিকর হউন। যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছে, আর ক্ষণবিলম্ব করাও উচিত নহে।

দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়া বলা যায় না। তাঁহারা যেন কতকটা নিশ্চিন্ত ও উদাসীন রহিয়াছেন। বিবেক বিহীন ব্যক্তি দিগের ব্যাঙ্গোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া প্রকৃত কথা বলিতে যে বিশেষ চরিত্র বলের প্রয়োজন, তাহা না বুঝি এমন নহে; কিন্তু যাহা বলা উচিৎ তাহা যদি না বলিতে বা যাহা করা উচিৎ তাহা যদি না করিতে পারিলে, তাহা হইলে জীবন ধারণে ফল কি? বহুল প্রচারে মিথ্যা যখন সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া উঠে, তৎ প্রশমনে চেষ্টা না করা মহা পাপ; সুতরাং যাহাই কেন হউক না, প্রকৃত সত্যের প্রকাশ ও প্রকৃত কর্ত্তব্যের সম্পাদন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

স্বদেশকে মহিমান্বিত দেখিতে,

হয় না, সে পাষণ্ড। কিন্তু কোন স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তিই অরাজকতার প্রশ্রয় দিতে পারেন না।

শাসন প্রণালীর সংস্কার প্রার্থনা করিতে আমরা সম্পূর্ণ অধিকারী, উহাতে যে সমুদায় দোষ আছে, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করা আমাদের উচিত। প্রজাদের উত্তরোত্তর রাজনৈতিক অধিকার পাওয়ার জন্য চেষ্ট করা আবশ্যক। কিন্তু যাহারা গবর্ণমেণ্টের দোষ অতিরঞ্জিত করিয়া, উহার সমুদায় সদ্গুণ গোপন করিয়া, স্বদেশ হিতৈষণার নামে উহার প্রতি একরূপ বিদ্বেষ ও ঘৃণার উত্তেজনা প্রচারিত করিবার ধারাবাহিক অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাদের কার্য্য কখনও অনুমোদন করিতে পারি না। অরাজকতা দেশে সুশাসন আনায়ন করিতে পারে না।

যে দেশে সম্রাট স্বয়ং বাস করেন না, এমন কি যেখানে তাঁহার দর্শন পাওয়াও একপ্রকার অসম্ভব, সে দেশে নিয়মের বশীভূত থাকাই রাজভক্তি প্রদর্শনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। সাধারণ জনমণ্ডলীকে আইনের মর্য্যাদা ভঙ্গ করিতে উত্তেজিত করিয়া, এবং অপরিণত বয়স্ক বালকদিগের মনে নিয়ম পরতন্ত্রতা ও বাধ্যতার পরিবর্ত্তে অবাধ্যতা ও অনিয়মের প্রাধান্য সংস্কার দৃঢ়ীভূত করিয়া আমরা কখনও কি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব?

যাহাদের চরিত্র গঠিত হয় নাই, যাহারা ধর্ম্মভীরু নহে, যাহারা শাসনাধীন হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিপথগামী ও বিভ্রান্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাদের উপর নির্ভর করিলে আমরা কোন উত্তম কার্য্য সম্পাদনেই সমর্থ হইব না।

চিনি এবং লবণ ব্যবহার করা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, কিন্তু উহা বহুল পরিমাণে উৎপন্ন না করিয়া উহা ব্যবহারের কথা বলায় ফল হয় না। উহা বহুল পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া নিজেদের ব্যবহার করিতে হইবে, এবং বিদেশে রপ্তানীর দ্বারা যাহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু স্বদেশ জাত দ্রব্য উৎপন্ন না করিয়া মৌখিক সুদীর্ঘ স্বদেশী আন্দোলনের চিৎকার করিলে কোন ফল হয় না। যাঁহারা দেশে কল কারখানা শিল্প বাণিজ্যের দ্বারা স্বদেশের ধন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা দেশের যথার্থ উপকার করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।

বাঙ্গালীরা স্বদেশী স্বন্ধে অনেক আন্দোলন করিয়া একটী মাত্র কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে বোম্বাই দেশবাসীগণ এসম্বন্ধে অধিক হৈ চৈ করেন নাই, অথচ এদেশে স্বদেশী আন্দোলনের নাম শ্রুত হইবার পূর্ব্ব হইতে বোম্বে প্রদেশে বহু বস্ত্রবয়ন কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। "পার্শী" জাতি যাহারা বিদেশী বর্জ্জনের কথাও মুখে আনে নাই, তাহারা বাণিজ্য বিভাগে কি আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করে নাই? তাহারা কি আমাদের ন্যায় একই আইনের অধীনে বাস করে না? তাহারাও আমাদের ন্যায় সর্ব্ববিধ বৈদেশিক শাসন জনিত অসুবিধার মধ্যে বাস করিতেছে। তাহাদের বাণিজ্য বিষয়ে অদম্য উৎসাহ এবং তাহাদের অতুলনীয় দানশীলতা কি আমাদের অনুকরণীয় নহে? উহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের অনুকরণীয়। তাহারাই প্রকৃত পক্ষে "বিদেশী" বর্জ্জনকারী, আমরা কেবল মাত্র বাক্যবাগীশ।

জগতের সভ্য জাতিসমূহ কেবল মাত্র তাহাদের পণ্য দ্রব্য বিনিময় করে না, পরন্তু পরস্পরের মধ্যে তাহাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, ও ধর্ম্ম বিষয়ক ভাব বিনিময় করিয়া থাকে। কোন এক দেশের নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সভ্য জগতের সমগ্র জাতির সাধারণ সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইতেছে। ইউরোপ বা আমেরিকার আবিষ্কার কেবল মাত্র ঐ ঐ দেশে সীমাবদ্ধ নহে। সমস্ত জগৎ একটি প্রকাণ্ড রাষ্ট্র তন্ত্রে পরিণত হইবার জন্য যেন ব্যগ্র হইতেছে। তবে যেমন ব্যক্তিগত স্বার্থের অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী, তেমনি জাতিসমূহের জাতীয় স্বার্থের অসামাঞ্জস্যও একেবারে যাইবার নহে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থের অসামঞ্জস্য নৈতিক বল দ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে। জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে কালে যুদ্ধ অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কোন দেশ চিরকাল পরাধীন থাকিতে পারে না। যে দেশে যে প্রকার শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিৎ, তাহাই অবশ্যম্ভাবী। প্রথম উপযোগী হইতে হয়, পরে উহা পাইবার আশা করিতে হয়। কর্ম্মবীরের ন্যায় কার্য্য করিতে হয়; আকাশকুসুম চিন্তা দ্বারা মস্তিষ্ক বিকৃত করা উচিত নহে। স্ব স্ব গৃহ সংস্কারে মনোযোগী হওয়া উচিত। যাহারা ধৈর্য্য ধারণ করিতে শিখিয়াছে, তাহারাই কালে সম্পূর্ণ সুফল পাইয়া থাকে। ব্যক্তি ও জাতি উভয়পক্ষেই এটি চির সত্য।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট—ইহার বহু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও—সর্ব্বোৎকৃষ্ট গবর্ণমেণ্ট।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শান্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতা, সম্পত্তি এবং ধর্ম্ম নিরাপদ। নানা জাতীয় ব্যক্তি নানা ধর্ম্মের লোক ব্রিটিশ শাসনে ক্রমে একটি জাতীয় জীবন লাভ করিতেছে। যদি ভারত উপযোগী হয়, কালে আমরা সম্পূর্ণ সায়ত্ব শাসন লাভ করিব। ইংলণ্ডের প্রবীণ রাজনৈতিক পণ্ডিতগণের মত এই যে—ভারতের কার্য্যাবলী হইতে ক্রমে অপসৃত হইয়া ভারতে ভারতীয় শাসন প্রবর্ত্তন করাই ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

হে স্বদেশ হিতৈষীগণ, নিজেরা কার্য কর এবং অপরকে স্বদেশের কার্য্য করিতে অনুপ্রাণিত কর, কিন্তু কাহারও কোন ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিও না। তোমার ব্যক্তিগত কার্য্যে অন্যের হস্তক্ষেপ যেমন তুমি ভালবাস না, তেমনি অন্যের ব্যক্তিগত অধিকারে অপরে ভালবাসিতে পারে না। প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টই তাহার নিকৃষ্টতম প্রজারও জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিতে বাধ্য। কোন প্রজার ইচ্ছা মত ক্রয় বিক্রয় করিবার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারিলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবেন। "বর্জ্জন" বল প্রয়োগ ও ঘৃণা অনুসূচিতকরে, উহা সবিনয় অনুরোধ জ্ঞাপক নহে। ইংরাজ বণিকগণ ভারতীয় দ্রব্য বর্জ্জন করিলে ভারতবাসীগণ তাহা কিরূপ ভালবাসিবে? জগতের কোন দেশ এমন কি, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, জার্ম্মানী ও একেবারে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া পারে না। বৈদেশিক সাহায্য ব্যতীত কোন সভ্য দেশ উন্নত হইতে পারে না। অতি অল্প ব্যয়ে স্বদেশ জাত দ্রব্য উৎপন্ন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী, কিন্তু যে সমস্ত

দ্রব্যাদি দেশে প্রস্তুত হয় না তাহা অবশ্যই বিদেশ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। কাপড়ের কল, ময়দার কল প্রভৃতি বৈদেশিক কল কি আমরা বিদেশ হইতে আনিব না? সর্ব্ব প্রকারের বৈদেশিক দ্রব্য পরিত্যাগ কি নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নহে? সুলভ, উপাদেয় স্বদেশী দ্রব্য উৎপন্ন করিতে চেষ্টা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। পরস্পরকে বিশ্বাস কর, যৌথ কারবার খুলিয়া দাও,—আপনা হইতেই দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হইবে।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাবলীর যতদূর সম্ভব আলোচনা করিব, কিন্তু গালাগালি দিব না। অত্যাচার ও অবিচার যথা সাধ্য নিবারণের চেষ্টা কর, কিন্তু নিজে অন্যায়কারী হইও না, বা অন্যের উপর অবিচার করিও না। অন্যে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে তুমি সুখী হও, তোমারও যেন অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার হয়।

বঙ্গ বিভাগ আমরা অনুমোদন করি না। যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইতে চেষ্টা কর এবং ইহার পরিবর্ত্তন জন্য সুসময়ের প্রতীক্ষা কর। ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাই পরিবর্দ্ধিত হয়; আন্দোলন যে ভাবে কিছু দিন চলিয়াছিল তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর নয়।

বলপ্রয়োগ কার্য্য সিদ্ধির অন্তরায়। গুপ্ত সভা, বা গুপ্ত হত্যা দ্বারা কোন জাতি স্বাধীন হয় নাই। এমন কি ইটালীও ঐ ভাবে স্বাধীন হয় নাই।

স্বদেশের উন্নতি জন্য কেবল মাত্র স্বদেশী আন্দোলন করিলেই যথেষ্ট হইবে না, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি করিতে বদ্ধ পরিকর হইতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে, জেতা বিজেতাদের মধ্যে, উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে পুনঃ শান্তি স্থাপন চেষ্টা করিতে হইবে এবং সকলে এক যোগে স্বদেশের জন্য কার্য্য করিতে হইবে। তাহা হইলে, দেশের উন্নতির জন্য যে সমস্ত কার্য্য প্রয়োজন ক্রমে তুমি পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ সংস্কার, নৈতিক উন্নতি প্রভৃতি নানা বিভাগে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইবে। বালক এবং যুবকবৃন্দ যাহাতে প্রলোভনে পতিত না হয়, তাহার জন্য তোমাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে; এবং ঘটনাক্রমে তাহারা দুষ্টগণের সংস্রবে মিশিতে না পারে তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নানা জাতি ও ধর্ম্মের সাম্য সংস্থাপন চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা হইলে সকল কাজে সকলের সাহায্য পাওয়া সহজ হইবে। বিদেশ যাত্রা করিতে হইবে, অন্যকে বিদেশে যাইতে সাহায্য করিতে হইবে। কেবল মাত্র বাণিজ্য উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করিলে চলিবে না, জ্ঞানোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে বহির্গত হইতে হইবে। কোন দেশই একক উন্নতি লাভ করিতে পারে না, উন্নত হইতে হইলে অন্য দেশের সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক। নির্বুদ্ধিতা, হিংসা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। তুমি অনেক সময়ে গবর্ণমেণ্ট বা অজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা নিন্দিত হইবে, কিন্তু সময়ে সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যদি তুমি ঐকান্তিকতার সহিত কার্য্য কর, তোমাকে বৃথা পরিশ্রম করিতে হইবে না।

দেশে ধর্ম্ম ও নীতির বহুল প্রচার কর, দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শান্তি প্রতিধ্বনিত হউক। আইস আমরা

অবিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই এবং আমাদের মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে মনোযোগী হই।

আমার ভাষা।

[১]

আজি গো তোমার চরণে জননি!—আনিয়া
অর্ঘ করি মা দান—
ভক্তি অশ্রু সলিল সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের
গান।
মন্দির রচি মা তোমার লাগি'—
পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি',
তোমারে পুজিতে মিলেছি জননি, স্নেহের
সরিতে করিয়া স্নান।

কোরাস্ { জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহিনা
অর্থ, চাহি না মান;
যদি তুমি দাও তোমার ও ছুটি
অমল কমল চরণে স্থান।

[২]

জানো কি জননি, জানো কি, কত যে আমাদের
এই কঠোর ব্রত!
(—হায় মা যাহারা তোমার ভক্ত, নিঃস্ব কি
গো মা তারাই যত!)
তবু সে লজ্জা, তবু সে দৈন্য,
সহেছি মা সুখে তোমার জন্য;
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে, ধরেছি—যেন সে
মহৎ মান।
কোরাস্। জননি বঙ্গভাষা—ইত্যাদি।

[৩]

নয়নে বহেছে নয়নের ধারা, জ্বলেছে জঠরে
য খনক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর জ্বালায়, পাইয়া তোমার
বচন সুধা;
মরুভূমে সম যখন তৃষায়
আমাদের মাগো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা তোমার
হাসিটি করিয়া পান।
কোরাস্। জননি বঙ্গভাষা—ইত্যাদি।

[৪]

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই, তোমার
কাছে মা এসেছি ছুটি;
বাসনা—তাহাই গুছায়ে যতনে, সাজাবো তোমার
চরণ দুটি;
চাহিনা ক কিছু, তুমি মা আমার,
এই জানি, কিছু নাহি জানি আর;
—তুমি গো জননি হৃদয় আমার, তুমি গো
জননি আমার প্রাণ।
কোরাস্। জননি বঙ্গভাষা—ইত্যাদি।

বঙ্গদর্শন।　　　　শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

শুশ্রূষক।

জ্ঞানের গৌরব-স্তম্ভ স্বরূপ বেদ শাস্ত্রে সমাজ পুরুষের বিরাট্ মূর্ত্তির বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। ঐ সুবিশাল মানব সমাজের মস্তক ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরুদেশ বৈশ্য ও চরণযুগল শূদ্র। এই বিচিত্র বহু ভাবময় বিশ্বের সমস্ত অংশে সকল সমাজেই বেদ প্রদর্শিত তত্ত্ব প্রত্যক্ষীকৃত হইতে পারে।

সকল সমাজই সাধারণতঃ ত্রিবিধ বলে বলীয়ান্ হয়। জ্ঞানবল, বাহুবল, ধনবল এই ত্রিবেণী সঙ্গমে যে জাতি বা যে সমাজ স্নান করে, তাহার মহিমা জ্যোতিতে দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত হইয়া থাকে। ইহার একটীর প্রতি অনাদর বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, অপরটীর অনুগ্রহ লাভের অধীশ্বর হইয়াও কৃত-কার্য্য হওয়ার প্রত্যাশা নাই। দুর্ব্বল জ্ঞানী বা বলবান্ অজ্ঞ যেমন জাগতিক প্রতিযোগিতার কঠোর সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম হয়। সেইরূপ জ্ঞানদরিদ্র ধনী ও নির্ধন পণ্ডিত কালস্রোতে ভাসিয়া যায়।

শ্রুতি ঘোষণা করিতেছেন—

"একো বলবান্ শতং জ্ঞানবতা-
মাকম্পয়তে।"

একজন বলবান্ লোক শত জ্ঞানীকে বিকম্পিত করিতে পারে। আবার যত বল-শালী হউক্ না কেন—

"জ্ঞানেনহীনা পশুভিঃ সমানাঃ।"

জ্ঞানহীন হইলে সে পশুতুল্য, মানবত্বের অনুগ্রহ দৃষ্টি তাহার প্রতি পতিত হয় না। প্রাচীন সমাজেও ধনাভাবের চিন্তা ছিল, অপেক্ষাকৃত নব্যযুগে মৃচ্ছকটিক নামক সুপ্রাচীন নাটকের ব্রাহ্মণযুবক শর্ব্বিলক কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে একান্ত বঞ্চিত ছিলেন না, অবস্থার আপীড়নে অপকৃষ্ট মানুষ ধর্ম্মের প্রবল তাড়নায়, দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাতে লাঞ্ছিত হইয়া যখন ধনার্জ্জনের চেষ্টায় চৌর্য্য কার্য্যে রত হইতেছেন, তখন তাঁহার হৃদয় অজ্ঞাতসারে পৌরুষ ও বংশোচিত মনুষ্যত্বের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু প্রয়োজন অভাবের প্রতি চালিত করে, মানব চক্ষু যে সময় জগতের অন্য বিষয়ে অন্ধ হয়, তাই শর্ব্বিলক বাধ্য হইয়া তস্কর কার্য্য করিতে গিয়া বলিতেছেন—

ধিগস্তু খলু দারিদ্র্যং অনিবেদিত
পৌরষং।
যদেতদ্ গর্হিতং কর্ম্ম নিন্দামি চ
করোমি চ।

হায়! দরিদ্রতাকে ধিক্! দরিদ্রতাদোষে মানুষের পৌরুষ প্রকটিত হয় না! আমি গর্হিত চৌর্য্যকার্য্যের নিন্দা করিতেছি কিন্তু দারিদ্র্য বশতঃ উহার অনুষ্ঠানও করিতেছি। ধনবল মানব সমাজদেহের রুধির। আমাদের দেশে চলিত কথায় অর্থকে 'রুধির' বলা হয়।

ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ ব্রহ্মচর্য্যের ও সাধনার অবতার ভরতকুল প্রদীপ আর্য্যজীবন মহাত্মা দেবব্রত বলিয়াছেন—

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো
ন কর্ম্মচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোহস্ম্যর্থেন
কৌরবৈঃ।

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, কৌরবগণের নিকট অর্থপাশে বদ্ধ আছি ইহা সত্য জানিবে। যদি ভীষ্মের মত পবিত্রপ্রাণ মানব ও অর্থের নিকট এত কৃতজ্ঞ হইতে বাধ্য হন, তবে সাধারণ সমাজে অর্থের প্রতিপত্তি কত তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই চিন্তার বিষয়।

এই তিন শক্তির অর্জ্জন রক্ষা নিয়োজনের জন্য দেশে সর্ব্বদায়ই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের প্রয়োজন। জ্ঞানের অনুশীলন প্রচার প্রভৃতি এক শ্রেণীর কার্য্য, অপর শ্রেণী

বলের উপাসক, আর এক সম্প্রদায় অর্থের অর্জ্জন রক্ষণ নিয়োজনে রত। এই তিন ভাব ত্যাগ করিলে কোনও জাতি বা সমাজ পরগলগ্রহ ভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। যাহার স্থিতি বিস্তৃতি প্রধানতঃ পরানুগ্রহে, সে ব্যক্তি, জাতি বা দেশের ন্যায় দুর্ভাগ্য ব্যক্তি জাতি বা দেশ জগতীতলে দ্বিতীয় নাই। এই ত্রিশক্তির তিন্ বিকাশ এদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ রূপে সংঘটিত হইয়াছিল।

এই তিন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মজীবনে আর এক অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ শুশ্রূষা। জ্ঞানী, বলী, ধনী কেহই পরিচর্য্যার অভাব হইলে কার্য্য করিতে পারে না। সেই জন্য অপর শুশ্রূষক সম্প্রদায়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি করা যায়। কোনও সময়ে ইহার এক এক কার্য্য এক এক সম্প্রদায়ে নিবদ্ধ ছিল, শুশ্রূষা শূদ্র নামক সম্প্রদায়ের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তক, তাহার কারণ জ্ঞান সমাজের শীর্ষস্থানে বিরাজিত, ক্ষত্রিয় বাহু, কারণ বাহু বলের ক্ষত্রশক্তির দ্বারা সমাজ আবশ্যকীয় উপকরণ সংগ্রহ করে ও প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করে। বৈশ্য উরু, ধনবল বা বৈশ্যশক্তি দ্বারা সমাজের গতি বিস্তৃতি সংসাধিত হয়, অর্থহীন সমাজ ভগ্নোরু দুর্য্যোধনের ন্যায় দুর্ব্বল। শূদ্রশক্তি বা শুশ্রূষুবর্গ না থাকিলে সমাজ দণ্ডায়মান হইতে পারে না, অর্থাৎ পরিচর্য্যার অভাবে অবসন্ন হয় তাই শূদ্র চরণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই শুশ্রূষা অবস্থাবিশেষে ও কার্য্যবিশেষে অধিকার ভেদে সকল বর্ণের প্রতিই প্রযুক্ত হইত। সমাজের সেই উন্নতিশীল অবস্থার নানাবিধ পরিবর্ত্তনে সমাজকে প্রসারের দিকে লইয়া যাইতেছিল। তখন অপরাধী বিপ্র রাজগৃহে দাস কর্ম্মে নিয়োজিত হইত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"প্রব্রজ্যাবসিতো রাজ্ঞো দাস
আমরণান্তিকম্।"

যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুনরায় সংসারে প্রবিষ্ট হয় সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য যে বর্ণ হউক না কেন, সে মরণ পর্য্যন্ত রাজার দাস হইয়া থাকিবে।

ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—

স্বায়ং প্রাতর্যদা সন্ধ্যাং যে বিপ্রান
উপাসতে।
তান্ স্বেষু ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্র
কর্ম্মসু যোজয়েৎ।

যে সকল বিপ্র সায়ং সময়ে ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যা উপাসনা করে না, ধর্ম্মরক্ষক ধর্ম্মপরায়ণ রাজা সেই সন্ধ্যাবর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে শূদ্রকার্য্যে (সেবাকর্ম্মে) নিযুক্ত করিবেন। এই প্রথানুসারে বিষ্ণুপুরাণের যুগে সৌবীর রাজ বিপ্রতনয় ভরতকে স্বীয় শিবিকাবহন কার্য্যে বাধ্য করিয়াছিলেন।

দাসকর্ম্মে তখন ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণেরই অধিকার ছিল না, তদ্ব্যতীত অপর সকল বর্ণই উচ্চবর্ণের দাসত্ব করিতেন। মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

'বর্ণানাং প্রতিলোম্যেন দাসত্বং ন
বিধীয়াত।
স্বধর্ম্মত্যাগিনোহন্যত্র দারবদ্দাসতা
মতা।"

উচ্চবর্ণ অপর বর্ণের দাসত্ব করিবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের দাসত্ব করিবেন না। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের এবং বৈশ্য শূদ্রের দাসত্ব করিবে না। শূদ্র অপর তিন বর্ণের, বৈশ্য অপর দুই বর্ণের এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগৃহে দাসত্ব করিতে পারেন। যেমন বিবাহ তেমনি দাসত্ব। অনুলোমক্রমে বিবাহ হয়, কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ অশাস্ত্রীয়, তেমনি অনুলোম প্রথায় দাসত্বের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু প্রতিলোম নিয়মে দাসত্ব বিধান অসঙ্গত। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে (যেমন প্রব্রজ্যাবসিত এবং সন্ধ্যাবিহীন সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) তাহার সম্বন্ধে প্রতিলোম নিয়মেও দাসত্ব ব্যবস্থা সঙ্গত। সুতরাং বলা যাইতে পারে, দাসত্ব কেবল শূদ্র মাত্রের সম্পত্তি ছিল না।

শুশ্রূষা কেবল দাসকর্ম্ম মাত্র নহে, শুশ্রূষক মাত্রেই দাস নহে। শুশ্রূষক পঞ্চবিধ। নারদ-সংহিতায় লিখিত আছে—

শুশ্রূষকঃ পঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টো মনীষিভিঃ।
চতুর্ব্বিধাঃ কর্ম্মকরাস্তেষাং দাসাস্ত্রিপঞ্চকাঃ।
শিষ্যান্তেবাসি ভৃত্তকাঃ চতুর্থস্ত্বধিকর্ম্মকৃৎ।
এতে কর্ম্মকরাঃ জ্ঞেয়াঃ দাসাস্তু গৃহজাদয়ঃ।

শাস্ত্রে মনীষিগণ পঞ্চ প্রকার শুশ্রূষকের উল্লেখ করিয়াছেন। চারি প্রকার কর্ম্মকর ও অপর এক প্রকার (পঞ্চদশবিধ) দাস। কর্ম্মকর চতুর্বিধ যথা, শিষ্য, অন্তেবাসী, ভৃতক, অধিকর্ম্মকৃৎ। পঞ্চদশ প্রকার দাস আর এক জাতীয় শুশ্রূষক। শিষ্য, যে বেদবিদ্যা শিক্ষার বাসনায় গুরুর নিকট পরিচর্য্যা অঙ্গীকার করিয়া যথা নিয়মে উপসন্ন হইয়াছে, বেদবিদ্যার্থী শিষ্য তাহার গুরুর নানা পরিচর্য্যা করে। মহাভারতীয় উদ্দালকোপখ্যানে বিবৃত হইয়াছে শিষ্য গুরুর পরিচর্য্যার্থে নিজের ব্যক্তিগত সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়াছে এমন কি আদেশ পালন জীবনরক্ষাপেক্ষা অধিকতর কর্ত্তব্য মনে করিয়াছে। এই শিষ্য ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ নৈষ্ঠিক এবং উপকুর্ব্বাণ। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী বেদবিদ্যা গ্রহণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত গুরুশুশ্রূষা করিবেন, আর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গৃহস্থধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন না, আমরণ গুরু, তদভাবে গুরুপুত্র বা ভগবান বৈশ্বানরের পরিচর্য্যা করিবেন। এইরূপ গুরুশুশ্রূষার উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করায় দৃষ্টান্ত কেবল ভারতেই বিরল নহে।

অন্তেবাসী শিল্প শিক্ষার্থী। বেদ বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী যেমন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য গুরুর পরিচর্য্যা করিতে প্রস্তুত হন; শিল্প শিক্ষার্থীও শিক্ষকের নিকট নির্দ্দিষ্ট কাল থাকিবার বন্দোবস্তে বাধ্য হন। মহর্ষি নারদ শিল্প শিক্ষার্থীর বিষয়ে বলিয়াছেন—

"স্বশিল্পমিচ্ছন্নস্থর্ত্তুং বান্ধবানামনুজ্ঞয়া।
আচার্য্যস্য বসেদন্তে কৃত্বা কালং সুনিশ্চিতম্।
আচায্যঃ শিক্ষয়েদেনং স্বগৃহে দত্তভোজনম্॥"

শিল্প শিক্ষার্থী বান্ধবগণের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক "এতদিন শিক্ষা করিব" এইরূপ কাল নিয়ম করিয়া আচার্য্যের সমীপে বাস করিবে, আচার্য্য তাহাকে নিজ গৃহে অন্নদ্বারা পোষণ করিবেন ও শিল্প শিক্ষা দিবেন। শিক্ষা কালে যে সমস্ত কার্য্য শিক্ষার্থী সম্পন্ন করিবে, তাহাতে আচার্য্যেরই লাভ হইবে, শিক্ষার্থী তজ্জন্য কিছুই পাইবেন না। যদি যথোচিত যত্ন সহকারে শিক্ষাদাতা আচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া দুষ্ট শিক্ষার্থী পলায়ন করে তবে আচার্য্য তাহাকে অবস্থার গুরুত্ব অনুসারে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া নিজগৃহে বাস করাইবেন, তাড়ন বন্ধন পর্য্যন্তও করিতে পারেন। নারদ সংহিতায় আছে—

"শিক্ষয়ন্তং অসংতুষ্টং য আচার্য্যং
পরিত্যজেৎ।
বলাৎ বাসয়িতব্যঃ স্যাৎ বধবন্ধৌ
চ সোঽর্হতি॥"

যদি প্রতিভাশালী শিষ্য নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে সুশিক্ষিত হয়, তথাপি সে চুক্তি অনুসারে অঙ্গীকৃত কাল পর্য্যন্ত গুরুর কর্ম্মশালায় উদরান্ন মাত্র গ্রহণে কার্য্য করিয়া তাহার আয় বৃদ্ধি করিতে বাধ্য থাকিবে।

নারদ বলেন—

"শিক্ষিতোঽপি কৃতং কালং অন্তে-
বাসী সমাপ্নুয়াৎ।
তত্র কর্ম্ম চ যৎ কুর্য্যাৎ আচার্য্য-
স্যৈব তৎফলং॥"

আধুনিক কালের ন্যায় প্রাচীন আচার্য্যেরা দক্ষিণা গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্য করিতেন না, অপিচ ছাত্রগণ গুরু গৃহে আহার প্রাপ্ত হইত। এরূপ স্থলেও যদি ছাত্র শিক্ষকের অতটুকু আনুগত্য অঙ্গীকার না করে, তবে জগত কৃতজ্ঞতার অস্তিত্বে ঘোরতর সন্দিহান হইতে প্রস্তুত হইবে। এখনও এ প্রথা ভারতে বহু স্থলে বিদ্যমান আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নারদের কথার অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"কৃতশিল্পোঽপি নিবসেৎ কৃত
কালং গুরোর্গৃহে।
অন্তেবাসী গুরুপ্রাপ্ত ভোজনস্তৎ
ফলপ্রদঃ॥"

শিল্প শিখিয়াও নির্দ্দিষ্ট কাল শিষ্য গুরু গৃহে বাস করিবে। গুরু তাহাকে আহার দিবেন, তৎকৃত কার্য্যের ফল ও গুরু লাভ করিবেন।

ভৃতক—যাহারা মূল্য গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করে। ভৃতক তিন প্রকার।

শাস্ত্রে আছে—

"উত্তম স্ত্বায়ুধীয়োঽত্র মধ্যমস্তু
কৃষীবলঃ।
অধমো ভারবাহী স্যাৎ ইত্যেবং
ত্রিবিধো ভৃতঃ॥"

আয়ুধীয় সশস্ত্র রক্ষক, বর্ত্তমান্ কালের দ্বারবান্ পদাতিক, অবস্থা বিশেষে শরীররক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তি আয়ুধীয়। ইহারা প্রথম শ্রেণীর ভৃতক কর্ষক। যে ব্যক্তি মূল্য গ্রহণ করিয়া কৃষি করে, অপর কোনও কার্য্য করে না, সে কর্ষক। অধম ভৃতক ভারবাহী মুটিয়া। এই ভৃতকগণও স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা প্রভুর শুশ্রূষা করে অতএব ইহারা শুশ্রূষক।



অধিকর্ম্মকৃৎ—কর্ম্মকরগণের অধিষ্ঠাতা। অবস্থাভেদে দুই শ্রেণীর অধিকর্ম্মকৃৎ দেখা যায়। যে নিজে কর্ম্ম করে এবং অন্যান্য কর্ম্মকরগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে সে কর্ম্মকর ও অধিকর্ম্মকৃৎ। আর যাহারা নিজে কর্ম্ম করে না, কেবল পর দ্বারা কার্য্যের সম্পাদন করে তাহারাও অধিকর্ম্মকৃৎ। সর্দ্দার কুলী বা কন্‌ট্রাক্টর অথবা কার্য্যপরিদর্শকেরাও এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। ইহারাও স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন দ্বারা প্রভুর শুশ্রূষাই করিয়া থাকে! এই চারি প্রকার কর্ম্মকর।

কর্ম্মকরগণ শুভ কর্ম্ম করিবে আর দাসগণ অশুভ কার্য্য করিবে। নারদ বলিয়াছেন—

"কর্ম্মাপি দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং অশুভং শুভ মেব চ।
অশুভং দাস কর্ম্মোক্তং শুভং কর্ম্ম-কৃতাং স্মৃতং॥"

অশুভ কর্ম্ম যাহা দাসগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে,—

"গৃহদ্বার শুচি স্থান রথ্যাবস্ক রশো ধনং।
গুহ্যাঙ্গ স্পর্শনোদ্দিষ্ট বিণ্মূত্র গ্রহণো জ্ঝনম্॥
ইচ্ছতঃ স্বামিনশ্চাঙ্গৈরুপস্থানং অথান্ততঃ।
অশুভং কর্ম্মবিজ্ঞেয় শুভমন্যদতঃ পরম্॥"

শাস্ত্র বলিতেছেন—গৃহের দ্বার, শুচি স্থান, পথ, অবস্কর (ঘরের জঞ্জাল বা ঝেটোলা) এই সকলের শোধন কার্য্য দাসোচিত অশুভ কর্ম্ম। প্রভুর আদেশ মতে তাঁহার গোপনীয় অঙ্গ স্পর্শ করা, বিষ্ঠা মূত্র গ্রহণ ও যথা স্থানে সে গুলিকে ত্যাগ করা আর প্রভুর ইচ্ছানুসারে শরীরের দ্বারা উপস্থান (হাত পা টিপিয়া দেওয়া, তৈল মাখান প্রভৃতি) এই সকল কর্ম্ম অশুভ কর্ম্ম, ইহা দাসেরাই সম্পন্ন করিবে, এতদ্ব্যতীত অন্য কর্ম্মকে শুভ কর্ম্ম বলা যায়। ঘর দোর পরিষ্কার করা, আস্তেকুঁড় পরিষ্কার করা, পথ মার্জ্জনা করা, ঘরের জঞ্জাল ফেলিয়া দেওয়া গোপনীয় অঙ্গের কণ্ডুয়ন সম্পাদনন, বিষ্ঠা মূত্র পরিষ্কার করা গা হাত টিপিয়া দেওয়া তৈল মর্দ্দন করা এবং এই শ্রেণীর কার্য্য সকল দাসেরা করিত, কর্ম্মকরগণ এই জাতীয় শুশ্রূষা করিত না। উচ্চ বর্ণ নিম্ন বর্ণের এই সকল শুশ্রূষা সর্ব্বদা করে না, কিন্তু সময় সময় ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়।

দাস পঞ্চদশ বিধ। শাস্ত্র পাঠে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়—

"গৃহজাতস্তথা ক্রীতঃ লব্ধঃ দায়াদুপাগত।
অনাকাল ভৃতঃ তদ্বৎ আহিতঃ স্বামিনা যঃ॥
মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধপ্রাপ্তঃ পণে জিতঃ।
তবাহমিত্যুপগনঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ।
ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ তথৈব বড়বা-হৃতঃ॥
বিক্রেতাবাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চ-দশ স্মৃতাঃ॥"

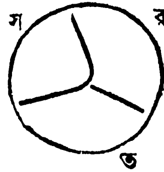
শাস্ত্রে পঞ্চদশ প্রকার দাসের কথা আছে। প্রথম প্রকার গৃহজাত, গৃহদাসীর সন্তান, এই সন্তান দাস হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তৎকালে দাস পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বিক্রীত হইত। যে দাসকে মূল্য দ্বারা ক্রয় হইত সে ক্রীত দাস। যে দাস একে অপরকে দান করিয়াছে সে লব্ধদাস, পূর্ব্বকালে দাস-দাসী দানের সামগ্রী ছিল। যে ব্যক্তি পিতার দাস, পুত্র পিতৃমরণের পরে সমস্ত সম্পত্তির সহিত সেই দাসকেও প্রাপ্ত হইত, সেই পিতৃদাস পুত্রের দায় প্রাপ্ত দাস। যখন দুর্ভিক্ষের মহামারীর রৌদ্র তাণ্ডবে সমাজ কম্পিত হয়, সহৃদয়গণ অন্নহীন সম্বলশূন্য মৃত্যুমধ্যে নিপতিত প্রায় মানবকে অন্নাদি দ্বারা রক্ষণ করেন। রক্ষিত মানব রক্ষণ কর্ত্তার দাসত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়, এই দাস অনাকালভৃত। যে দাসকে অপরের নিকট বন্ধক রাখিয়া তাহার প্রভু ঋণ গ্রহণ করেন, সে দাস ঋণ দাতার প্রভু দ্বারা আহিত দাস। ঋণ ভারগ্রস্থ ব্যক্তি যদি তাহার ঋণ শোধের বিনিময়ে স্বজ্ঞানেচ্ছার অভিমতে দাসত্ব গ্রহণ করে তবে সে ঋণ হইতে মোক্ষিত দাস। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যাহারা দাসত্ব প্রাপ্ত হয় তাহারা যুদ্ধপ্রাপ্ত দাস, যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে এমন প্রতিজ্ঞা বন্ধন হয় যে তুমি পরাজিত হইলে, আমার দাসত্ব স্বীকার করিবে আর আমি পরাজিত হইলে তোমার দাসত্ব গ্রহণ করিব, তবে সেই প্রতিজ্ঞার ফলানুসারে সে দাসে পরিণত হয় সে পণেজিত দাস। মহাভারতীয় উপাখ্যানে কদ্রু ও বিনতার পরস্পর দাসীত্ব লাভের পণ পরিণামে পরাজিতা বিনতার দাসীত্ব আনয়ন করিয়াছিল। যদি কোনও ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কাহারও নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া দাসত্ব অঙ্গীকার করে সে স্বয়মুপগত দাস। প্রব্রজ্যাবসিত অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তি আমরণ রাজগৃহে দাসত্ব করিবে, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কৃতদাস যে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মূল্যের বিনিময়ে দাসভাব গ্রহণ করে সে কৃতদাস। ভক্ত অর্থ ভাত তাহার বিনিময়ে যে দাসত্ব গ্রহণ করে অর্থাৎ যে "পেটে ভাতে" চাকর সে ভক্ত দাস। বড়বাহৃত দাস, যে বড়বার নিমিত্তে আহৃত হয়। বড়বা অর্থ গৃহদাসী। একজনের গৃহদাসীতে অনুরক্ত হইয়া সেই দাসীর পতিরূপে যে গৃহস্বামীর দাসত্ব করিতে প্রস্তুত হয় সে বড়বাহৃত দাস। আত্মবিক্রেতা দাস, যে স্বয়ং ইচ্ছানুসারে আত্ম বিক্রয় করিয়া দাসে পরিণত হয়। আত্ম বিক্রয় মহৎ কার্য্যের উদ্দেশে অনেকে করিয়াছেন। সুপ্রথিতনামা পৌরাণিক রাজা হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞ-দক্ষিণার পরিশোধার্থে শ্মশান চণ্ডালের গৃহে আত্ম বিক্রয় করিয়াছিলেন। এরূপ উপাখ্যান হিন্দুর গৃহলক্ষ্মীগণেরও অজ্ঞাত নহে। এই দাসগণ পূর্ব্বোক্ত অশুভ কর্ম্ম করিতে বাধ্য থাকিবে।

কালের বিচিত্র গতিতে দাস জগতের এক নূতন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। দাস সমস্যাই এখন অভিজাতবর্গের হৃদয়তোষক সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। কে জানে, প্রকৃতির অজ্ঞেয় গুহার অভ্যন্তরে আরও কত অপ্রকাশিত চিত্রপট প্রকাশোন্মুখ হইয়া আছে।

শ্রী:——

ত্রিগুণ, কর্ম্ম ও জাতি।

প্রকৃতি বিকার (মূলাশক্তির প্রচলন) এই সংসার চক্রবৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একবার লয় একবার বিকাশ হইতেছে। এই সংসারচক্রে তিনটী প্রধান অর ও তিনটী প্রধান নেমী আছে, ঐ অর ও নেমী ৩ × ৩ = ৯ ভাগে বিভক্ত, ঐ নয়টী অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ অর ও নেমীর ঘূর্ণনে এই সংসারস্থ সমস্ত জীবজন্তু ঘুরিয়া (কর্ম্ম-বিপাকে) বেড়াইতেছে। এই সংসার চক্রের



অর তিনটী তিন গুণ (স সত্ত্ব, র রজ, ত—তম), আর সেই গুণবৃত্তিতে ভ্রাম্যমান ভূত, ভৌতিক পদার্থ ও জীব সকল (এবং জীবের কর্ম্ম) তিনটী নেমী ; অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পদার্থ এবং জীব।

যেমন চলায়মান শকটচক্রের যে অংশ ভূমিতে সংলগ্ন হয়, সেই অংশ আবরিত থাকে, তেমনই সংসার-চক্রের (মানবাদির) যে অংশ (তমোরূপ অর ও তামস কর্ম্মাদি-নেমী) নিম্নে পতিত হয়, তাহার স্বরূপ আবরিত হয়, এই আবরণই অভিভূত ভাব, এই অভিভূত ভাব হইতে বুদ্ধির মোহ (জড়তা), অর্থাৎ এই তমোগুণ হইতে মানব ধর্ম্ম, বিদ্যা ও জ্ঞানহীন হয়, ধর্ম্ম, বিদ্যা ও জ্ঞানহীন হইলেই তামস কর্ম্মশক্তি আইসে এবং এই তামস কর্ম্ম হইতে শূদ্রতা প্রাপ্তি হয়, এই শূদ্রতা হইতে প্রনষ্ট হয়। এইরূপে ঐ চক্রের রজোরূপ অর ও রাজস কর্ম্মাদি-নেমীর দিকে যখন মানব পতিত হয়, তখন বিশেষ গতি বা চলন দৃষ্টিগোচর হয়, এই চলনই রাজসিক কর্ম্ম, যে কর্ম্ম হইতে মানবের শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞান ও যুদ্ধবিগ্রহাদি বাড়িতে থাকে, এই গুণ কর্ম্ম হইতে ক্ষত্রিয় জাতি। এই সংসার-চক্রের সত্ত্বরূপ অর ও সাত্ত্বিক কর্ম্মাদি—নেমী (যাহা ঐ শকটে চক্রের ন্যায় ঠিক ভূমির) বিপরীত দিকে (উর্দ্ধে) স্থিত, এই স্থিতি (নেমী = সাত্ত্বিক কর্ম্ম, অর্থাৎ মনূক্ত দশবিধ ধর্ম্ম*, পরমার্থ বিদ্যা, জ্ঞান এবং বিজ্ঞান) হইতে ব্রহ্মণ্য এই ব্রহ্মণ্যই মানবকে চরম-উন্নতির (মোক্ষের) মার্গে উন্নীত করে। এই নিয়মে একদিন ভারতবর্ষ এই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়াছিল আর অপর মহাদেশ সকল মহা অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন ছিল। আবার ঐ চক্র ভ্রমন প্রণালীতে আজ ভারত অধঃপতিত (তমোগুণাভিভূত) ; য়ুরোপাদি উর্দ্ধাদিকে উঠিতেছে, এখন তাহাদের মধ্যমাবস্থা ; প্রবল বেগে কর্ম্মক্ষেত্রে (রজ প্রবল হেতু) ছুটিতেছে ও নানা পার্থিব শিল্পনৈপুণ্যের যুদ্ধবিগ্রহের

---

* ধৃতিঃ ক্ষমা দমো ? স্তেয়ঃ শৌচ মিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্ ॥

উপায় উদ্ভাবনে অগ্রণী হইতেছে। আবার একদিন ঐ য়ুরোপ ভারতের মত (সত্ত্ব-গুণাধিক্য হইলে) চরমাবস্থায় উঠিয়া সমগ্র পৃথিবীকে ধর্ম্ম ও জ্ঞান* বিতরণ করিবে। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীতে কোন দেশ উঠিতেছে, কোন দেশ পড়িতেছে, অতএব ভারতবাসিন্! য়ুরোপের উন্নতি ও শ্রীতে প্রীত হও। কালস্রোতে গুণকর্ম্মের বশে য়ুরোপবাসী ঊর্দ্ধে উঠিতেছেন, আর তোমাদের গুণ কর্ম্মদোষে অধোগতি হইতেছে। ঐ শকট চক্র ভ্রমণ নিয়মে যদি ধরা যায় তাহা হইলে ভারতবর্ষে এখন গুণ ও কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই প্রায় তামস ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন; তবে প্রকৃত সাত্ত্বিক ও রাজসিক প্রকৃতির লোক (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়) যে আদৌ নাই, একথা বলিতেছি না; ৩০ কোটী লোকের মধ্যে অনুপাতে অতি কমই আছেন। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণকে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাষিক জাতি কহে; অর্থাৎ যাহাদের বংশগোত্র স্থির আছে, কোন ব্যাভিচার হয় নাই, তাহারাই ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি, জাতি, আর যাহাদের ঐ রূপ ব্যভিচার হইয়াছে, তাহারাই প্রাতিভাষিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ, এবং যাহাদের বংশ-গোত্রে অকলঙ্ক ও গুণ কর্ম্মানুষ্ঠান আছে, তাঁহারাই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি জানিবে।

এই পারমার্থিক জাতি সম্বন্ধে (অনাদি গুণ ও কর্ম্ম প্রথা লইয়াই) শ্রীশ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, আমি গুণ কর্ম্ম হইতে জাতি চতুষ্টয়* সৃষ্টি করিয়াছি। যথা—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ বিভাগ দ্বারা বা ন্যূনাধিক্য দ্বারা এবং কর্ম্ম বা চেষ্টা বিভাগ দ্বারা বা কর্ম্মের ন্যূনাধিক্যে আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য দ্বারা এবং শম, দম, তপ, সত্য ও সরলতাদি কর্ম্ম বা চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মণ, সত্ত্ব গুণের অনাধিক্যে এবং রজোগুণের আধিক্য দ্বারা ও শৌর্য্য, বীর্য্য ও যুদ্ধাদি কর্ম্ম বা চেষ্টা দ্বারা ক্ষত্রিয়,

* মোক্ষধর্ম্ম, আর্য্যদর্শন ও যোগ।

* ঐ ত্রিগুণ ও জীব অনাদি, অত-এব তাহার (জীবের) কর্ম্মও অনাদি, তবে পৌরুষ অর্থাৎ পুরুষ-চেষ্টা (পুরুষ-কার) দ্বারা কর্ম্ম ও জাতি পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়; ব্রাহ্মণ শূদ্র, শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে। যথা—মহাভারত শান্তি মোক্ষ পর্ব্ব ১৮৯ অধ্যায় ও ১৯০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এই নিয়মে (গুণ কর্ম্মানুসারে) রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন, শূদ্র জাতি বিদুর যোগিব্রতাবলম্বন করিয়া সত্যলোক লাভ করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মের দ্বারা সামান্য ব্রাহ্মণোর বর্ণ ব্রাহ্মণ হওয়া ত সামান্য কথা! এই মানব শরীরে নহুষ রাজা শরীর ধাতু বদলাইয়া কৃকলাশ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। মনের তীব্র চিন্তা (ধ্যান) ও তীব্র কর্ম্ম দ্বারা জাতি ও শরীর যে কোন জাতি ও যোনিতে পরিবর্ত্তন করা যায়। সাংখ্যের ভূতাভিমান ও শরীরাভিমান (অস্মিতা) তত্ত্ব উপলব্ধি হইলে ধীর পাঠক ইহা বুঝিতে পারিবেন।

রজোগুণের আধিক্যে এবং তমোগুণের অনাধিক্যের দ্বারা ও কৃষি, বাণিজ্যাদি কর্ম্ম বা চেষ্টার দ্বারা বৈশ্য, আর রজো গুণের অনাধিক্য এবং তমোগুণের আধিক্য দ্বারা ও ত্রৈবর্ণিক শুশ্রূষাদি কর্ম্ম বা চেষ্টা দ্বারা শূদ্র সৃষ্টি করিয়াছি।"

শ্রীশ্রীভগবান্ চৈতন্য দেবও ঐরূপ গুণ কর্ম্মানুসারে ব্যবহারিক হীন জাতির ব্যক্তিকে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাষিক ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও উচ্চাধিকার দিয়াছিলেন, অর্থাৎ পারমার্থিক ব্রাহ্মণোচিৎ "শ্রীগোস্বামী" সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

এই গুণ কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের স্রোতটী এখন য়ুরোপ প্রদেশে গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বোধ করি তাই আজ 'Mrs Besut' এর নিকট বসিয়া কত ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ করিতেছেন (?) ইহা আমাদের অনুমান; এখন বিজ্ঞ পাঠকের উপর ইহার বিচারভার অর্পিত হইল। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঐ গুণ কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বশেষে এই ভারতবর্ষে সনাতন মতাবলম্বী হইয়া না জন্মগ্রহণ করিলে সাত্বিক ভাবের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না; ঐ সাত্বিক ভাব ও কর্ম্মের পূর্ণ অনুষ্ঠান না হইলেও মোক্ষ (নির্ব্বাণ) লাভ হয় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীসাংখ্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী,
কাপিলাশ্রম।

নব
চিকিৎসা বিজ্ঞান।

প্রতিবিধান—উপাদান।

বাষ্পস্নান, সূর্য্যস্নান, ঘর্ষণ নিতম্ব স্নান, ঘর্ষণ শিশ্ন স্নান নানা বিধ রোগ ও তাহাদের কারণ বর্ণনের পর মানব জাতির আক্রমণকারী বিবিধ পীড়ার নিরাময় উপায় বিবৃত করা প্রয়োজন। এবং এ স্থলেও আমরা অবশ্য আশা করিতে পারি যে সকল রোগের নিরাময়-উপায় একই হইবে, কারণ সর্ব্ব রোগের মূল এক।

সর্ব্ব প্রথম বাষ্পস্নান।

ইহার বিবিধ প্রকার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ত্বকের ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃ আনয়ন করণ পক্ষে বাষ্পস্নান সুযোগ্যতম উপায় হইতেছে। যাহারা স্বাস্থ্য লাভে অভি-লাষী এবং যাহারা স্বাস্থ্য রক্ষার অভিলাষী তাহাদের পক্ষে এই একটী অবর্জ্জনীয় পদ।

সর্ব্বাঙ্গীন বাষ্পস্নান।

আমি স্নানের সুযোগ্য আসন নির্ম্মাণ করিয়াছি ... ... এই আসন ব্যবহারের প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি এই:—বড় কম্বল একখানি, কয়েকটী জল পাত্র, মৃৎ-নির্ম্মিত নিতম্ব স্নানাসন বা সাধারণ স্নান টব। মৃৎ নির্ম্মিত বাষ্পস্নানাসনের বিশেষত্ব এই যে সর্ব্ব শরীর বা যে কোন অঙ্গে বাষ্পের ক্রিয়াধীন করা যাইতে পারে।

বাষ্পস্নানাসন বিস্তার করিয়া তিনটী বা চারিটী জলপাত্রে জল গরম কর।

জলপাত্রগুলি পূর্ণ না থাকে। জল ফুটিলে রোগী আসনে শয়ান হইবে, নিরম্বর বেশে, প্রথমে চিৎ ভাবে। রোগী কম্বলে শরীর আচ্ছাদিত করিবে। কম্বল উভয় পার্শ্বে ঝুলিতে থাকিবে যেন কোন বাষ্প বাহির না হয় এমত ভাবে। প্রথমে মস্তকও আচ্ছাদিত থাকিবে। অপর এক ব্যক্তি কম্বল একটু উঠাইয়া জলপাত্র গুলি বেঞ্চের নিচে বসাইয়া দিবেক। আবশ্যক মত বাষ্প জলপাত্র হইতে চালিত হইবে, জলপাত্রের মুখটি অল্প বা অধিক উত্তোলিত হইবে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি হইলে দুইটি বা তিনটি জলপাত্র ব্যবহৃত হইবে। বালকের একটি হইলেই চলিবে। একটি জলপাত্র সতত উননে গরম হইবে। এইটি পুঁজি থাকিবে। প্রথম জলপাত্র—বালকের বেলা এই একটি মাত্র পূর্ব্ব প্রকোষ্টে বসাইবে কোমরের নিচে। দ্বিতীয়টি পদতলে তৃতীয়টি, যদি দরকার হয়, পৃষ্ঠতলে বসাইবে।

বাষ্প স্রোত বসিলে (অনুমান দশমিনিট পরে) পুঁজির জলপাত্রটি কোমরের নিচে বদলাইয়া দিবে। সাবেক জলপাত্র উননে দিবে। পদতলের জলপাত্র সচরাচর বদলাইতে হয় না। মৎ-নির্ম্মিত স্পিরিট জলপাত্র হইলে বদলাবদলির দরকার হয় না।

দশ পনর মিনিট পরে রোগী উবুড় হইয়েন। কেননা বাষ্প বক্ষে ও প্রদরে লাগা আবশ্যক। যদি এতক্ষণে ঘর্ম্ম বাহির না হইয়া থাকে তবে এখন আপাদ মস্তক ঘর্ম্মাক্ত হইবে।* বালকের পক্ষে প্রয়োগ জলপাত্র বদলাইতে হয় না। যাহাদের ঘর্ম্ম সহসা হয় না তাহাদের মস্তক সতত কম্বলে আবৃত থাকিবে। ইহা বড় বিরক্তি কর হইবে না।

ঘর্ম্ম—১৫ মিনিট বা অর্দ্ধ ঘণ্টা থাকিতে থাকিবে। জলপাত্র বদলান প্রয়োজনাধীন। যে অঙ্গ দহমান বস্তুতে ভারাক্রান্ত সে অঙ্গ সহজে ঘামিবে না। রোগী সেই স্থানে বাষ্প চালন ইচ্ছা করিবে। রোগীর ইচ্ছা পূরণ করিতে হইবে। কারণ এইরূপে বাষ্পস্নান ফলপ্রদ চিকিৎসা সাধিত হয়।

দুর্ব্বল ব্যক্তি এবং নিদান পীড়িত ব্যক্তি বিশেষতঃ ভীরু ব্যক্তিকে কখন বাষ্পস্নান দিবে না। ঘর্ষণ শিশ্নে বা নিতম্ব স্নানের সহিত সূর্য্যস্নান দিলেই ক্রিয়া গৌণভাবে হইবে। যাহারা সহজেই ঘামে তাহাদের বাষ্পস্নানের দরকার কখন কখন হয় না। সপ্তাহে দুইবারের অধিক বাষ্পস্নান প্রশস্ত নহে। বিশেষ ব্যবস্থার দরকার।

বাষ্পস্নান ছাড়িয়া ৬৮° হইতে ৮৪° তাপের গরম জলে ঘর্ষণ নিতম্ব স্নান করিতে হয়। কারণ শরীর ঠাণ্ডা করা উচিত। ঘর্ষণ নিতম্ব স্নানের বিধি পরে প্রকটিত হইবে। তৎপরে বা তৎপূর্ব্বে শরীরের অবশিষ্ট স্থান,—বক্ষ, বাহু, পদতল, মাথা ও গলা—ঝটপট্ ধুইতে হইবে কারণ এ সব ও পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা করা দরকার। শরীর যত গরম হইবে ঠাণ্ডা তত কম বোধ হইবে। ঘর্ম্মাক্ত হইলে উত্তেজনা হয় না। কেবল ত্বক্ গরম হয়। এই স্নানে কোন ভয় নাই। ইস্পাত যখন তাতিয়া সাদা হয় তখন তাহা ঠাণ্ডা জলে ফেলিলে শক্ত হয়। সেইরূপ মানবদেহ বাষ্পস্নানের পর ঠাণ্ডা হইলে শক্ত ও কষ্টসহ হয়।

ঘর্ষণ নিতম্ব স্নানের পর রোগীর দেহ পুনঃ গরম হওয়া দরকার তাহাতে একটু ঘর্ম্ম হইবে। বলবান্ রোগী খোলা বাতাসে

বিশেষতঃ রৌদ্রময় স্থানে ব্যায়াম দ্বারা শরীর গরম করিবেন। দুর্ব্বল ব্যক্তি (খুব সাবধানে বাষ্পস্নান করিবেন) বিছানায় শরীর আবৃত করিলে চলিবে তবে জানেলা একটু খুলিয়া রাখিতে হইবে।

জল ২১২° ফার গরম হইলেই বাষ্প জন্মে। জলপাত্রের বাষ্প এবং বাষ্প ফোটকের বাষ্প একরূপ। এই মাত্র ভেদ যে বাষ্পের পরিমাণ ন্যূন ও অধিক। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায় যে জলপাত্রেই—ইষ্ট সিদ্ধ হয়।

যে স্থলে মৎ-নির্ম্মিত বাষ্পস্নানের আসন বা বেত্রাচ্ছাদিত বেঞ্চ (যাহা তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে) অপ্রাপ্য হয় সে স্থলে সাধারণ বেত্রাচ্ছন্ন চেয়ার দ্বারা কাজ চলিবে। রোগী তদুপরি বসিবেন এবং কম্বলে আচ্ছাদিত হইবে। চেয়ারের তলে গরম জলপাত্র রাখিতে হইবে এবং রোগীর পদ অপর একটী অর্দ্ধ পূর্ণ গরম জলপাত্রের উপর স্থাপিত হইবে। জলপাত্র মুখে দুইটী কাষ্ঠ খণ্ড রাখিলে পদ ধারণ করিতে পারিবে।

মৎ নির্ম্মিত বাষ্পস্নানের আসনের বিশেষ উপযোগীতা এই যে ইচ্ছানুসারে শরীরের যে কোন অঙ্গে বাষ্প চালন ঘটিবে।

প্রদরের বাষ্প স্নান।

কূট প্রদরপীড়ায়, হরিত পীড়ায়, ঋতু বিভ্রাটে এবং অন্য যোষিৎ রোগে ইহা প্রশস্ত।

ইহার প্রয়োগ বিধি চিত্রে পরিস্কার দৃষ্ট হইবে। একটীমাত্র জলপাত্র চেয়ারের নিচে বসাইতে হয়। বদ্‌লান রোগীর ইচ্ছা। ইহাতে শরীরের অপর অংশও গরম হইবে। সমগ্র প্রদর ঠাণ্ডা করিতে হইবে (ঘর্ষণ তিনস্বস্নান দ্বারা) ফলিত পক্ষে পূর্ণবাষ্প স্নান বিধি ইহাতেও খাটিবে। অনেক স্থলে, বিশেষত যোষিৎ রোগে, বাষ্পস্নানের পর ঘর্ষণ শিশ্নস্নান সমধিক প্রশস্ত। এই স্নান বা ঘর্ষণ নিতম্বস্নান শরীর ঠাণ্ডা না হওয়া পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

সাবধানে কাজ চলিলে এই সকল বাষ্পস্নান বিশেষ ফলোপ ধায়ক হয়।

গলদেশ ও মস্তকের বাষ্পস্নান চিত্রে প্রদর্শিত আছে। বেঞ্চের উপর কষ্টে কলস রাখিয়া জলপাত্র তদুপরি রাখিতে হয়। যতক্ষণ খুব ঘর্ম্ম না হয় ততক্ষণ গলা ও মাথায় বাষ্প চালন করিতে হয়। ঘর্ম্ম আরম্ভেই যে কোন বেদনা দূর হইবে। দন্ত বেদনায় ইহা সহজেই উপলক্ষিত হয়। মস্তক ও বক্ষ গরম হইলে ঝট পট ঠাণ্ডা জলে ধুইতে হয়। এবং ঘর্ষণ নিতম্বস্নান বা শিশ্নস্নান তৎক্ষণাৎ করিতে হয়। কাণে বেদনা পুনরাগত হইলে পূর্ণ বাষ্পস্নান (ইহাতে প্রদরে প্রচুর বাষ্প চালনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে) এবং গলবাষ্পস্নান পর্য্যায়ক্রমে করিতে হইবে।

এই সকল স্থানীয় বাষ্পস্নান বিশেষ আশুফলপ্রদ। যথা কর্ণ রোগে চক্ষু, নাশিকা, গলনালী রোগে বিশেষতঃ দন্ত রোগে এবং ব্রণ ও পৃষ্ঠাঘাতে।

আংশিক বাষ্পস্নানও দেওয়া যায় কিন্তু মৎ নির্ম্মিত আসন ভিন্ন তত সুবিধা হয় না। প্রদরের বাষ্পস্নান বেত্রাচ্ছাদিত সাধারণ চেয়ারে চলিতে পারে। মস্তকের বাষ্পস্নানে রন্ধনশালায় বেঞ্চে বসিলে চলে;

জলপাত্র বেঞ্চের উপর রাখিয়া সম্মুখে একখানা চেয়ার বাহুর আশ্রয় জন্য স্থাপন করিলে হয়।

সূর্য্যস্নান। সূর্য্যস্নান যাহা কেবল গরম-দিনে করা যাইতে পারে তাহার বিধি এই :—রোগী পাতলা পোষাক পরিয়া, বায়ু-সঞ্চরণ-রহিত স্থানে পাটীর উপর শুইবেন। জুতা ও মোজা ত্যাগ করিতে হইবে। স্ত্রীলোক ও বালিকা কর্সেট ত্যাগ করিবেন। মাথা ও মুখ রৌদ্র হইতে রক্ষা করিতে হইবে, এজন্য বৃক্ষপত্রে আচ্ছাদিত রাখিতে হইবে। হরিতবর্ণ বড়পাতা বা কতকগুলি ছোট পাতা চাই। খোলা তলপেট ঐরূপ পত্রে বা ভিজা কাপড়ে আচ্ছাদিত থাকিবে।

সূর্য্যস্নান অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে দেড় ঘণ্টা চলিবে। যে রোগী সহজে ঘামেনা, তাহার অধিকক্ষণ স্নানে থাকিতে হয়, কিন্তু ক্লান্তি বোধ করিলে স্নানে থাকা উচিত নহে। উষ্ণদিনে স্নান অধিকক্ষণ চলিবে না।

সূর্য্যস্নানে যাহাদের মাথাধরে, অথবা যাহাদের মাথাঘোরে, তাহারা প্রথমে অল্পক্ষণ স্নান করিবেন। যাহাদের ঘর্ম্ম হয় না বা যাহারা অতি কষ্টে ঘামে, তাহাদের পক্ষে এই বিধি বিশেষ মতে খাঁটে। সূর্য্যস্নানের পর ঠাণ্ডাকর ঘর্ষণ-নিতম্বস্নান বা ঘর্ষণ-শিশ্নস্নান করিতে হয়, তদ্বারা ঘর্ম্মনিসৃত রোগজ পদার্থ অন্তরিত হইবে ঠাণ্ডাকর ঘর্ষণ-নিতম্বস্নান বা শিশ্নস্নান অন্তে যে রোগীর শরীরের সহজ তাপ দীপ্ত না হয়, সে রোগী মাথা ঢাকিয়া রৌদ্র পোহাইবে বা রৌদ্রে হাটিবে। নিদান পীড়িত ব্যক্তি বা ঋজু ব্যক্তির প্রতি এই বিধি বিশেষ রূপে খাঁটিবে। ইহা নিশ্চিত যে, ঐ সকল ব্যক্তির পক্ষে সূর্য্যস্নান সচরাচর অতি উগ্র ঔষধ, এবং চিকিৎসার প্রথমে ব্যবহার্য্য নহে।

সূর্য্যস্নানের প্রশস্ত সময় ১০টা—৩টা। দুপুরে ভোজনের পর ইচ্ছা করি'লে লওয়া যায়, কিন্তু এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অপেক্ষা করা ভাল। কারণ সূর্য্যস্নানের পরস্থ ঠাণ্ডাকর স্নানে শরীরের তাপ কমে, কিন্তু পরিপাক জন্য তাপ দরকার হয়।

আংশিক সূর্য্যস্নান। আমি আংশিক সূর্য্যস্নান দ্বারা রোগীর শরীরে গ্রন্থি জন্মিলে, বা সমুখক্ষত বা জমাট বা আব বা মাংস-বৃদ্ধি বা বেদনাস্থান জন্মিলে বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি। পূর্ণ সূর্য্যস্নানের মত আংশিক সূর্য্যস্নান করিতে হয়। কেবল অধিক এই যে, শরীরের যে স্থানে স্নান লইতে হইবে, সে স্থানও নিরম্বর থাকিবে এবং তাহা সবুজ পত্রে আচ্ছাদন করিতে হইবে।

মোটের উপর সূর্য্যস্নানের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে জল ও পথ্যাসহ সূর্য্যই পরম ঔষধ। এরূপ ফললাভ অন্য কোন উপায়ে হয় না। বিশেষতঃ চিররোগের পক্ষে এমন গুণকারী অথচ এমন মৃদু ঔষধ দ্বিতীয় নাই—যাহাতে অবাস্তবী পদার্থ উত্তেজিত ও বহিস্কৃত করিতে পারে। একটী তুলনা দ্বারা পাঠক ইহা বিশদরূপে বুঝিলেন। ইহা সকলেই জানেন যে—ময়লা কাপড় রৌদ্রে রাখিলে ময়লা কাপড়ে আটিয়া যায়। কিন্তু যদি ময়লা কাপড় জলে

ও রৌদ্রে অন্তরঙ্গ ভাবে রাখা যায় তবে, সূর্য্য ময়লা কমবেশ বাহির করিয়া লয় এবং ধৌত কার্য্য অধিকতর পরিষ্কার হয় এবং সাদা হয়।

সজীব জন্তুমাত্রের পৃথিবীতে বাস, সূর্য্য, জল, বায়ু ও মৃত্তিকার অন্তরঙ্গ ভাবে ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। গাছ ও গাছড়া বাড়িতে থাকে—যদি সূর্য্য জল বায়ু ও মৃত্তিকা পায়। জীবনের এই উপকরণগুলির অভাবে গাছগাছড়া আমরায় বা শুকায়। অন্য জীবনের পক্ষেও এই কথা খাটে। সুতরাং মানবের পক্ষেও খাটে। দুঃখের বিষয়, অনেকে রৌদ্র ও জল বর্জ্জন এত করেন যাহা ভাল নহে। ইহাতে দেহের অবসাদ জন্মে এবং ইহার ফলে দেহ পীড়াভিমুখে নীত হয়। সুস্থ ব্যক্তির রৌদ্রসেবনে কোন অসুখ হয় না। পীড়িত বা ক্ষীণ ব্যক্তি পক্ষান্তরে ইতর জ্ঞানেই রৌদ্র বর্জ্জন করে, কারণ ইহাতে সে অসুখী হয়। রৌদ্রতাপে উত্তেজিত পীড়াকর পদার্থের অস্ত সঞ্চালনে শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, আলস্য ভার জন্মে। কারণ স্রাবযন্ত্রগুলির দুর্ব্বলতার ফল—এই সমস্ত লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি দেখায় যে অবান্তর পদার্থ সব ছুটিতেছে। পরবর্ত্তী জলপান ব্যতীত কেবল সূর্য্যস্নানে ইষ্টফল আমাদের আয়ত্ত করিতে দিবে না। কারণ জলে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হয় এবং জীবনীশক্তির বৃদ্ধিই আমাদের প্রথম লক্ষ্য। গাছড়া সূর্য্য ও জলের অন্তরঙ্গ পর্য্যায়ে বর্দ্ধিত হয়, খালি খোলা রোদ্রে আমুয়ায়। প্রকৃতির ক্রিয়াপথ একবার ধরিতে পারিলে, ইহা বুঝিতে আর কঠিন হয় না যে কিরূপে চিররোগে সূর্য্যস্নান মুহূর্ত্তিক উৎপাতগুলি (আরামদ শকট) জলস্নানে তৎক্ষণাৎ প্রতিপ্রসূত হয়। আবার জলস্নানগুলি যাহা বর্ণিত হইয়াছে, সূর্য্যস্নানের সহিত চমৎকার আরামদ হয়।

কেহ কল্পনা করিতে পারেন যে, পরিচ্ছন্ন দেহ অপেক্ষা নিরম্বর দেহের উপর রৌদ্রের ক্রিয়া তীব্রতর হইতে পারে। কিন্তু ইহা ভুল। প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সত্যের উপলব্ধি হইবে। দ্রাক্ষালতার প্রতি দৃষ্টি কর, আঙ্গুরফল রৌদ্রভয়ে পত্র মধ্যে লুকায় না? পত্রাচ্ছাদিত থাকিলেই ফল সুপক হয়—রৌদ্রোত্তপ্ত ফল টক ও ছোট হয়। চেরি বৃক্ষেরও এই গতি। যদি ফল পাকিবার বেলা শূককীট ইহার পত্র খায়, ফল তেমন পাকে না। পত্র থাকিলে ভাল পাকিত। প্রত্যুত ফল আমরিয়া যায়—আর বাড়ে না। পাকিতে হইলে, সকল ফলই পত্রের ছায়া চাহে। প্রকৃতি হইতে গৃহীত উদাহরণ পরিষ্কারতম রূপে দেখায় যে রৌদ্রের মুখ্য ও গৌণক্রিয়ার তারতম্য কত।

অনাবৃত মস্তকের উপর রৌদ্রের ক্রিয়া অনিষ্টকর। অনেক ব্যাধি এই নিরাবরণ হইতে জন্মে। যদি দেহ বস্ত্রাবৃত থাকে, ত্বক্ তাহার ছিদ্রগুলি খুলিয়া দেয়, শীঘ্র সজল হয় ও গরম হয় এবং স্বেদ নির্গত করে। কিন্তু ক্রিয়া খুব বাড়ে—যদি আমরা নিরম্বর দেহের পরে জলপূর্ণ আচ্ছাদন স্থাপন করি। হরিৎ, সরস, তাজা পাতা ঐ জলপূর্ণ আচ্ছাদনের তুল্যমূল্য।

ইহা সকলেই জানেন যে, কাল কাপড়ে রৌদ্রের ক্রিয়া ও সাদা কাপড়ে রৌদ্রের ক্রিয়া ঢের তফাৎ। অতএব আবরণ কালাপোষাক কি সাদা কাপড় কি হরিৎ-বর্ণ রসময় পত্র হইবে, ইহা ঔদাস্যের বিষয় নহে। আমার চিকিৎসালয়ে বহুবর্ষ-ব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে, হরিৎবর্ণ পত্রাভ্যন্তরের রৌদ্র দেহের পীড়াদ কুরসের উত্তম অধি-ক্ষেপক। সূর্য্যস্নান আমার অন্যতর আরা-মোপকরণ সহিত অসামান্য মূল্যবান্ বলিয়া দৃষ্ট হইবে; বিশেষতঃ হরিৎ রোগে কাউল রোগে, গণ্ডমালা, কাস রোগে ও বাত রোগে।

ঘর্ষণ-নিতম্বস্নান।

ইহা এইরূপে করিতে হয় যথা—একটী স্নানপাত্র—আসন এই ভাবে জল পূর্ণ করিতে হয় যে, জল উরুদেশ ও নাভি পর্য্যন্ত উঠিবে। জল ৮৪০—৬৮০ ফার গরম হইবে। স্নাতক আধ-বসা আধ-শোয়া ভাবে থাকিয়া, প্রদর ধৌত করি-বেন। ধৌতকরণ তাড়াতাড়ি ও অক্লান্ত হইবে; নাভিদেশ হইতে নিম্নভাগ পর্য্যন্ত ধৌত করিবে। মার্জ্জনীবস্ত্র মোটা ও অর্দ্ধার্দ্র হইবে এবং কার্পাস বা পাট নির্ম্মিত হইবে। যতক্ষণ না দেহ বেশ ঠাণ্ডা হয়, ততক্ষণ স্নান চলিবে। প্রথম প্রথম ৫' হইতে ১০' মিনিট হইলে চলিবে কিন্তু পরে স্নান অধিক সময়ব্যাপী হইবে। অতি দুর্ব্বল ব্যক্তি ও বালক ২।৩ মিনিট দ্বারা করিবে। ইহা অতি আবশ্যক যে পদ, পাদ এবং উচ্চ অর্দ্ধ ঠাণ্ডা না হয়;—কারণ রক্তহীন হইলে তাহারা ক্লিষ্ট হয়; তাহারা কম্বলাবৃত থাকিবে। ঘর্ষণ-নিতম্ব-স্নানের পর শীঘ্রই দেহ গরম করিতে হইবে। খোলা বাতাসে ব্যায়াম দ্বারা গরম হইবে। নিদান পীড়িত ব্যক্তি বা ঋজু ব্যক্তিকে বিছানায় ঢাকিয়া রাখিবে। যদি দেহ শীঘ্র গরম না হয়, তবে প্রদর-বন্ধ ব্যবহার করিবে।

এই ঘর্ষণ-নিতম্বস্নান দিনে ১—৩ বার লইতে পারিবে। স্নান স্থিতি ও জলের তাপ—রোগীর অবস্থানুসারে বিধান করিবে। অনেক স্থলে ইহার পরিবর্ত্তে ঘর্ষণশিশ্নস্নান বিধেয় অথবা উভয় স্নান পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে।

ঘর্ষণশিশ্নস্নান।

এই স্নান যোষিৎ রোগে বিশেষ মুখ্য এবং ইহা করিবার বিধি এই :—

শেষোক্ত স্নানপাত্র আসন মধ্যে এক-খানি পাদচৌকি বা মন্নির্ম্মিত কাষ্ঠাসন বসাইবে। পরে ঐ আসনে জল ঢালিবে। জল ঐ পাদচৌকির কাঁধা পর্য্যন্ত উঠিবে, চৌকির পৃষ্ঠ শুষ্ক থাকিবে। স্নাতকা ঐ শুষ্ক পৃষ্ঠে বসিবেন এবং একখানি বস্ত্র তোয়ালে জলে চুবাইবেন এবং হাতে যত জল ধরে তাহা ঐ তোয়ালেতে লইয়া, ঐ তোয়ালে দ্বারা শিশ্নের আবরক অধরদ্বয় ধৌত করিতে থাকিবেন। ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ঐ অধরদ্বয় ভিন্ন তৎ অভ্যন্তর স্পর্শ না হয় এবং অধরদ্বয় কর্কশরূপে অগ্র-পশ্চাৎ ক্রমে ধৌত করা না হয়, কিন্তু কেবল আস্তে আস্তে কোষপূর্ণ জলদ্বারা অধরদ্বয়ে তোয়ালে বুলাইয়া ধৌত করিতে

হইবে। এই স্নানেও পাদ, পদ এবং উচ্চ ক থাকিবে, তবে নিতম্বতল আর্দ্র হইলে কোন ক্ষতি নাই; তাহাতে স্নান-ফলের ক্রিয়ার কোন বাধা ঘটিবে না। ঋতুকালে স্নান বন্ধ থাকিবে। অস্বাভাবিক স্রাব হইলে, আমার ব্যবস্থা লইয়া স্নান চালান যাইতে পারে। ঋতু ২।৩ দিনের বেশী থাকা শ্রেয় নহে, জোর ৪ দিন থাকে। তদধিক স্থায়ী হইলে বুঝিতে হইবে যে, অস্বাভাবিক ও ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা ঘটিয়াছে।

ঘর্ষণশিশ্নস্নানের জল জলাশয়ের প্রাপ্য জলে চলিবে। তাপ ৫০—৬০ ডিক্রী ফার হইবে। কিন্তু বিশেষ স্থলে কিছু উচ্চ তাপ (৬৮ ফার) লওয়া যাইতে পারে। এই স্নান চলিবে ১০ মিনিট হইতে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত। ব্যাপকতা রোগীর অবস্থা ও বয়সের প্রতি নির্ভর করে। স্নান-ঘর সুখদ গরম থাকিবে, বিশেষতঃ শীত-কালে। জল যত ঠাণ্ডা হইবে, এই স্নান তত ফলপ্রদ হইবে। কিন্তু স্নাতকার হস্তের অসহনীয় ঠাণ্ডা না হয়। নিরক্ষবৃত্তে এবং উষ্ণ প্রদেশে এখানকার মত ঠাণ্ডাজল মিলিবার সম্ভাবনা নাই। তবে জল যেমন ঠাণ্ডা মেলে, তাহাই লইতে হইবে। তাহাতে স্নানের ক্রিয়ার অভাব হইবে বলিয়া কোন ভয় নাই, কারণ বায়ু ও জলের তাপের পার্থক্য সম্বন্ধ গরমদেশে যেরূপ, আমাদের দেশেও সেইরূপ, সুতরাং স্নানফল সর্ব্বত্রই তুল্য হইবে। নিরক্ষ-দেশ হইতে প্রাপ্ত সমাচার আমার এই মত সমর্থন করে।

যেখানে নির্দ্দিষ্টস্নানাসন অভাব হয়, সেখানে যে কোন ধবল—গামলা শিশ্নস্নানার্থে ব্যবহার করিবে। তবে গামলা এত বড় হইবে যে চৌকী বা অন্য আসন ধরিতে পারে এবং ২৫।৩০ সের জল ধরে। সে জল চৌকীর কান্ধা পর্য্যন্ত উঠিবে। যদি বড় কম জল লও, তবে তাহা সত্বর গরম হইবে এবং স্নানফল কম হইবে। টাট্‌কা নির্ঝর-বারি অপেক্ষা সুকোমল জল ভাল। যেখানে পূর্ব্বোক্ত জলমাত্র প্রাপ্য, ঐ জল কিছু-কাল থিতাইবে, কিন্তু যেন কালক্ষয়ে গরম হইয়া না উঠে।

ভদ্রপরিবারের লোকে গামলায় এই-রূপ স্নান করিয়া থাকেন, কেবল গাত্র পরিষ্কার রাখার জন্য,—কিন্তু এমন ঠাণ্ডা-জল ব্যবহৃত হয় না। এবং এত সময়-ব্যাপী স্নানও হয় না, অথবা মন্নির্দ্দিষ্ট বিধি-মতও সে স্নান নহে।

পুরুষের জন্যও স্নানের উপাদান ঐরূপে সাজাইতে হইবে। ঠাণ্ডা জলে অগ্র-ত্বকের অন্তভাগ অর্থাৎ চরমধার ধৌত করিতে হইবে। স্নাতক বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি-মধ্যে বা তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ-মধ্যে অগ্রত্বক্‌ টানিয়া ধরিবেন, যেন মুদা বেশ ঢাকা পড়ে এবং মুদা ঘর্ষণ হইতে সুপরিরক্ষিত থাকে। স্নাতক দক্ষিণ হস্তে একখানি কর্কশ তোয়ালে ধরিয়া, জলের ভিতর রাখিয়া, ঐ তোয়ালে দ্বারা অগ্রত্বকের চরমধার অবিশ্রান্ত ভাবে আস্তে আস্তে কচলাইবেন। রুমালের মত বড় পীটের বা কাপাসের কাপড় হইলে চলিবে। ইহা অতি আবশ্যক যে, ঠিক এই নির্দ্দিষ্ট প্রকার অনুসরণ করিতে হইবে। যে কোন ব্যক্তি

এই ব্যবস্থা বেশ স্পষ্টভাবে না বুঝিবেন, তিনি সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম প্রকরণ গুলির উপদেশ জন্ত জানাইবেন, ইহাতে তিনি অহেতুক উপসর্গ, সময়ক্ষেপ এবং হয় ত দেহক্ষয় হইতে নিস্তার পাইবেন।

যে সকল রোগী দেহের অভ্যন্তরস্থ স্ফীতি বা ক্ষত হইতে যন্ত্রণা পাইয়া থাকেন, অথবা যাহাদের প্রচীন জাপা রোগ তরুণ হয়, তাহাদের আভ্যন্তরিক স্ফীতি প্রথম স্নানের পর সচরাচর অধঃ আকৃষ্ট হয় এবং ঘর্ষিত স্থানে বা তাহার সন্নিকটে উদিত হয়। এ লক্ষণ কদাচ অপ্রিয় নহে। দ্বিতীয় ভাগে ক্ষত অধ্যায়ে এই ব্যাপারের বিস্তার লিখিব। স্নানভ্রষ্টতায় কোন চিন্তার কারণ নাই। স্নান পূর্ব্বমত চালাইতে হইবে, তবে কোমলবস্ত্র ইচ্ছা করিলে ব্যবহার করিবে। অনেক রোগে গামলার জল চৌকীর পৃষ্ঠের উপর তিন অঙ্গুলি জল বাড়াইয়া দিলে, আশুতর ফললাভ হয়। সে স্থলে জল ৬১°—৭০° ডিক্রীফার গরম হইবে। নিতম্বের তলদেশ জলমগ্ন হইবে, আর আর ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ।

অনেকে ইহা যুক্তিহীন মনে করিবেন যে—দেহের এই প্রত্যঙ্গে—অন্য অঙ্গে বা প্রত্যঙ্গে নহে—স্নান দিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু বাস্তবপক্ষে এই প্রত্যঙ্গ ভিন্ন দেহের অন্য স্থান তেমন উপযোগী নহে। দেহের অন্য স্থানে এত প্রধান ধমনীমুখ আর কোথাও নাই। এই সকল ধমনীর কতক মেরুদণ্ডিক ধমনীর শাখা, কতক সহানুভূতিক ধমনীর শাখা, যাহারা মস্তিকের সহিত সংস্পৃষ্ট আছে। একজ সমগ্র ধমনীকুলে প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ। জননেন্দ্রিয় হইতেই সমগ্র ধমনীকুল সঞ্চালিত হইতে পারে। এই স্থানেই জীবন-বৃক্ষের মূল অবস্থিত। শীতল জলে ধৌতকরণে কেবল যে ব্যাধিময় আন্তরিক তাপ কমে তাহা নহে, আরও ধমনীকুল প্রকৃষ্টরূপে উজ্জীবিত হয়, অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সহ সমগ্র দেহের জীবনী শক্তি উদ্দীপিত হয়। তবে ডাক্তারি অস্ত্রাদি-সম্ভূত ধমনী-বিচ্ছেদ ঘটিলে—প্রয়াস বিফল হয়।

প্রত্যেক জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ক্রিয়া-পরীক্ষায় নির্ভীক হইলে অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, মন্নির্দ্দিষ্ট ঘর্ষণশিশ্নস্নানে স্বাভাবিক শারীরিক সমস্ত ক্রিয়া পুনঃ প্রকৃতিস্থ করিবার সর্ব্বোপকরণ পরিপূর্ণ আছে।

ইহা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য, যে ঘর্ষণশিশ্ন স্নানে সহস্র রোগীকে সাস্থ্য দিতেছে, সেই স্নান কেবল রোগীরই উপকারক। যাহারা জানেন যে, কত যন্ত্রণাদায়ক অপ্রিয় এবং কুৎসিত ক্রিয়ার অধীনে দেহকে ডাক্তারগণ সতত আনিয়া থাকেন, তাহারা এই সহজ নিরাময়প্রদ ঘর্ষণ-শিশ্ন-স্নানকে সুচক্ষে দেখিবেন। ইহাতে কিঞ্চিৎমাত্রও লজ্জাশীলতা থাকিতে পারে না, যে স্থলে ইহা আতুরজনের শুভকর। সম্যক্ সুস্থ ব্যক্তির উপর ঘর্ষণশিশ্নস্নানের কোন ক্রিয়া হয় না এবং এ ব্যবস্থা তাহাদের জন্য নহে। তাঁহাদের পক্ষে ইহা ত্যাজ্য, পক্ষান্তরে পীড়িত রোগী অধিকতর ক্ষণ এই স্নান করিতে চাইবেন।

এস্থলে মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন যে, প্রকৃতি অবিশ্রামে সামঞ্জস্য

রাখিবার চেষ্টায় নিরত আছে। এই চেষ্টা কেবল পদার্থিক ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ—এরূপ বৃথা জল্পনা কেহ কেহ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। মানব-দেহ ও তাহার পরিবেষ্টক বাহ্য বস্তুর মধ্যে নিয়মিত তাপ-বিনিময়েও এই চেষ্টা উপলক্ষিত হয়। অভ্যন্তর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে অভ্যন্তরে তাপের পরিবর্ত্তন হয়। এই ক্রিয়াকে, সঙ্গত রূপেই তাড়িতস্রোত বলা হয়। এবং যেরূপ পদার্থিক স্রোতে সেইরূপ এখানেও কতক বিস্ফারণ হয়। এই বিস্ফারণ যত বেশী থাকিবে, যথা—যখন দেহ জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হয়—ততই আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থা অসহনীয় হইবে এবং রোগলক্ষণ তীব্রতর হইবে। ঝড়ো মেঘের গুমট্টা ও অশান্তিকরত্বের মত দেহস্থ দায় মানবকে পীড়া দেয়। সামঞ্জস্য পুনরানয়ন অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক ও জ্ঞান-সঙ্গত কি হইতে পারে? উচ্চতর তাপ স্নিগ্ধতর তাপের সহিত সমীভূত হউক, ফাজিল কমিয়া সাহজ্যে আসুক। এই অভীষ্ট সাধনের সেতু-স্বরূপ অন্যান্য চিকিৎসার উপকরণের সহিত এই ঘর্ষণশিল্প-স্নান যেরূপ পূর্ব্বে বিস্তৃত ভাবে নানা কারণ দর্শাইয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—কেবল ঠাণ্ডা জলে করিতে হইবে। ইহার ক্রিয়া অতুলনীয় এবং অসংখ্য রোগে অতি ফলপ্রদ। যদি অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি না হয়, তবে বুঝিবে যে দেহ জীবনীশক্তি হারাইয়াছে।

যদি দেহাভ্যন্তর ব্যাধিময় বস্তুতে পূর্ণ হয়, তবে তাহাকে কলকব্জা যন্ত্রের প্রকৃতি তুলনা করা যায় এবং বিনষ্ট পরিপাক চিরপরিমিত খাদ্য হইতে যথেষ্ট জীবনীশক্তি আহরণ করিয়া, দেহের পূর্ব্বতন অবস্থা বজায় রাখিতে আর সমর্থ হয় না। গতিকে অধিকতর পরিমাণ খাদ্য কবলিত করা হয় এবং প্রায়শঃ বিশেষ উত্তেজক পানীয় পান দ্বারা রোগীকে কর্ম্মক্ষম রাখা হয়। কিন্তু, এস্থলে পরিপাক শক্তি সহজেই—ক্রমে কমিতে থাকে।

যদি দেহের জীবনীশক্তির পুনরুত্থান অভিলাষ কর, তবে এমন উপায় নিযুক্ত কর—যাহা পরিপাক বাড়াইবে। আমি যে সদুপায় জানি, তাহা স্বাভাবিক খাদ্য সহ এই সকল ঠাণ্ডাকর স্নান। ইহারা অন্য ঔষধ অপেক্ষা অল্পতর সময়ে মন্দতর পরিপাক উন্নত করে (যদি উন্নতির পথ থাকে) এবং স্বাভাবিক ভাবে কাজ করে। অধিকন্তু এই সকল স্নান ব্যাধিময় বস্তুর ঘর্ষণজনিত জ্বরতাপ কমাইয়া সহজ অবস্থা আনয়ন করে, সুতরাং রোগের বৃদ্ধি দমন করে। দৈনিক জীবনযাত্রা হইতে একটী উদাহরণ দেখ। ফুটন্ত জলের বাষ্পকে যদি ইহার প্রাকৃত অবস্থায় (জলে) পরিণত করিতে ইচ্ছা হয়, তবে, ঐ ফুটন্ত জলের তাপ কমাইতে হয়। ব্যাধিময় বস্তু বা প্রত্যেক রোগের সম্বন্ধে ঐ বিধি খাটিবে। দেহের তাপ বৃদ্ধি হইলেই রোগ উপস্থিত হয় এবং বিপরীত অবস্থা ঘটিলেই দূর হয় অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে ঠাণ্ডা করণে ও আভ্যন্তরিক অতিরিক্ত তাপ কমানে দূর হয়।

যেমন জলের একটী বিন্দু হইতে

গতির বৃদ্ধি বা হ্রাস করান যায়—মানব-দেহ ও তদ্রূপ। জীবনীশক্তি একটীমাত্র বিন্দু হইতে সঞ্চালিত হইতে পারে—ঐ বিন্দু আমি যেখানে-ঘর্ষণ-শিন্ন স্নানের জন্য মনোনীত করিলাম, তথায় স্থিত আছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যার পর ইহা সকলেরই পরিষ্কার প্রতীত হইবে, যে কি জন্য আমি সফলতার সহিত চক্ষু ও কর্ণরোগ যে ঔষধে চিকিৎসা করি (প্রতি রোগে অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থান্তর করিতে হয় বটে) লোহিত জ্বরে, বসন্তরোগ, ওলাউঠা প্রভৃতিতে সেই ঔষধে আরোগ্য দেই। সমগ্র দেহের জীবনীশক্তি উন্নত হয় এবং এক অঙ্গ হইতে অপর অঙ্গ অধিকতর বিদ্রাপিত হয় না—তবে যদি ধমনীকুল পূর্ব্বকথিত মত বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা। উন্নমিত জীবনীশক্তি কেমন ভাবে স্বপ্রকাশিত হয়, তাহা অনেকে সম্পূর্ণ অনবগত এবং তাহা রোগীর আশার বিপরীত ভাবে প্রকাশ হয়। যথা—ধূমপায়ীগণ এই সব স্নান করিয়া, কেহ কেহ আর ধূমপান করিতে পারেন না এবং মনে করেন যে—তাহাদের উদর দুর্ব্বল হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তদ্‌বিপরীত ঘটনা হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহাদের উদর এত মগ্ন ছিল যে তামাকের কূট রোধ করিতে পারিত না, কিন্তু এক্ষণে প্রয়োজনীয় বিক্রম লাভ করিয়া, বিষের বিদ্রোহী হইতেছে। এই সব স্নানে ধমনীকুল বলশালী হইবার ক্ষমতা থাকিলে, প্রণালী সতত শক্তি অর্জন করিয়া, দেহে যে সকল অবান্তর বস্তু ক্রমে সমবেত হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক স্রাব-অঙ্গ দ্বারা নির্গত করিয়া দিবে।

ঘর্ষণ-শিন্ন-স্নানের সঙ্গে সঙ্গে প্রদরে মৃৎ-লেপন বাহ্যতাপ হ্রাসে এবং ব্যাধিময় বস্তু-ভঙ্গে অতি ফলপ্রদ হইবে। এই লেপ জঘনে ও ব্রণে অতি উপকারী।

কেহ ইহা মনে না করেন যে—এই ঔষধ সকল (প্রতি রোগের অবস্থানুসারে ব্যবস্থাতব্য) রোগীমাত্রকেই অব্যাহত-ভাবে আরাম করিবে। পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি, আমি সব রোগ আরাম করিতে পারি কিন্তু সব রোগী আরাম করিতে পারি, না। কারণ যে স্থলে শারিরীক জীবনী সুতরাং পাকশক্তি ভগ্ন হইয়াছে, এই ঔষধে আরাম দিবে—যাহা অন্য ঔষধের ক্ষমতার অতীত, কিন্তু উহারা পূর্ণ আরোগ্য দিতে পারিবে না।

এমন শক্ত রোগ আছে, যেখানে আমার স্নান খুব ধীরে দিতে হয়, যেখানে অনেক সময়ে তাহাদের সাময়িক ভাবে বন্ধ করিতে হয়। এরূপ শক্ত স্থলে কেবল বহির উপদেশ-বলে আমার বিধানের সুচারু জ্ঞানলাভ ব্যতীত রোগী চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া সুপরামর্শ নহে। এরূপ স্থলে আমাকে পত্র লিখিয়া, উপদেশ লওয়া ভাল, তাহা হইলে ঔষধ গ্রহণে কোন মন্দ ফল ফলিবে না।

অনুবাদকের মন্তব্য।

পূর্ণ বাষ্পস্নান

সপ্তাহে ২ বার

কাল অনির্দ্দিষ্ট—

ক্ষণ ১৫'———৩০' মিনিট
জল ২১২' ডিগ্রী
পোষাক নিরম্বর
ঘর্ষণ-নিতম্ব-স্নান।
দৈনিক ২——৩ বার
কাল বাষ্প ও সূর্য্য স্নানানন্তর এবং সকাল ও সন্ধ্যা
ক্ষণ ৫'———১০' মিনিট
জল ৬৮'———৮৪' ডিগ্রী
পোষাক গরম
সূর্য্যস্নান।
সপ্তাহে ২ বার
দিবা ১০টা———৩ টা
জল—যে ডিগ্রী ½——— ১½ ঘণ্টা
পোষাক পাতলা
ঘর্ষণ-শিশ্ন-স্নান।
দৈনিক ২——৩ বার
বাষ্প ও সূর্য্য স্নানান্তর এবং সকাল সন্ধ্যা
ক্ষণ ১৫'———৬০' মিনিট
জল ৫০'———৬০' ডিগ্রী
পোষাক গরম

অনুবাদক
শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুধর্ম্মকে কেন ভালবাসি?*

Why do we love Hindooism?

মান্যবর সভাপতি এবং সভ্যমহোদয়গণ! একটি গুরুতর বিষয়ের সন্তোষজনক মীমাংসা করিবার জন্য, একটি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিবার জন্য, আমি অদ্যকার সভায় আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আমার বলিবার বিষয়—"হিন্দুধর্ম্মকে আমরা ভালবাসি কেন?" এই কথাটা যদি অন্যরূপ প্রশ্নে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে কহিতে হয়—"আমরা হিন্দু কেন, অথবা আমরা হিন্দু আছি কেন?" ইহার উত্তর এই হয় যে,—আমরা হিন্দুধর্ম্মকে ভালবাসি বলিয়া আমরা হিন্দু আছি। কিন্তু এই প্রশ্নের ইহা সদুত্তর হইলেও সম্পূর্ণ উত্তর নহে, কারণ খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, ব্রাহ্ম ইহারাও কহিতে পারেন—আমরা আমাদের ধর্ম্মকে ভালবাসি বলিয়া, স্ব স্ব ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া আছি। কিন্তু মহাশয়গণ! হিন্দুর উত্তর তাহা হইতে পারে না; "আমরা হিন্দুধর্ম্মকে ভালবাসি বলিয়া, হিন্দুধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছি"—বিশিষ্ট হিন্দুর মুখে এই উত্তর সম্পূর্ণ উত্তর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পৃথিবীপূজ্য সনাতন হিন্দু সন্তানের মুখে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সদুত্তর পাইবার আশা করি। সেই সদুত্তর—সেই সম্পূর্ণ উত্তর পাইবার জন্য এই প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের আলোচনার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ কহিতে পারেন, সকলেই আপনাপন ধর্ম্মকে ভালবাসিয়া থাকে, সেই হিসাবে আমরাও হিন্দুধর্ম্মকে ভালবাসি। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ উত্তরে সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু আমি ইহাতে সন্তুষ্ট বা পরিতৃপ্ত নহি। হিন্দুধর্ম্মে হিন্দুর ভালবাসা, আর অপর ধর্ম্মে অপরের ভালবাসায় অনেকটা প্রভেদ আছে। আপনারা বলিতে পারেন, "ভালবাসার কি আবার ইতর-বিশেষ আছে? প্রকৃত ভালবাসা

* কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব "শাস্ত্রতত্ত্বালোচনী" সভায় এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। মুদ্রাঙ্কনকালে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সকল স্থলেই সমান।” আমি বলি, যদি ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা হয়, তাহা হইলে অবশ্য তাহাতে ভেদাভেদ নাই একথা সত্য, কিন্তু জগতে সকল ক্ষেত্রে ভালবাসা কি একই প্রকার হইয়া থাকে বা হইতে পারে? মুসলমান কর্ত্তৃক পোষা মুর্গীর প্রতি ভালবাসা আর হিন্দু কর্ত্তৃক গাভীর প্রতি ভালবাসা কি এক? ভেকের সহিত সর্প-বন্ধুর ভালবাসা কিম্বা মৎস্যের সহিত বকবন্ধু কিম্বা বিড়াল বন্ধুর ভালবাসা আর বানরবাচ্ছার প্রতি বানরীর অসাধারণ ভালবাসা কি একই প্রকৃতির? পোষা মোরগ বা মুর্গীর প্রতি মুসলমান গৃহস্থ যাহা করে, অথবা ছাগল বা ভেড়ার প্রতি কশাইয়েরা যাহা করে বা দেখায়—তাহা ভালবাসা নহে; তাহা যত্ন হইতে পারে। যত্ন ও ভালবাসা, দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ। হিন্দুর স্বধর্ম্মে ভালবাসা আছে। যত্নের নানা উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসার একই উদ্দেশ্য, তাহা সদাই বিশুদ্ধ, সদাই সাত্ত্বিক এবং সদাই অকৃত্রিম। এরূপ ভালবাসা যাহার নাই, সে হিন্দু নহে; হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও হিন্দুয়ানী হইতে সে ব্যক্তি বহু সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত।

মহাশয়গণ! আমাদের ধর্ম্মকে আমরা ভালবাসি কেন, অথবা ধর্ম্ম ভালবাসিবার জিনিষ কেন, এবং ধর্ম্মকে ভালবাসা কেন উচিত, ইহা জানিতে পারিলে, জীবন অনেকটা সুখময় হইয়া উঠে। মায়াময় সাংসারিক জীবভার অনেকটা লঘু হইয়া যায় এবং দুঃখ, অজ্ঞান, অবিশ্বাস, অপ্রীতি, অশান্তি প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া, পরিণামে বিমল ব্রহ্মানন্দ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন আর মরণে ভয় থাকে না, বিপদে অধীরতা থাকে না, দারিদ্র্য দুঃখে মনবৃত্তি অসংযত হয় না। আশা, ভরসা, সাহস, উৎসাহ ও প্রফুল্লতা আসিয়া আমাদিগকে সতেজ করিয়া দেয়। মনে করুন, একটি বালিকা যদি জানিতে পারে যে, তাহার পিতা, মাতা ও অভিভাবকগণ অমুক ব্যক্তি স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম, চরিত্র, কুল, বংশমর্য্যাদা, গুণ, রূপ প্রভৃতি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, দেশাচার—লোকাচার—শাস্ত্রাচার মতে, তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছেন, এবং সেই ব্যক্তির তাহার পতি, তাহা হইলে ঐ বালিকা (অল্পবয়স্কা বা অধিক বয়স্কা হউক), ঐ পুরুষের দিকে স্বভাবতঃ আকৃষ্টা হয়, এবং যখন ভাবে যে তাহার সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতি, ভাল মন্দ, রোগ শোক, বিপদ সম্পদ, প্রভৃতি সমুদয় ব্যাপারেই তুল্যরূপে অধিকারিণী, তখন তাহার দিকে ঐ বালিকা আরও ঝুঁকিয়া পড়ে। অনন্তর যখন ইহা বুঝিতে পারে যে, সে হিন্দুররমণী এবং ঐ ব্যক্তি হিন্দু-পুরুষ, সুতরাং হিন্দুস্ত্রীর পতি ভিন্ন গত্যন্তর নাই, পতি যেমনই হউক, পতির অনুগত হইয়া তাহার সেবা করা হিন্দুস্ত্রীর ধর্ম্ম, তখন ঐ স্ত্রীলোক, ঐ পতির সেবাকে কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ বিশ্বাস করিয়া লয়। ইহার পরে বালিকা যখন আবার বুঝিতে সক্ষমা হয় যে উভয়ের দেহ ভিন্ন হইলেও মন প্রাণ এক, দুয়ে এক এবং দুয়ে অভিন্ন, তখন আরও তন্ময়া হইয়া পড়ে। পরিণামে যখন ইহা জানিতে ও বুঝিতে পারে যে, স্ত্রীর পতিই মোক্ষ এবং স্ত্রীর পক্ষে ইহলোকে ও পরলোকে পতিই গতি এবং বিবাহোপলক্ষে পরস্পরের সম্মিলন বা একীকরণ, পরলোকে ব্রহ্মপদ

প্রাপ্তির প্রধান হেতু, তখন প্রেমময়ী, ভক্তিময়ী, কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরী গোপিকার ন্যায় আপনার শ্রীকৃষ্ণরূপ পতিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিয়া তাহাতেই দেহ, মন ও আত্মা সমর্পণ করিয়া পরমানন্দে সেই সাধ্বীরমনী সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন; গৃহ ও গৃহস্থ এবং সমগ্র সংসার তখন তাঁহাদের নিকট দেবসদন বলিয়া বোধ হয়, সমস্ত জগত প্রেমময় ও শান্তিময় বলিয়া বোধ হয় এবং পতি তাঁহার পত্নীকে প্রাণের ভিতরে রাখিয়া দেন এবং পত্নীও তাঁহার প্রাণকে ঐ মহাপ্রাণে মিলাইয়া দিয়া আনন্দরূপিণী হইয়া বসেন। এইরূপে হিন্দু যদি বুঝিতে পারে "আমি কেন হিন্দু? আমার হিন্দুধর্ম্মে থাকা কেন উচিন অথবা কোন্ গুণে বা কি হেতুবাদে হিন্দুধর্ম্মকে ভালবাসা আমার পরম কর্ত্তব্য" তাহা হইলে হিন্দু সমাজের যে অসাধারণ সামর্থ্য, শোভা, সমৃদ্ধি ও জগন্মোহনকারিণী শক্তি জন্মে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? একজন চিন্তাশীল লোক কহিয়াছিলেন, কেন ভালবাসিব, তাহা তুমি আমাকে শিখাইয়া বা বুঝাইয়া দাও, তাহা হইলে তুমি আমার হইয়া যাইবে এবং আমি তোমার হইয়া যাইব, তাহা হইলে পরিণামে তুমি ও আমি এক হইয়া যাইব। পতি ও পত্নী যখন বুঝে স্ত্রী ও স্বামী একসঙ্গে না থাকিলে ধর্ম্ম সাধন হয় না (কারণ স্ত্রীর অপর নাম সহধর্ম্মিনী), তাহা হইলে পতি ও পত্নী আর স্বতন্ত্র হয় না। হিন্দু যখন বুঝে বা বুঝিতে পারে, অমুক অমুক কারণে হিন্দুধর্ম্মের পালন, রক্ষা, সেবা এবং তাহাতে এবং ধর্ম্ম, তখন হিন্দুর দেশ, হিন্দুর সাহিত্য, হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ এবং হিন্দুর সমুদয় ভালমন্দকে প্রত্যেক হিন্দু আপনার স্বার্থের সহিত জড়িত করিয়া লয় এবং নিজস্ব ভাবিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির কল্যাণ কামনায় বদ্ধপরিকর হয়। সুতরাং কি কারণে আমরা হিন্দুধর্ম্মকে ভালবাসিব এবং কি কারণে হিন্দুধর্ম্মকে ভালবাসা আমাদের কর্ত্তব্য তাহা জানা উচিত এবং প্রত্যেক হিন্দুকে তাহা শিখাইয়া ও জানাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সভ্য মহোদয়গণ! আপনাদের মধ্যে অনেকে কহিতে পারেন হিন্দুধর্ম্ম ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, এইজন্য হিন্দুধর্ম্মকে আমরা ভালবাসি, কিন্তু উত্তরটা সকল সময়ে ঠিক কি? হিন্দু না হইলে লোকে কি ধার্ম্মিক হইতে পারে না? অহিন্দুর মধ্যেও কি পরম ধার্ম্মিক লোক নাই? কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া নিরপেক্ষ ভাবেও উদার হৃদয়ে কহা যায়, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যেও অনেক বিশিষ্ট ধার্ম্মিক পুরুষ এবং যথার্থ ধার্ম্মিকা রমণী বিদ্যমান আছেন। আবার হিন্দুর মধ্যেও অধার্ম্মিকের সংখ্যা সহস্র সহস্র দেখান যাইতে পারে, কারণ ধর্ম্মের ঘরে কুষ্ঠরোগীর অভাব নাই আর যজ্ঞশালায় কাকের বা চিলের সংখ্যাও কমনয়। সুতরাং হিন্দু বলিলেই যে ধার্ম্মিক বুঝায় তাহা নহে এবং অহিন্দু বলিলেই যে অধার্ম্মিক বুঝায় তাহাও নহে। হিন্দুর হিন্দুয়াণী স্বতন্ত্র জিনিষ; ইহাকে কেন ভালবাসি তাহার বিশেষ রূপে আলোচনা কর—বিশেষতঃ আজি কালিকার দিনে, নানা কারণে, তাহার সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম রূপে আলোচনা করা—নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই

নানা প্রকার যুবকদিগের নানা প্রকার কাণ্ডা-কাণ্ড জ্ঞানশূন্য ব্যবহারের দিনে, এই গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয়টি আমাদের ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

মহাশয়গণ! হিন্দুধর্ম্মকে ভালবাসিবার যে সকল কারণ আছে তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথমতঃ সাধারণ কারণ, দ্বিতীয়তঃ বিশেষ কারণ। সর্ব্বপ্রথমে কতকগুলি সাধারণ কারণের উল্লেখ করিতে আকাঙ্খা করি।

যে কুলে যাহার জন্ম হয়, স্বভাবতঃ সেই কুলের সে ব্যক্তি পক্ষপাতী হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রকৃতির ইহা অকাট্য নিয়ম। যে সমাজে যাহার জন্ম, সেই সমাজ তাহার পক্ষে প্রিয় হয় এবং যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশ ঐ ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গ সমতুল্য মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালী যেমন দেশে ও বিদেশে বাঙ্গালীকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না, ব্রাহ্মণ যেমন ব্রাহ্মণকে অথবা কায়স্থ ও বৈদ্য যেমন কায়স্থ ও বৈদ্যকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না এবং ভারতবাসী ভারতবাসীকে ভাল বাসিতে যেমন সহজে প্রবৃত্ত হইয়া উঠে, হিন্দু তেমনি আর একজন হিন্দুকে স্বভাবতঃ ভাল না বাসিয়া পারে না। লোকে কথায় বলে "আকরে টানে।" স্বধর্ম্মীর সহিত সমধর্ম্মীর সহানুভূতি স্বভাবসিদ্ধ। একজন মুসলমান সহসা যেমন একজন পরিচিত বা অপরিচিত মুসলমানের সহিত সহানুভূতি করিতে পারে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য তত পারে না; সুতরাং হিন্দুর সহিত হিন্দুর সহানুভূতি স্বভাবসিদ্ধ। হিন্দুর সহিত সহানুভূতি থাকিলেই তাহার সুখ দুঃখে আমরা সুখী ও দুঃখী হইয়া থাকি। একজন খৃষ্টান, খৃষ্টান পিতার ঔরসে ও খৃষ্টানী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃষ্টকুলে প্রতিপালিত, শিক্ষিত ও মিলিত হইয়া গেলে, এবং খৃষ্টান সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলে, খৃষ্টানের সহিত তাহার সহানুভূতি এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতি তাহার ভালবাসা কি স্বাভাবিক নহে? মুসলমান ও বৌদ্ধের পক্ষেও তাই। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া সাধারণতঃ আমার হিন্দুধর্ম্মকে ভালবাসি। বাল্যকালে সর্ব্বপ্রথমে স্বধর্ম্মের প্রতি আমাদের যে সাধারণ ভালবাসা জন্মে তাহার কারণ এই যে, আমাদের পিতা, মাতা, জ্ঞাতি, প্রতিবাসী, আত্মীয়, কুটুম্ব, সখা, সখি, সমবয়স্ক, গ্রামবাসী, নগরবাসী সকলকেই আমারই আপন করিতে দেখিতে পাই। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মকে ভালবাসি। হিন্দু বালকের বাল স্বভাবের একটা সাধারণ নিয়ম। হিন্দুকুলের অন্নে আমরা প্রতিপালিত, হিন্দুর ঘরে আমার প্রতিপালিত, হিন্দু সমাজে আমরা প্রতিপালিত এবং হিন্দুর লোকাচার, দেশাচার, ও শাস্ত্রাচার অনুসারে আমাদের জীবনের সমুদয় সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে ও হইতেছে, এই জন্য হিন্দুধর্ম্মকে ভালবাসা স্বাভাবিক। হিন্দুর হিন্দুয়ানী আমাদিগকে ইহকাল ও পরকালের সুখের নিয়ম সমূহ শিক্ষা দিয়াছে, ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছে, আধ্যাত্মিক জগতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে তাহার দিব্য আলোক দেখাইয়া দিয়াছে, সুতরাং হিন্দুধর্ম্মকে ভালবাসা হিন্দুর পক্ষে স্বাভাবিক। বাল্যকাল হইতে হিন্দুর সাহিত্য শিক্ষা, হিন্দুর আচার ব্যবহার

পালন, হিন্দু মতের অনুসরণ প্রভৃতি দ্বারা মনের গতি ও প্রকৃতি ঠিক করিয়া লইয়াছি; হিন্দুর দেশ, হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর ভাষা ও সাহিত্য, হিন্দুর পুরুষ ও রমণী, হিন্দুর গুরু পুরোহিত ও আচার্য্য প্রভৃতির নিকটে নানা কারণে ঋণী, সুতরাং হিন্দুধর্ম্মকে আমারা ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। এই কৃতজ্ঞতা গুণে আমরা ভালবাসিতে বাধ্য হই। হিন্দুর সমাজকে না মানিলে, হিন্দুর ধর্ম্মে অবিশ্বাস করিলে, হিন্দুর প্রথাসমূহকে তুচ্ছ করিলে, হিন্দুর বিশ্বাসের সহিত নিজের বিশ্বাস এক না করিলে, আমরা হিন্দুয়ানী হারাইব এবং তাহা হইলে হিন্দুকুল ও হিন্দু সমাজের সহিত সম্পূর্ণ রূপে আমাদিগকে স্বতন্ত্র থাকিতে হইবে সুতরাং বহুবিধ অসুবিধায় এই মায়াময় ও দুঃখময় সংসারধামে জীবনকে দুঃখভার ও চিন্তাভার হইতে লঘু না করিয়া বরং অধিকতর অসুবিধা, অবসাদ, ক্লেশ, চিন্তা, অশান্তি প্রভৃতিতে আমরা নিমগ্ন হইয়া যাইব, সুতরাং হিন্দুসন্তান হিন্দুধর্ম্মকেই ভালবাসিতে বাধ্য হয়েন। যাহা চির দিনের অভ্যাস, যাহা শৈশব হইতে জীবনের সঙ্গী, যাহা পুরুষানুক্রমে রক্তে ধাতুতে, শোণিতে শোণিতে, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও প্রকৃতিতে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে, তাহাকে সহজে ছাড়া যায় না এবং নাড়িতে ও হৃদয়ে সহসা একটা প্রবৃত্তি জন্মে, সুতরাং ভাল হউক আর মন্দই হউক, হিন্দুধর্ম্মকে হিন্দুসন্তান ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে কি ?

মাননীয়বর সভাপতি ও সভ্যমহোদয়গণ! হিন্দুসন্তান, হিন্দুধর্ম্মকে যে ভালবাসে তাহার এই গুলি সাধারণ কারণ। কিন্তু সাধারণ কারণ সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব সমাজে এবং সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে সমভাবে খাটে না। যে গুলি বিশেষ কারণ সেই গুলিই ভালবাসার মুখ্য ও প্রধান কারণ। আমি দেখাইব, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি হিন্দুসন্তানের ভালবাসার সে কতগুলি বিশেষ কারণ আছে, অন্য ধর্ম্মে তাহার (সকলগুলি না হউক) অনেকগুলি নাই। হিন্দুধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্ব জন্যই হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুর নিকটে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর এবং প্রিয়তর হইতে প্রিয়তম হইয়া উঠিত। যে সকল মহাত্মার অকৃত্রিম অধ্যবসায়, স্বদেশপ্রেম, স্বধর্ম্মপরায়ণতা, স্বজাতিবৎসলতা, ঐকান্তিকি ভক্তি এবং বিদ্যাবল ও ধর্ম্মবল হিন্দুধর্ম্মের অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং যাঁহাদের যত্ন, যজন, বিশ্বাস ভক্তি ও ভালবাসার এখনও হিন্দু জাতি ধরাতলে অভ্রভেদী অত্যুচ্চ হিমগিরির ন্যায় অটুট ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যাঁহাদের চরিত্র বলে হিন্দুর হিন্দুয়ানী অদ্যাপি নষ্ট হয় নাই, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মকে এই ভাবেই ভালবাসিয়া গিয়াছেন এবং এখনও ঐ ভাবেই ভালবাসিতেছেন। আমেরিকার চিন্তাশীল সুলেখক ইমার্শন লিখিয়াছেন, Man lives by faith, love and admiration. অর্থাৎ ভক্তি, প্রেম ও প্রশংসায় মানুষ বাচে নতুবা মানুষ মরিয়া যাইত; আমি বলি কেবল মানুষ নহে, মানুষের ধর্ম্ম ও ভক্তি, প্রেম এবং প্রশাংসা বিনা একদিনও টিকিতে পারে না। স্বধর্ম্মের প্রতি হিন্দুর এরূপ ভক্তি, প্রেম ও প্রশংসাবাদ আছে বলিয়া হিন্দুর হিন্দুয়ানী এখনও শুকায় নাই, এখনও লুপ্ত হয় নাই। এই তিনটি যে দিন শুকাইবে সেই দিন হিন্দুধর্ম্ম

এবং হিন্দু জাতিরও নাম লোপ পাইয়া যাইবে। কথাটি স্থানান্তরে বিশদ করিয়া বুঝাইবার আকাঙ্খা রহিল, এক্ষণে কয়েকটি "বিশেষ কারণে" উল্লেখ করিতেছি।

মহাশয়গণ! সচরাচর আমরা দেখিতে পাই, মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা প্রধানতঃ পাঁচটি কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথম গুণজ ভালাবাসা, দ্বিতীয়—কর্ত্তব্যজ ভালবাসা, তৃতীয়—ধর্ম্মজ ভালবাসা, চতুর্থ—মোহজ ভালবাসা, পঞ্চম—স্বভাব সম্ভূত ভালবাসা। কথাগুলি একটু গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সুরাপায়ী বা নেশায় মাতোয়ারা ব্যক্তি নেশাবস্থায় হঠাৎ একজন সুন্দরী স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া, তাহার চরিত্র, গুণ, ধর্ম্ম, জাতি, কুল, বংশ, স্বভাব প্রভৃতির অনুমাত্রও অনুসন্ধান না করিয়া, কেবল রূপ দর্শনে, মোহ বশতঃ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলে তাহাকে মোহজ ভালবাসা কহা যাইতে পারে। personal arttaction (অর্থাৎ শুধু শারিরীক সৌন্দর্য্য) অনেক সময়ে এই মোহজ ভালবাসার কারণ। দুষ্ট স্বার্থাভিসন্ধি পরিপূরণ কামনায় যে ভালবাসা জন্মে তাহাও মোহজ ভালবাসা। বনের লতা জমির উপর দিয়া বিস্তৃত হইতে হইতে সর্ব্বপ্রথমে যে গাছটাকে বা যে বস্তুকে সম্মুখে পায় তাহাকেই জড়াইয়া ধরে এবং তাহাকেই আশ্রয় করিয়া ঘেরিয়া থাকে এবং তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিয়া যায়। গাছটা কণ্টকাকীর্ণ কিনা, বস্তুটা বিষক্ত কিনা, তাহা ঐ লতাটা চাহিয়া দেখে না। যুবকের যৌবনাবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রথম পরিস্ফুরণকালে যে মেয়েটাকে বা মাগীটাকে সর্ব্বপ্রথম আলাপ পরিচয়ে বা দর্শন স্পর্শণে চক্ষুর ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করে ঐ লতার মত তাহাতেই মজিয়া যায়, এই মেয়েটার কুল, বংশ, জাতি, গুণ, শিক্ষা, স্বভাব, চরিত্র, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কিছুই জানিবার, শুনিবার ও বুঝিবার আর সময় পায় না, কারণ সেই যুবক তখন ভ্রমান্ধ বা মোহান্ধ হইয়া পড়ে। এই ভালবাসার নাম মোহজ ভালবাসা। এই জন্যই পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় কুটুম্বের পরীক্ষিত, পরিচিত ও নির্ব্বাচিত পাত্র বা পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ করাই হিন্দুর শাস্ত্র সিদ্ধ এবং সমাজ সিদ্ধ, তাহা না হইলে কেবল মোহজ ভালবাসায় যে বিবাহ হয় তাহার পরিণাম প্রায়ই ভাল হয় না এরূপ সচারাচর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ রূপ ও স্বার্থ এই দুইটি মোহজ ভালবাসার আদি কারণ। ভৃত্য তাহার প্রভুকে ভালবাসে, ছাত্র তাহার শিক্ষককে ভালবাসে, গ্রামবাসী তাহার গ্রামবাসীকে ভালবাসে, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞের বা উপকৃতের ভালবাসা, এই গুলি কর্ত্তব্যজ ভালবাসা। পিতা পুত্রকে ভালবাসে, বাল্যকাল হইতে সমস্ত জীবনে একজন লোককে অকৃত্রিম মিত্রতা সুত্রে ভালবাসা, গুণীর গুণ দেখিয়া গুণীর প্রতি ভালবাসা, ভালবাস বলিয়া ভালবাসি, প্রভৃতি, এইরূপ ভালবাসা স্বভাব সম্ভূত ভালবাসা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কারণ love begets love, ভালবাসা হইতেও অনেক সময়ে ভালবাসা জন্মিয়া থাকে, যেমন শাবকের প্রতি পশুর ভালবাসা এবং পুত্র কন্যার প্রতি মাতা পিতার ভালবাসা। এইগুলি স্বভাব সম্ভূত। এখন বাকী আছে ধর্ম্মজ ভালবাসা। অনেকে কহিতে পারেন,

ধর্ম্মজ ভালবাসা আর কর্ত্তব্যজ ভালবাসা একই জিনিষ; আমার মতে তাহা নহে। কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ, কারণ কর্ত্তব্যের নিয়মের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, ধর্ম্মের নিয়মের পরিবর্ত্তন হয় না। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। পৃথিবী সমুদয় শাস্ত্রে, সমুদয় ধর্ম্মে, সমুদয় সভ্য সমাজে এই বিধি আছে যে, সদা সত্যং ব্রুয়াৎ—সতত সত্য কহিবে, সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহিবে না। কিন্তু অনেকানেক হিন্দুশাস্ত্র, মুসলমানদের কোরাণ এবং খৃষ্টানদিগের বাইবেল খুলিয়া আমি দেখাইতে পারি, এই সকল শাস্ত্রে সত্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া সমাদার করিলেও স্থল ও কাল এবং কারণ বিশেষে সত্যের অপলাপ করি. মিথ্যা বলিবার বিধিও সন্নিবিষ্ট আছে। মহামহর্ষি মনু মহোদয় লিখিয়াছেন, ধর্ম্ম, গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও বালকের প্রাণ রক্ষার জন্য মিথ্যা বলিলেও মিথ্যাবাদী প্রত্যবায় গ্রস্ত হয় না। শ্রীমৎ ভাগবত শাস্ত্রে লিখিত আছে, অত্যাচারীর দমন ও ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হেতু মিথ্যা প্রয়োজন হইলে তাহা মিথ্যা বলিয়া গণ্য হইবে না। কোরাণ ও বাইবেলেও এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তাহা দেখাইলাম না। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি এই, ব্রাহ্মণ সন্তান যেন স্বহস্তে প্রাণীবধ না করেন এবং যুদ্ধে গমন বা অস্ত্রধারণ না করেন। কিন্তু সেই হিন্দুশাস্ত্রই তারস্বরে কহিতেছেন যে, প্রাণীবধ, সমরক্ষেত্রে গমন ও অস্ত্রধারণ ব্রাহ্মণ বর্গের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে বলিয়া গণ্য হইলেও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে পারেন, করিলে "পতিত" বলিয়া গণ্য হইবেন না। মহামুণি পরাশর বলেন, ব্যবসা বা বাণিজ্য ব্রাহ্মণের বৃত্তি বা কর্ত্তব্য নহে কিন্তু দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্রাহ্মণেরা ব্যবসায়ী বা বণিক হইলে কর্ত্তব্যের লঙ্ঘন জনিত অপরাধে অপরাধী হয়েন না। তাহা হইলেই দেখুন, স্থল বিশেষে কর্ত্তব্যেরও লঙ্ঘন হয় এবং হইতে পারে এবং হইলেও শাস্ত্রমতে অপরাধ নাই, কিন্তু ধর্ম্ম এমন একটি জিনিষ যাহার পরিবর্ত্তন বা লঙ্ঘন আদৌ হইতে পারে না এবং হইবার বিধিও কোন শাস্ত্রে বা সমাজে নাই। গুরুভক্তি, ভগবৎ-ভক্তি, স্বদেশের প্রতি ভালবাসা, ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ, অধর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণা, ঈশ্বরাজ্ঞা পালন, স্বধর্ম্মের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি ধর্ম্মজ ভালবাসা। ইহার লঙ্ঘন হইলেই অপরাধ হইবে ইহা ধ্রুব সত্য। তাহা হইলেই দেখুন ধর্ম্মজ ভালবাসা সকল প্রকার ভালবাসা হইতে অধিকতম প্রয়োজনীয়। যে শিক্ষক মহাশয় আপনাকে সমস্ত জীবন সুশিক্ষা দান করিয়াছেন, শাস্ত্রের বিধি অনুসারে স্থল বিশেষে বা কারণ বিশেষে আপনি তাহার অনুজ্ঞা অবহেলা বা উপেক্ষা করিলেও অপরাধী হয়েন না, কিন্তু আপনার পূজ্যপাদ ইষ্টদেব হয়ত আপনার কর্ণকুহরে একটি মাত্র কথা ইষ্টমন্ত্র বা বীজমন্ত্র রূপে প্রবিষ্ট করাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন আপনি তাহা জানেন না, কিন্তু চীরজীবনের শিক্ষকে আবশ্যক হইলে আপনি পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্র মানিয়া যদি চলেন তাহা হইলে একদিনে পরিচিত গুরুদেবকে আপনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহাকে না দেখিলেও আপনি তাঁহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান ও ভালবাসিতে বাধ্য, কারণ এই

ভালবাসা ধর্ম্মজ ভালবাসা। ধর্ম্মজ ভালবাসার মূলে মুক্তিদেবী লুক্কায়িতা থাকেন, সুতরাং ধর্ম্মজ ভালবাসাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসা হিন্দু-ধর্ম্মকে ভাল বাসিবার একটা বিশেষ কারণ এই যে, ইহার প্রতি আমাদের ভালবাসা ধর্ম্মজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন. এই ভালবাসা যুক্তি প্রদায়িনী, এই ভালবাসা আমাদের ইহকাল ও পরকালের দোসর, সুতরাং হিন্দুসন্তান তাঁহার স্বধর্ম্মকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। আবার যদি ঐ ভালবাসার মূলে রূপ, গুণ, কর্ত্তব্য প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হয়; আমি দেখাইব হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুসন্তানের ভালবাসা সর্ব্ব-প্রকারেই বিশুদ্ধা ও সর্ব্বপ্রকারেই উত্তম কারণ সমুদ্ভূতা। এখন দেখা যাউক, যে সকল হেতুতে প্রকৃত ভালবাসার উৎপত্তি হইতে পারে, হিন্দুর ধর্ম্মে সেই সকল উপাদান আছে কি না? আমি দেখাইতে চেষ্টা করি, সেই সুন্দর উপাদানগুলি আমাদের ধর্ম্মে বর্ত্ত-মান আছে বলিয়া আমরা হিন্দুকে এত স্নেহ করি, হিন্দুধর্ম্মকে এত ভালবাসি, হিন্দু সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইতে তত ঘৃণা করি এবং হিন্দুর সহিত হিন্দু থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সন্তোষ লাভ করি।

মনে করুন, একটি পল্লীগ্রামে একটি দোকান আছে, ঐ দোকানে বস্ত্র ভিন্ন আর কিছু বিক্রীত হয় না। কাপড় ভিন্ন ঐ বিপণীতে আর কোন দ্রব্য এককড়া কড়ি মূল্যেও পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় দোকানটি একটু দূরে অবস্থিত, ইহা লব-ণের আড়ত, লবণ ভিন্ন ইহাতে অন্য কিছু বিক্রয় হয় না। তৃতীয় দোকান আরও দূরবর্ত্তী, ইহাতে ঘৃত ছাড়া আর কিছু পাইবেন না। চতুর্থ দোকানে কেবল সর্ষপ তৈল বিক্রীত হয় তাহা সর্ষপ তৈল মাত্রের আড়ত। কিন্তু গ্রামের মধ্যস্থলে এমন একটি সুবৃহৎ দোকান আছে যেখানে উপস্থিত হইলে বস্ত্র, ঘৃত, লবণ, তৈল, চাউল, ডাউল, মশলা, ছাতা, মোজা, টোপি, শ্লেট, পেন্সিল, বই, কাগজ, প্রভৃতি বহু প্রকার দ্রব্য একই বিপনী মধ্যে বিক্রীত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই দোকানটির গৌরব মর্য্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কারণ একই স্থানে দাঁড়াইয়া আমরা বহু প্রকার দ্রব্য খরিদ করিতে পারি, অন্য স্থানে গিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। তাহার পরে আর এক দিন দেখুন, বর্ণ মালার মধ্যে কেবল ক বর্গের একখানি অভিধান, অথবা কেবল চ বর্গের একখানি অভিধান কিম্বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্গের পৃথক পৃথক অভিধান অপেক্ষা একই খানি গ্রন্থে সমুদয় বর্ণের এবং সমুদয় শাস্ত্রের অভিধান করিয়া লওয়া কি অধিকতর সুবিধা জনক হয় না? একলক্ষ লোকের প্রত্যেককে অর্দ্ধ পয়সা করিয়া দান করা অপেক্ষা একজন বুদ্ধি-মান ও ভাল লোককে একলক্ষ পয়সায় যত টাকা হয় তাহা দান করা অধিকতর সৎযুক্তি সঙ্গত, কারণ একলক্ষ লোকের প্রত্যেকে অর্দ্ধ পয়সা দান প্রাপ্ত হইয়া যাহা না করিতে পারে অথবা যে সুবিধা প্রাপ্ত না হয়, একটা লোক ঐ ৫০ সহস্র পয়সা প্রাপ্ত হইলে সে একটা সুবৃহৎ ব্যাপার

সম্পাদন করিতে পারে, তাহাতে দেশের হিতের হয়, দশজন লোকের প্রতিপালন হয় এবং নানাপ্রকারে সমাজ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অর্দ্ধ পয়সায় কাহারও দুঃখও মিটে না অথচ দশজনের উপকারও হয় না। আর একদিক দিয়া কথাটা ভাবিয়া দেখুন। যদি একটা লোক কেবল সঙ্গীত বিদ্যা ভিন্ন আর কোন বিদ্যাই জানে না তাহা হইলে তাহাকে আদর্শ বিদ্বান বলা যায় না। কুড়িজন লোকের মধ্যে প্রত্যেকে যদি কেবল এক একটা বিষয়ের পূর্ণতঃ বা অংশতঃ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে আদর্শ পণ্ডিত কহা অযৌক্তিক, কিন্তু একজন লোক যদি এমন হয়েন যে, তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পুরুষ পুঙ্গব, সর্ব্ববিধ শাস্ত্রে অধিকারী, সকল প্রকার জ্ঞানে পারদর্শী, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আদর্শ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। এই এক জন আদর্শ পণ্ডিত ঐ কুড়িজন পণ্ডিতের অপেক্ষা অধিক সারবান। সভ্য মহোদয়গণ! আমি এতক্ষণ দৃষ্টান্ত স্বরূপে যাহা কহিয়া আসিলাম, তাহা এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের সহিত ধীর ভাবে এবং বিচক্ষণতার সহিত মিলাইয়া দেখুন। আমার বিবেচনায়, হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্ম। কর্ম্মকাণ্ডী, জ্ঞানকাণ্ডী, ভক্তিমার্গাবলম্বী, সাকারোপাসক, নিরাকারোপাসক, দার্শনিক, তার্কিক, সকামী, নিষ্কামী, শক্তি, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, সৌর, গাণপত্য, কৃষ্ণোপাসক, রামোপাসক, শিবোপাসক, দেবোপাসক, দেবী উপাসক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক হিন্দুধর্ম্ম মন্দিরে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জ্ঞান বিশ্বাস ও অভ্যাস অনুসারে স্বধর্ম্ম পালন করিতে পারেন। যিনি কিছুই চান না কেবল ভক্তি চান তিনিও এখানে, আর যিনি শুধু জ্ঞান ও তর্ক লইয়াই সমগ্র জীবন ব্যস্ত তিনিও এখানে। যিনি ত্যাগী তাঁহারও স্থান হিন্দুধর্ম্ম আর যিনি ত্যাগী নহেন তিনিও হিন্দুধর্ম্ম মন্দিরে। যিনি একশাস্ত্র না মানিয়া অন্য শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মী বা জ্ঞানী অথবা ভক্তরূপে বিরাজ করিতে চাহেন তিনিও আমাদের যেমন প্রিয়, আবার যিনি সর্ব্বশাস্ত্রেই বিশ্বাস রাখেন তিনিও আমাদের সুপ্রিয়। শ্মশানের সাধক, মশানের তান্ত্রিক, সিংহাসনের রাজা, পথের ভিখারী, মঠের মোহান্ত বা বৈরাগী, অরণ্য বা পর্ব্বত গুহার যোগী, সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুশীলক, এসমুদয়েরই স্থান হিন্দুধর্ম্মের মন্দিরের প্রশস্ত, প্রাচীন ও পবিত্র প্রাঙ্গনে সুন্দর ভাবে বন্দোবস্ত করা আছে। যিনি বৈদিক ধর্ম্মের অনুসারী, আর যিনি পৌরাণিক ধর্ম্মের অনুসারী আর যিনি কেবল গীতা বা বেদান্তের চর্চ্চায় অনুরক্ত কিম্বা যিনি শুধু তন্ত্রশাস্ত্র লইয়াই ব্যস্ত অথবা ভাগবত ও বৈষ্ণব শাস্ত্রেই উলট পালট করেন, ইহারা সকলেই হিন্দুসমাজ ভুক্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শ্রীশ্রীহরি।

(১৮৬৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৫শ বর্ষ, ১৫শ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। | পৌষ। | ১৩১৫ সাল, ১৮৩০ শকাব্দা।

যজুর্ব্বেদ—রুদ্রাধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

আলোচনা। এই মন্ত্রে রুদ্রগণকে গণ ও গণপতি, ব্রাত ও ব্রাতপতি, গৃৎস ও গৃৎসপতি, বিরূপ ও বিশ্বরূপ বলা হইয়াছে। গণশব্দে মহীধরাচার্য্য বুঝেন, দেবানুচর ভূত-বিশেষ। রুদ্রের বিশ্বরূপ রুদ্রাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে. সুতরাং রুদ্র—ভূত ও ভূতপতি হইতে পারেন। আধুনিকগণের মতে, গণ জনসমূহ ও গণপতি জনসমূহের নায়ক। রুদ্র সমূহস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে অন্তর্য্যামি-রূপে বিরাজ করেন, আবার তিনি গণনায়কের হৃদয়ে পরিচালকরূপে বিদ্যমান। ব্রাত অর্থ—দুর্ব্বল সংস্কারহীন মানব। এই ব্রাত শব্দ ঋক্‌সংহিতায় দৃষ্ট হয়। ইহা পরে 'ব্রাত্য' আকার ধারণ করিয়াছে। আধুনিক পণ্ডিত-গণ এই মত পোষণ করেন। মহীধর বলেন, ব্রাত নানাজাতীয় ব্যক্তির সংঘ। ব্রাতপতি ব্রাতগণের পালক। এই উভয় রূপেই রুদ্র বর্ণিত হইতে পারেন। গৃৎস অর্থে মহীধর বুঝিয়াছেন, বিষয়-লম্পট ও মেধাবী। যদি গৃৎস অর্থ মেধাবী হয়, তবে ব্রাত অর্থ সংস্কারহীন নীচ মানব হওয়া অনেক সঙ্গত হয়। মেধাবীও মেধাবীর পালকও রুদ্র, আবার সংস্কার-বিহীন এবং তাহা-দের পালকও রুদ্র। রুদ্র বিরূপ অর্থাৎ জগতে বলবান্ জ্ঞানবান্ ও যোদ্ধা। যেরূপ রুদ্রের মূর্ত্তি, হীনবল পঙ্গু খঞ্জও তেমনি রুদ্ররূপ। মহীধর বলেন, বিরূপ অর্থ নগ্ন অর্থাৎ দিগম্বর মুণ্ড ও জটিল প্রভৃতি। এই সকল বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকমূর্ত্তি যজুর্ব্বেদের যুগে পরিজ্ঞাত ছিল কি না, ইহার বিচার কর্ত্তব্য মনে করি না, তবে ঐ ব্যাখ্যা হইতেই কল্পিত সূত্রপাত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে—শ্রুতি প্রাণ খুলিয়া বলিতেছেন, রুদ্র বিশ্বরূপ। মহীধর মনে করেন—বিশ্বরূপ অর্থাৎ হয়গ্রীবাদি

বিচিত্র ও বিবেচনার অতীত অবতার-মূর্ত্তি। এই হয়গ্রীবাদির অস্তিত্ব যজুর্ব্বেদের সময় ছিল কি না, সন্দেহস্থল। কার্য্যতঃ রুদ্রা-ধ্যায়ে রুদ্রের বিশ্বরূপই বর্ণিত হইতেছে, অতএব বিশ্বরূপ বুঝিতে হয়গ্রীব নৃসিংহ পর্য্যন্ত অবতরণের প্রয়োজন বোধ হয় না।

নমঃ সেনাভ্যঃ সেনানীভ্যশ্চ বো নমো নমো রথিভ্যো অরথেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ ক্ষত্তৃভ্যঃ সংগ্রহীতৃভ্যশ্চ বো নমো নমো মহদ্ভ্যো অর্ভকেভ্যশ্চ বো নমঃ। ২৬

পদপাঠঃ। নমঃ। সেনাভ্যঃ। সেনানীভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ। নমঃ। রথিভ্যঃ। অরথেভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ। নমঃ। ক্ষত্তৃভ্যঃ। সংগ্রহীতৃভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ। নমঃ। মহদ্ভ্যঃ। অর্ভকেভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার। সেনাভ্যঃ—সেনারূপ রুদ্রগণকে। সেনানীভ্যঃ—সেনানায়করূপ রুদ্রগণকে। চ—ও। বঃ—তোমাদিগকে। রথিভ্যঃ—রথচারিগণকে। অরথেভ্যঃ—রথহীনগণকে। ক্ষত্তৃভ্যঃ—রথাধিষ্ঠাতৃগণকে। সংগ্রহীতৃভ্যঃ—সারথিগণকে। মহদ্ভ্যঃ—মহদ্গণকে। অর্ভকেভ্যঃ—বালকগণকে বা ক্ষুদ্রগণকে। নমঃ—নমস্কার। ('বঃ' 'চ' ইহাদের অর্থ পূর্ব্ববৎ।)

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমোস্কারোঽস্তু। সেনাভ্যঃ—সেনারূপেভ্যঃ রুদ্রেভ্যঃ। সেনানীভ্যঃ—সেনাপতিভ্যঃ। চ—অপি। বঃ—যুষ্মভ্যং। নমঃ—সর্ব্বত্র এক এবার্থঃ। রথিভ্যঃ—রথযুক্তেভ্যঃ। অরথেভ্যঃ—রথহীনেভ্যঃ—পদাতিভ্য ইত্যর্থঃ। বঃ—যুষ্মভ্যং (সর্ব্বত্রৈবং)। ক্ষত্তৃভ্যঃ—রথাধিষ্ঠাতৃভ্যঃ—রথচালকেভ্যঃ বা। সংগ্রহীতৃভ্যঃ—সারথিভ্যঃ অশ্বারোহিভ্যো বা। মহদ্ভ্যঃ—উৎকৃষ্টেভ্যঃ। অর্ভকেভ্যঃ—জ্ঞানবালেভ্যঃ অপকৃষ্টেভ্যঃ। (অপরং পূর্ব্ববৎ)।

অন্বয়ঃ। হে রুদ্রাঃ! সেনাভ্যঃ সেনানীভ্যশ্চ যুষ্মভ্যং নমঃ, রথিভ্যঃ—অরথেভ্যশ্চ বো নমঃ, ক্ষত্তৃভ্যঃ সংগ্রহীতৃভ্যশ্চ বো নমঃ, মহদ্ভ্যঃ অর্ভকেভ্যশ্চ বো নমঃ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। হে রুদ্রাঃ! সেনাভ্যঃ সৈনিকরূপেভ্যঃ সেনানীভ্যঃ সেনানায়করূপেভ্যশ্চ যুষ্মভ্যং নমঃ অস্তু। যূয়মেব সৈনিকাঃ সেনাপতয়শ্চ ইতি ভাবঃ। (সেনাং নয়ন্তি যেতে সেনান্যঃ সৈনিকচালকাঃ) রথিভ্যঃ রথশালিভ্যঃ (রথাঃ সন্তি যেষাং তে রথিনঃ তেভ্যঃ) তথা অরথেভ্যঃ রথবিযুক্তেভ্যঃ পাদচরেভ্যঃ ইতি ভাবঃ (নাস্তি রথো যেষাং তে অরথাঃ তেভ্যঃ) চ যুষ্মভ্যং নমঃ নমঃ। রথিরূপেণ পদাতিরূপেণ চ হে রুদ্রাঃ যূয়মেব বিদ্যমানা ইতি ভাবঃ। ক্ষত্তৃভ্যঃ—রথাধিষ্ঠিতেভ্যঃ রথচালকেভ্যো বা (ক্ষি নিবাসগত্যোঃ তুদাদিঃ ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি রথেষু ইতি ক্ষত্তারঃ। যদ্বা ক্ষিপ প্রেরণে ক্ষিপন্তি প্রেরয়ন্তি সারথীন্ ইতি ক্ষত্তারঃ রথাধিষ্ঠাতারঃ, নপ্তৃ নেষ্টৃ ত্বষ্টৃ ক্ষত্তৃ পোতৃ ভ্রাতৃ জামাতৃ পিতৃ দুহিতৃ ইত্যৌণাদিকসূত্রেণ, তৃচ প্রত্যয়ান্তো নিপাতঃ। তেভ্যো নম ইতি মহীধরাচার্য্যঃ।) সংগ্রহীতৃভ্যঃ—অশ্বারোহিভ্যঃ সারথিভ্যো বা (সংগৃহ্নন্তি অশ্বান্ ইতি সংগ্রহীতারঃ সারথয়ঃ গ্রহতৃচাবিতি তৃচ্ ইতি মহীধরাচার্য্যঃ। নব্যাস্ত সংগৃহ্ণন্ত্যশ্বান্ ইত্যশ্বারোহিণঃ,

ইত্যাহুঃ) যুষ্মভ্যং নমঃ। মহদ্ভ্যঃ—উৎকৃষ্টেভ্যঃ (মহান্তো জাতিবিদ্যাদিভিরুৎকৃষ্টাঃ তেভ্যঃ নমঃ ইতি মহীধরঃ) অর্ভকেভ্যঃ—ক্ষুদ্রেভ্যঃ— (অর্ভকাঃ প্রমাণাদিভিরল্পাঃ তেভ্যো নম ইতি মহীধরঃ) চ যুষ্মভ্যং নমঃ। হে রুদ্রাঃ যূয়ং সৈনিকাঃ সেনাপতয়ঃ রথিনঃ পদাতয়ঃ রথাধিষ্ঠাতারঃ সারথয়ঃ—যুয়মেব মহান্তঃ ক্ষুদ্রাশ্চ ইতি রহস্যম্।

মন্ত্রার্থঃ। হে রুদ্রগণ! সেনা ও সেনাপতি-স্বরূপ তোমাদিগকে নমস্কার। রথী ও পদাতিরূপ তোমাদিগকে নমস্কার। ক্ষত্তৃ ও সারথিরূপ তোমাদিগকে নমস্কার। মহৎ ও ক্ষুদ্ররূপ তোমাদিগকে নমস্কার।

আলোচনা। এ মন্ত্রে রুদ্রদেবকে সেনা, সেনাপতি, রথী, পদাতি, ক্ষত্তৃ, সারথি, মহৎ ও ক্ষুদ্ররূপে বর্ণনা করা হইতেছে। 'সেনা' শব্দ সাধারণ অর্থবোধক—রথী, পদাতি, ধানুকী, খড়্গী, গদী, নিষাদী প্রভৃতি সেনার বিশেষ নাম। সেনাপতিগণ সর্ব্বসেনার অথবা সেনাদল-বিশেষের নায়ক। রথী—যাহারা রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করে। 'অরথ' যাহাদের রথ নাই, ভূমিতে পাদচারে ভ্রমণ করিয়া সংগ্রাম করে। ক্ষত্তৃ শব্দের অর্থ সূত্রধর অথবা রথ-সূত অর্থাৎ সারথি; কিন্তু এখানে মহীধর আচার্য্য বলেন, যাহারা রথে বাস করে, অথবা সারথিগণকে প্রেরণ করে তাহারা 'ক্ষত্তৃ'। এরূপ অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ বাহুল্য নাই। 'সংগৃহীতৃ' শব্দে মহীধরাচার্য্য বুঝিয়াছেন, যাহারা অশ্বগণকে সংগ্রহ অর্থাৎ রশ্মি সংযমদ্বারা আকর্ষণ করে, তাহারা সংগ্রহীতৃ সারথি। এ ব্যাখ্যা সুন্দর নহে। 'ক্ষত্তৃ' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সূত বা সারথি। সেই অর্থ গ্রহণ করিলে, ভাল হয়। 'সংগ্রহীতৃ' অর্থ অশ্বারোহী। সারথি যেমন রথ যোজিত অশ্বের সংগ্রহ করে, অশ্বারোহীও তদ্রূপ স্বীয় অশ্বের বল্‌গা আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সংযত করে, সুতরাং এই যোগার্থ উভয়স্থলে সমান। 'ক্ষত্তৃ' শব্দের প্রসিদ্ধ সূত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্রসিদ্ধ রথাধিষ্ঠাতা অর্থ গ্রহণ করা সুসঙ্গত নহে। 'ক্ষত্তা' যদি রথাধিষ্ঠাতা হন, এবং সারথির চালক বা প্রেরক হন, তবে তিনি রথী হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হন না, কিন্তু এই মন্ত্রেই পূর্ব্বে 'রথিভ্যঃ' এই পদের দ্বারা রথীর কথা বলা হইয়াছে। আবার যদি 'ক্ষত্তৃ' অর্থ রথী হয়, তবে পুনরুক্তিদোষ ও একটী শব্দের ব্যর্থতা স্বীকার করিতে হয়। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া, আমরা কোন মতে মহীধরাচার্য্যের মত গ্রহণ করিতে পারি না। 'মহৎ' শব্দে উৎকৃষ্ট জাতি, বিদ্যা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইতে পারে, কিন্তু 'অর্ভক' শব্দের বালক (অল্পবয়স্ক) অর্থই প্রসিদ্ধ। এখানে জ্ঞানে বালক, শিক্ষায় শিশু, প্রমাণে অল্প এই কষ্টকল্পনা কতদূর সঙ্গত, তাহা সাধারণের বোধগম্য। আমরা মনে করি—'মহৎ' অর্থ বৃদ্ধ, আর অর্ভক অর্থ বালক। রুদ্রগণ বৃদ্ধও বটেন, বালকও বটেন। এখানে "তুমি কুমার তুমিই কুমারী। তুমি যষ্টি গ্রহণ করিয়া তাহার অবলম্বনে গমনাগমন (বৃদ্ধরূপে) কর" ইত্যাদি বেদবাক্যের ভাব পরিস্ফুট হইতেছে। অতএব জ্ঞানীয়ান্‌ ও অল্পজ্ঞের কথা না বলিয়া, বৃদ্ধ ও বালকের কথা বলিলে সমধিক সুসঙ্গত হয়, তাহাতে 'অর্ভক' শব্দের চিরপ্রসিদ্ধ অর্থের বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম হয় না।

নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্ম্মারেভ্যশ্চ বো নমো নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নম। ২৭

পদপাঠঃ। নমঃ। তক্ষভ্যঃ। রথকারেভ্যঃ। কুলালেভ্যঃ কর্ম্মারেভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ। নমঃ। নিষাদেভ্যঃ। পুঞ্জিষ্ঠেভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ। নমঃ। শ্বনিভ্যঃ। মৃগয়ুভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ।

পদব্যাখ্যা। তক্ষভ্যঃ—কাষ্ঠশিল্পীগণস্বরূপ রুদ্রসকলকে। রথকারেভ্যঃ—সুদক্ষ সূত্রধরস্বরূপ রুদ্রগণকে। চ—ও। বঃ—তোমাদিগকে। (সর্ব্বত্র এই অর্থ)। কুলালেভ্যঃ—কুম্ভকাররূপ রুদ্রগণকে। কর্ম্মারেভ্যঃ—লৌহশিল্পীস্বরূপ রুদ্রগণকে (ইহাদিগকে সাধারণতঃ কামার বা কর্ম্মকার বলে।) নিষাদেভ্যঃ—নিষাদস্বরূপ রুদ্রগণকে। পুঞ্জিষ্ঠেভ্যঃ—পক্ষিপুঞ্জঘাতক পুক্কশাদিরূপ রুদ্রগণকে। শ্বনিভ্যঃ—যাহারা কুক্কুর পোষণ করে তাহারা 'শ্বনি'—তদ্রূপ রুদ্রসমূহকে। মৃগয়ুভ্যঃ—মৃগঘাতক লুব্ধক বা ব্যাধস্বরূপ রুদ্রবর্গকে। (নমস্কার।)

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারো হস্তু। তক্ষভ্যঃ—কাষ্ঠশিল্পিভ্যঃ—সূত্রধরসংজ্ঞকেভ্যঃ। রথকারেভ্যঃ—কাষ্ঠশিল্পিষু যে উত্তমাঃ রথনির্ম্মাণক্ষমাঃ তেভ্যঃ। চ—অপি। বঃ—যুষ্মভ্যং। নম ইতি সর্ব্বত্রৈকরূপং। কুলালেভ্যঃ—মৃৎশিল্পিনঃ কুলালাঃ ঘটকারাঃ তেভ্যঃ। কর্ম্মারেভ্যঃ—লৌহকারেভ্যঃ। নিষাদেভ্যঃ—গিরিচরেভ্যঃ মাংসাশিভ্যঃ। পুঞ্জিষ্ঠেভ্যঃ—পক্ষিবন্ধকেভ্যঃ। শ্বনিভ্যঃ—কুক্কুর পোষকেভ্যঃ। মৃগয়ুভ্যঃ—মৃগপ্রার্থিভ্যঃ। চ—অপি। (সর্ব্বত্র) বঃ—যুষ্মভ্যং (সর্ব্বত্র এবং।) নমঃ—নমস্কারো হস্তু।

অন্বয়ঃ। তক্ষভ্যঃ রথকারেভ্যশ্চ (হে রুদ্রাঃ) যুষ্মভ্যং নমঃ। কুলালেভ্যঃ কর্ম্মারেভ্যশ্চ বো নমঃ। নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ যুষ্মভ্যং নমঃ। শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। হে রুদ্রাঃ! তক্ষভ্যঃ—কাষ্ঠশিল্পজীবিভ্যঃ (তক্ষাণঃ শিল্পিজাতয়ঃ ইতি মহীধরাচার্য্যঃ) রথকারেভ্যঃ—রথনির্ম্মাতৃভ্যঃ (রথং কুর্ব্বন্তীতি রথকারাঃ সূত্রধার-বিশেষাঃ তেভ্যঃ বো নমঃ ইতি মহীধরঃ। তক্ষরূপেভ্যঃ রথকাররূপেভ্যশ্চ রুদ্রেভ্যো নমোহস্তু। কুলালেভ্যঃ কুম্ভকারেভ্যঃ কর্ম্মারেভ্যঃ লোহনির্ম্মাতৃভ্যঃ চ যুষ্মভ্যং নমোহস্তু। নিষাদাঃ—মাংসাশনাঃ গিরিচারিণঃ ভিল্লাদয়ঃ তদ্রূপেভ্যঃ। পুঞ্জিষ্ঠাশ্চ পক্ষিপুঞ্জনাশকাঃ অন্ত্যজাঃ পুক্কশাদয়ঃ তেভ্যশ্চ বো নমঃ। শ্বনিভ্যঃ—শ্বানাং কপালকেভ্যঃ (শুনো নয়ন্তি তে শ্বন্যঃ শ্বকণ্ঠবদ্ধ রজ্জুধারকাঃ শ্বগণিনঃ নয়তেঃ ডুস্ব আর্ষঃ ইতি মহীধরাচার্য্যঃ) মৃগয়ুভ্যঃ মৃগবন্ধকেভ্যঃ (মৃগান্ কাময়ন্তে তে মৃগয়বঃ। ইদং যুরিদং কাময়মান ইতি যাস্কোক্তেঃ। শুপ আত্মনঃ ক্যজিতি ক্যচ্ ক্যচিচেতি প্রাপ্তস্তেত্বস্য ন চ্ছন্দস্যপুত্রস্যেতি নিষেধঃ মৃগয়বো লুব্ধকাঃ—ইতি মহীধরাচার্য্যঃ) চ যুষ্মভ্যং নমস্কারোহস্তু ইতি যোজনা।

বঙ্গার্থঃ। হে রুদ্রগণ! তক্ষ ও রথকারস্বরূপ তোমাদিগকে নমস্কার করি। কুলাল ও কর্ম্মারস্বরূপ তোমাদিগকে নমস্কার করি। নিষাদ ও পুঞ্জিষ্ঠস্বরূপ তোমাদিগকে নমস্কার

করি। শ্বনি ও মৃগয়ুরূপ তোমাদিগকে নমস্কার করি।

আলোচনা। এ মন্ত্রে রুদ্রগণের শিল্পিমূর্ত্তিসমূহ ও বিভিন্ন-বৃত্তিশীল নানাজাতীয় মূর্ত্তির বর্ণনা দেওয়া হইতেছে। তক্ষা সূত্রধর বা—ছুতর। রথকার উৎকৃষ্ট সূত্রধর—যে রথাদি নির্ম্মাণে সুদক্ষ। কেহ ২ বলেন, রথকার একপ্রকার সঙ্কর-জাতি। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে যে "মাহিষ্যেণ করণ্যাং তু রথকারঃ প্রজায়তে।" মাহিষ্যের ঔরসে করণীর গর্ভে 'রথকার' নামক জাতির প্রবর্ত্তক রথকার জন্মগ্রহণ করে। নিষাদ বনচর অসভ্য ভিল্ কোল প্রভৃতি জাতি—পুঞ্জিষ্ঠ ঐরূপ অসভ্য বনচর জীব, কিন্তু ইহারা প্রধানতঃ পক্ষী ধারণ, বিনাশ ও বিক্রয় প্রভৃতিদ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। শ্বনি, যাহারা কুকুর লইয়া বেড়ায়। ইহারা বোধহয় বর্ত্তমানকালের 'শিয়াল-মারার' দল। শিয়াল-মারারা কুকুর লইয়া বেড়ায়; তাহার সাহায্যে জীবজন্ত ধরিয়া থাকে। মৃগয়ু ব্যাধ মৃগমারণব্যবসায়ী। এই সকল অসভ্য অরণ্যচর অনুন্নত মানব এবং লৌহশিল্প, কাষ্ঠশিল্প ও মৃৎশিল্পব্যবসায়ী মানবগণ রুদ্রদেবেরই ভিন্ন ২ মূর্ত্তি। সকলেরই অন্তরে অন্তরাত্মরূপে রুদ্র বিরাজ করিতেছেন।

নমঃ শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো ভবায় চ রুদ্রায় চ নমঃ শর্বায় চ পশুপতয়ে চ নমো নীলগ্রীবায় চ শিতিকণ্ঠায় চ। ২৮

পদপাঠঃ। নমঃ। শ্বভ্যঃ। শ্বপতিভ্যঃ। চ। বঃ। নমঃ। নমঃ। ভবায়। চ। রুদ্রায়। চ। নমঃ। শর্বায়। চ। পশুপতয়ে। চ। নমঃ। নীলগ্রীবায়। চ শিতিকণ্ঠায়। চ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার করি। শ্বভ্যঃ—কুকুররূপী রুদ্রগণকে। শ্বপতিভ্যঃ—কুকুরপালকস্বরূপ রুদ্রগণকে। চ—ও। বঃ—তোমাদিগকে। ভবায়—যাহা হইতে জীবগণ জন্মগ্রহণ করে সেই রুদ্রদেবকে। চ—এবং। রুদ্রায়—দুঃখনাশক রুদ্রদেবতাকে। শর্বায়—পাপনাশক রুদ্রদেবকে। চ—আর। পশুপতয়ে—অজ্ঞজনের পালক রুদ্রকে। চ—অপিচ। নীলগ্রীবায়—নীলকণ্ঠ মহাদেবকে। চ—ও। শিতিকণ্ঠায়—যাহার কণ্ঠদেশ গরলধারণ স্থান ভিন্ন অন্যত্র শ্বেতবর্ণ—সেই ঈশ রুদ্রদেবকে (নমস্কার করি।)

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারোঽস্তু। শ্বভ্যঃ—শ্বরূপেভ্যঃ রুদ্রেভ্যঃ। শ্বপতিভ্যঃ—শ্বপালক-রুদ্রেভ্যঃ। চ—অপিচ। বঃ—যুষ্মভ্যং। নমঃ—(সর্ব্বত্রৈকরূপম্)। ভবায়—উৎপত্তিস্থানস্বরূপায়। রুদ্রায়—দুঃখনাশকায়। শর্বায়—পাপনাশকায়। পশুপতয়ে—অজ্ঞজনানাং স্বামিনে। নীলগ্রীবায়—নীলবর্ণকণ্ঠদেশশালিনে। শিতিকণ্ঠায়—নীলাৎ অন্যত্র শ্বেতবর্ণ-কণ্ঠবিশিষ্টায়।

অন্বয়ঃ। হে রুদ্রাঃ! শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ যুষ্মভ্যং নম। ভবায় নমঃ। রুদ্রায় নমঃ। শর্বায় পশুপতয়ে চ নমঃ। নীলগ্রীবায় শিতিকণ্ঠায় চ নমঃ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। শ্বানঃ কুকুরাঃ তেঽপি রুদ্রা এব, রুদ্রাণাং বিশ্বব্যাপিত্বাৎ তেভ্যো নমঃ। শুনাং পতিঃ শ্বপতিঃ—কুকুরপালকাঃ নিকৃষ্টবৃত্তয়ঃ মানবাঃ—তেঽপি রুদ্ররূপাঃ তেভ্যো নমঃ। ভবন্ত্যুৎপদ্যন্তে জন্তবোঽস্মাদিতি ভবঃ

জন্তুনাং উৎপত্তিহেতুঃ তস্মৈ রুদ্রায় নমঃ। রুৎ দুঃখং দ্রাবয়তি নাশয়তি রুদ্রঃ তস্মৈ নমঃ। শৃণাতি হিনস্তি পাপং ইতি শর্ব্বঃ ইতি মহীধরাচার্য্যঃ। তস্মৈ শর্বায় নমস্কারোঽস্তু। পশূন্ অজ্ঞান্ পাতি রক্ষতি পশুপতিঃ ইতি মহীধরাচার্য্যঃ। অয়স্তু শৃঙ্খলবিমুক্তঃ বিন্যাসঃ—পশূনাং পতিরিতি পশুপতিঃ, পতিস্তু পাতীতি কৃত্বা যুজ্যতে তথাচ সর্ব্বং সমঞ্জসং ;—বিষভক্ষণেন নীলা গ্রীবা কণ্ঠৈকদেশো যস্য সঃ নীলগ্রীবঃ তস্মৈ নমঃ। অপিচ গরলপানং-লেপাদন্যত্র শিতিঃ শ্বেতঃ কণ্ঠো যস্য স শিতিকণ্ঠঃ তস্মৈ নমঃ। কোষস্মৃতিঃ—শিতিঃ ধবলমেচকো ইতি।

মন্ত্রার্থঃ। যিনি কুক্কুররূপী অর্থাৎ বিড়্-ভোজী কুক্কুরের অন্তর্দেবতারূপে বিরাজ করেন ; যিনি কুক্কুরগণেরও পালক, যিনি ভব, রুদ্র, শর্ব, পশুপতি, নীলকণ্ঠ ও শিতিকণ্ঠ, তাঁহাকে নমস্কার করি।

আলোচনা। এখানে বলা হইতেছে—রুদ্র বিশ্বময়, বিশ্বের উৎপত্তির কারণ মঙ্গলরক্ষক ও অজ্ঞজনগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল। যেমন সংসারের বিভূতিমৎ বস্তুজাত তাঁহার এক এক বিকাশ, তেমনি নীচ প্রাণী বিড়্-ভোজী কুক্কুর ও নিম্নস্তরের মানব কিরাত—এ সকলও তাঁহার অন্য বিকাশ ব্যতীত কিছু নহে। প্রকারান্তরে রুদ্র সর্ব্বজীবে সমভাবে বিদ্যমান, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। 'ভব' অর্থ জীবগণের উৎপত্তির কারণ, তাৎপর্য্যতঃ যিনি এই জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল যে ভগবান্ রুদ্র জীবজগতের সৃষ্টি করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন, তাহা নহে; জগতের অশেষ দুঃখরাশি বিনাশ পূর্ব্বক জীবকুলের ত্রিতাপদগ্ধজীবনে শান্তিবারি বর্ষণ করিতেও তিনি রত আছেন। কেন না, তিনি রুদ্র, রুৎ দুঃখ দ্রাবিত বা দূরিত করেন যিনি, তিনিই রুদ্রনামে অভিহিত হন। জগৎ-পালনও তাঁহারই কার্য্য—সংক্ষেপে ইহা বলা হইল। দুঃখ দূরে গেলেও সুখপিপাসু মানবের সুখ-সম্ভোগে অজ্ঞাতসারে বহু পাপ আগমন করে, তাহাও রুদ্রদেব দূরীভূত করেন। 'শর্ব'—যিনি পাপ সকলকে শীর্ণ অর্থাৎ বিনষ্ট করেন। যাহারা সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্ রুদ্রের সন্তোষসাধন করিতে পারে, তাহাদেরই পাপ বিনষ্ট করেন, এতদ্রূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ তিনি পশুপতি। যাহারা জ্ঞান-দরিদ্র তাহারাই পশু কারণ আহার-নিদ্রা-ভীতি-সম্ভোগাদি ব্যাপারে মানব ও পশুতে পার্থক্য নাই। কেবল ভেদ, জ্ঞানবিকাশের তারতম্যে, সুতরাং যে অল্পজ্ঞান সে পশুতুল্য বা 'পশু' ইহা নিতান্ত অসঙ্গত মনে হয় না। রুদ্রদেব সেই পশুগণের—জ্ঞানহীনবর্গেরও পালক। একটী সঙ্গীতের একটা পদ স্মরণ হয়—"যার কেহ নাই তুমি আছ তার !" বস্তুতঃ অকৃতিগণের প্রতিও তাঁহার করুণা-বর্ষণের অভাব নাই। মেঘ উচ্চগিরিকূটেও যেমন বর্ষণ করে, নিম্ন সাগরবক্ষেও তেমনি ; সেখানে কৃপণতা নাই। রুদ্রদেব বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, আবার তিনি শিতিকণ্ঠ; গরল যেখানে লাগে নাই, তাদৃশস্থানে তাহার কণ্ঠ শ্বেত বা শিতি।

নমঃ কপর্দ্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ নমঃ সহস্রাক্ষায় চ শতধন্বনে চ নমো

গিরিশয়ায় চ শিপিবিষ্টায় চ নমো মীঢ়ুষ্টমায় চেষুমতে চ। ২৯

পদপাঠঃ। নমঃ। কপর্দ্দিনে। ব্যুপ্ত-কেশায়। চ। নমঃ। সহস্রাক্ষায়। চ। শতধন্বনে। চ। নমঃ। গিরিশয়ায়। চ। নমঃ। মীঢ়ুষ্টমায়। চ। ইষুমতে। চ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার করি (সর্ব্বত্র এইরূপ।) কপর্দ্দিনে—জটাজূটধারী রুদ্রকে। ব্যুপ্তকেশায়—মুণ্ডিত-মস্তক রুদ্রকে। চ—এবং। (সর্ব্বত্র এই অর্থ) সহস্রাক্ষায়—ইন্দ্ররূপ রুদ্রকে। শতধন্বনে—শত শত ধনুর্দ্ধারী রুদ্রকে। গিরিশয়ায়—কৈলাসে শিবরূপে যিনি বিরাজমান তাঁহাকে। শিপি-বিষ্টায়—শিপিবিষ্ট নামধারী রুদ্রকে। মীঢ়ুষ্ট-মায়—যিনি অতিশয় বর্ষণকারী সেই রুদ্রকে। ইষুমতে—বাণধারী রুদ্রকে নমস্কার।

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারোঽস্তু। কপর্দ্দিনে—কপর্দ্দধারিণে। ব্যুপ্তকেশায়—মুণ্ডিতমস্তকায়। সহস্রাক্ষায়—অসংখ্য-নেত্রায়। শতধন্বনে—বহু ধনুর্দ্ধারিণে। গিরি-শয়ায়—কৈলাসস্থায় শিবায়। শিপিবিষ্টায়—বিষ্ণুরূপিণে পশুহৃদয়স্থায় যজ্ঞাধিষ্ঠাতৃদেবায় বা। মীঢ়ুষ্টমায়—সেক্তৃতমায়। ইষুমতে—বাণকরায় রুদ্রায়, নমঃ ইতি শেষঃ।

অন্বয়ঃ। কপর্দ্দিনে ব্যুপ্তকেশায় সহস্রাক্ষায় শতধন্বনে গিরিশয়ায় শিপিবিষ্টায় মীঢ়ুষ্টমায় চ রুদ্রায় নমোঽস্তু।

মন্ত্রব্যাখ্যা। কপর্দ্দিনে নমঃ—কপর্দ্দো-ঽস্য জটাজূট ইতি কোষঃ—জটিলায় ইতি যাবৎ। ব্যুপ্তকেশায় মুণ্ডিতশিরোরুহায় মুণ্ডিত-মস্তক যত্যাদিরূপেণ রুদ্র এব সেব্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। সহস্রসংখ্যানি চক্ষূংষি যস্য সঃ তস্মৈ, শতধন্বনে শতং ধনূংষি যস্য স শত-ধন্বা ধনুষশ্চেত্যনঙ্ ইতি মহীধরাচার্য্যাঃ। বহুধনুর্দ্ধারিণে ইত্যর্থঃ। গিরৌ কৈলাসে শেতে ইতি গিরিশয়ঃ তস্মৈ নমঃ। শিপি-বিষ্টায় বিষ্ণুরূপায় রুদ্রায়। "বিষ্ণুঃ শিপিবিষ্ট ইতি" শ্রুতেঃ। স রুদ্রঃ বিষ্ণুরূপেণ রাজতে তস্মৈ ইতি তাৎপর্য্যম্। শিপিষু পশুষু অন্তর্য্যামিরূপেণ বিষ্টঃ প্রবিষ্টঃ পশুহৃদয়স্থ আত্মরূপঃ রুদ্রঃ শিপিবিষ্টঃ—পশবো বৈ শিপি-রিতি শ্রুতেঃ ইতি মহীধরাচার্য্যাঃ। যজ্ঞে অধিষ্ঠাতৃতয়া বিষ্টঃ শিপিবিষ্টঃ যজ্ঞো বৈ শিপি-রিতি শ্রুতেঃ যজ্ঞপুরুষোঽপি রুদ্রঃ এব পৌরাণিকোপাখ্যানে রুদ্রহীনতয়া দক্ষস্য প্রজাপতে র্যজ্ঞপূর্ত্তিরপি ন জাতা ইতি শ্রূয়তে। শিপিষু রশ্মিষু মণ্ডলাধিষ্ঠাতৃতয়া আদিত্যরূপেণ প্রবিষ্টঃ শিপিবিষ্টঃ সূর্য্যঃ—তদ্রূপায় রুদ্রায় ইত্যপি সমগচ্ছতে। শিপয়ো-ঽত্র রশ্ময়ঃ উচ্যন্তে তৈরাবিষ্টো ভবতীতি যাস্কোক্তেঃ। চরাচরাবভাসকঃ সূর্য্যরূপ রুদ্রঃ তস্মৈ নমঃ। মীঢ়ুষ্টম অতিশয়েন মীঢ়ান্ সেক্তৃতমঃ পর্জ্জন্যাদিরূপেণ তস্মৈ রুদ্রায়। ইষুমতে ইষবঃ বাণাঃ অস্য সন্তীতি ইষুমান্—তস্মৈ রুদ্রায় নমঃ।

বঙ্গার্থঃ। যিনি জটাধারী এবং মুণ্ডিত মস্তক এই উভয়রূপেই বিদ্যমান, যিনি সহ-স্রাক্ষ, বহুধনুর্দ্ধারী, কৈলাসাচলস্থ এবং বিষ্ণু-রূপে বা পশুহৃদয়স্থ অন্তর্য্যামিরূপে অথবা যজ্ঞাধিষ্ঠাতৃরূপে বিরাজ করিতেছেন—সেই রুদ্রদেবকে নমস্কার। যিনি বর্ষণকারী ও বাণ-ধারী সেই রুদ্রকে বহুধা নমস্কার করি।

আলোচনা। এই মন্ত্রে রুদ্রবিভূতির নানারূপ বর্ণনা বিদ্যমান। যে রুদ্র জটাধারী

তাপসরূপে ও মুণ্ডিতশির। যতিরূপে বিরাজ করেন, তাঁহাকে নমস্কার করা হইতেছে। এই উভয়ভাবেই তাঁহার দুইপ্রকার বিকাশ। যে রুদ্র সহস্রচক্ষু—অর্থাৎ অনন্তনেত্র তাৎপর্য্যতঃ সর্ব্বদর্শী। যাহার তীব্র চক্ষুঃ অতি গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিতে সক্ষম, যাহার চক্ষু জলধির তলদেশ—আকাশের উচ্চলোকেও দর্শন করে, সেই সর্ব্বদর্শী ভগবান্ রুদ্র এখানে প্রতিপাদ্য। রুদ্র শতধন্বা অর্থাৎ অসংখ্য হস্তে অসংখ্য ধনু ধারণ করিয়া, তিনি কুকর্ম্মীর পথ রোধ করিতেছেন। অমঙ্গল উপদ্রব নিবারণে যাহার দৃঢ়হস্তে ভীষণ ধনু দীপ্তি পাইতেছে, সেই রুদ্রকে নমস্কার করা হইতেছে। যিনি শিবরূপে কৈলাসাচলবিহারী দেবতা, যিনি জীবগণের হৃদয়গিরিগুহায় আত্মরূপে বিরাজমান সেই রুদ্র—হৃদয়দেবতা রুদ্র গিরিশয়। শিপিবিষ্ট—অর্থাৎ বিষ্ণুরূপী। বেদে আছে, শিপিবিষ্ট বিষ্ণুর নাম। যিনি বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন, সেই রুদ্রদেব এখানকার প্রতিপাদ্য। বেদে উক্ত আছে—শিপি অর্থ পশু; যিনি পশুগণেরও হৃদয়ে অন্তর্যামি চালকরূপে প্রবিষ্ট—তিনি শিপিবিষ্ট। শিপি শব্দের অন্য অর্থ যজ্ঞ, ইহাও শ্রুতির মহীয়সী ঘোষণা। যিনি যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বররূপে বিরাজিত হইয়া, যজ্ঞ সম্পাদন করেন—তিনি শিপিবিষ্ট। রুদ্র যে যজ্ঞপতি, ইহা দক্ষযজ্ঞের উপাখ্যানে স্পষ্টই প্রতীত হইয়াছে। রুদ্র উপস্থিত না হওয়ায় যজ্ঞ বিনষ্ট বিপ্রদুষ্ট হয়। শিপি শব্দের আর এক অর্থ রশ্মি। যিনি রশ্মিসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া আদিত্যমণ্ডলে বিরাজ করেন, সেই ভগবান্ রুদ্র শিপিবিষ্ট। যিনি পর্জ্জন্যরূপে বর্ষণদ্বারা বিশ্বের কল্যাণসাধন করেন, সেই বর্ষণকারী রুদ্র মীঢ়ুষ্টম। যিনি অমঙ্গল ধ্বংসের জন্য তীক্ষ্ণবাণ ধারণ পূর্ব্বক বিরাজমান, সেই সকলজগন্মঙ্গল-হেতু রুদ্রদেবতা এখানে কোটীশঃ নমস্কৃত হইতেছেন।

নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ নমো বৃহতে বর্ষীয়সে চ নমো বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ নমোঽগ্র্যায় চ প্রথমায় চ। ৩০

পদপাঠঃ। নমঃ। হ্রস্বায়। চ। বামনায়। চ। নমঃ। বৃহতে। চ। বর্ষীয়সে। চ। নমঃ। বৃদ্ধায়। চ। সবৃধে। চ। নমঃ। অগ্র্যায়। চ। প্রথমায়। চ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার করি (সর্ব্বত্র এইরূপ)। হ্রস্বায়—অল্পদেহবিশিষ্টকে। চ—এবং। বামনায়—সঙ্কুচিতাবয়ব খর্ব্ব ব্যক্তিকে। চ—আর। বৃহতে—দীর্ঘকায় প্রৌঢ় ব্যক্তিকে। বর্ষীয়সে—অতিবৃদ্ধকে। বৃদ্ধায়—বয়োজ্যেষ্ঠকে। সবৃধে—বিদ্যাবিনয় প্রভৃতি গুণশালী পণ্ডিতজনকে। অগ্র্যায়—জীবজগতের আদিতে যিনি বিরাজমান ছিলেন তাঁহাকে। প্রথমায়—যিনি সর্ব্বকার্য্যে প্রধান বা প্রথম তাঁহাকে। (নমস্কার করি।)

পদপরিবর্ত্তনম্। নমঃ—নমস্কারোঽস্তু। হ্রস্বায়—অল্পদেহায়। চ—অপি। (সর্ব্বত্রৈবং) বামনায়—সঙ্কুচিতাবয়বায়। বৃহতে—প্রৌঢ়দেহায়। বর্ষীয়সে—অতিবৃদ্ধায়। বৃদ্ধায়—বয়োঽধিকায়। সবৃধে—জ্ঞানবৃদ্ধায় পণ্ডিতায়। অগ্র্যায়—জগদাদিগায়। প্রথমায়—সর্ব্বেভ্যঃ মুখ্যায়। নম ইতি শেষঃ।

অন্বয়ঃ। হ্রস্বায় বামনায়, চ নম। বৃহতে চ বর্ষীয়সে চ নমঃ, বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ নমঃ, অগ্র্যায় চ প্রথমায় চ নমঃ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। হ্রস্বোঽল্প শরীরস্তস্মৈ নমঃ বামনঃ, সঙ্কুচিতাবয়বঃ তস্মৈ নমঃ। বৃহন্ প্রৌঢ়স্তস্মৈ নমঃ। বর্ষিয়ান্ অতিশয়েন বৃদ্ধঃ। প্রষ্ঠস্কেত্যাদিনা. বর্ষাদেশঃ ইতি মহীধরাচার্য্যঃ। বৃদ্ধঃ বয়সাধিকঃ, সর্বাস্তে বিদ্যাবিনয়াদিগুণৈঃ তে বৃধঃ পণ্ডিতাঃ কিন্তৈঃ সহ বর্ত্তত ইতি সবৃধং তস্মৈ। জগতামগ্রেভবো ঽগ্র্যঃ। অগ্র্যাদ্ যৎ। সর্ব্বত্র মুখ্যঃ প্রথমস্তস্মৈ নমঃ ইতি যোজনা।

বঙ্গার্থঃ। হ্রস্ব ও বামনস্বরূপ রুদ্রদেবকে নমস্কার। প্রৌঢ় ও বর্ষীয়ান্ রুদ্রদেবকে নমস্কার। বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ রুদ্রদেবকে নমস্কার। জগৎসৃষ্টির আদিভূতও মুখ্যতম রুদ্রদেবকে নমস্কার করি।

আলোচনা। এই মন্ত্রে নানাবিধ দৈহিক ভাব ও অন্যান্য মানবীয় উৎকর্ষ অপকর্ষের বর্ণনা দ্বারা রুদ্রদেবের বিভূতির পরিচয় দেওয়া হইতেছে। রুদ্রদেব হ্রস্ব ও বামন। সাধারণতঃ বেঁটে মানুষ ও বামনে যে পার্থক্য তাহাই হ্রস্ব ও বামনের প্রভেদ। খর্ব্বকায় ব্যক্তিমাত্রই বামন নহেন, বামনে দেহাবয়ব স্বভাবের বিকাশশক্তির অকৃপাবশতঃ প্রস্ফুটিত হয় না, সঙ্কুচিত থাকে। সামান্যতঃ অল্পকায় ও সঙ্কুচিতাবয়ব বামনমূর্ত্তিও ভগবান্ রুদ্ররে বিভূতি। প্রৌঢ়দেহ এবং স্থবির ও রুদ্রেরই অন্যতম বিকাশ। তাৎপর্য্যতঃ কি বামনদেহে কি প্রৌঢ়দেহে, কি স্থবির শরীরে সর্ব্বত্রই রুদ্র ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজিত ইহার স্থলে প্রতিপাদিত হইতেছে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতদ্ যোবেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ। হে কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র নামে কথিত হয়। যিনি এই ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতারূপে এই ক্ষেত্রকে অবগত আছেন সেই অন্তরাত্মা জীবই ক্ষেত্রজ্ঞ—ইহা তত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়াছেন। এখানেও বলা হইতেছে, কি বামনদেহে কি প্রৌঢ়দেহে। কি বালশরীরে কি বৃদ্ধ দেহে সর্ব্বত্র দেহাধিষ্ঠিত আত্মারূপে ভগবান্ রুদ্র বিরাজ করিতেছে। যেমন বৃদ্ধ দেহে আত্মারূপে তিনি বিরাজমান তেমনি জ্ঞানবৃদ্ধের হৃদয়েও চিন্ময়রূপে তিনি দীপ্তি পাইতেছেন। সৃষ্টির আদিতে যিনি ছিলেন এবং যিনি বিদ্যমান জগতের মধ্যে সারভূত মুখ্যতত্ত্ব সেই রুদ্রদেবকে ভূয়শঃ—নমস্কার করা হইতেছে।

নমঃ আশবে আজিরায় চ নমো শীঘ্রায় চ শীভ্যায় চ নমঃ ঊর্ম্ম্যায় চাবস্বন্যায় চ নমো নাদেয়ায় চ দ্বীপ্যায় চ। ৩১

পদপাঠঃ। নমঃ। আশবে। চ। অজিরায়। চ। নমঃ। শীঘ্রায়। চ। শীভ্যায়। চ। নমঃ। ঊর্ম্ম্যায়। চ। অবস্বন্যায়। চ। নমঃ। নাদেয়ায়। চ। দ্বীপ্যায়। চ।

পদব্যাখ্যা। নমঃ—নমস্কার। আশবে—বিশ্বব্যাপক রুদ্রকে। অজিরায়—গতিশীল-রুদ্রকে। শীঘ্রায়—বেগবৎ বস্তুতে যিনি বিরাজমান সেই রুদ্রকে। শীভ্যায়—আত্মশ্লাঘা সম্পন্ন স্থানে যিনি বিরাজ করেন

তাঁহাকে। ঊর্ম্ম্যায়—যিনি জলকল্লোলে বিকাশমান তাঁহাকে। অবস্বন্যায়—নীরব স্থির জলে যিনি বিরাজ করেন তাঁহাকে। নাদেয়ায়—নদীজলে যিনি বিরাজিত তাঁহাকে। দ্বীপ্যায়—যিনি জলমধ্যস্থ দ্বীপাকার নির্জ্জল ভূভাগে—বিদ্যমান তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

পদপরিবর্ত্তনম্। নমস্কারোঽস্তু। আশবে জগদ্ব্যাপকায়। অজিরায়—গতিমতে। শীঘ্রায়—বেগবতি ভবায়। শীভ্যায়—আত্মশ্লাঘিনি ভবায়। ঊর্ম্ম্যায়—কল্লোলভবায়। অবস্বন্যায়—স্থিরজলভবায়। নাদেয়ায়—নদীভবায়। দ্বীপ্যায়—দ্বীপস্থায়—নম ইতি যোজনা।

অন্বয়ঃ। আশবে চ অজিরায় চ নমঃ। শীঘ্রায় চ শীভ্যায় চ নমঃ ঊর্ম্ম্যায় চ অবস্বন্যায় চ নমঃ। নাদেয়ায় চ দ্বীপ্যায় চ নমঃ।

মন্ত্রব্যাখ্যা। অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি ইতি আশুঃ তস্মৈ। অজতি গচ্ছতি ইতি অজিরঃ গতিশীলঃ তস্মৈ। শীঘ্রে বেগবতি ভবঃ শীঘ্রঃ তত্রভব ইতি যৎসর্ব্বত্র ইতি মহীধরঃ। শীভৃ কথনে শীভতে কথতে ইতি শীভঃ আত্মশ্লাঘী পচাদ্যচ্ তত্রভবঃ শীভ্যঃ, শীভো জলপ্রবাহো বা শীভঃ ক্ষিপ্রো বা তত্রভবায় নম ইতি মহীধরঃ, ঊর্ম্মিষু কল্লোলেষু ভব ঊর্ম্ম্যঃ তস্মৈ নমঃ। অবগত স্বনোযস্মাৎ তদবস্বনং স্থিরজলং যদ্বা অবনীচৈর্গর্ত্তাদৌ স্বনোঽবস্বনজলম্ ভবায় নমঃ। নদ্যাং ভবো নাদেয়ঃ তস্মৈ, স্ত্রোত্যোঠক্ ইতি মহীধরঃ। দ্বীপে জলান্তর্ব্বর্ত্তি নির্জ্জলভূমৌ ভবো দ্বীপ্যস্তস্মৈ নমঃ।

বঙ্গার্থঃ। বিশ্বব্যাপক গতিশক্তির আকর ও গতিশীলপদার্থসমূহে বিরাজমান রুদ্রকে নমস্কার। আত্মশ্লাঘি পদার্থে বিরাজমান রুদ্রকে নমস্কার। কল্লোলময় জলে এবং স্থির জলে যিনি বিরাজিত সেই রুদ্রকে নমস্কার। নদীজলে ও নদী বা সমুদ্রমধ্যস্থ নির্জ্জলদ্বীপে যিনি বিরাজ করেন সেই রুদ্রকে নমস্কার করি।

আলোচনা। এই মন্ত্রে প্রতিপাদিত রুদ্র সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বস্থানের [illegible]। অশ্ ধাতু হইতে আশু পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অশ্ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্ত [illegible] বিশ্বব্যাপী রুদ্র আশুশব্দের প্রতিপাদ্য। রুদ্র অজির অর্থাৎ গতিশীল। [illegible] সর্ব্বব্যাপী [illegible] সর্ব্বত্র [illegible] [illegible] কারণ [illegible] চালকশক্তিরূপে [illegible] অর্থাৎ শ্লাঘী বা [illegible] পদার্থে বিরাজিত যে বস্তু, ব্যক্তি বা জাতিতে শ্লাঘার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, তাহা রুদ্রশক্তির অঙ্কচ্ছায়ায় লালিত এ বিষয়ে সংশয় নাই। ঐ যে পবনান্দোলিত অস্থির জলোর্ম্মিমালা ধাবনকুর্দ্দনরত দুরন্ত শিশুর মত একে অপরের গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—ইহাই রুদ্রের প্রকাশ। ঐ যে অবাত নিস্তব্ধ জলরাশি গাম্ভীর্য্য স্থৈর্য্যের সুস্পষ্ট পরিচয় স্বরূপ সমাধিমগ্ন যোগীর মত অবস্থান করিতেছে উহাতে রুদ্রবিভূতি। ঐ যে নদ নদীর জল ঐ যে নদ নদী বা সাগরমধ্যস্থ দ্বীপ নামক জলবেষ্টিত জলশূন্য স্থল ইহাও রুদ্রের অধিবাস-

স্থান। তিনি যেমন জলে বিরাজিত তেমনি জলশূন্য স্থলভাগেও দেদীপ্যমান। তিনি সর্ব্বত্র নানাভাবে বিরাজ করিতেছেন। সেই সর্ব্বময় রুদ্রকে নমস্কার করা হইতেছে।

নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ পূর্ব্বজায় চাপরজায় চ নমো মধ্যমায় চাপগল্‌ভায় চ নমো জঘন্যায় চ [illegible] বুধ্ন্যায় চ।

[illegible]

অ[illegible]য়। [illegible] জঘন্যায় [illegible] বু[illegible] চ।

পদব্যাখ্যা। [illegible] জ্যেষ্ঠায়—জ্যেষ্ঠরূপ [illegible] চ—এবং (সর্ব্বত্র এই অর্থ)। [illegible] রুদ্রকে। পূর্ব্বজায়—জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি হিরণ্যগর্ভরূপে জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাকে। অপরজায়—অপর সময়ে অর্থাৎ প্রলয় দশায় যিনি কালাগ্নিরূপে জন্ম স্বীকার করেন তাঁহাকে। মধ্যমায়—সৃষ্টি ও সংহারের মধ্যকালে অর্থাৎ স্থিতি সময়ে যিনি নর জগতুরগাদিরূপে বিদ্যমান থাকেন তাঁহাকে। অপগল্‌ভায়—অব্যুৎপন্নেন্দ্রিয়কে। জঘন্যায়—যিনি গবাদির জঘনদেশে বিরাজ করেন তাঁহাকে। বুধ্ন্যায়—যিনি বৃক্ষাদির মূলদেশে বিরাজমান তাঁহাকে নমস্কার।

পদপরিবর্ত্তনম্‌। নমঃ—নমস্কারোঽস্তু। জ্যেষ্ঠায়—প্রশস্যতমায়। কনিষ্ঠায়—অতিশয়েন অল্পীয়সে। পূর্ব্বজায়—জগদাদৌ হিরণ্যগর্ভরূপেণোদ্ভূতায়। অপরজায়—প্রলয়ে সম্বর্ত্তাগ্নিরূপেণাবির্ভূতায়। মধ্যমায়—স্থিতৌ নরাদিরূপায়। অপগল্‌ভায়—বিগতধার্ষ্ট্যায়। জঘন্যায়—জঘনভবায়। বুধ্ন্যায়—বৃক্ষাদিমূলজায়। নম ইতি শেষ।

অন্বয়ঃ। জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ। পূর্ব্বজায় চ অপরজায় চ নমঃ। মধ্যমায় চ অপগল্‌ভায় চ নমঃ, জঘন্যায় চ বুধ্ন্যায় চ নমঃ।

[illegible]ব্যাখ্যা। [illegible] প্রশস্যো জ্যেষ্ঠঃ [illegible] নমঃ। জ্যচেতি প্রশস্যশব্দস্য জ্যাদেশঃ। [illegible] যুবা অল্পো বা কনিষ্ঠস্তস্মৈ নমঃ। যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যাং ইতি কনাদেশঃ। [illegible] হিরণ্যগর্ভরূপেণোৎপন্নঃ পূর্ব্বজঃ [illegible]। অপরস্মিন্‌ কালে প্রলয়ে কালাগ্নি[illegible] জাতঃ অপরজঃ, তস্মৈ। মধ্যে সৃষ্টি-সংহারয়োর্দেবতির্য্যগাদিরূপেণ ভবো মধ্যমঃ [illegible]। মধ্যান্ম ইতি ব্যাকরণস্মৃতিঃ। ধার্ষ্ট্যমপগল্‌ভনং, গল্‌ভঃ ধার্ষ্ট্যম্‌ অপগতো গল্‌ভো যস্মাৎ সোঽপগল্‌ভঃ অব্যুৎপন্নেন্দ্রিয়ঃ তদ্রূপায় নমঃ। জঘনং গবাদীনাং পশ্চাদ্ভাগঃ তত্র ভবো জঘন্যঃ তস্মৈ নমঃ। বুধ্নে বৃক্ষাদি মূলে ভবো বুধ্ন্যঃ তস্মৈ নমঃ।

বঙ্গার্থঃ। জ্যেষ্ঠও কনিষ্ঠস্বরূপ রুদ্রকে নমস্কার। পূর্ব্বজ ও অপরজরূপ রুদ্রকে নমস্কার। মধ্যম ও অপগল্‌ভস্বরূপ রুদ্রকে নমস্কার। জঘন্য ও বুধ্ন্য রুদ্রকে নমস্কার।

আলোচনা। এই মন্ত্রে বয়োবস্থা, এবং জাগতিক বিকাশের নানা ভাব লইয়া রুদ্র-বিভূতির বর্ণনা করা হইতেছে। রুদ্র জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ। জেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব বয়োগত পার্থক্যের পরিচায়ক। এই বয়োবস্থা দেহগত বিকারবিশেষ, আত্মরূপী রুদ্র উহা

হইতে স্বতন্ত্র, সুতরাং দেহাতিরিক্ত রুদ্রদেবকে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠে সমভাবে বিরাজমান। সুতরাং রুদ্রদেব পূর্ব্বে জগৎসৃষ্টির প্রাক্কালে হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদ তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস জাত, পতিরেক আসীৎ সৃষ্টির আদিতে ভূতজাতের একমাত্র অধিস্বামী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা বিদ্যমান ছিলেন। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে মহীয়সী বেদবাণীর প্রতিষ্ঠান করিয়া বলিতেছেন সবৈ শরীরী প্রথমঃ সবৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত। সেই হিরণ্যগর্ভ প্রথম শরীরধারী তিনিই প্রথম পুরুষ নামে কথিত হয়েন, তিনিই ভূতবর্গের আদিকর্ত্তা তিনি জগৎ বিকাশের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। রুদ্র অপরজ অর্থাৎ অপর সময়ে (প্রলয়কালে) কালাগ্নিরূপে আবির্ভূত হইয়া জগৎ সৃজন ও প্রলয়াগ্নিরূপে বিশ্ব ধ্বংস করেন। সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যাবস্থায় বিশ্বের স্থিতিসময়েও তিনি জীবরূপে বিদ্যমান থাকেন। আদি মধ্য ও অন্ত—সমগ্র সংসার রুদ্রমূর্ত্তি ইহাই তাৎপর্য্য। রুদ্রদেব অপগলভ অর্থাৎ গলভহীন তাৎপর্য্য—যাহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির তাদৃশ স্ফুরণ নাই সেই স্তিমিতেন্দ্রিয়গণ ও রুদ্রের মূর্ত্তি। রুদ্রদেব জঘন্য অর্থাৎ জঘনদেশে জাত তাৎপর্য্যতঃ যিনি জঘনাদিদেশে আপন শক্তি বা কেন্দ্রাপগা শক্তিরূপে বিরাজিত। তিনি রুদ্রই। রুদ্র ধুধ্ন, অচল বৃক্ষাদির মূলদেশে রস সমাকর্ষণ সঙ্কলনাদি শক্তিরূপেও ভগবান রুদ্রই দেদীপ্যমান। সংক্ষেপে বলিতে গেলে জগতের সর্ব্বশক্তিরুদ্র সর্ব্বস্বরূপ।

নম স্তোভ্যায় চ প্রতিসর্য্যায় চ নমো যাম্যায় চ ক্ষেম্যায় চ নমঃ শ্লোক্যায় চাবসান্যায় চ নম উর্ব্বর্য্যায় চ খল্যায় চ। ৩৩

পদ পাঠ, পদ পরিবর্ত্তন—শ্লোক গুলি এত সহজ যে পদ পাঠাদি অনাবশ্যক।

সোভ্যায়—সোভং গন্ধর্ব্ব নগরং তত্র ভবঃ সোভ্যঃ যদ্বা উভাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং সহিতঃ সোভো মনুষ্য লোকঃ। পুণ্যেণ পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপ মুভাভ্যাং মনুষ্য লোক-মিতি শ্রুতেঃ তত্র ভবঃ সোভ্যস্তস্মৈ নমঃ।

গন্ধর্ব্ব নগরকে সোভ বলে। গন্ধর্ব্ব নগরে যাহার উদ্ভব তাহাকে সোভ্য বলা যায়! অথবা পাপ ও পুণ্য এই দুয়ের দ্বারা যে লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ মনুষ্য লোক তাহাতে জন্ম যার তিনি সোভ্য। শ্রুতি বলেন পুণ্যদ্বারা পুণ্যলোক, পাপদ্বারা পাপলোক এবং উভয় দ্বারা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হইতে হয়।

প্রতি সর্য্যায়—প্রতি সরো বিবাহোচিতং হস্তসূত্রমভিচারো বা তত্র ভবঃ প্রতিসর্য্য। বিবাহাদি কার্য্য হস্তস্থিত মঙ্গলসূত্রকে প্রতিসর বলে। তাহাতে বিদ্যমান যিনি তিনি প্রতিসর্য্য।

যাম্যায়—যমে ভবো যাম্যঃ পাপিনাং নরকার্ত্তি দত্তা তস্মৈ। যমেতে উদ্ভূত যাম্য অর্থাৎ পাপিদিগের নরক ক্লেশ যিনি দেন।

ক্ষেম্যায়—ক্ষেমে কুশলে ভবঃ ক্ষেম্যস্তস্মৈ। ক্ষেম অর্থাৎ কুশলে জন্ম যাহার তিনি ক্ষেম্য।

শ্লোক্যায়—শ্লোকা বৈদিক মন্ত্রা যশো বা তত্র ভব শ্লোক্যঃ। শ্লোক বলিতে বৈদিক মন্ত্র বা যশ বুঝায়।—

অবসান্যায়—অবসানং সমাপ্তির্বেদান্তো বা তত্র ভবো হব সান্ত্যঃ। অবসান—সমাপ্তি বা বেদান্ত তাহাতে উদ্ভব যাহার।

উর্ব্বর্য্যায়—সর্ব্বশস্যাঢ্যা ভূঃ তত্র ধান্য-রূপেণ ভব উর্ব্বর্য্যঃ। উর্ব্বরা ভূমিতে যাহার জন্ম অর্থাৎ ধান্যাদি।

খল্যায়—খলো ধান্য বিবেচনদেশঃ তত্র ভবঃ খল্যঃ। যেখানে ধান্য মলা হয়। অর্থাৎ প্রচলিত ভাষায় যাহাকে খলিয়ান বলে।

অনুবাদ—যিনি সোভ্য, যিনি প্রতিসর্য্য, যিনি যাম্য, যিনি ক্ষেম্য, যিনি শ্লোক্য, যিনি অবসান্য, যিনি উর্ব্বর্য্য, যিনি খল্য, তাঁহাকে নমস্কার।

বিশদব্যাখ্যা—বিশ্বস্থ যাহা কিছু সমস্তই রুদ্রদেবতা, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী শ্লোকে ঐ কথাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলা হইয়াছে।

নমো বন্যায় চ কক্ষ্যায় চ নমঃ শ্রবায় চ প্রতিশ্রবায় চ নমঃ আশু-ষেণায় চাশুরথায় চ নমঃ শূরায় চা বভেদিনে চ। ৩৪

পদব্যাখ্যা—বনে বৃক্ষাদিরূপেণ ভবো বন্যস্তস্মৈ। বন্য অর্থাৎ বৃক্ষাদি। কক্ষং তৃণং তত্র ভবঃ। শ্রূয়তে ইতি শ্রবঃ শব্দস্তদ্রূপায়। প্রতিশ্রবায় প্রতিশব্দস্তদ্রূপায় আশুঃ শীঘ্র সেনা যস্য স আশুষেণঃ। আশু শীঘ্র রথঃ যস্য অসৌ আশুরথঃ। শূরায়—যুদ্ধ-বীরায় অবভিনত্তি রিপুন্নীচৈবিদারয়ন্তি ইতি।

বঙ্গার্থ—বন্য অর্থাৎ বনে জাত বৃক্ষাদিকে, কক্ষ্য অর্থাৎ তৃণজাতদিগকে, শ্রবায় অর্থাৎ শব্দকে, প্রতিশ্রবায় অর্থাৎ প্রতিশব্দকে, আশুষেণায় অর্থাৎ শীঘ্রগামী সেনাকে, আশু-রথায় অর্থাৎ শীঘ্রগামী রথকে। অবভেদিনে অর্থাৎ শত্রু বিদারণকারীকে নমস্কার।

নম বিল্মিনে চ কবচিনে চ নমো বর্ম্মিণে চ বরুথিনে চ নমঃ শ্রুতায় চ শ্রুতসেনায় চ নমো দুন্দুভ্যায় চা হনন্যায় চ। ৩৫

বিল্মং শিরস্ত্রাণং। পটস্যূতং কার্পাস গর্ভং দেহ রক্ষকং কবচং। লোহময়ং শরীর রক্ষকং বর্ম্ম। গজোপরিস্থো গজাকারঃ কোষ্ঠো বরুথঃ রথগুপ্তি বা শ্রুতায় প্রসিদ্ধায় শ্রুতা প্রসিদ্ধা সেনা যস্য স শ্রুতসেনঃ। দুন্দুভৌ ভের্য্যাং ভবঃ দুন্দুভ্যঃ। আহন্যতে অনেন বাদ্য সাধনং দণ্ডাদি। তত্র ভবঃ আহনন্যঃ।

বঙ্গার্থ। বিল্মী অর্থাৎ শিরস্ত্রাণধারীকে, কবচী অর্থাৎ কবচধারীকে, (ভিতরে কার্পাস উপরে পট দ্বারা সেলাই) বর্ম্মী অর্থাৎ লৌহ-ময় শরীর রক্ষকধারীকে, বরুথী যিনি গজ-পৃষ্ঠে হাওদার মধ্যে থাকেন তাহাকে, শ্রুতকে অর্থাৎ পদাতিকে, শ্রুতসেন, যাহার পদাতিক সেনা আছে, তাহাকে, দুন্দুভ্য অর্থাৎ দুন্দুভিজাত রণবাদ্যকে, অহনন্য অর্থাৎ বাদনদণ্ড বা কাঠিকে নমস্কার।

নমো ধৃষ্ণবে চ প্রমৃশায় চ নমো নিষঙ্গিণেচেষুধিমতে চ নমস্তীক্ষ্ণেষবে চায়ুধিনে চ নমঃ স্বায়ুধায় চ সুধন্বনে চ। ৩৬

যিনি ধৃষ্ণু অর্থাৎ রক্ষণে পটু, যিনি প্রমৃশ অর্থাৎ বিচারে পটু, নিষঙ্গিনে অর্থাৎ

খড়্গধারীকে। ইষুধিমতে অর্থাৎ তূণধারীকে তীক্ষ্ণেষবে তীক্ষ্ণবাণধারীকে, আয়ুধিনে মুদ্গর-ধারীকে, স্বায়ুধায়, শোভন ত্রিশূলধারীকে, সুধন্বা—শোভন ধনুধারীকে নমস্কার।

নমঃ স্রুত্যায় চ পথ্যায় চ নমঃ কাট্যায় চ নীপ্যায় চ নমঃ কুল্যায় চ সরস্যায় চ নমো নাদেয়ায় চ বৈশন্তায় চ। ৩৭

যিনি স্রুতি অর্থাৎ ক্ষুদ্রপথে আছেন যিনি পথে অর্থাৎ প্রশস্ত রাজপথে আছেন, যিনি কাট্য অর্থাৎ দুর্গম পথে আছেন (কুৎসিতম্ অটতিজন যত্রেতি কাটো তত্র ভবঃ) যিনি নীপ্য অর্থাৎ পর্ব্বতের অধো-ভাগের পথে আছেন, (নীচৈঃ পতত্যাপো যত্রেতি নীপ্যো গিরধোভাগঃ) যিনি কুল্য অর্থাৎ কৃত্রিম সরিতে আছেন, যিনি সরস্য অর্থাৎ সরোবরে আছেন, যিনি নাদেয় অর্থাৎ নদীতে আছেন, (নদ্যাং ভব নাদেয়ঃ) যিনি বৈশন্ত অর্থাৎ অপ্রশস্ত জলভাগে আছেন, তাহাকে নমস্কার।

ক্রমশঃ—

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

মধুচ্ছন্দা ঋষি।

—o—

[১]

এসত, এসত ত্বরা স্তুতিকারী সখাগণ,
বসিয়া হেথায় কর ইন্দ্রের স্তবন।

[২]

বহুশত্রু গ্লানিকর বহুশ্রেষ্ঠ ধনেশ্বর
ইন্দ্রে—সোমসুত হলে মিলে গাও গান।

[৩]

সেই ইন্দ্র আমাদের ইষ্ট-ধন বৃদ্ধি হেতু
আসুন অশ্বে রথে মোদের সকাশে।

[৪]

ইন্দ্রের [illegible]; [illegible] শত্রু [illegible] অরি
রণে [illegible] যুক্ত হরিদ্বয় পাশে।

[৫]

[illegible] পান হেতু এই সোম
[illegible]—শুদ্ধ [illegible] দধিতে শোধিত

[৬]

[illegible] আর শ্রেষ্ঠ হেতু তুমি
হে সুক্রতো! হইয়াছ সদ্য সংবর্দ্ধিত।

[৭]

ব্যাপ্তিমান্ সোম সকৃ আবিষ্ট তোমাতে ইন্দ্র
হে গির্ব্বন! শুভ হোক্ তোমা চেতাইতে

[৮]

স্তোম্ উক্থ শতক্রতো! করেছে বর্দ্ধন স্তোম
হ'ক্ বৃদ্ধি তব আমাদের স্তুতি হ'তে।

[৯]

অবিরত রক্ষারত হে ইন্দ্র! ভুঞ্জহ অন্ন,
সহস্র এ—ইথে বিশ্ব-পৌরুষ নিহিত।

[১০]

গির্ব্বন্ ঈশান ইন্দ্র! আমাদের দেহে যেন
মর্ত্ত্য না আঘাতে,—কর বধ নিবারিত।

৬ সূক্ত।

ইন্দ্র ও মরুৎগণ দেবতা।

মধুচ্ছন্দা ঋষি।

[১]

তেজোময় সূর্য্যরূপে রোষহীন অগ্নিরূপে
বহমান বায়ুরূপে যিনি অবস্থিত।
চৌদিকস্থ প্রাণী তাঁরে স্বর্গে নিয়োজন করে
নক্ষত্ররূপেতে তিনি নভে প্রকাশিত।

[২]

কমনীয় রক্তবর্ণ নৃবাহক তেজো পূর্ণ
হরিদ্বর্ণ তার রথ সাথে সংযোজিত।

[৩]

সংজ্ঞাহীনে সংজ্ঞা দিয়া — [illegible]
[illegible]

[৪]

ওহে! পরে তিনি পুনঃ ধরিয়া যজ্ঞীয় নাম
স্বধা অনুসারি, গর্ভ করেন নিবৃত্ত।

[৫]

দৃঢ়ভেদী মরুতের সহ, ইন্দ্র! অন্বেষিয়া
করেছ উদ্ধার গুহাস্থিত গাভীগণ।

[৬]

ধনমুক্ত-খ্যাত মহা মরুতে পাইতে স্তুতি
করে দেবকামী স্তোতা ইন্দ্রেরে যেমন।

[৭]

হে মরুত! দেখা দাও নির্ভয় ইন্দ্রের সনে
তোমরা ত তুল্যদীপ্তি নিত্য প্রমুদিত।

[৮]

নির্দ্দোষ-দ্যুলোকগামী কাম্য মরুৎগণ সহ
ইন্দ্র বলবান,—হন যজ্ঞেতে অর্চ্চিত।

[৯]

ওহে সর্ব্বব্যাপী! এস হেথা হতে—স্বর্গ হ'তে
কিম্বা সূর্য্য হ'তে;—স্তুতি ইহার সাধন।

[১০]

এ পৃথিবী দ্যুলোক বা মহা অন্তরীক্ষ হ'তে
ধন দান-হেতু করি ইন্দ্রকে ভজন।

৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

মধুচ্ছন্দা ঋষি।

---

[১]

ইন্দ্রে করে গায়কেরা বৃহৎ গাথায় স্তব,
অর্চ্চিগণ অর্কদ্বারা, বাণীদ্বারা কেহ

[২]

বজ্রী হিরন্ময় ইন্দ্র, মিলিত সবার সনে;
তাঁর বাক্য-মাত্রে-যুক্ত হরিদ্বয় সহ।

[৩]

দূর দৃষ্টি হেতু ইন্দ্র দ্যুলোকে স্থাপেন সূর্য্যে
করেন প্রকাশ অদ্রি আপন কিরণে।

[৪]

উগ্র ইন্দ্র! রণে আর সহস্র মহা সংগ্রাম
রক্ষ আমাদের, তব অমোঘ রক্ষণে।

[৫]

প্রচুর বা অল্প ধন তরে ইন্দ্রে আবাহনি
শত্রু কাছে বজ্রী তিনি,-সহায় মোদের।

[৬]

হে ফলদ, বৃষ্টিপ্রদ! দাও আমাদের তরে
খুলি মেঘে; অস্খলিত যাচ্ঞা আমাদের।

[৭]

ভিন্ন ভিন্ন ফলদাতা অন্য দেবতার স্তুতি
উৎকৃষ্ট যা,-বজ্রী ইন্দ্রে নাহিক যোগ্যতা।

[৮]

না কর নিষ্ফল বাঞ্চা হে বৃষ ঈশান! কর
নহে বশী;-যশ গতি বৃষ যুথে যথা।

[৯]
যে ইন্দ্র একাকী হন ইষ্টকারী মানবের
বসুদের আর পঞ্চক্ষিতি সকলের।

[১০]
সর্ব্বলোকোপরে স্থিত—ইন্দ্রে তোমাদের তরে
আবাহনি, তিনি হন কেবল মোদের।

—o—

৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

মধুচ্ছন্দা ঋষি।

—o—

[১]
আমাদের রক্ষা হেতু, দেহ ইন্দ্র বহু-ধন
ভোগ্য-জয়শীল-সদা জয়ী শত্রুগণে।

[২]
যাহে শুধু মুষ্ট্যাঘাতে নিবারিব অরিগণে—
তোমার রক্ষিত মোরা,—কিম্বা অশ্ববলে।

[৩]
তব রক্ষাযুক্ত মোরা ধরি ইন্দ্র! বজ্র দৃঢ়
জিনিব সমরে মোরা স্পর্দ্ধাবান অরি;—

[৪]
তোমার সহায় মোরা শূর অস্ত্রধারী সনে,
সৈন্যগামী শত্রুদের পরাজয় করি।

[৫]
মহান্ পরম-বজ্রী! ইন্দ্রের মহত্ত্ব থাক্;
দ্যুলোকের মত বল প্রভূত তাঁহার।

[৬]
যে নর সমরে লিপ্ত প্রজালাভে ইচ্ছা যার
কিম্বা বিপ্র প্রজ্ঞাগামী—(সিদ্ধ স্তবে তাঁর)।

[৭]
অতি-সোম-পান-রত, কুক্ষি যাঁর হয় স্ফীত
সিন্ধু যথা,—মুখে বারি প্রচার যেমন।

[৮]
সুবাক্য এরূপ তাঁর মিষ্ট, পূজ্য, গাভীদাতা,
হব্য দাতা কাছে,—পক্ব শাখার মতন।

[৯]
ঈদৃশ বিভূতি তব, যাদৃশ হোতার ইন্দ্র!
হয় রক্ষা হেতু, আর আশু ফলান্বিত

[১০]
এইরূপই হয় এঁর স্তোম উক্থ কমনীয়,
ইন্দ্রের এ সোমপান হেতু,—প্রশংসিত।

---

৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

মধুচ্ছন্দা ঋষি।

—o—

[১]
এস ইন্দ্র হৃষ্ট হও সর্ব্ব সোমরস অন্নে
কর শত্রু পরাজয় মহাবল হয়ে।

[২]
সুত হলে হর্ষ দাতা কর্ম্মে উত্তেজক সোম,
হৃষ্ট সর্ব্বকারী ইন্দ্রে দাও উৎসর্গিয়ে।

[৩]
সুনাসির! সর্ব্ব নেতা পূজ্য! হর্ষকরী স্তোমে
হৃষ্ট হও! দেব সনে এস এ বনে।

[৪]
হে ইন্দ্র অভীষ্ট দাতা! পালয়িতা তব স্তুতি
রচিয়াছি,—পেয়ে তাহা করহ গ্রহণ।

[৫]
হে ইন্দ্র! তোমার আছে, বরেণ্য বিচিত্র ধন
পর্য্যাপ্ত প্রভূত,—সেথা দাও পাঠাইয়া।

[৬]
বহু ধনী ইন্দ্র! মোরা উদ্যোগী ও কীর্ত্তিমান্
ধনসিদ্ধি তরে কর্ম্মে দাও নিয়োজিয়া।

গাভীযুক্ত, অন্নযুক্ত, বিশ্ব-আয়ু, অবিনাশী
প্রভৃত প্রধান ধন দাও আমাদের।

৮

হে ইন্দ্র!—বৃহৎকীর্ত্তি সহস্র দানের ধন,—
বহু রথ পূর্ণ অন্ন প্রদান মোদের।

৯

আবাহনি—বসুপতি ঋক্‌প্রিয় যজ্ঞাগামী
ইন্দ্রে—স্তবে স্তুতি করি,—ধন রক্ষা তরে।

১০

নিয়ত নিবাস প্রৌঢ় ইন্দ্রের মহৎ বল
প্রাপ্তি অভিষবে যজমান পূজা করে।

১০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১

গায়কেরা গান গাহিছে তোমার
অর্চ্চনীয় তোমা অর্চ্চে অর্চ্চকেরা,
করিছে উন্নত তোমা শতক্রতো!
বংশের মতন যত ব্রহ্মাণেরা।

২

সানু হ'তে যথা সানু আরোহন,—
বহু কর্ম্ম তথা হয় আচরিত;
তাহে ইন্দ্র হন জ্ঞাত অভিলাষ
যূথ সনে হন কামদ কম্পিত।

৩

সোমপায়ী ইন্দ্র! করহ যোজনা
পুন্নাগ—কেশরী—অতি বলবান,
[illegible] এস তার পর
আমাদের স্তুতি করিতে শ্রবণ।

আইস হে এই স্তোম অভিমুখে
কর ধ্বনি-শব্দ-রবে প্রশংসিত।
বাসদাতা ইন্দ্র! কর আমাদের
ব্রহ্ম আর যজ্ঞ একত্র বর্দ্ধিত।

৫

বহু শত্রু-নিষেধক ইন্দ্র তরে
বৃদ্ধিকারী-উক্‌থ প্রশংসিত হয়;
শক্র আমাদের পুত্র মিত্র মাঝে,
করেন যেরূপ শব্দ অতিশয়।

৬

পাই যেন তাঁরে বন্ধুতার তরে,
ধন হেতু আর সুবীর্য্য কারণে,
শক্তিমান ইন্দ্র আর আমাদের
দিয়া ধন হন সমর্থ-রক্ষণে।

৭

তোমার প্রদত্ত অন্ন জয় ইন্দ্র!
সর্ব্বত্র প্রস্তৃত, সুলভ সর্ব্বদা;
গাভী বাসস্থান দাও হে খুলিয়া
অদ্রি-সম-বজ্রি হওহে ধনদা।

৮

শত্রু বধ কালে তোমাকে না পারে
এ উভয় লোক করিতে ধারণ,
পাঠাও স্বর্গীয় বারি আমাদের,—
শ্রেষ্ঠ গাভী আর করহ প্রেরণ।

৯

কর্ণ তব শুনে চারিদিক হ'তে—
শুন ইন্দ্র ত্বরা এই আবাহন,
ধর বাক্য মম, মম স্তোম আর
সখাদের—কর অন্তরে গ্রহণ।

১০

জানি তুমি হও কামদাতা অতি
সমরে স্তোত্রের শুন আবাহন

আহ্বানি সে মহাঅভীষ্ট দাতারে
সহস্র ধনদা—রক্ষার কারণ।

১১

আইস হেথায় হে ইন্দ্র কৌশিক!
হৃষ্ট হও সুতসোম পান ক'রে,
বাড়াও নবীন আয়ু ভালরূপে,
কর ঋষি আর সহস্র প্রকারে।

১২

হে গির্ব্বণ! সর্ব্ব দিকে এই স্তুতি—
যুতায়ু তোমার প্রসাদে বর্দ্ধিত—
সর্ব্বরূপে গ্রাহ্য হউক্ তোমার,—
হ'ক তুষ্টি হেতু তোমার সেবিত।

১১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

মধুচ্ছন্দা পুত্র জেতৃ ঋষি।

১

সর্ব্ব স্তুতি ইন্দ্রে করয়ে বর্দ্ধিত,
হন তিনি ব্যাপ্ত সমুদ্র যেমতি,
রথীর মাঝারে তিনি শ্রেষ্ট রথী
সজ্জন-পালক-তিনি অন্নপতি।

২

বলপতি ইন্দ্র! তব মিত্রতায়
হ'য়ে অন্নবান নাহি করি ভয়,
হে অপরাজিত! সদা রণজয়ী
চারি দিক হ'তে প্রণমি তোমায়।

৩

ইন্দ্র ধনদাতা খ্যাতি পূর্ব্ব হ'তে
স্তোতাগণে যদি দেন তিনি ধন—
যাহা গাভীযুত বহু অন্নবান্—
তবু রক্ষা তাঁর হবেনা বারণ।

৪

এই ইন্দ্র হন অসুরগণের
পুর ভেদকারী, মেধাবী, যুবক,
বজ্রী, বহু স্তুত, অতি বলবান্,
বিশ্বে সমুদায় কর্ম্মের ধারক।

৫

অদ্রিবান্ ইন্দ্র! করেছিলে তুমি
সগাভী 'বলের' গুহা উদ্ঘাটন,
তাই ভয়হীন হইয়া তোমায়
পেয়েছিল নিপীড়িত দেবগণ।

৬

হে শূর গির্ব্বণ! তব ধনদান
আশায় এসেছি করিয়া কীর্ত্তিত
স্যন্দমান সোমে; জানিত তোমায়
তব পাশে যজ্ঞকর্ত্তা যে আসিত।

৭

হে ইন্দ্র! মায়াবী শোষক অসুরে
বহুমায়া দ্বারা করেছ নিহত
মেধাবীরা জানে মহিমা তোমার
তাহাদের অন্ন করহ বর্দ্ধিত।

৮

স্তোতাগণ নিজ বলের সহিত
ঈশান ইন্দ্রের ক'রে স্তুতি সদা,
যাঁর ধনদান সহস্র প্রকার—
কিম্বা ততোধিক হয় ফলপ্রদা।

১২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা।

কণ্ব পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১

অগ্নি—দেবদূত, হোতা সর্ব্ব ধনযুক্ত, তিনি
এই যজ্ঞকারী—করি বরণ তাঁহায়।

অগ্নিকে আহ্বান করে, আহ্বান মন্ত্রেতে সদা,—
বহু প্রিয় হব্যবাহী পালক প্রজার।

৩

হে অরণ্যজাত অগ্নি আমাদের স্তুত্য হোতা,
ছিন্ন কুশযুক্ত স্থানে আন' দেবগণে।

৪

হও দূত,—হব্যকামী দেবে কর প্রবোধিত,
হে অগ্নি! এ কুশে এসে বসু দেবসনে।

৫

ঘৃতাহুত দীপ্যমান ওহে অগ্নি! প্রতিকূল
রক্ষঃযুক্ত বৈরীদের হওহে দাহক।

৬

অগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি,—তিনি কবি, যুবা,
গৃহপতি, জুহুমুখ, হবির বাহক।

৭

কবি, দেব সত্যধর্ম্মী, শত্রুদের নাশকারী,
অগ্নির সমীপে যজ্ঞে—কর স্তুতি তাঁর।

৮

দেব অগ্নি! দেব দূত, যেই হব্যপতি করে
পরিচর্য্যা তব, হও রক্ষক তাহার।

৯

দেবতার হব্যপান তরে,—অগ্নি! সেবা তব
করে হবির্যুক্ত সেই, কর সুখী তারে।

১০

হে দীপ্ত পাবক অগ্নি! লয়ে এ'স দেবে হেথা
আমাদের হব্য,—যজ্ঞ দাও দেবতারে।

১১

নূতন গায়ত্রী ছন্দে হইয়া সংস্তুত, দাও—
ভূরি আমাদের বীরযুক্ত অন্ন ধন।

১২

সর্ব্ব দেব আহ্বানের স্তুতিযুক্ত তুমি অগ্নি
শুভ্র জ্যোতি! এই স্তোম করহ গ্রহণ।

১৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা।

মেধাতিথি ঋষি।

১

'সুসমিদ্ধ' অগ্নি দেবে আন যজমান পাশে
আমাদের,—কর যজ্ঞ হে হোতা পাবক।

২

হে কবি 'তনুনপাৎ'! আজ মধুমৎ যজ্ঞ
ভক্ষনার্থ দেবতার হওহে বাহক।

৩

হেথা এই যজ্ঞে—প্রিয়, মধুজিহ্ব যজ্ঞকারী
'নরাশংস' অগ্নিকেই করি আবাহন।

৪

হে অগ্নি 'ঈলিত' তুমি নর হিতকারী, হোতা
সুখতম রথে করি আন দেবগণ।

৫

হে মনীষি! ঘৃতপৃষ্ঠ পরস্পর বদ্ধ 'বর্হি'
করহ বিস্তার,—যাহে অমৃত দর্শন।

৬

ঋতবর্দ্ধী 'দীপ্তদ্বার' ছিল রুদ্ধ এতদিন
খোল, আজ হবে স্থির যজ্ঞ অনুষ্ঠান।

৭

এই যজ্ঞে আমাদের এই কুশে বসিবারে
আবাহনি সে সুরূপ 'নক্ত' ও 'উষারে'।

৮

সুজিহ্ব মেধাবী সেই দিব্য 'হোতা দ্বয়ে' করি
আবাহন—আমাদের যজ্ঞ করিবারে।

৯

সুখপ্রদ ক্ষয়হীন, 'ইলা' 'সরস্বতী' 'মহী'
বসুন এ তিন দেবী এই কুশোপরে।

১০

আহ্বানি 'ত্বষ্টারে' হেথা তিনি জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ
থাকুন কেবল তিনি আমাদের তরে।

১১

ওহে 'বনস্পতি' দেব কর হব্য সমর্পন,
দেবগণে; হবির্দাতা যেন পায় জ্ঞান।

১২

'স্বাহা' যজ্ঞ ইন্দ্রতরে কর যজমান গৃহে,
সেই যজ্ঞে দেবগণে কর আবাহন।

১৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা।

মেধাতিথি ঋষি।

১

এস অগ্নি! সেবা স্তবে এই বিশ্বদেব সহ
সোমপান তরে; যজ্ঞ কর সম্পাদন।

২

ওহে বিপ্র অগ্নি! তোমা আবাহনে কণ্বগণ,
করে স্তব কর্ম্ম,—এস সহ দেবগণ।

৩

এস-সহ ইন্দ্রবায়ু, বৃহস্পতি, মিত্র, অগ্নি
মরুৎগণ, পূষা, ভগ আদিত্য সকল।

৪

তোমাদের তরে সোম সুপ্রস্তুত,—তৃপ্তিকর
হর্ষহেতু—চমুস্থিত মধুর-তরল।

৫

হব্যযুক্ত অলঙ্কৃত কণ্বগণ করে স্তুতি
তব, রক্ষালাভ আশে—ছিন্ন কুশ করে।

৬

ঘৃতপৃষ্ঠ মনোযুক্ত তোমার বাহক যারা,
তাহে আন দেবগণে সোমপান তরে।

৭

যজ্ঞের বর্দ্ধনকারী দেবগণে-পত্নীযুক্ত
কর হে সুজীহ্ব অগ্নি। পিয়াও এ মধু।

যজনীয় পূজ্য যাঁরা বষট্কারে তাঁরা অগ্নি!
করুন জিহ্বায় তব পান এই মধু।

৯

উষায় প্রবুদ্ধ বিশ্বদেবগণে ল'য়ে এস
ওহে বিপ্র হোতা! হেথা সূর্য্যলোক হ'তে।

১০

অগ্নি! এই সোম মধু কর পান,—ইন্দ্র বায়ু
বিশ্বদেব আর মিত্র জ্যোতিসব সাথে।

১১

মানব নিযুক্ত হোতা অগ্নি এই যজ্ঞে ব'স
কর আর আমাদের যজ্ঞ সম্পাদন।

১২

গতিযুক্ত সুবাহক রোহিতাশ্বগণে দেব!
যুক্ত রথে; তাহে হেথা আন দেবগণ।

১৫ সূক্ত।

ঋতু প্রভৃতি দেবতা।

মেধাতিথি ঋষি।

১

ইন্দ্র! কর সোমপান ঋতু সনে; তৃপ্তিকর
তোমাশ্রিত সোম হ'ক্ প্রবিষ্ট তোমাতে।

২

হে মরুত! শ্রেষ্টদাতা কর যজ্ঞপূত তুমি—
পার তাহা, ঋতুসনে পিয় পোত্র হ'তে।

৩

পত্নীযুক্ত নেষ্টা! কর যজ্ঞস্তুতি দেব পাশে
তুমি রত্নদাতা কর ঋতু সনে পান।

৪

অগ্নি। হেথা আন দেবে বসাইয়া তিন স্থানে
কর অলঙ্কৃত, কর ঋতু সনে পান।

ব্রাহ্মণের রত্নপাত্রে ঋতুদের পরে ইন্দ্র !
পিয় সোম ; অস্খলিত সখ্যতা তোমার ।

৬

তোমরা মিত্র বরুণ ! ধৃতব্রত,—ঋতু সনে
প্রবৃদ্ধ দুর্দ্দহ যজ্ঞে হও ব্যাপ্ত আর ।

৭

হিংসাহীন যজ্ঞে—করে ধনদাতা দেবে স্তুতি
ঋত্বিক প্রস্তর হাতে, পাইবারে ধন ।

৮

শুনেছি যে ধন কথা,—ধনদাতা আমাদের
দিন্ তাহা ; দেবতরে করিব গ্রহণ ।

৯

ধনদাতা ঋতুসনে নেষ্ট্রা—পাত্রে ইচ্ছে পান
যাও, কর হোম, পরে করিও প্রস্থান ।

১০

ধনদাতা ঋতুসনে অর্চ্চিনু এ চারিবার,—
অতএব আমাদের ধন কর দান ।

১১

দীপ্ত-অগ্নিযুক্ত, যজ্ঞ-নির্ব্বাহক-ঋতুসহ
শুচিব্রত অশ্বিদ্বয় পিয় মধু সোম ।

১২

ফলদ, যাজক-গৃহ-পতিরূপে ঋতু সনে—
দেবকামী তরে কর দেবের যজন ।

---

১৬ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা ।

মেধাতিথি ঋষি ।

১

কামবর্ষী তোমা ইন্দ্র ! সোমপান তরে বহি
আনুন, হরিরা,—যারা সূর্য্য চক্ষুষ্মান্ ।

হরিদ্বয় হেথা এই ঘৃতস্রাবী ধানা পাশে
সুখতম রথে ইন্দ্রে করুন বহন ।

৩

আবাহনি ইন্দ্রে প্রাতে, ইন্দ্রে যজ্ঞ সম্পাদনে
আর ইন্দ্রে—(যজ্ঞ শেষে) সোমপান তরে ।

৪

কেশরী হরির সহ এস সুত সোম পাশে,
সোম সুত—তাই ইন্দ্র আহ্বান তোমারে ।

৫

এস তুমি আমাদের এই স্তুতি প্রতি, সুত
এ সবনে, পিয়—যথা তৃষিত হরিণ ।

৬

প্রচুর ফেনিল সোম অভিষুত কুশোপরে,
তাহা ইন্দ্র ! বললাভ তরে কর পান ।

৭

হর্ষহেতু সোমপান তরে ইন্দ্র বৃত্রহন্তা
সব সুত সবনেতে করেন গমন ।

৮

মোদের কামনা পূর্ণ কর গাভী অশ্ব দিয়ে
শতক্রতো ! তব স্তব করি ধ্যানে মগ্ন হয়ে ।

১৭ সূক্ত ।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা ।

মেধাতিথি ঋষি ।

১

সম্রাট ! ইন্দ্র বরুণে রক্ষার্থ বরণ করি,
তাহা করিবেন তাঁরা সুখী আমাদের ।

২

মাদৃশ বিপ্রেরে রক্ষা করিবারে আবাহন
লহ এই ; তোমরাও ধারক জনের ।

কাম অনুসারে ধন দিয়া হে ইন্দ্র বরুণ
কর তৃপ্ত; তোমাদের সান্নিধি প্রার্থনা।

৪

মিশ্রিত যজ্ঞীয় হবিঃ—সুমতিদিগের স্তুতি;—
অন্নদাতা মাঝে শ্রেষ্ঠ হইতে বাসনা।

৫

সহস্র ধনের দাতা মাঝে ইন্দ্র ধনদাতা
স্তুতিযোগ্য মাঝে স্তুত্য হয়েন বরুণ।

৬

তাদের রক্ষণে মোরা করি ভোগ আর রাখি
নিধিরূপে; ততোধিক হয় যেন ধন।

৭

হে ইন্দ্র বরুণ! করি আবাহন তোমাদের
বিচিত্র ধনের হেতু;—জয়যুক্ত কর।

৮

যবে ইচ্ছে বুদ্ধি তোমা সেবিতে ইন্দ্রবরুণ
তখনই মোদের শ্রেষ্ঠ সুখদান কর।

৯

যে সুস্তবে তোমাদের করি আবাহন
এক সথে স্তবে হয় যাহার বর্দ্ধন;
তোমা ব্যাপ্ত হক্ তাহা হে ইন্দ্রবরুণ!

৩

উপদ্রবী মানুষের হিংসাযুক্ত নিন্দা যেন
না স্পর্শে মোদের; রক্ষ হে ব্রহ্মণস্পতি!

৪

ইন্দ্র ব্রহ্মণস্পতি, আর সোম যে নরের
বর্দ্ধওয়িতা,—সে বীর না পায় নষ্টগতি।

৫

হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি,—ইন্দ্র চন্দ্র ও দক্ষিণা
মানবে তোমরা সব রক্ষ পাপ হতে।

৬

অদ্ভুত, ইন্দ্রের প্রিয়, ধনদাতা, কমনীয়,
সদসস্পতিকে পাই—মেধাবী হইতে।

৭

যাহা বিনা জ্ঞানীদের যজ্ঞসিদ্ধ নাহি হয়
তিনি বুদ্ধি যোগ ব্যাপি অবস্থিত হন!

৮

তিনি হবিতাদের করেণ বর্দ্ধন,—আর
যজ্ঞ পূর্ণ হোত্র করে দেবেতে গমন।

৯

সুবিখ্যাত আর অতি বলশালী নরাশংসে
দেখিয়াছি,—প্রাপ্ত তেজঃ দ্যুলোক সমান।

১৮ সূক্ত।

ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি দেবতা।

মেধাতিথি ঋষি।

১

হে ব্রহ্মণস্পতি! সোমদাতাগণে প্রকাশিত
করদেরে; হে উশিজ কক্ষীবান যথা।

২

যিনি ধনী, রোগহারী, ধনদাতা অতি, পুষ্টিকারী
ক্ষিপ্রশক্তি অনুগ্রহ করুন সর্ব্বথা।

১৯ সূক্ত।

অগ্নি ও মরুৎগণ দেবতা।

মেধাতিথি ঋষি।

১

হয়েছ আহুত তুমি সোমপান হেতু এই
চারু যজ্ঞে,—এস অগ্নি! মরুৎগণ সনে।

২

মহান তোমার ক্রতু অতিক্রমি শ্রেষ্ঠ হতে
নাহি দেব নর, এস মরুৎগণ সনে।

যাঁরা বিশ্বদের হন্ মহাবৃষ্টিকর্ম্ম জ্ঞাতা
দ্রোহহীন,—এস অগ্নি! সে মরুৎ সনে।

৪

বলেতে অপ্রতিহত উগ্র হয়ে বরষেন
বারি যাঁরা—এস অগ্নি! সে মরুৎ সনে।

৫

যাঁরা শুভ্র, ঘোররূপ, হিংসক নাশক, শ্রেষ্ঠ
ধনযুক্ত,—এস অগ্নি! সে মরুৎ সনে।

৬

সুখময় লোক পরে দীপ্ত স্বর্গে, দীপ্তিমান্
যাহাদের স্থান,—এস সে মরুৎ সনে।

৭

পর্ব্বত চালক যাঁরা, লাঞ্ছিত জলধি সিন্ধু
যাহাদের হতে,—এস সে মরুৎ সনে।

৮

যারা সৌরকর সহ ব্যাপ্ত নভে, তিরস্কৃত
সিন্ধু যাঁর বলে,—এস সে মরুৎ সনে।

৯

তব অগ্রে পান তরে প্রস্তুত এ সোম মধু
করিয়াছি,—এস অগ্নি! মরুৎগণ সনে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

২০ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা।

মেধাতিথি ঋষি।

১

জন্মেছিলা দেব যাঁরা,=তাহাদের তরে এই
রত্নপ্রদ স্তোম মুখে রচেছে বিপ্রেরা।

২

যাঁদের মানস সৃষ্টি ইন্দ্রতরে বাক্যেযুক্ত
'হরিদ্বয়'; কর্ম্মদ্বারা যজ্ঞে ব্যাপ্ত তাঁরা।

অশ্বীদ্বয়তরে তারা করেছিলা সর্ব্বগামী
সুখময় রথ, ধেনু ক্ষীরদোগ্ধ্রা আর।

৪

সত্যমন্ত্র ঋজুকামী ব্যাপ্তিবান ঋভু হতে
পেয়ে ছিল পিতামাতা যৌবন আবার।

৫

স-মরুৎ ইন্দ্র! দীপ্ত আদিত্যগণের সহ,
তোমাদের হর্ষহেতু সোম হয় দান।

৬

ত্বষ্টা দেবতার সেই নূতন চমস্ ছিল
সুনির্ম্মিত,—করিয়াছ তারে চারিখান।

৭

তোমরা সুস্তুতি পেয়ে দাও আমাদের জন্য
একে একে তিনরূপ আর সাত যার।

৮

ঋভুগণ যজ্ঞবাহী ধরেন সুকৃতি বলে,
লহেন দেবের সনে যজ্ঞভাগ আর

২১ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতা।

মেধাতিথি ঋষি।

১

ইন্দ্র ও অগ্নিকে হেথা আবাহনি, তাঁহাদের
স্তোমযাচি, সোমপায়ি! কর সোমপান।

২

সে অগ্নি-ইন্দ্রকে যজ্ঞে সংসিত শোভিত কর
গায়ত্রীতে গাও নর! তাঁহাদের গান।

৩

মিত্রের প্রশংসা তরে সে ইন্দ্র অগ্নিকে করি
আবাহন, সোমপায়ি! এস সোম পানে।

৪

সুত এই সবনের কাছে করি আবাহন
উগ্রসে ইন্দ্র-অগ্নিকে, আইস এখানে

সুমহান্ সদস্পতি ইন্দ্রঅগ্নি! রক্ষদের
কর ঋজু, ভক্ষকেরা হক্ নিঃসন্তান।

৬

হে ইন্দ্রাগ্নি! সত্যদ্বারা প্রজ্ঞাপিত পদেরহ
জাগরিত; আমাদের শর্ম্ম কর দান।

২২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা।

মেধাতিথি ঋষি।

১

প্রাতেযুক্ত অশ্বিদ্বয়ে কর প্রবোধিত, হেথা
করুন এ সোমপান তরে আগমন।

২

সুশোভিত রথযুক্ত রথীশ্রেষ্ঠ স্বর্গবাসী
সেই অশ্বিদ্বয় দেবে কার আবাহন।

৩

তোমাদের কশা যাহা মধুমতী সত্যবতী
তা সহ হে অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞসিক্ত কর।

৪

সোমযাজীদের গৃহে যাও হেথা রথে করি,
অশ্বিদ্বয়! তাহা নহে দূরেত তোমার।

৫

সবিতা হিরণ্যপাণি রক্ষাহেতু আবাহনি
করেন জ্ঞাপন তিনি পদ দেবতার।

৬

রক্ষাহেতু আমাদের কর স্তুতি সবিতার
জলের শোষক তিনি ইচ্ছি ব্রততাঁর।

৭

বাসদাতা, বহুবিধ ধনের বিভাগকারী
নরচক্ষু সবিতারে করি আবাহন।

সখারা চৌদিকে ব'স হবে স্তব সবিতার,
আমাদের ধনদাতা ওই দীপ্তিমান।

৯

ওহে অগ্নি! দেবদের আকাঙ্ক্ষিনী পত্নীগণে
আনহ,—ত্বষ্টাকে আর, সোমপান তরে।

১০

যুবা অগ্নি! রক্ষাতরে আন দেবপত্নীগণে
হোত্রা ও ভারতী বরণীয়া ধীষণারে।

১১

দেবীরা অচ্ছিন্নপক্ষা নৃপালিকা, আমাদের
রক্ষা আর সুখদানে করুণ সেবন।

১২

বরুণানী ইন্দ্রাণীও আগ্নেয়ীকে স্বস্তি হেতু
সোমপান তরে হেথা করি আবাহন।

১৩

মহতী দ্যুলোক পৃথ্বী করেন মোদের যজ্ঞ
রসেসিক্ত, পুষ্টিদ্বারা মোদের পূরণ।

১৪

উভয়ের গন্ধর্ব্বের ধ্রুবপদে, কর্ম্ম বলে
ঘৃতবৎ জল বিপ্র করেন লেহন।

১৫

পৃথিবী! বিস্তীর্ণা হও বাসযোগ্য নিষ্কণ্টক,
সুবিস্তৃত সুখ কর দান আমাদের।

১৬

সপ্ত ধামে বিচরেন পৃথ্বী—বিষ্ণু যেথা হবে
সেথা হতে দেবগণ রক্ষহ মোদের।

১৭

বিচরেন বিষ্ণু ইহা তিনরূপ পদক্ষেপে
সমুদায় স্থিত তাঁর ধুলিযুক্ত পদে।

১৮

তিন পদে পরিক্রম করেন রক্ষক বিষ্ণু
হিংসাহীন,—ধর্ম্ম সব বিবৃত তাহাতেও

১৯

দেখহ বিষ্ণুর কর্ম্ম,—অনুষ্ঠিত ব্রত সব
হয় যাহে,—উপযুক্ত ইন্দ্র সখা হন্।

২০

বিষ্ণুর পরম পদ সদাহেরে সূরিগণ,—
চক্ষু অব্যাহত দৃষ্টি আকাশে যেমন

২১

সদা জাগরিত রহি স্তবকারী বিপ্রগণ
বিষ্ণুর পরম সেই পদ করে প্রদীপন।

২৩ সূক্ত।

বায়ু দেবতা।

মেধাতিথি ঋষি।

১

হে বায়ু! এ সোম—তীব্র সুখপাচ্য অভিভূত,
আইস হে প্রস্থাপিত সোম কর পান।

২

ইন্দ্র বায়ুদেব উভে দ্যুলোকনিবাসী, করি
আবাহন, এই সোম করিবারে পান।

৩

বিপ্রগণ রক্ষাহেতু আবাহনে ইন্দ্রবায়ু-
মনোগতি যজ্ঞপতি সহস্রনয়ন।

৪

যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত শুদ্ধবল মিত্র ও বরুণে
সোম পান তরে করি মোরা আবাহন।

৫

ঋত দ্বারা ঋতবর্দ্ধ ঋতের জ্যোতির পতি
সে মিত্র-বরুণে করি মোরা আবাহন।

৬

সর্ব্বরূপ রক্ষাদ্বারা রক্ষহে মিত্র বরুণ!
কর আমাদের আর শ্রেষ্ঠ বলবান।

মরুৎবান ইন্দ্রে মোরা সোমপান তরে করি
আবাহন,—তৃপ্ত হন সহিত স্বগণ।

৮

ইন্দ্র-শ্রেষ্ঠ, মরুতেরা গণযুক্ত, পুষ্পদাতা,
সর্ব্বদেবগণ! শুন মম আবাহন।

৯

শ্রেষ্ঠদাতা ইন্দ্রসহ সবলে বিনাশ অরি,
ব্যর্থ হক্, মোদের যে কহে দুর্ব্বচন।

১০

বিশ্বদেব মরুৎগণে সোমপান তরে করি
আবাহন, উগ্র তাঁরা পৃশ্নির সন্তান।

১১

মরুতের শব্দ বায় ধৃষ্ট হয়ে—বিজয়ীর
নাদ যেন,—শুভ পাও যখন হে নর!

১২

দীপ্তিকারী অতিদীপ্ত অন্তরীক্ষ হ'তে আগু
মরুৎগণ! আমাদেরে রক্ষ—সুখী কর।

১৩

দীপ্ত দ্রুতগামী পূষা চিত্রদর্ভে আন সোমে
স্বর্গ হ'তে, নষ্ট পশু সংগ্রহ যেমন;

১৪

অতি গূঢ় গুহাস্থিত বিচিত্র দর্ভে সংস্থিত
দীপ্তিমান সোমে পূষা করেন সন্ধান।

১৫

করেন মোদের তরে ছয় ঋতু একে একে
সোমে যুক্ত,—সব চাষ যথা গরু সাথে।

১৬

জল যজ্ঞকামীদের মাতৃরূপা হিতকরী,
মধুর সে দুগ্ধদাত্রী যান যজ্ঞপথে।

১৭

যেই জল রবিপাশে কিম্বা রবি সহস্থিত
করুন মোদের যজ্ঞ তিনি প্রীতিমান।

১৮

পিয়ে যেই জল গাভী, আহ্বানি সে জলদেবী,
প্রবাহিত বারিকে কর্ত্তব্য হবি দান।

১৯

জলেতে অমৃত আছে, জলেতে আছে ঔষধি,
এস ত্বরা তাঁর স্তুতি তরে ঋষিগণ!

২০

কহেছেন সোম মোরে,—আছয়ে বারি-অন্তরে
বিশ্বের ভেষজ, আর অগ্নি-বিশ্বশুভকর,—

২১

কর বারি! পুষ্টিবৃত, আছয়ে ঔষধি যত,
মম দেহে ব্যাধিচয় যাহে নিবারিত হয়,—
সূর্য্য হয় নিত্য দরশন।

২২

আমাতে দুরিত যাহা, করেছি যে দ্রোহ—তাহা,
দিয়াছি যে অভিশাপ—মিথ্যা কহি, যেই পাপ
বারি! সব কর প্রক্ষালন।

২৩

জলেতে অবগাহন করিয়া রসে মগন
হই—আজ, অগ্নি! এস—জলে তুমি কর বাস,
বলবান করহ আমাকে।

২৪

আমাকে বলের সহ প্রজ্ঞা আর আয়ু সহ
করহ সংযোগ; যেন ইন্দ্রসহ ঋষিগণ
আর দেবে জানেন আমাকে।

২৪ সূক্ত।

অগ্নি প্রভৃতি দেবতা।

অজিগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

১

অমৃত দেবের মাঝে কোন্ জাতি দেবতার—
কাহার বা চারু নাম করিব গ্রহণ!
কে দিবেন আমাদেরে পুনঃ এ পৃথ্বী মহান্,
যাহা হতে হবে পিতা-মাতা দরশন।

২

অমৃত দেবের মাঝে প্রথমে আমরা করি
অগ্নি দেবতার চারু নাম উচ্চারণ,
দিবেন মোদেরে তিনি পুনঃ এ পৃথ্বী মহান্,
যাহা হ'তে হবে পিতা-মাতা দরশন।

৩

তুমি সদা রক্ষাকারী বরণীয় ধনেশ্বর
হে সবিতা! তব পাশে মাগি ভোগ্যধন।

৪

প্রশংসিত ভজনীয়ে আনন্দিত দ্বেষহীন
হেন ধন করে তব করেছ ধারণ।

৫

সে আমরা ধনযুক্ত তোমার রক্ষণে, হয়ে
ব্যস্ত, করি সে ধনের উৎকর্ষ সাধন।

৬

ওই যে উড্ডীয়মান পক্ষীগণ, তাহারা ত
পায় নাই তব বল, ক্রোধ, পরাক্রম;
অনিমেষ প্রবাহিত বারি পায় নাই তাহা,
তব বেগ বায়ু হিংসা করেনা কখন।

৭

পবিত্র বল বরুণ রাজা,—মূলহীন স্থানে
বরণীয় তেজ স্তূপ ধরেন উপরে।
মূল উপরেতে—কিন্তু থাকে তারা নিম্নমুখে,
আমাদের প্রাণ তথা নিহিত অন্তরে।

৮

করেন বরুণরাজ বিস্তীর্ণ সূর্য্যের পথ
ক্রমগতি হেতু; আর পদহীন স্থান।
পদক্ষেপ তরে পথ করেন বিস্তার তিনি;—
হৃদিভেদী শত্রুকে করুন তিরস্কার।

৯

রয়জন! আছে শতেক সহস্র ভেষজ তব,
গভীর বিস্তৃত হয় সুমতি তোমার।

নিঋতিকে পরাঙ্মুখী বাধা দিয়া রাখ দূরে,
আমাদের কৃত পাপ হতে মুক্ত কর।

১০

সপ্তর্ষি-স্থাপিত হয়ে ঊর্দ্ধে—রাত্রে দৃষ্ট হয়,
দিবাগমে যায় তারা চলিয়া কোথায়।
বরুণের কর্ম্মচয় নাহি প্রতিহত হয়
নীশিথে চন্দ্রমা দীপ্ত তাঁহার আজ্ঞায়।

১১

বন্দ্য তুমি ব্রহ্মদ্বারা আয়ু মাগি তব কাছে,
আয়ু যাচে যজমান করি হবিঃ দান।
মন দাও হে বরুণ! ইথে নাহি ক'রো হেলা,
বহু স্তত্য! আয়ু মোর ক'রোনা হরণ।

১২

দিবসে রাত্রিতে মোরে কহেছেন ইহলোকে
করেছে প্রকাশ মম হৃদিস্থিত জ্ঞান,
যূপবদ্ধ শুনঃশেফ করে যাঁরে আবাহন
সে বরুণ রাজা মোরে করুন মোচন।

১৩

হয়ে ধৃত—হয়ে বদ্ধ তিন পদযুক্ত করি
শুনঃশেফ আবাহনে অদিতি-পুত্রেরে,
তাই সে বরুণ রাজা অহিংসিত সুবিদ্বান্
করুন মোচন পাশমুক্ত করি তারে।

১৪

হে বরুণ! করি তব অবহেলা অপ্রনীত,
যজ্ঞ হবি দ্বারা, আর করে নমস্কার।
হে অসুর! হে প্রচেত! নিরস মোদের কর্ম্ম,
রাজন্! শিথিল কর পাপ আমাদের।

১৫

হে বরুণ! আমাদের উত্তম মধ্য অধম
পাশ খুলে দাও উচ্চ-মধ্য নিম্ন দিয়া।
হে অদিনিপুত্র! মোরা করিয়ে খণ্ডন
ব্রত তব, রহিব হে নিষ্পাপ হইয়া।

২৫ সূক্ত।

বরুণ দেবতা।

অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেফ ঋষি।

১

হে দেব বরুণ! মোরা সাধিতে তোমার ব্রত
করি ভ্রম দিনে দিনে,—ভ্রান্ত লোক মত।

২

করোনা মোদের যেন হেলাকারী নিহন্তার
বধযোগ্য; কি ক্রুদ্ধের ক্রোধের আস্পদ।

৩

হে বরুণ! সুখ-আশে স্তুতি দ্বারা তব মন
করি তুষ্ট; শ্রান্ত অশ্বে তোষে রথী যথা।

৪

ক্রোধহীন বুদ্ধি মম হয় বসু লাভ আশে
প্রধাবিত, ব্যোমে ধায় পক্ষীগণ যথা।

৫

সেই তেজঃ যুক্তনর—বহুদ্রষ্টা বরুণেরে
সুখ হেতু কবে কর্ম্মে পারিব আনিতে?

৬

ধৃতব্রত হবিদাতা প্রতি তুষ্ট দেবতারা
লন এ সামান্য হবি, নাহি হেলা তাতে।

৭

অন্তরীক্ষচারী যত পক্ষীপথ জ্ঞাত যিনি,
তিনিই জানেন পথ সমুদ্রে নৌকার।

৮

জানেন যে ধৃতব্রত প্রজাযুক্ত বারমাসে,
জ্ঞাত তিনি সেই মাস উৎপত্তি যাহার—

৯

বিস্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ মহান্ বায়ুপথ জ্ঞাত তিনি,
জানেন তাঁদেরে—যাঁরা থাকেন উপরে।

১০

ধৃতব্রত শ্রেষ্ঠকর্ম্মা বরুণ বসেন আসি
সাম্রাজ্য স্থাপিতে দৈবী প্রজার মাঝারে।

১১

তাহা হতে জ্ঞানবান—কে করে শাসন বিশ্বে,
অদ্ভুত যা কিছু—কৃত যা হইবে আর।

১২
সুক্রতু আদিতি পুত্র করুণ সুপথ্যগামী
প্রত্যহ মোদের—আর আয়ুর প্রসার।
১৩
বরুণ করেন দেহ হিরণ্ময় কবচেতে
আবরিত। রশ্মি যার চৌদিকে বিস্তৃত।
১৪
সে দেবে হিংসিতে নারে হিংসকেরা, কিম্বা যারা
প্রাণীর পীড়নকারী, আর পাপী যত।
১৫
মানুষের তরে অন্ন চৌদিকে সৃজেন যিনি
পূর্ণরূপে—আমাদের উদরের তরে।
১৬
সে বহুদ্রষ্টার আশে অনিবৃত্ত হয়ে ধায়
বুদ্ধি মম—গাভী যথা যায় গোঠ পরে।
১৭
মম প্রিয় মধু এই সুপ্রস্তুত, কর পান—
হোতা যথা; পরে উভে করি আলাপন।
১৮
বিশ্বদর্শনীয়তারে, হেথা তার রথ আর
হেরিয়াছি, করেছেন এ স্তুতি গ্রহণ।
১৯
হে বরুণ শুন মম এই আবাহন কর
কর সুখী আজ, ডাকি তোমা উচ্চে রক্ষা তরে।
২০
যে মেধাবী! বিশ্বমাঝে স্বর্গে মর্ত্ত্যে দীপ্ত তুমি
কল্যাণ-কামনা-সিদ্ধি জানাও উত্তরে।
২১
উচ্চ মধ্য অধো হতে উচ্চ মধ্য নিম্নপাশ
আমাদের কর ছিন্ন—আয়ু বৃদ্ধি তরে।

---

২৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা।

শুনঃশেক ঋষি।

১
যজ্ঞ যোগ্য অন্নপতি দীপ্ত কর তেজবান
আমাদের এই যজ্ঞ কর সম্পাদিত।

নিত্য যুবা বরণীয় তেজে স্বপ্রকাশ অগ্নি
এস আমাদের হোতা দীপ্ত বাক্যে স্তুত।
৩
অভীষ্ট প্রদানে যথা পিতা-পুত্রে, মিত্র মিত্রে,
সখা-প্রিয়ে, হে বরেণ্য! দাও তুমি তথা।
৪
বরুণ মিত্র আর্য্যমা শত্রুনাশী. আমাদের
যজ্ঞে হন অধিষ্ঠিত, মনু যজ্ঞে যথা।
৫
ওহে পুরাতন হোতা! মোদের এ যজ্ঞে যাগ
সখ্যতায় তুষ্ট হও; শুন স্তুতিবাণী।
৬
যদিও বিস্তৃত নিত্য যজ্ঞে যজি নানাদেবে,
কিন্তু মোরা তোমারেই সে হবিঃ প্রদানি।
৭
প্রজাপতি—হোতা হৃষ্ট বরেণ্য অগ্নি মোদের
হন প্রিয়; অগ্নিযুক্ত মোরা প্রিয় তাঁর।
৮
অগ্নিযুক্ত দেবগণ মোদের বরেণ্য হবি;
ধরেছেন; অগ্নিযুক্ত—করি যাজ্ঞা তাঁর
৯
তারপর হে অমৃত! মর্ত্য আমাদের উভে
মিলি হক পরস্পর প্রশংসাবচন।
১০
ওহে বনপুত্র অগ্নি! বিশ্ব-অগ্নি সহ কর
এই যজ্ঞ, এই স্তুতি. এ অন্ন ধারণ।

২৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা।

শুনঃশেফ ঋষি।

১
অগ্নি! তুমি পুচ্ছযুক্ত অশ্বমত, বন্দি তোমা
নমস্কারে; তুমি হও সম্রাট্ যজ্ঞের।
২
পৃথুগামী বনপুত্র! আমাদের সুখ হেতু
হও তুমি,—কামবর্ষী হও আমাদের।

বিশ্ব আয়ু তুমি,—দুর সন্নিহিত পাপমতি
মর্ত্ত্য হতে কর সদা মোদের রক্ষণ।

৪

অগ্নি! তুমি বলো দেবে ভালকরে—আমাদের
নূতন গায়ত্রী-স্তুতি,—এই হবি দান।

৫

পরম মধ্যম অধঃ সর্ব্বদিক্ হতে দাও
আমাদের, অন্তরস্থ ধন কর দান।

৬

সিন্ধু পশে উর্ম্মি যথা, তুমি ধন, ভাগকারী
চিত্র দীপ্ত সদা কর দাতারে বর্ষণ।

৭

রক্ষ যে মর্ত্ত্যেরে রণে, পাঠাও সমরে যারে,
অগ্নি! সেই হয় নিত্য নিয়ন্তা অন্নের।

৮

ওহে শত্রুজয়কারী! অক্রমিতে নারে কেহ
ইহারে; প্রসিদ্ধ বল আছয়ে ইহাঁর।

৯

সর্ব্বনর যুক্ত তিনি করুন সমরে পার
অশ্ব দ্বারা; বিপ্র দ্বারা ফলদাতা তিনি।

১০

স্তুতিতে প্রবুদ্ধ তিনি রুদ্রে স্তুতি শ্রেষ্ঠ অতি;—
জনে জনে যজ্ঞ তরে প্রবিষ্ট আপনি

১১

মহান্ অপরিমেয় ধূমকেতু বহু দীপ্তি
তিনি হ'ন আমাদের কর্ম্মে-অন্নে প্রীত।

১২

প্রজাপতি দেবহোতা দূত মহাদীপ্ত অগ্নি
শুন আমাদের স্তুতি ধনীদের মত।

১৩

নমঃ মহাদেবগণে, নমঃ ন্যূন দেব সবে,
নমঃ যুবা দেবতারে, নমঃ বৃদ্ধ দেবে,
যতদুর সাধ্য করি দেবগণে এ অর্চ্চনা,
যেন নাহি ত্যজি দেব! স্তুতি জ্যেষ্ঠা দেবে।

২৮ সূক্ত

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা

শুনঃশেফ ঋষি।

১

সেই যজ্ঞে অভিষব হেতু স্থূল মূল শিলা উত্তোলন
উদূখলে সুত যেই সোম জানি তব—কর ইন্দ্র
পান।

২

যেথা অভিষব পট্ট দুটী বিস্তৃত জঘন দুটী যেন,
উদূখলে সুত যেই সোম জানি তব—কর ইন্দ্র
পান।

৩

যজ্ঞশালে প্রবেশ নিগম শিক্ষা করে যেথা নারীগণ
উদূখলে সুত যেই সোম জানি তব কর ইন্দ্র পান।

৪

মন্থনের দাও বদ্ধ যেথা সংযমন রশ্মির মতন,
উদূখলে সুত যেই সোম জানি তব - কর ইন্দ্র
পান।

৫

যদিও হে উদূখল তুমি গৃহে গৃহে হও ব্যবহৃত,
হেথা কর অতি দীপ্ত ধ্বনি বিজয়ীর দুন্দুভির
মত।

৬

ওহে বনস্পতি উদূখল! অগ্রে তব বায়ু প্রবা-
হিত,
অতএব কর ইন্দ্র তরে পান হেতু সোম অভিষুত।

৭

অন্নপ্রদ, যজ্ঞের সাধক উদূখল মুসল দুজনে
উচ্চনাদে করহ বিহার অশ্ব যথা আহার চর্ব্বণে।

৮

ওহে বনস্পতিদ্বয়! আজ শ্রেষ্ঠ অভিষব যন্ত্র সনে
হয়ে দর্শনীয় ইন্দ্র তরে কর সুতমধুময় সোম।

৯

অভিষব পট্ট হতে আর অবশিষ্ট কর উত্তোলন,
রাখ সোম পবিত্র কুশেতে পরে কর গোচর্ম্মে
স্থাপন।

২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

শুনঃশেফ ঋষি।

১

ওহে সোমপায়ি সদা সত্যবাদী
নহিক আমরা প্রশংসিত যদি,—
ইন্দ্র! তুমি হও বহুধনপতি—
কর আমাদেরে প্রশংসিত অতি—
সহস্র গো আর অশ্ব সুশোভন
আমাদের তরে করিয়া প্রদান।

২

সুনাসিক অন্নপতি শচীমান্,
তব অনুগ্রহ সদা বর্ত্তমান।
ইন্দ্র তুমি হও বহু ধনপতি,
কর আমাদেরে প্রশংসিত অতি।
সহস্র গো আর অশ্ব সুশোভন,
আমাদের তরে করিয়া প্রদান।

৩

পরস্পরে যারা কর দরশন
কর সুপ্ত, হো'ক ঘুমে অচেতন;
ইন্দ্র! তুমি হও বহুধনপতি
কর আমাদেরে প্রশংসিত অতি—
সহস্র গো আর অশ্ব সুশোভন
আমাদের তরে করিয়া প্রদান।

৪

সুপ্ত থাক্ শূর! অরাতি মোদের,
থাকুক্ জাগ্রত বন্ধু আমাদের,
ইন্দ্র! তুমি হও বহুধনপতি,
কর আমাদেরে প্রশংসিত অতি,
সহস্র গো আর অশ্ব সুশোভন,
আমাদের তরে করিয়া প্রদান।

৫

ওই নিন্দাকারী গর্দ্দভের দলে
করহ বিনাশ হে ইন্দ্র সবলে,
ইন্দ্র! তুমি হও বহু ধনপতি,
কর আমাদেরে প্রশংশিত অতি,
সহস্র গো আর অশ্ব সুশোভন
আমাদের তরে করিয়া প্রদান।

৬

ওই যে অনিল কুটিলগমন,
বন হ'তে দূরে করুক্ প্রস্থান,
ইন্দ্র! তুমি হও বহুধনপতি,
কর আমাদেরে প্রশংসিত অতি;
সহস্র গো আর অশ্ব সুশোভন,
আমাদের তরে করিয়া প্রদান।

৭

বিনাশ সকল আক্রোশকারীকে,
বিনাশ তাদেরে, যারা হিংসা করে।
ইন্দ্র! তুমি হও বহুধনপতি,
কর আমাদেরে প্রশংশিত অতি;
সহস্র গো আর অশ্ব সুশোভন,
আমাদের তরে করিয়া প্রদান।

৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

শুনঃশেফ ঋষি।

১

অন্ন আশে করি সোমে যে আসিঞ্চিত তোমাদের
বৃদ্ধ শতক্রতু ইন্দ্রে তব কূপ যথা জলে।

২

তিনি শত শুদ্ধ আর সহস্র আশীরযুক্ত
সোম-পাশে যা'ন্—বারি নিম্নে যথা চলে।

৩

বলবান' ইন্দ্রে ইহা হর্ষ হেতু যুক্ত হয়,
ইথে তাঁর পুর্ণোদর, সমুদ্র মতন।

৪

লও ইহা—তোমারই এ—কপোত যেমন লয়
গর্ভিণী কপোতী, ধর মম এ বচন।

৫

স্তুতিভাক্ ধনপতি বীর তব স্তুতি, এই
হউক্ বিভুতি তব প্রিয় সত্য আর।

৬

রক্ষিতে মোদেরে রণে, রহ উচ্চে শতক্রতো!
পরে উভে মোরা অন্ত করিব বিচার।

প্রতি কর্ম্ম-উপক্রমে, প্রতি যুদ্ধে আবাহনি
সখা মম অতিবলী ইন্দ্রে, রক্ষা তরে।

৮

এ আহ্বান শুন যদি—অবশ্য আসিবে হেথা,
সহস্র প্রকার রক্ষা অন্ন সহকারে।

৯

পুরাণ আবাশ হতে বহুগামী নর! তোমা
আবাহনি;—যথা পূর্ব্বে আহ্বান পিতার।

১০

বিশ্ববরণীয়-সখা—বহুহুত—বাস হেতু—
স্তোতাগণ তরে করি প্রার্থনা তোমার।

১১

হে সোমপা সখা বজ্রি! তব সোম পায়ী যথা
আমরা—মোদের থাক্ গাভী সুনাসিক্।

১২

হে সোমপা সখা বজ্রি! ইষ্টতরে করি যথা,
বাঞ্ছা তব,-কর তাহা—তাহাই হউক।

১৩

ইন্দ্র হৃষ্ট হলে,—গাভী হবে বলী, দুগ্ধবতী
তা সনে হইব হৃষ্ট মোরা অন্নবান।

১৪

ধৃষ্ণু! তব সম আত্মতৃপ্ত দেব-দিন ইথে
অভীষ্ট স্তোতার,—চক্র অক্ষকে যেমন।

১৫

স্তোতার কামনা যাহা, সেই ধন শতক্রতো!
দাও আনি—রথগতি অক্ষকে যেমন।

১৬

হ্রেষারব-ঘনশ্বাস ভক্ষণান্তে শব্দযুক্ত
অশ্বসহ, কর ইন্দ্র! সদা জয় ধন।
চর্ম্মবান্ দানশীল হে ইন্দ্র! মোদের তরে
হিরন্ময় রথ তুমি করিয়াছ দান।

১৭

অশ্বযুক্ত, বৈদ্য অশ্বিদ্বয়! এস অন্ন সহ,
কর গৃহ অশ্বে আর হিরণ্যে পূরণ।

১৮

দেবৌ! বৈদ্য অশ্বিদ্বয়-সমান যোজিত তব
রথ অবিনাশী, করে সমুদ্রে গমন।

১৯

রথের একটী চক্র আছে দূর গিরি-শিরে
নিয়মিত,—অন্যচক্র আকাশে বিচরে।

২০

হে অমরস্তুতিপ্রিয় উষা! কোন্ মর্ত্ত্য হয়
ভোগ্য তব? বিভাবরি! প্রাপ্ত হও কারে?

২১

হে ব্যাপক দীপ্যমান্ উষা, সন্নিকট হ'তে
কিম্বা দূর হ'তে, নারি বুঝিতে তোমারে।

২২

হে-স্বর্গ দুহিতা! তুমি কর আগমন সেই
অন্ন সহ; ধন আর কর দান মোরে।

৩১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা।

অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি।

তুমি অগ্নি! আদি ঋষি অঙ্গিরাগণের
দেব হয়ে দেবতার সখা শিবকারী;
তব কর্ম্মে হয় জন্ম মরুৎগণের—
যারা কবি কর্ম্মজ্ঞাতা দীপ্ত অস্ত্রধারী।

২

প্রথম অঙ্গিরা শ্রেষ্ঠ তুমি, হয়ে কবি
ওহে অগ্নি! দেবকর্ম্ম করহ ভূষিত;
বিশ্বভুবনেতে বিভু দ্বিমাতৃ মেধাবী,
নরের হিতার্থে তুমি কত রূপে স্থিত।

৩

অগ্নি! তুমি হও মাতরিশ্বার প্রধান,
সুবজ্ঞার্থী সেবকের কাছে আভির্ভূত;
কাঁপে স্বর্গ মর্ত্ত্য; কর হে বসু! বহন
হোতা হয়ে যজ্ঞভার-যজ্ঞ সম্পাদিত।

৪

করেছ মনুরে লভে স্বরগ যেমনে;
পুরুরবে কর পুণ্যে শ্রেষ্ঠ ফলদান;
মুক্ত যবে—তব পিতা অরণি মণ্ডলে,
করে তোমা বেদী-পূর্ব্বে পশ্চাতে স্থাপন

তুমি অগ্নি ইষ্টবর্ষী, পুষ্টি বর্দ্ধয়িতা
শ্রুব উঠাইয়া করে তোমারে কীর্ত্তিত
বষট্‌কারে হে একায়ু! যে আহুতিদাতা,
আগে তথা—পরে অন্যে হও প্রকাশিত।

৬

হে বিশিষ্ট জ্ঞানি! তুমি ভ্রান্ত পথগামী
নরে আনি শুভকর্ম্মে কর নিয়োজন,
বহু শূরসহ বহুব্যাপী রণে তুমি
অল্প লোক দ্বারা কর বহুর নিধন।

৭

তুমি অগ্নি! সে মর্ত্ত্যেরে অমৃতে উত্তম
অন্ন তরে দিনে দিনে করহ ধারণ;
বাঞ্ছিত যাহার হয় উভয় জনম
সেই জ্ঞানী তার সুখ অন্ন কর দান।

৮

অগ্নি মোরা ধন আশে করি স্তুতি তব
যশস্বী সুকর্ম্মী পুত্র দাও আমাদের,
বর্দ্ধন করিব কর্ম্ম পেয়ে বল নব,
দেবসহ দ্যাবা পৃথ্বী! রক্ষহ মোদের।

৯

থাক পিতা মাতা কাছে দোষহীন অতি
দেবে থাক জাগরিত, কর পুত্র দান
বুদ্ধ হয়ে, শুভমতি হও কর্ম্মী-পতি,
হে কল্যাণ! বিশ্বধন করহ বপন।

১০

হে অগ্নি! প্রসন্নমতি হও আমাদেরে
তুমি পিতা আয়ুদাতা, মোরা বন্ধু তব
তুমিই নিধান শত সহস্র ধনের
বীরযুক্ত ব্রতপাতা নাহি শত্রু তব।

১১

নররূপে তোমা অগ্নি! পূর্ব্বে দেবতায়
করেছিলা নররূপী নহুষ-সেনানী;
মানুষের উপদ্রেষ্ট্রী করেন ইলায়
আমার পিতার পুত্র জন্মেছে যখনি।

১২

বন্দ্য তুমি দেব অগ্নি! তোমার পালনে
পূর্ব্ব আমাদের রক্ষ পুত্রে আর,
তব ব্রত অনিমেষ নিযুক্ত রক্ষণে
পৌত্রদের গাভীগণে লহ রক্ষা ভার।

১৩

যাজক পালক তুমি, বাধা দূর তরে
চতুরক্ষরূপে দীপ্ত থাক, যজ্ঞ পাশে,
হবি দেয় হিংসাহীন পালক তোমার
যেই, তার মন্ত্র কর গ্রহণ মানসে।

১৪

ওহে অগ্নি! যে ঋত্বিক হন বহু স্তোতা,
বাঞ্ছিত পরম ধন কর তারে দান;
কহে তোমা অক্ষমের দয়াময় পিতা
হে জ্ঞাতা! শিশুকে দাও শিক্ষাদিক্ জ্ঞান।

১৫

দক্ষিণা প্রদাতা নরে ওহে অগ্নি কর
সর্ব্বদিকে রক্ষা তুমি, স্যূতবর্ম্মা মত,
গৃহে স্বাদু অন্নে অতিথির তৃপ্তিকর
জীব যজ্ঞ করে যেই, স্বর্গ তার মত।

১৬

করেছি ইথে যে ভ্রম, এসেছি যে আর
দূর হ'তে এ বিপথে, অগ্নি! তাহা ক্ষম;
সুপ্রাপ্য, সুমতি, পিতা, নিয়ন্তা কর্ম্মের
তুমি, সোমযাজী মর্ত্ত্যে কর ঋষি সম।

১৭

হে শুদ্ধ অঙ্গিরা অগ্নি! যাও যজ্ঞ পানে
আদিরা, যযাতি, মনু, পূর্ব্ববর্ত্তীগণ
যাইত যেরূপে; আন তথা দেবগণে,
বসাও কুশেতে, কর প্রিয় হব্যদান।

১৮

এই ব্রহ্মে তুমি অগ্নি! হও প্রবর্দ্ধিত,
যথা শক্তি বিদ্যা ইহা করেছি রচন,
ইথে কর আমাদের শ্রেষ্ঠধনযুত,
অন্নযুক্ত শুভ বুদ্ধি করহ প্রদান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু এম এ বি এল্।

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু পত্রিকা



১৫শ বর্ষ, ১৫শ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | মাঘ। | ১৩১৫ সাল, ১৮৩০ শকাব্দা।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম।

১। "কর্ম্ম" শব্দের অর্থ। জীবের ধর্ম্মা-ধর্ম্ম বা অদৃষ্টরূপ যে 'কল্পকল্পান্তরব্যাপী প্রবাহরূপী অনাদি কর্ম্মতত্ত্ব, তাহা ব্যাখ্যা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মানবের বিত্তোপার্জ্জন, পোষ্যবর্গপালন, ব্যায়াম শিক্ষা, দেশভ্রমণ, সমাজ সংস্কার, পুরুষকার, খ্যাতি-শ্রয়স প্রভৃতি স্বাভাবিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ বা উপদেশ করাও ইহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু শাস্ত্রবিহিত যে সকল আচার এবং নিত্য-নৈমিত্তিক দেবোৎসবাদি কর্ম্ম এই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণাদি হিন্দু গৃহস্থগণের আশ্রমে এই বর্ত্তমান যুগে প্রচলিত আছে, তৎসমস্ত অনুষ্ঠানের প্রতি হিন্দুসন্তানদিগের চিত্ত আকর্ষণ করা ইহার উদ্দেশ্য। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এরূপ উপদেশের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ক্রমে নানা কারণে এই সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের ঔদাসীন্য জন্মিয়াছে, অথচ চতুর্দ্দিকে দেখাও যাইতেছে যে, কর্ম্মানুষ্ঠানে শিথিলযত্ন হইয়াও, অনেকে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছেন। অতএব এই সময়টী এরূপ উপদেশ দানের উপযুক্ত অবসর।

২। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম পালনে কিঞ্চিন্মাত্র শ্রদ্ধা রাখেন, তাঁহারা যথাসম্ভব কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইলে, কোনরূপ প্রতিবন্ধক তাঁহা-দিগকে বাধা দিতে পারিবে না। ইহাই ভরসা। অন্যান্য প্রতিবন্ধক যতই থাকুক, কতিপয় গৃহভেদী উপদ্রব অনেক অনিষ্ট করিতে পারে। অনুষ্ঠানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে তৎ-প্রতি সতর্ক হইতে হইবে। "কর্ম্ম" এবং "ব্রহ্ম" এই দুইটীই বৈদিক শব্দ এবং সনাতন ধর্ম্মপ্রিয় হিন্দুসমাজে এই শব্দদ্বয়-প্রতি-

পাদ্য বৈদিক অর্থই গৃহীত এবং বেদ-প্রতি-পাদ্য ধর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই বর্ত্তমান সময়ে তত্ত্বদ্বয়ের অর্থ বিকৃত-ভাবাপন্ন হইয়াছে; শব্দ দুটী যথাবৎ আছে। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিমিশ্র তাৎপর্য্য সে দুটীর বৈদিকার্থের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এখন বিজাতীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং পুরা-বৃত্ত সম্পাদ্য বসনভূষণে শোভিত হইয়া ঐরূপ তাৎপর্য্যের সহিত "কর্ম্ম" ও "ব্রহ্ম" রব চতুর্দ্দিকে কর্ণ বধির করিতেছে। কিন্তু অনুষ্ঠানপরায়ণ সাধুপুরুষদিগের তৎপ্রতি কর্ণপাত করা উচিত নহে। এই সত্য তাঁহাদিগকে ধারণ করা উচিত যে, পরিবর্ত্তন ও মিশ্রণ হিন্দু ধর্ম্মের ধাতুর অযোগ্য।

৩। কেবল কর্ম্ম কর্ম্ম উচ্চারণ করিলে বা কর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে কোন ফল হয় না; কিন্তু শাস্ত্রবিহিতরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান আব-শ্যক। তাহাতে ঐহিক পারত্রিক শুভ হয় এবং ক্রমে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা ও মোক্ষ রূপ উচ্চাধিকার জন্মে। কর্ত্তৃতন্ত্র সাধনবির-হিত কর্ম্মবাদ এবং বস্তুতন্ত্র-জ্ঞান বিরহিত ব্রহ্মবাদ হিন্দুধর্ম্ম নহে। ঋষি ও আচার্য্য-দিগের কৃত যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্ম-বিদ্যার সিদ্ধান্ত, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম। তদ্ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধান্ত শাস্ত্রার্থে বা ধর্ম্মার্থে প্রামাণ্য নহে।

(২) কর্ম্মশ্রেণী।

৪। কর্ম্মের প্রকারভেদ। ভারতবাসী ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের এবং কায়স্থাদি অপর উপনীত বা অনুপনীত ভদ্র গৃহস্থগণের অনু-ষ্ঠেয় কর্ম্ম প্রধানতঃ ষট্ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তৎসমস্তই শাস্ত্রবিহিত এবং সনাতন পদ্ধতিবদ্ধ।

(১) কাম্যকর্ম্ম। স্বর্গাদি ইষ্টসাধন জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ। দুর্গোৎসবও কাম্যাধি কারে এইরূপ মহা যজ্ঞ। কিন্তু তাহা প্রায়শঃ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্যামাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজাদিরও এই ভাব। এ সমস্ত নিষ্কামভাবে আচরিত হইলে মুক্তিফল এবং স্বর্গাদি অবান্তর ফল লাভ হয়।

(২) নিত্যকর্ম্ম। বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনাদি, নিত্য শিবপূজা, নারায়ণের নিত্য সেবা, নিত্য তর্পণ, নিত্য হোম ইত্যাদি 'নিত্যকর্ম্ম' শব্দের বাচ্য। এ সমস্তই নিষ্কাম। নিষ্কাম দুর্গোৎসবাদিও নিত্যকর্ম্ম বলিয়া অভি-হিত হয়। এই সমস্তের মধ্যে সন্ধ্যা-উপাসনাদি অহরহ অবশ্য কর্ত্তব্য। না করিলে পাপ হয়।

(৩) নৈমিত্তিক কর্ম্ম। দশ সংস্কারকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম কহে। গৃহস্থাশ্রমে, বিবাহাদি ঘটনা নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, এজন্য এসমস্ত সংস্কার নৈমিত্তিক শব্দের বাচ্য। এ সমস্তও নিষ্কামকর্ম্ম। যথা বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, এবং সমাবর্ত্তন। জাত বালকের জন্মকর্ম্মকে শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সংস্কৃত করিবার জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা। পিতৃশ্রাদ্ধাদি এবং তান্ত্রিকীদীক্ষাও নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

(৪) প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম। কেবলমাত্র পাপ-ক্ষয়ের জন্য অনুষ্ঠিত চান্দ্রায়ণাদি ব্রত। ইহ বা পূর্ব্বজন্মের পাপ জন্য শরীরে যে সকল দুরারোগ্য রোগ বদ্ধমূল হয়, তাহার কারণ স্বরূপ পাপ হইতে উদ্ধার লাভার্থও প্রায়শ্চিত্ত আচরিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রায়-শ্চিত্তও আছে।

(৫) উপাসনাকর্ম্ম। সগুণব্রহ্মোপাসনা, সনধিকযোগ, এবং ঈশ্বরার্থ আচরিত সমস্ত কর্ম্মযোগ।

(৬) পূর্ত্তকর্ম্ম অর্থাৎ জলাশয়, রাজপথ, বৃক্ষ, পান্থশালা, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও তৎসংক্রান্ত

এই সকলের মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, এবং উপাসনা, যোগসাধন এবং কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয়, চিত্তশুদ্ধি, মনের একাগ্রতা মানসিক ধর্ম্মের উন্নতি, আন্তরিক শৌচ এবং বাহ্যশৌচ ও সদাচার উপার্জ্জিত হয় এবং পরলোকে সদ্‌গতি হয়।

(৩) লক্ষণ।

৫। কর্ম্মের লক্ষণ। কর্ম্ম সমস্তই মন্ত্রসমবায়ী। বিধিবিহিতরূপে প্রস্তুত যজমান, পুরোহিত, উপকরণদ্রব্য ও দক্ষিণা, এবং শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রমাবলম্বিত মন্ত্রপূতক্রিয়া, এই সমস্তের সমবেত অনুষ্ঠানকে কর্ম্ম কহে। তন্মধ্যে দীক্ষাসংস্কারে গুরুর প্রয়োজন; এবং নিত্য সন্ধ্যা বন্দনা গুরুপুরোহিত নিরপেক্ষ। মন্ত্র-সমবায়িত্ব ব্যতীত কর্ম্মের অন্যান্য লক্ষণ এই যে, ইহা কর্ত্তৃতন্ত্র, বিধিতন্ত্র এবং মানসব্যাপারপরতন্ত্র সাধনসাপেক্ষ। যজমানরূপ কর্ত্তার প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের উত্তরসাধকরূপে কর্ম্ম চরিত হয়, এই হেতু কর্ম্মমাত্রেই কর্ত্তৃতন্ত্রসাধন। বেদ-স্মৃতি-আগম-পুরাণ বিহিত ক্রিয়াবিধি অনুসারে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এজন্য কর্ম্ম সমস্ত বিধিতন্ত্র। মনোবুদ্ধ্যাদির যোজনারূপ কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ বশতঃ, অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম সকলকে, মানসব্যাপারপরতন্ত্র এবং সাধনসাপেক্ষ কহা যায়। এই সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও জ্ঞান প্রবাহিত হয়, তৎসমুদয়ই প্রায় কর্ত্রাত্মক অর্থাৎ কর্ত্তৃ-ভোক্তৃলক্ষণ অভিমানাত্মক। তন্মধ্যে যাহা সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্পণন্যায়ে আচরিত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠকল্প। তাহার লক্ষণ পশ্চাতে বলিব।

৬। ক্রিয়া সমস্ত যেমন মন্ত্রময়, এবং অনুষ্ঠানসাপেক্ষ, সেইরূপ শুভদিন, শুভলগ্ন, অথবা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কাল সাপেক্ষ। গ্রহনক্ষত্রাদির শুভাশুভ প্রভাব নির্ণয়দ্বারা নৈমিত্তিকাদি কতিপয় কর্ম্মানুষ্ঠানের লগ্ন স্থির হয়। দুর্গোৎসবাদি যজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধকর্ম্ম স্ব স্ব কালে আচরিত হয়। যেমন কালের অপেক্ষা আছে, সেইরূপ দিক্ ও দেশেরও অপেক্ষা আছে। ক্রিয়াবিশেষ উত্তর, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ আস্যাদিক্রমে আচরিত হয়; বিপরীতক্রমে হয় না। এই ভারত কর্ম্মভূমিই কর্ম্মানুষ্ঠানের দেশ। ম্লেচ্ছরাজ্যে সমস্ত উপায় সংগ্রহ করিতে পারিলেও, বৈধক্রিয়া আচরিত হইতে পারে না।

৭। কর্ম্মের আর একটী লক্ষণ মন্ত্রাধিপতিদেবতাতে বিশ্বাস। কর্ম্ম সমস্ত যেমন মন্ত্রময়, তেমনি মন্ত্রাধিপতি দেবতাময়। সমস্ত যজ্ঞীয় দেবতাই মূর্ত্তিমান। যে দেবতার যে মন্ত্র, যজ্ঞকালে তদুচ্চারণমাত্রে, সেই মন্ত্র-প্রভাবে যজ্ঞস্থলে সেই দেবতার মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। সে সমস্ত মূর্ত্তি ইন্দ্রিয়গোচর নহে, মন্ত্রের প্রভাব মাত্র। প্রত্যেক দেবতার মন্ত্ররূপী ধ্যান আছে। সেই সব ধ্যানানুযায়ী তাঁহাদের প্রতিমা নির্ম্মাণ হয়। অতএব প্রয়োজনানুসারে প্রতিমা অথবা পটেতে মূর্ত্তিচিত্রিত করিয়া তদবলম্বনে দেবতাগণের প্রতি উদ্দিষ্ট যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মন্ত্রশক্তি ও দেবতাতে বিশ্বাস ব্যতীত ক্রিয়া অবিদ্যা মাত্র এবং তাদৃশ ক্রিয়াদ্বারা শুভগতি হয়।

(৪) মূর্ত্তি।

৮। বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রনিষ্পন্ন দেবতার রূপ, গুণ, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য জড় নহে। যে পরব্রহ্ম, মন্ত্র ও শব্দব্রহ্মরূপে বেদাগমে ব্যাপ্ত আছেন, তিনিই স্বয়ং মন্ত্রনিষ্পন্ন দেবতারূপী। সুতরাং যজ্ঞীয় দেবগণ তাঁহারই যজ্ঞ-মূর্ত্তি এবং প্রত্যেক দেবতাই মন্ত্র ও যজ্ঞাধিপতি কর্ম্মফলদাতা চৈতন্যময় ঈশ্বর। এই বিশ্বাস প্রত্যেক সরলহৃদয় পুরুষের অন্তরে জাগ্রৎ আছে। নর-নারীগণ মূর্ত্তিময়। তাঁহাদের স্থূলকলেবর সর্ব্বেন্দ্রিয়গোচর বাহ্যমূর্ত্তি। তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীর কেবল বুদ্ধি ও অনুমানগোচর আভ্যন্তরিক মূর্ত্তি। প্রকৃতি সেই উভয়প্রকার দেহের অনাদিবীজ। সেজন্য তাহাই তাঁহাদের 'কারণ-দেহ' নামে উক্ত হয়। তাহাও কেবল শাস্ত্রীয় বুদ্ধি ও অনুমানের গোচর মাত্র, কিন্তু বাহ্যেন্দ্রিয়ের অবিষয়। এই ত্রিবিধ মূর্ত্তিধারী নর-নারীর কাম্যফল সকলও মূর্ত্তিমান। রাজ্য, ধন, পুত্র-কন্যা, দাসদাসী, মর্ত্ত্যলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বসতি ও ভোগস্থান, সমস্তই নানা বিধ মূর্ত্তিতে দেদীপ্যমান। যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান, তিনি নিগু'ণ ব্রহ্মস্বরূপে অমূর্ত্ত এবং সৃষ্টির বিকারে নির্লিপ্ত হইলেও, সগুণ ঈশ্বর স্বরূপে—মূল স্বরূপতঃ অমূর্ত্ত এই সকল কর্ম্মজন্য দেহধারী নরনারীর ভোগার্থ, ঐ সকল মূর্ত্তিমান কাম্যফল বিধান করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রের মর্ম্ম অনুধ্যান করিলে, জীবের সহ তাঁহার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দুই প্রকার সম্বন্ধই অনুভূত হয়। জীবকে যথাযোগ্য পুরুষার্থ-পরিবেষণই তাহার উদ্দেশ্য।

(১) মোক্ষাবস্থায় যখন জীবের আত্মা সর্ব্বপ্রকার দেহ, ফলাকাঙ্ক্ষা, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবিরহিত হন, তখন তাঁহার কোন মূর্ত্তি ও মূর্ত্ত পদার্থের ধ্যান থাকেনা। সে অবস্থায় অমূর্ত্ত পরমাত্মাই তাঁহার মোক্ষফল স্বরূপ। তখন প্রাপ্তা প্রাপ্তব্য, গন্তাগন্তব্য সমস্তই মূর্ত্তিহীন; এই যোজ্যযোজিত সম্বন্ধ যেমন শাস্ত্রসিদ্ধ, সেইরূপ সুসঙ্গত।

(২) কিন্তু সংসারাধিকারে মূর্ত্তিই কেবল জীবাত্মার জ্ঞান, ধ্যান ও কামনা। সে অবস্থায় পরমাত্মার সহিত তাহার মূর্ত্তসম্বন্ধ। ইহা শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ। শব্দব্রহ্মরূপী বেদ মূর্ত্তিমান। তাহার ক্রিয়াসাধক মন্ত্র সকল শ্রূয়মান, উচ্চার্য্যমান, মূর্ত্তদেবতাধর্ম্মী, মূর্ত্তফলধর্ম্মী ইত্যাদি আকারবিশিষ্ট। তৎসমস্ত কর্ম্মকর্ত্তার স্বাভাবিক সমূর্ত্ত প্রার্থনার স্থল গ্রহণপূর্ব্বক ফল প্রদান করে। পরমাত্মা যজ্ঞেশ্বর মূর্ত্তিতে এই সমস্ত ক্রিয়া সমবায়ী অঙ্গে অঙ্গীপুরুষ।

(৫) যজ্ঞীয়দেবতা।

১০। মন্ত্রের সহজাত দেবতাই যজ্ঞীয় দেবতা। যথা গণেশাদি পঞ্চদেবতা, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন দুর্গাদি শক্তিমূর্ত্তি, এবং বিষ্ণুর এবং শিবের অবতারগণ। ইঁহাদিগের অর্চনারূপ যজ্ঞে ইঁহারা সকলেই মন্ত্রজাত। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, গণেশ, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা এবং সূর্য্য-পঞ্চদেবতা" শব্দের বাচ্য। ইঁহারা সকলেই যজ্ঞীয় দেবতা। ফলাধিকারে ইঁহারা সকলেই কর্ম্মের যোগে ফলদাতা। কিন্তু মূলত ইঁহারা একমাত্র ব্রহ্মেরই স্বরূপ। এবং ব্রহ্মই যজ্ঞেশ্বররূপে বিষ্ণুমূর্ত্তি।

তথাচ মন্ত্রবর্ণে। "ইন্দ্রংমিত্রং বরুণমগ্নি-
মাহু রথোদিব্যঃসসুপর্ণোগরুত্মান্।
একংসদ্বিপ্রাবহুধা বদন্তি অগ্নিং যমংমাত-
রিশ্বান মাহুঃ॥

মন্ত্রবর্ণে কহেন, সদ্বিপ্রেরা একই দেবতাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, যম, বায়ু, এইরূপ বহু প্রকার নামে বলেন।

"বাজসনে য়িনশ্চামনন্তি।
তদ্যদিদমাহুরমুংযজামুং যজেত্যেকেকং দেবং এতস্যৈবসাবি সৃষ্টিরেষউহ্যেবসর্ব্বেদেবাইতি॥"

বাজসনেয়ীরা বলেন, "ইঁহাকে পূজা কর, ইঁহাকে পূজা কর" এইরূপ যদি এক এক দেবতার উল্লেখ হয়, তাহা সেই একই দেবতার পূজা, সেই একই (ব্রহ্ম) সকল দেবতা। (সায়নাচার্য্য) তথাচ মানবে ১২। ১২৩। "এতামেকে বদন্ত্যগ্নিং" ইত্যাদি বচনে কুল্লুকভট্ট লেখেন "মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বরূপেচ ব্রহ্মণি সর্ব্বা এব উপাসনাঃ শ্রুতিসিদ্ধাভবতি।" মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বরূপে এক ব্রহ্মেরই এই সমস্ত উপাসনা। এসমস্তই শ্রুতিসিদ্ধ (বেদবিহিত)।

স্মরণে রাখিতে হইবে যে, এই দেবতত্ত্ব কেবল যজ্ঞ-উপাসনাদি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ও ফলাধিকার উপলক্ষে কথিত হইয়াছে। নচেৎ মন্ত্রসমবায়ী উপাস্যলক্ষণব্যতীত, মন্ত্রাধিপত্য ব্যতীত, যজ্ঞীয় ফলদান ব্যতীত, দেবতাদের যদি স্বতন্ত্রসত্তা বা ভিন্ন লক্ষণ থাকে, তবে তাদৃশ দেবতত্ত্ব কর্ম্মাধিকারের বহির্ভূত। তাহার দৃষ্টান্ত এই। ইন্দ্র এক জন যজ্ঞীয় দেবতা। যজ্ঞস্থলে সংকল্পপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা ইন্দ্রদেবতার আমন্ত্রণ করিলে যজ্ঞেতে তাঁহার আবির্ভাব হইবে। ইহাই নিত্যবিধি। কিন্তু যে দেবতা ইন্দ্র নামক দেবরাজ ও স্বর্গরাজ্যের অধিপতি, তিনি একমাত্র নিত্য দেবতা নহেন। প্রত্যেক মন্বন্তরে এক এক জন্ম দেবতা পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। এই বর্ত্তমান শ্বেতবরাহকল্পে ১০০০ চতুর্যুগ আছে। এই কল্পকালটী চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে বিভক্ত। তন্মধ্যে ছয়টী গত হইয়া এইক্ষণ সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে মন্বন্তরে যিনি যিনি ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদান করিতেছি। যথা ভাগবতে—

সংখ্যা	নাম মন্বন্তর	নাম ইন্দ্রদেবতা।
১	স্বায়ম্ভুব	যজ্ঞ
২	স্বরোচিষ	রোচন
৩	উত্তম	সত্যজিত
৪	তামস	ত্রিশিখ
৫	রৈবত	বিভু
৬	চাক্ষুষ	মন্ত্রদ্রুম
৭	বৈবস্বত শ্রাদ্ধদেব বিবস্বান সূর্য্যের পুত্র	পুরন্দর

এই সকল ইন্দ্রেরা স্ব স্ব অধিকারের অন্তে অপরাপর দেবত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; যথা প্রথম মন্বন্তরীয় "যজ্ঞ" নামক ইন্দ্র দেবতা পরজন্মে আকুতির গর্ভে রুচিপ্রজাপতির ঔরসে ধর্ম্মোপদেশ দানার্থ "যজ্ঞরূপী বিষ্ণু দেবতা" হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

১১। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, ইন্দ্র-দেবরাজ একজন নহেন। সে জন্য ইন্দ্রত্ব কোন ব্যক্তিধর্ম্মী পদার্থ নহে। উহা একটী দেবত্বপদধর্ম্মী। মন্বন্তর বলেতে

এই সাতটীর নাম এবং তাহার প্রত্যেক

সেই সুসূক্ষ্ম মহেন্দ্র দেবের আমন্ত্রণ, অধিবাস, বরণ এবং অর্চনা হয়। তিনি নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, উন্নতিবিহীন, অপরিণামী এবং জন্মজন্মান্তরশূন্য। মানবের মানসগগনোত্থিত কামনা যখন বেদবিহিতমন্ত্র পবিত্র সূক্ত ও সামগানাদি দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্ত লাভ করে, তখন তাহা সুসিদ্ধ হয়। শুদ্ধ কামনা সফল হয় এমত নহে, কিন্তু সেই অর্চ্চনা, উক্ত মন্ত্রশক্তিতে প্রাদুর্ভূত পদনীয় যজ্ঞীয় ইন্দ্র মহারাজকে তৃপ্ত করে, এবং সেই যজ্ঞীয় তৃপ্তির অংশ সকল, সেই দেবতার অংশ স্থানীয় ব্যক্তিধর্ম্মী ইন্দ্রগণের তৃপ্তি সাধন করে। সেই তর্পণপ্রভাব চতুর্দ্দিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বৃষ্টির শক্তিকে, বিদ্যুতের বলকে, শস্যের পুষ্টিকে, গোধনের শ্রীকে, চন্দ্রের কান্তিকে এবং যজমানের হস্তের গ্রহণশক্তি, পদের গতিশক্তি ও গন্তব্য ইন্দ্র-চন্দ্রাদি স্বর্গলোককে তেজঃসম্পন্ন করে। কেননা তৎসমস্তই ইন্দ্রশক্তির অংশ।

১২। ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধীয় এই দৃষ্টান্ত তৎশ্রেণীর অন্যান্য দেবতাতেও সংলগ্ন হইবে। এই সকল দেবতারা যে জন্মান্তর বা মন্বন্তরাদি যোগে পদোন্নতি বা জগদীশ্বরের জগদ্ধর্ম্ম-পরিপালনের ভারান্তর প্রাপ্ত হন, সাধন প্রভাবই তাহার হেতু। ফলতঃ শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের যেমন সাধনাধিকার আছে, সেইরূপ সাধন-নিরপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের এবং মুক্তির অধিকারও আছে।

তলবকারোপনিষদে আছে—

"তস্মাদ্বাএতে দেবাঅতি 'তরামিবাণ্যান্ দেবান্ যদগ্নির্ব্বায়ুরিন্দ্রঃ। তেহ্যেনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শুঃ তেহ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মতি॥"

অগ্নিবায়ু এবং ইন্দ্র, ইঁহারা ব্রহ্মের নিকটস্থ হইয়াছিলেন, এবং পরস্পরায় ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন সেই নিমিত্তে তাঁহারা অন্য দেবতা অপেক্ষা প্রধান হয়েন।

"তস্মাদ্বাইন্দ্রেতিত বামিবাণ্যান্ দেবান্ সহ্যেনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ সহ্যেনৎ প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।"

ইন্দ্র ব্রহ্মের অধিকতর নিকটস্থ হইয়াছিলেন এবং তিনি অগ্রে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন, সে নিমিত্তে তিনি অগ্নি ও বায়ু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এই দুইটী বেদবাক্য হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে যে, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণাদি দেবগণের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে।

১৩। শারীরক সূত্রে (১।৩।২৬—৩৩ সূত্রে) দেবতাধিকরণে উক্ত অধিকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার আছে। তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদান করিতেছি।

"তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।" ২৬।

মনুষ্য এবং দেবতা উভয়েরই উপরি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে, ইহা বাদরায়ণ কহিয়াছেন। যেহেতু বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে, সেইরূপ দেবতাতেও আছে।

"বিরোধঃ কর্ম্মণীতিচেন্নানেক প্রতিপত্তেদর্শনাৎ।"

দেবতারা স্বর্গভোগী হইলেও মর্ত্ত্যের কর্ম্মব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলন করিতে পারেন। এককালে উভয় ধর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে পরস্পর বিরোধী বা প্রতিবন্ধক নহে।

যেহেতু তাঁহারা এককালে অনেক রূপধারণ করিতে পারেন। তাহাতে একরূপ ধরিয়া স্বর্গের কর্ম্ম এবং রূপান্তরে মর্ত্তের কর্ম্ম করিতে পারেন।

"শব্দইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানমা-ভ্যাম্।"

বেদমন্ত্রেতে উক্ত যে সমস্ত ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণাদি দেবতা, তাঁহারা উঁহারা নহেন। কেননা, তাঁহারা কেবল ইন্দ্রত্ব, বায়ুত্ব, অগ্নিত্ব, বরুণত্ব আদি জাতি মাত্র। তৎসমস্ত দেবত্বের সহিত বেদের মন্ত্রাত্মক সম্বন্ধ। তাঁহারাই যজ্ঞীয় দেবতা। কিন্তু স্বর্গও মোক্ষের অধিকারী যে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহারা ব্যক্তিধর্ম্মী এবং ঔপাধিকতায় অনিত্য। নিত্যস্বরূপ বেদমন্ত্রের সহিত অনিত্য ও ব্যক্তিধর্ম্মী দেবতাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, বেদমন্ত্রেতে অনিত্য-সংযোগদোষ সংঘটিত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, বেদমন্ত্রের সহিত কেবল মন্ত্রাত্মক যজ্ঞীয় দেবগণেরই জাতিপুরঃসর সম্বন্ধ। যেহেতু বেদমন্ত্র এবং ইন্দ্রত্বাদি জাতি উভয়ই নিত্য। এই কথা বেদ এবং স্মৃতি উভয়-সম্মত।

স্থূলকথা এই যে, যে সকল দেবতার সাধনাধিকার, পদোন্নতি, জন্মান্তর-পরিগ্রহ, স্বর্গভোগ, ঐশ্বর্য্যভোগ এবং অন্তে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার ও মোক্ষ আছে, তাঁহারা মন্ত্রাত্মক যজ্ঞীয় দেবতা নহেন। তবে যজ্ঞীয় দেবতাদের নামের সহ তাঁহাদের অনেকের যে নামের ঐক্য আছে, তাহা সাধনার ফল মাত্র। যেমন বসুর উপাসক বসু হন এবং সূর্য্যোপাসক সূর্য্য হন। কিন্তু তাহা বলিয়া সে উপাসকদিগের পূজা উদ্দেশ্য নহে। কেবল যজ্ঞীয় মন্ত্রাত্মক বসু ও সূর্য্যের অর্চ্চনাই উদ্দেশ্য।

১৪। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই সকল মন্ত্রময় দেবতা যজমানের ফলকামনার নানাত্ব হেতু এবং পৃথক্ জ্ঞান নিমিত্ত সংখ্যাতে বহু হইলেও, কর্ম্মাধিকারে তাঁহারা একই পরমদেবতার নানামূর্ত্তি। সেই একই ভগবান সর্ব্বযজ্ঞে মন্ত্র, অর্থবাদ ও দেবতারূপে বহু প্রকারে আবির্ভূত এবং যজ্ঞেশ্বর রূপে অধিপতি হয়েন। অতএব কর্ম্মকাণ্ডের সকল বিভাগে সেই একই ব্রহ্ম পূজনীয় রূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং সমস্ত নরনারী ও দেবতারা ভোগ ও মোক্ষাধিকারে নানা উপচারে তাঁহারই পূজা করিতেছেন।

(৬) তান্ত্রিক মন্ত্র।

১৫। উপরিভাগে আমি কেবল বেদ-মন্ত্রের নিত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি; কিন্তু উদ্দেশ্য যজ্ঞীয় মন্ত্র সমস্তই। যজ্ঞ ও উপাসনা ক্রিয়াতে যে সকল তান্ত্রিক মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তৎসমস্তও সমভাবে নিত্য এবং সে সকল মন্ত্রেতে, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা ও দশমহাবিদ্যা দেব-দেবীগণ, তাঁহারা সমস্তই জাতিপুরঃসরে নিত্য। তাঁহাদের প্রীতিকামনায় অথবা ফলকামনায় তাঁহাদের উদ্দেশে, যে সকল যজ্ঞ, উৎসব বা অর্চ্চনাদির অনুষ্ঠান হয়, তাহা ঐ সকল মন্ত্রমূর্ত্তিরই পূজা। তাঁহাদের অবতীর্ণ আবির্ভাবের, তদনুরূপ বা তদ্বিলক্ষণ, যেরূপ আকৃতি ছিল, তাহার অর্চ্চনা বা প্রতিম

হয় না। তাহা এখন কেহ জানেও না। প্রত্যেক মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দেব-দেবীগণের সবাহন, সশস্ত্র, সাভরণভূষণ এবং বৈরাটিক প্রভাবযুক্ত রূপের যে ধ্যান আছে, তদনুসারে তাঁহাদের প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়া থাকে; এবং সেই মন্ত্র-নিষ্পন্ন প্রতিমাতে যথাবিধানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবির্ভাব আবাহন পূর্ব্বক তাদাত্ম্যজ্ঞানে উদ্দিষ্ট মন্ত্র-মূর্ত্তির অর্চ্চনা হয়। তান্ত্রিক মন্ত্র সকল কল্পিত বা অমূলক নহে। সে সমস্তই বেদমূলক। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বচনের টীকায় কুল্লূকভট্ট নিম্নস্থ হারীত-বচন উদ্ধার করিয়াছেন। তাহাতে তান্ত্রিক মন্ত্রের বেদমূলকত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

"অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ শ্রুতি প্রমাণকোধর্ম্মঃ শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।"

অর্থা অতঃপর আমরা ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব। ধর্ম্ম শ্রুতি-প্রমাণক। সেই শ্রুতি দ্বিবিধা। বৈদিকী এবং তান্ত্রিকী। এথানে "ধর্ম্ম" শব্দের অর্থ যজ্ঞার্চ্চনাদি কর্ম্মকাণ্ড। "বেদপ্রমাণকঃ শ্রেয়ঃ সাধনং ধর্ম্মইত্যতঃ।"

বেদবিহিত শ্রেয়ঃ সাধনের নাম ধর্ম্ম। ভবিষ্যপুরাণে "ধর্ম্ম" শব্দার্থ—

"ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয় লক্ষণং।
স তু পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ বেদমূলঃ সনাতনঃ।
অস্য সম্যগনুষ্ঠানাৎ স্বর্গোমোক্ষশ্চ জায়তে।
ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্যমতুলঞ্চ খগাধিপ।"

শ্রেয়ঃ অভিপ্রেত, অভ্যুদয়-লক্ষণ কর্ম্মানুষ্ঠান "কর্ম্ম" শব্দের বাচ্য। তাহা বেদমূলক ও সনাতন। তাহার সম্যগনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গ ও মোক্ষ হয়। ইহলোকেও অতুল সুখৈশ্বর্য্য লাভ হয়।

"বেদপ্রমাণকং শ্রেয়ঃ সাধনং জ্যোতিষ্টোমাদি ধর্ম্মইতি।"

বেদবিহিত শ্রেয়ঃ সাধন কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদি ধর্ম্মরূপ। অতএব ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড। তাহা শ্রুতিপ্রমাণক। "শ্রুতিস্তু বেদোবিজ্ঞেয়ো" (মনু ২।১০)

শ্রুতিকেই বেদ বলিয়া জানিবে। এস্থানে শ্রুতি শব্দে কর্ম্মনির্ব্বাহক বেদমন্ত্র। সেই মন্ত্র দ্বিবিধ। বৈদিক ও তান্ত্রিক। দেবতা ও অনুষ্ঠানভেদে তন্মধ্যে একপ্রকারের বা দ্বিতীয় প্রকারের বা উভয়ের প্রয়োগ হয়। এ ব্যবহার সনাতন। উভয়প্রকার মন্ত্রের প্রভাব যথাধিকারে অব্যর্থ।

অনেকে তান্ত্রিক মন্ত্রকে আধুনিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা বেদমূলক এবং বৈদিক মূল হইতে সদাশিব কর্ত্তৃক আকর্ষিত; সুতরাং আধুনিক হইতে পারেনা। বিশেষতঃ কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রদীক্ষা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তদ্ভিন্ন অনেক দেবদেবীর অর্চ্চনা কালেতে তন্ত্রমতেই অনুষ্ঠিত হয়। কেবল যুগধর্ম্ম পরিপালন জন্য এ সমস্ত তন্ত্র মন্ত্র ও অনুষ্ঠান, বৈদিক ক্রিয়ার প্রকার-ভেদমাত্র। সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে পরব্রহ্মই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব রূপে আপনার রূপ কল্পনা করেন—এবং আপনার মহাশক্তিস্বরূপিণী মহামায়াদেবীকে প্রকট করেন। তিনি নানা মূর্ত্তিতে উক্ত দেবত্রয়ের সহযোগিনী হইয়া, জগতের সৃষ্টি, পালন, ও সংহরণ করেন। এতদ্ব্যতীত যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন যুগে যুগে সেই পরব্রহ্ম রাম-কৃষ্ণাদি ও মহাবিদ্যাদিরূপে

মায়া-নির্ম্মিত কলেবর ধারণপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্থাপন, সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং দুষ্টদিগের বিনাশ করিয়া থাকেন। যদিও জগতের মঙ্গলার্থে তাঁহার এই সকল মূর্ত্তির নৈমিত্তিক ও প্রবাহরূপে নিত্য আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, কিন্তু তাঁহাদের মন্ত্রময় মূর্ত্তি সকল অপরিবর্ত্তনীয় ও সত্তাধিকারে ধ্রুব নিত্য। সুতরাং বেদ ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্র-মূর্ত্তি সকল এবং মন্ত্র-সমবায়ী ক্রিয়াকলাপ একই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে ভারতধর্ম্মের মেরুদণ্ড স্বরূপ হইয়া আছে। ভারতীয় অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মকর্ম্মের এই সমস্ত মন্ত্রলক্ষণ, দেবতত্ত্ব, প্রতিমাতত্ত্ব এবং যজ্ঞেশ্বরতত্ত্ব সদাচিন্তনীয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

পুরুষ বা আত্মা।

(সংজ্ঞা)

১। আত্মা শব্দের দ্বারা সাধারণতঃ শরীরাদি আমাদের সমস্তই বুঝায়। কিন্তু মোক্ষশাস্ত্রের পরিভাষায় কেবল বিশুদ্ধ বা স্বরূপ আত্মভাব বুঝায়; পুরুষ শব্দও ঐ প্রকার অর্থযুক্ত।

২। অহং শব্দ শুদ্ধ ও মিশ্র উভয় প্রকার আত্মভাববাচী। অর্থাৎ উহা শুদ্ধ আত্মভাববাচীও হয়, মিশ্র আত্মভাববাচীও হয়।

শঙ্কা—অহং শব্দ ত শরীরাদি মিশ্র আত্মভাববাচীরূপে ব্যবহার হইতে অনুভূত হয়, অতএব উহা কেবল মিশ্র আত্মভাববাচী। উহাকে শুদ্ধাত্মভাববাচী কিরূপে বলা যায়? উত্তর—অহং শব্দ নিম্নলিখিত অর্থে বা ভাবে ব্যবহৃত হয়।

(১) শরীরাদি বাহ্য পদার্থের আভিমানিক ভাবে; যথা—'আমি ধনী' 'আমি দরিদ্র' ইত্যাদি।

(২) শরীরাভিমান-ভাবে। যথা—'আমি কৃশ', 'আমি গৌর' ইত্যাদি শারীর অবস্থার অভিমানমূলক ভাবে।

শরীর বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়সমষ্টি। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের যন্ত্র লইয়া শরীর (চিন্তাযন্ত্রও শরীরের ক্ষুদ্র একাংশ); সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে "আমি হস্তপদ-চক্ষুরাদি সত্তাবান্" এইরূপ অভিমান ভাবই শরীরাভিমান ভাবে অহং শব্দের প্রয়োগ-স্থল।

(৩) মানসাভিমান ভাবে যথা—'আমি বুদ্ধিমান', 'আমি চিন্তাকারী' ইত্যাদি।

শঙ্কা হইতে পারে—ইহা শুদ্ধ মানস অভিমান নহে; এস্থলে শরীরাভিমান ভাবকেও অন্তর্গত করিয়া 'আমি' বলা হয়। সত্য বটে, এতাদৃশ ক্ষেত্রে কখন২ শরীরাভিমানকে অন্তর্গত করা হয়, কিন্তু অনেক স্থলে শরীর তাহার অন্তর্গত না হইতেও পারে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় আমিত্ব ভাব। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ থাকিলেও 'চক্ষুরাদিসত্তাবান্ আমি' এরূপ প্রত্যয় হয়। তাহা 'চক্ষুরাদিসত্তাবান্' ভাবের সংস্কার হইতে হয়। সংস্কার মনে থাকে; সুতরাং তখন মানসাভিমান ভাবেই 'আমি' শব্দ প্রযুক্ত হয়।

(৪) মনঃশূন্যভাবে; অর্থাৎ চিন্তাদি-ব্যক্ত মানসক্রিয়াশূন্য ভাবে। যথা—'আমি সুখে সুষুপ্ত ছিলাম'। সুষুপ্তি স্বপ্নহীন নিদ্রা।

শঙ্কা—স্বপ্নহীন নিদ্রা হয় কিনা, তাহা আমার অনুভূত নহে।

উঃ—স্বপ্নহীন নিদ্রা অনুভব করা দুর্ঘট নহে। প্রগাঢ় নিদ্রার মধ্যভাগে কোন ব্যক্তিকে জাগাইলে, সে স্মরণ করিয়া বলিবে, 'আমি কোন স্বপ্ন দেখি নাই, অথচ নিদ্রিত ছিলাম'। মস্তিষ্কস্থ চিন্তা-যন্ত্রের সম্পূর্ণ রুদ্ধাবস্থা প্রাণবিদ্যাও (Physiology) তদনুমত।

শঙ্কা—'আমি তখন থাকি না' কিন্তু পরে কল্পনা করিয়া বলি 'আমি সুষুপ্ত ছিলাম' এরূপও হইতে পারে।

উঃ—আমরা কল্পনা করিয়া বলি না, 'আমি সুষুপ্ত ছিলাম'—কিন্তু স্মরণ করিয়া বলি। স্মরণ অনুভূত ভাবের বোধ। সুতরাং সুষুপ্তি আমার অনুভূত ভাব।

কিন্তু 'আমি থাকি না' এরূপ বলিলেও মনঃশূন্যভাবে অহং শব্দ প্রয়োগ করা হয়। কেন—তাহা আলোচিত হইতেছে।

অভাব অর্থে আমরা কেবল অবস্থাভেদ বা অবস্থানভেদ বুঝি। 'ঐ স্থানে ঘটাভাব' অর্থে ঘট অন্য স্থানে অবস্থান করিতেছে বা ঘট নামে অবয়বসমষ্টি ভাঙ্গিয়া অন্য স্থানে অন্যভাবে অবস্থান করিতেছে। "ভাবান্তরমভাবোহি কয়াচিত্ত্ব্যপেক্ষয়া" অর্থাৎ বস্তুতঃ একের অভাব অর্থে অন্যের ভাব। যাহাদের অবস্থান্তর হয়, তাহাদের সম্বন্ধেই অভাব শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। আন্তর ও বাহ্য সমস্ত পদার্থে ঐরূপ 'ভাবান্তর' অর্থেই অভাব শব্দ প্রযুক্ত হয়।

কিন্তু ক্রিয়ারূপ চিত্তবৃত্তিসম্বন্ধীয় অভাব অর্থে কালিক অবস্থান-ভেদ। 'ক্রোধকালে রাগাভাব' অর্থে রাগ অতীত বা অনাগত কালে আছে। এইরূপে আমরা চিত্তবৃত্তির অভাব বা 'না থাকা' বুঝি। নচেৎ ভাব পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব কল্পনারও যোগ্য নহে।

কিন্তু যেমন বর্ত্তমান বা জায়মান ঘটের তৎকালে ও তৎস্থানে অভাব ধারণা করিতে পারি না, সেইরূপ প্রত্যেক চিন্তায় 'আমি' থাকে বলিয়া আমির অভাবও কখনও ধারণা করিতে পারি না। অতএব 'আমি থাকিব না' অর্থে আমার চিত্তবৃত্তির 'অভাব' মাত্র কল্পনা করি। অর্থাৎ 'আমি থাকিব না' অর্থে চিত্তবৃত্তিশূন্য আমি হইব। কারণ আমার অন্তর্গত চিত্তবৃত্তি সমূহেরই 'অভাব' আমরা ধারণা করিতে পারি। সম্পূর্ণ আমির অভাব ধারণা করিতে পারি না। যখন 'আমির' সম্পূর্ণ অভাব ধারণার অযোগ্য, তখন 'আমি থাকিব না' এরূপ বাক্য যথার্থতঃ নিরর্থক। তবে মনোবৃত্তির লয় ধারণার যোগ্য, সুতরাং 'আমি থাকিব না' অর্থে মনোবৃত্তিশূন্য আমি থাকিব' এরূপ ভাবার্থই কেবল মাত্র সঙ্গত হইতে পারে।

৩। অতএব বাহ্যাভিমান, শারীরাভিমান, মানসাভিমান ও মনঃশূন্য ভাব, এই চারি ভাবে আমরা অহং শব্দ প্রয়োগ করি। এতন্মধ্যে বাহ্য দ্রব্য ও শরীরাদি হইতে ভিন্ন মানসাভিমান ভাবে যখন স্পষ্টতঃ

আমি শব্দ প্রযুক্ত হয়, তখন প্রায় সর্ব্বলোকে আমি পদার্থকে মানসতা-বিশেষবাচীরূপে ব্যবহার করে। অতএব ইহা মুখ্য আমি বা অহং শব্দের মুখ্যার্থ।

আমি কিসে নির্ম্মিত ?

৪। অহং শব্দের বাচ্য পদার্থসমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদির গোলক স্পষ্টতঃ ভৌতিক দেখা যায়। মনেরও অধিষ্ঠান মস্তিষ্ক। অতএব আমি কিসে নির্ম্মিত, এই প্রশ্ন প্রথমেই লোকায়তের উপপত্তি (theory) এবম্প্রকারে সমাধানের চেষ্টা করে। যথা—

৫। লোকায়ত বলে আমির সমস্তই ভূতনির্ম্মিত। ভূতের সংযোগবিশেষ ও ক্রিয়াবিশেষ হইতে আমির সমস্তই উৎপন্ন হয়।

প্রাচীন স্থূলপ্রজ্ঞ লোকায়ত বলিত—"যখন ভৌতিক সুরা হইতে মত্ততা নামক গুণ উৎপন্ন হয়, তখন 'আমির' সমস্তই ভৌতিক। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে "যখন ভৌতিক সুরা হইতে মানসিক মত্ততা হয়, তখন ভূতই মনোময়"। বস্তুতঃ মনের কারণ ভূত—কি ভূতের কারণ মন, তাহা লোকায়তে স্থির করিবার উপায় নাই।

অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মপ্রজ্ঞ আধুনিক লোকায়ত ওরূপ স্থূল উপমা ছাড়িয়া মস্তিষ্কের তত্ত্ব গবেষণা পূর্ব্বক সমাহার করিয়া বলেন—যখন মস্তিষ্ক ব্যতীত মনের সত্তা উপলব্ধি হয় না, তখন মন অর্থাৎ আমির প্রকৃত অংশ মস্তিষ্কের ক্রিয়া।

লোকায়তকে জিজ্ঞাস্য—মস্তিষ্ক কি ?

লোকা। Nerve, cell এবং fibre এর সমষ্টি। তাহারা কি ?

লোকা। Lecithen, proteid প্রভৃতি দ্রব্যনির্ম্মিত। Lecithen আদি কি ?

লোকা। Carbon, hydrogen, nitrogen আদিদ্রব্যের সংযোগবিশেষ। corbon আদি কি ?

লোকা। বিশেষ বিশেষ শব্দ-স্পর্শাদি গুণবিশিষ্ট দ্রব্য। শব্দাদি কি ?

লোকা। ম্যাটারের প্রচলনবিশেষ। ম্যাটার কি ?

লোকা। যাহার প্রচলনে শব্দাদি হয়। যাহার প্রচলনে শব্দাদি হয়, 'তাহা' কি ?

লোকা। (অগত্যা) তাহা অজ্ঞেয়।

অতএব লোকায়ত মতের পরিণামে মস্তিষ্কের বস্তুতঃ অজ্ঞেয় matter নামক দ্রব্য এবং তাহার ক্রিয়া মন (অর্থাৎ আমি) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। ম্যাটারের ক্রিয়া অর্থে স্থানপরিবর্ত্তন বা ইতস্ততঃ গমন। ইতস্ততঃ গমন হইতে কিরূপে ইচ্ছা, প্রেম, বোধ আদি হয়, তাহা লোকায়ত! বলিতে পার ?

লোকা। না।

কল্পনা করিতে পার ?

লোকা। আহাও পারি না।

৫। অতএব লোকায়ত মতে অজ্ঞেয় কারণ পদার্থ ও তাহার অজ্ঞেয় অকল্পনীয় প্রক্রিয়ার (process) দ্বারা মন নির্ম্মিত। সুতরাং লোকায়তের উপপত্তি বা theory "আমি কিসে নির্ম্মিত" তাহা বুঝাইতে সক্ষম নহে।

লোকায়তের প্রথম হইতেই বলা উচিত 'আমি উহা জানি না'। লোকায়ত হয়ত

বলিবে মূল কারণ অজ্ঞেয় হইলেও, আমি ম্যাটারের জ্ঞাত ভাবকেই কারণ বলিয়াছি।

ম্যাটারের জ্ঞাত ভাব শব্দাদি, কিন্তু তাহাও মনসাপেক্ষ—অর্থাৎ তাহারা মনোভাব বা মনের অঙ্গ। শুদ্ধ ম্যাটারের ক্রিয়া (ইতস্ততঃ চলন) কল্পনীয়। ইতস্ততঃ চলন ও নীলরূপ সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। অতএব ম্যাটারের জ্ঞাত ভাবকে মনের কারণ বলিলে, মনের অঙ্গবিশেষকেই মনের কারণের অন্তর্গত করা হয়।

আর যখন ক্রিয়া বা স্পন্দনবিশেষ এবং নীলজ্ঞান ইহাদের জনক-জন্য ভাবের প্রক্রিয়া বা process জান না, তখন "ম্যাটারের ক্রিয়াই মন" এরূপ বলা Jumping in to a conclusiou.

ঈদৃশ সিদ্ধান্ত নিম্নস্থ উদাহরণের ন্যায় অন্যায্য :—

একটী লোক পশ্চিমে যাইতেছে; কাশী পশ্চিমে। অতএব ঐ লোক কাশী পশ্চিমে যাইতেছে। আর লোকায়ত ঐ সিদ্ধান্তে নির্ভর করিয়া যে বলে—মস্তিষ্কের সহিত মনের উৎপত্তি, 'মস্তিষ্কের ধ্বংসে মনের ধ্বংস,' বিকারে মনের বিকৃতিঃ; তাহাও সুতরাং আস্থেয় নহে। মনের কারণই যখন বস্তুগত্যা অজ্ঞেয়, তখন তাহার উৎপত্তি ও লয়ের বিষয়ও অজ্ঞেয় বলাই যুক্ত। নাশ অর্থে কারণে লয়। কারণ না জানিলে নাশ কল্পনা করা অযুক্ত। কারণ না জানিলে নাশকে অগোচর অবস্থা বলাই যুক্ত। অর্থাৎ যে দ্রব্য হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাতে তাহার লয় হয়। দ্রব্য অজ্ঞেয় হইলে, উৎপত্তি ও লয়কে কেবল গোচর ও অগোচর 'ভাব' বলা উচিত। ধ্বংস অভাবাদি শব্দ তদ্বিষয়ে প্রয়োজ্য নহে। ফলতঃ যখন তাহা না দেখিতে পাই, তখন তাহা থাকে না, এরূপ বলা অন্যায্য।

প্রত্যুত, অজ্ঞেয় ম্যাটার হইতে মন উদ্ভূত, এরূপ বলিলে, ন্যায়ানুসারে ম্যাটার আর অজ্ঞেয় থাকে না।

যেহেতু; সর্ব্বত্রই কারণ কার্য্যের সধর্ম্মক; মন বোধ-ইচ্ছাদিরূপঃ অতএব তাহার কারণও বোধজাতীয়। ম্যাটার মনের কারণ হইলে, ম্যাটারও বোধজাতীয় বলিতে হইবে। এরূপ সিদ্ধান্ত ন্যায্য হয়।

৬। লোকায়ত অপেক্ষা ধর্ম্মবাদীর (phenomenalist) পক্ষ অধিকতর যুক্ত। তন্মতে, মন ও ম্যাটারের জন্য-জনকতা সম্বন্ধ যখন অপ্রমেয়, তখন উভয়কে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া স্বীকার করা ন্যায্য। আধুনিক ধর্ম্মবাদী আমিত্বকে কতকগুলি বিক্রিয়মান ধর্ম্মস্বরূপ স্বীকার করেন। আমিত্বকে মস্তিষ্কের সহভাবী ও সহবিলয়ী বলা যায় কিনা, তাহা বক্তব্য নহে। উহা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, এরূপ চিন্তাই তাঁহাদের দৃষ্টি অনুসারে ন্যায্য হইবে।

প্রকৃত ধর্ম্মবাদে ম্যাটার‡ শব্দ বস্তুতঃ কতকগুলি জ্ঞাত ধর্ম্মবাচী; আর আমিত্ব

---

‡ বস্তুত ম্যাটার শব্দ জ্যামিতির বিন্দুর ন্যায় কাল্পনিক পদার্থ। উহার বাস্তব লক্ষণ নাই। অস্মদ্দর্শনের জড় পদার্থ ও ম্যাটার পৃথক্ পদার্থ। জড়

নামক ধর্ম্মসমূহের মূলে কি আছে—তাহারা কাহার ধর্ম্ম, সে বিষয় অজ্ঞেয়।

বস্তুতঃ 'মূল অজ্ঞেয়' এরূপ বলিলে, তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় হয় না। তাহার অর্থ "জ্ঞায়মান ধর্ম্মের মূল আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞেয় নহে" মূলের অস্তিত্বা ও মানস-ক্রিয়ার হেতুত্বা জ্ঞেয়, কিন্তু অপর কোন বিষয় জ্ঞেয় নহে। পরন্তু ক্রিয়া দেখিলে, তাহার শক্তিরূপ অব্যক্ত অবস্থা কল্পনা না করিলে গত্যন্তর নাই। তাহা না হইলে সম্পূর্ণ অভাব হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, এরূপ অযুক্ত চিন্তা করিতে হয়। অতএব ধর্ম্মবাদীর অজ্ঞেয় অর্থ—ধারণার অযোগ্য। তাঁহারা যে সম্পূর্ণ (ন্যায়ের ভাষায় distributed) অজ্ঞেয় বলেন, তাহা ভ্রম। আর জ্ঞায়মান মানস ধর্ম্মসমূহের মধ্যেও দুইটী ভেদ আছে; সূক্ষ্ম বিশ্লেষ করিয়া সেই ভিন্ন পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ যেরূপে নির্ণীত হয়। তাহা পরে বক্তব্য।

প্রাচীন ধর্ম্মবাদী (বৌদ্ধ) ম্যাটারের পরিবর্ত্তে 'রূপ ধর্ম্ম' এই সংজ্ঞা সুযুক্তি-সহকারে ব্যবহার করেন। তন্মতে 'আমি' কতকগুলি অধ্যাত্ম ভূতরূপ ধর্ম্ম+সংজ্ঞা ধর্ম্ম+সংস্কার ধর্ম্ম+বেদনা ধর্ম্ম+বিজ্ঞান ধর্ম্ম।

অর্থে যাহা চৈতন্য বা দ্রষ্টা নহে, কিন্তু যাহা দৃশ্য। . .

যাহার কম্পন হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি হয়, তাহা ম্যাটার, এরূপ লক্ষণে ম্যাটার ধারণার অযোগ্য পদার্থ হয়। তাহার বিশেষ জ্ঞাতব্য নহে; কিন্তু তাহাকে বিশেষিত কল্পনা করা সম্পূর্ণ অন্যায়।

তন্মতে সংজ্ঞাদি চারি অরূপ ধর্ম্মই মুখ্য আমি পদবাচ্য। ঐ ধর্ম্মসকল প্রতিক্ষণে উদীয়মান ও লীয়মান হইয়া প্রবাহ বা সন্তান ভাবে চলিতেছে।

সেই ধর্ম্মসন্তানের কোনটি অন্য কোনটির প্রত্যয় বা হেতু। যেমন অবিদ্যা হইতে তৃষ্ণা; তৃষ্ণা হইতে স্পর্শ ইত্যাদি। সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকদের সেই ধর্ম্ম সন্তানের নিরোধ অনুভূত থাকাতে এই মতে ধর্ম্মসমূহের নিরোধ বা উপশমও স্বীকৃত। ধর্ম্মের উপশম হইলে শূন্য হয়; সুতরাং ধর্ম্ম মূলতঃ শূন্য।

ধর্ম্ম সকলের সন্তান যে এক সময়ে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; কারণ ঐ ধর্ম্ম-সমূহ ব্যতীত 'আরম্ভের হেতু' নামক কোন হেতু পাওয়া যায় না। অতএব ধর্ম্মসন্তান অনাদি। তন্মতে এই ধর্ম্মসন্তানই 'আমি'।

ধর্ম্ম সকল উদীয়মান ও লীয়মান পৃথক্ সত্তা; সুতরাং 'আমি' পৃথক্২ ধর্ম্মপ্রবাহের সাধারণ নাম মাত্র হইবে।

আর "প্রদীপস্যেব নির্ব্বাণং বিমোক্ষস্তস্য

তানি নঃ।"

অর্থাৎ প্রদীপের নির্ব্বাণের ন্যায় সেই ধর্ম্মসন্তান যখন শূন্য হয়, তখন আমি বস্তুতঃ শূন্য—অর্থাৎ আত্মাই অনাত্মা।

শঙ্কা—প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা যে "আমি" এক বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা কিরূপে সম্ভব? কারণ প্রকৃত পক্ষে তোমার মতে 'আমি' বহুর সাধারণ নাম মাত্র।

বৈনাশিক ধর্ম্মবাদী তদুত্তরে বলেন" আমি" এক প্রকার ভ্রান্তিমাত্র শব্দ—ভ্রান্তি সর্ব্বত্রই এক পদার্থকে অন্যরূপে জ্ঞান। ভ্রান্তির অন্য উদাহরণ নাই। অতএব আমিত্বজ্ঞান যদি

ভ্রান্তি হয়, তবে তাহা কোন পদার্থকে কোন পদার্থ জ্ঞান হইবে? অতএব বৈনাশিকের দৃষ্টিতে অগত্যা সম্যক্ জ্ঞানে "আমি বহু" এরূপ জ্ঞান হওয়া উচিত।*

কিন্তু আমি বহু, এরূপ অনুভব অসাধ্য। তাহা কিরূপে সাধ্য, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কারণ সদাই আমি এক, এরূপ অনুভব হয়। তবে কল্পনা করিতে পার, আমি বহু, কিন্তু তাহাতে কল্পক এক থাকিবে। আর তাহা হইলে সম্যক্ জ্ঞান কল্পনা মাত্র হইবে। কিন্তু যদি বল আমি যখন বস্তুতঃ শূন্য, তখন আমিকে সত্তাভাবাই ভ্রান্তি। "আমি শূন্য" ইহাই প্রকৃত জ্ঞান।

তাহাও বলা সঙ্গত নহে; কারণ ধর্ম্ম সকলই তোমার মতে সত্তা; সেই সত্তার নামই আমি বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সুতরাং "আমি সত্তা" ইহাই সম্যক্ জ্ঞান এবং আমি শূন্য, ইহাই ভ্রান্তিজ্ঞান। অতএব যাহারা বলেন "আমি শূন্য" ইহাই সম্যক্ জ্ঞান, তাঁহাদের পক্ষ নিতান্ত অযুক্ত।

এতদ্ব্যতীত অসৎ হইতে সৎ ও সতের অসৎ হওয়ারূপ অন্যান্য চিন্তা এই বাদের সহায় বলিয়া এই বাদ ন্যায্য নহে।

৮। লোকায়ত ও ধর্ম্মবাদী ব্যতীত আত্মবাদীরাও "আমি কিসে নির্ম্মিত" এই প্রশ্নের উত্তর দেন। আত্মবাদীদের অনেক ভেদ আছে। কেবলমাত্র আপ্ত বচন ও শাস্ত্রানুসারে অনেক আত্মবাদী উহার উত্তর দেন।

তাহা ত্যাগ করিয়া যুক্ততম আত্মবাদীর (সাংখ্য) উত্তর ন্যস্ত হইতেছে।

সাংখ্য বলেন—মুখ্য বা মানস "আমিকে" বিশ্লেষ করিয়া দুই পদার্থ পাওয়া যায়—দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়।

"আমি নীল জানিতেছি" এই প্রত্যক্ষের মধ্যে আমি, জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা এবং নীল জ্ঞেয় বা দৃশ্য। দৃশ্যভাবও বিশ্লেষ করিয়া ত্রিবিধ ভাব পাওয়া যায়। প্রখ্যা বা জ্ঞান, প্রবৃত্তি বা চেষ্টা ভাব, স্থিতি বা ধৃতি ভাব।

দৃশ্য প্রধানতঃ দ্বিবিধ—সব্যবসায়িক এবং অনুব্যবসায়িক।* অর্থাৎ গ্রহণব্যাপার এবং গৃহীত বিষয় লইয়া পুনঃ আভ্যন্তরিক ব্যাপার।

প্রকাশশীল ভাবের উদাহরণ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, সুখাদির বোধ, এবং ঐরূপ জ্ঞানের পুনর্জ্ঞান (মনে২ উত্তোলন বা উহনপূর্ব্বক)।

নীল, পীত আদি জ্ঞেয় মনোভাব—অর্থাৎ জ্ঞান সকল যে আমি নহি, তাহা অনুভব বা মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রমিত হয়। এই রূপে জানা যায় যে, জ্ঞানরূপ দৃশ্য আমি নহি। ক্রিয়াশীল দৃশ্য ইচ্ছা, চেষ্টা আদি বৃত্তি। "আমি ইচ্ছা করি" আর "আমি ইচ্ছা নহি"

---

* অথবা "আমি উৎপন্ন ও লয় প্রাপ্ত হইলাম এবং আমি পূর্ব্বকথিত আমির সহিত অসম্বদ্ধ" ইহাই সম্যক্ জ্ঞান হইবে। আমার উৎপত্তি ও লয়ের দ্রষ্টা "আমি" হইতে পারি না; কারণ উৎপন্ন ও স্থিত অবস্থাই "আমি"। উৎপত্তি ও লয় অনুমেয়—অর্থাৎ অনুমানপূর্ব্বক কল্পনা করা; সুতরাং তাদৃশ কল্পনাই তাহা হইলে সম্যক্ জ্ঞান হয়।

* করণসমূহের বিষয়ের সাক্ষাৎ বোধ সব্যবসায় বা গ্রহণ (reception) এবং গৃহীত বিষয়ের সংস্কার লইয়া পুনঃ যে ব্যবসায়, তাহাই অনুব্যবসায় (reflection) চিত্তের এই দ্বিবিধ কার্য্য। চিন্তা অনুব্যবসায়ের উদাহরণ।

ইহাও স্পষ্ট অনুভূত হয়। অতএব চেষ্টারূপ দৃশ্যও আমি নহি। বস্তুতঃ ক্রিয়াশীল দৃশ্যও বোধের বিষয় বলিয়াই দৃশ্য।

ধৃতিরূপ দৃশ্য জ্ঞান ও ক্রিয়ার শক্তিরূপ§ অবস্থা। অর্থাৎ যাবতীয় করণের শক্তিস্বরূপ। ইহাতেই দৃঢ় আমিত্ব-প্রতীতি হয়।

কিন্তু যখন নীল-জ্ঞান আমি নহি, তখন নীলজ্ঞানের শক্তি অবস্থা অর্থাৎ যে শক্তিরূপ অবস্থা পরিণত হইয়া নীলজ্ঞান হয়, তাহাও আমি হইব না। ক্রিয়ার শক্তি অবস্থা সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। প্রত্যুত শক্তিসমূহকে আমার বলিয়া অনুভব হয়। যাহা 'আমার'— তাহা আমি নহি। কারণ "আমি" বাহ্য পদার্থ হইলেই তাহাতে "আমার" এইরূপ ভাব অনুভূত হয়। সুতরাং আমার শক্তি বলিয়া যে দর্শনাদি শক্তি অনুভূত হয়, তাহা আমি নহি।

এইরূপে দেখা গেল যে, জ্ঞান, চেষ্টা ও ধৃতিরূপ যাবতীয় দৃশ্য ¶ দ্রষ্টা আমি হইতে পৃথক্ পদার্থ।

§ শক্তি ক্রিয়ার পূর্ব্বাবস্থা। ক্রিয়ার যাহা উপাদান কারণ, তাহাই শক্তি। অন্তঃকরণাদি যাবতীয় করণের যে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়ার যাহা শক্তি, সেই শক্তিসমূহই ধৃতি। বা স্থিতিরূপ দৃশ্য। বস্তুতঃ এক এক জাতীয় ধৃত ভাবই এক এক করণ। পাশ্চাত্যদের মতে স্নায়ু পেশী আদি সর্ব্বক্রিয়ার শক্তি (energy) প্রত্যেক জৈব ক্রিয়াতে স্নায়ু পেশী আদির আংশিক বিশ্লব ও তৎসহভাবী শক্তির উন্মোচন হয়। সাংখ্য পক্ষে স্নায়ু পেশী আদিরা প্রাণ নামক সর্ব্বকরণগত শক্তির দ্বারা বিবৃত ভাব মাত্র। যাহা দ্বারা স্নায়ু পেশী আদি নির্ম্মিত, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, তাহা অবশ্য স্নায়ুআদির অতিরিক্ত শক্তি।

¶ বলা বাহুল্য অন্তঃকরণের সমস্তবৃত্তিই ঐ তিন জাতির অন্তর্গত। ঐ তিন জাতিতে পড়ে না, এরূপ বৃত্তি নাই। সুতরাং সমস্ত বৃত্তিই দৃশ্য।

১০। শঙ্কা হইতে পারে—'শীলাপুত্রের শরীর" এখানে ষষ্ঠীব্যপদেশ হইলেও যেমন উভয় পদার্থ এক, আমি এবং "আমার শক্তিও" সেইরূপ।

উঃ। শিলাপুত্র (নোড়া) ও তাহার শরীর বস্তুতঃ একই দ্রব্য। কিন্তু অভিন্নকে ভিন্নরূপে কল্পনা করিয়া বলিতেছ "শিলাপুত্রের শরীর"। আর সেই কাল্পনিক উদাহরণ দিয়া অনুভূত বিষয়কে খণ্ডিত করিতে যাইতেছ!!

যদি প্রমাণ করিতে পারিতে যে, শিলাপুত্রের 'আমি শিলাপুত্র' ও "আমার শরীর" এইরূপ অনুভব হয়, এবং তাহার শরীর নাশে তাহার আমিরও নাশ হয়, তবে তোমার পক্ষ যুক্ত হইত। এইরূপে দেখা যায়, ধৃতিরূপ দৃশ্যও আমি নহে। করণশক্তির সত্তা অস্ফুটরূপে সদা অনুভূত হয় বলিয়া স্থিতিশীল শক্তিসমূহও অনুভবের বিষয় বা দৃশ্য।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, মূলতঃ "আমি" যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়া এবং ধৃতি বা সংস্কার (জ্ঞান ও ক্রিয়ার আহিত ভাব) হইতে ব্যতিরিক্ত দ্রষ্টা। সুতরাং তাহাই প্রকৃত আমি পদবাচ্য পদার্থ।

শঙ্কা হইতে পারে, যখন "আমি আছি" ইহাও একপ্রকার জ্ঞেয় বিষয়, তখন "আমিও" দৃশ্য। ইহাতে জিজ্ঞাস্য—আমি কাহার দৃশ্য? উত্তর হইবে—পূর্ব্ব অহং, উত্তর অহংপ্রত্যয়ের দৃশ্য।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষণিকবাদ আশ্রয় করিয়াই এই উত্তর হইবে, কারণ তন্মতে পূর্ব্ব ও উত্তর

প্রত্যয় বিভিন্ন। উত্তর ও পূর্ব্ব "অহং"কে অভিন্ন স্বীকার করিলে এই শঙ্কা হইতে পারে না।

কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাস্য পূর্ব্বপ্রত্যয় লয় হইলে উত্তরপ্রত্যয় হয়, অতএব লীন অহং কিরূপে দৃশ্য হইবে? ফলতঃ "আমি আছি" ইহা এক অনুভবের ভাষা। যখন উহা বলি, তখন সে অনুভব থাকে না। যেমন ইচ্ছা করিয়া পরে "আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম" এরূপ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করি, উহাও সেইরূপ।

১০। বস্তুতঃ "অহং" এই শব্দময় নাম এবং তদর্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্যান্য স্থলের ন্যায় পৃথক্ শব্দ ও পৃথক্ অর্থকে একের ন্যায় বিকল্প করিয়া "আমি আছি" এরূপ কল্পনা করি। সেই চিন্তা প্রকৃত "আমি" নামক বোধ নহে বলিয়া তাহাও দৃশ্যের অন্তর্গত †

সুতরাং তাহা দৃশ্য হইলেও ক্ষতি নাই। সেই চিন্তার ফলে এইরূপ ন্যায্য নিশ্চয় হয় যে—প্রকৃত আমি পদার্থ দ্রষ্টা, অন্য সমস্ত দৃশ্য।‡ তাদৃশ চিন্তা না করা অন্যায্য চিন্তা।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সত্তা সমকালিক হওয়া চাই*। নীলজ্ঞান ও নীলবিজ্ঞতা এককালেই থাকে। 'আমি' মাত্র যদি অন্য আমির দৃশ্য হয়, তবে এককালে দুই আমি থাকা চাই। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে।

পুনঃ শঙ্কা হইতে পারে, যখন বলি—'আমি দ্রষ্টা' তখন এক দৃশ্য কেন্দ্রকেই লক্ষ্য করিয়া 'আমি' শব্দ প্রয়োগ করি। কখনও দৃশ্যাতীত পদার্থ সাক্ষাৎ করিয়া আমি শব্দ প্রয়োগ করি না। অতএব আমি প্রকৃত পক্ষে দৃশ্যের একতম কেন্দ্র।

উত্তর—সত্য বটে সাধারণ অবস্থায় আমরা একতম দৃশ্য কেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া 'অহং' শব্দ প্রয়োগ করি। কিন্তু তাহা প্রয়োগ যে অন্যায্য বা ভ্রান্তি, তাহাই পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। দৃশ্য ধরিয়াই যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়—"আমি" দৃশ্য নহে। যেমন "পরিমাণ অনন্ত" ইহা যুক্ত চিন্তা। কিন্তু অনন্তের চিন্তা। অন্ত পদার্থের দ্বারাই (ন+অন্ত) করিতে হয়, উহাও সেইরূপ। কিন্তু দৃশ্যাতীত ভাব সাক্ষাৎ করিয়াও আমি শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে। তদ্বিবয় পরে বক্তব্য।

১১। একপ্রকার বাদী আছে, তাহাদের নাম প্রতীতিবাদী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। জগতে সমস্তই প্রতীতি। শব্দ-স্পর্শাদি আন্তর ও বাহ্য সমস্ত পদার্থই আমাদের প্রতীতি। প্রতীতি মনের ধর্ম্ম; মন আমিত্বের অন্তর্গত, সুতরাং আমিই জগৎ। আমা ছাড়া আর কিছুই নাই, সবই আমার সৃষ্টি। এই বাদ প্রাচীনকাল হইতে আছে। অধুনা কেহ

† "আমি আছি", "আমি জানিতেছি" ইত্যাদি ভাব দৃশ্যের চরম মূর্ত্তি। "আমি আছি তাহা আমি জানি" ঈদৃশ প্রত্যয়ের দ্বিতীয় আমিই দ্রষ্টা।

‡ অর্থাৎ "আমি আছি তাহা আমি জানি" এরূপ চিন্তাকে বিশ্লেষ করিলে দ্রষ্টা ও দৃশ্য নামক দুই ভাব ন্যায়ানুসারে লব্ধ হয়। কিরূপে হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

* বলিতে পার—স্মর্য্য বিষয় দৃশ্য, কিন্তু তাহা স্মরণ কালে থাকে না। ইহা ঠিক নহে। স্মর্য্য বিষয় বস্তুতঃ সংস্কার বা অনুভূত বিষয়ের ছাপ। তাহা চিত্তে বর্ত্তমান থাকে।

কেহ উহা মায়াবাদের ভিত্তি করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, 'প্রতীতিসমূহের মধ্যে এক অংশ "জ্ঞেয় আমি" ও অন্য অংশ "জ্ঞাতা আমি"। উভয় আমিই এক। অতএব সোঽহং বা জীবই ব্রহ্ম।

প্রতীতিবাদের ন্যায্য অংশ সাংখ্য সম্মত বটে, কিন্তু উহার দ্বারা সোঽহং প্রমাণ করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অন্যায্য। সাংখ্যমতে করণ সকল আভিমানিক। জ্ঞান সকল করণের পরিণামবিশেষ, সুতরাং তাহারাও আভিমানিক অর্থাৎ আমিত্বের বিকারবিশেষ। কিন্তু প্রতীতি সমূহের মধ্যে এক দ্রষ্টা বা বিজ্ঞাতা এবং দৃশ্য থাকে, তাহারা ভিন্ন বলিয়াই প্রতীতি হয়। তজ্জন্য তাহারা পৃথক্। জ্ঞেয় "আমি" ও জ্ঞাতা "আমি" কেন যে এক, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এক "আমি" নামের সাদৃশ্য ধরিয়া উভয়কে এক বলা সম্পূর্ণ অন্যায্য। আমও টক, আমড়াও টক, তাই আম—আমড়া—এই হেত্বাভাসের ন্যায় উহা অযুক্ত। ভিন্নরূপে অনুভূয়মান দ্রষ্টা ও দৃশ্য কেন এক—আর এক হইলেও তাহাদের ছিন্নবৎ প্রতীতির কারণ কি? তাহা না দেখানতে উক্ত বাদ সারশূন্য।

১২। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ সাংখ্যগণ অন্যান্য যুক্তির দ্বারাও প্রমাণিত করেন। সেই যুক্তিগুলি কারিকায় সংগৃহীত হইয়াছে। যথা :—

সংহত পদার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।

অর্থাৎ সংহতের পরার্থত্বহেতু ত্রৈগুণ্যাদি দৃশ্য ধর্ম্মের সহিত বিসদৃশতা হেতু, অধিষ্ঠান হেতু, ভোক্তৃত্ব হেতু ও কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি হেতু স্বতন্ত্র পুরুষ আছেন।

এই যুক্তিগুলি পরস্পর সংযুক্ত। একটির দ্বারা অন্যগুলিও সূচিত হয়। তন্মধ্যে প্রথম যুক্তি "সংহত পদার্থত্বাৎ"। অর্থাৎ যাহারা সংহত, তাহারা পদার্থ। সাঙ্গ অন্তঃকরণ সংহত; সুতরাং তাহা পদার্থ।

সেই পর, যদর্থে অন্তঃকরণাদি সকল সংহত, তিনিই পুরুষ। ইহা বিশদ করিয়া দেখান যাইতেছে।

সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায় যে, কতকগুলি পরার্থ যদি মিলিত হয়, তবে তাহারা কোন উপরিস্থিত বা অতিরিক্ত প্রযোজক শক্তির দ্বারা মিলিত হয়, আর সেই মিলনের ফল সেই প্রযোজকের প্রয়োজন (প্র + যোজন) সিদ্ধি।

প্রয়োজন দ্বিবিধ হইতে পারে, এক চেতন সম্বন্ধীয় ও অন্য অচেতন সম্বন্ধীয়। সঙ্কল্প পূর্ব্বক প্রয়োজন প্রথম; চৌম্বক শক্তি আদির প্রয়োজন দ্বিতীয়। কিন্তু উভয়েরই এক উপরিস্থিত শক্তির দ্বারা সংহনন অথবা বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

বাসের সংকল্প পূর্ব্বক হস্তাদি শক্তির দ্বারা ইষ্টক কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ হয়। ইষ্টকাদি উপরিস্থিত এক শক্তির দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া মিলিত হয়, সেই মিলনের ফল (গৃহবাস) ইষ্টকাদিরা পায় না, তাহা সেই প্রয়োজক শক্তির প্রয়োজনসিদ্ধি অর্থাৎ সংকল্পসিদ্ধি।

দুই চুম্বক নিকটবর্ত্তী হইলে মিলিত হয়। ব্যাপী এক চৌম্বক শক্তি আছে, যদ্দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া দুই চুম্বকখণ্ড মিলিত হয়। সেই মিলনের ফল উভয়বিধ চৌম্বক শক্তির (positive and negetive) মিলন জাত সাম্যরূপ প্রয়োজনসিদ্ধি।

মনুষ্যেরা মিলিত হইয়া ভারবহন করিলে, সেই ভারই বাহিত হয়, মনুষ্যেরা বাহিত হয় না। সে স্থলে ভারের বহন অর্থে মনুষ্যেরা সংহননকারী। সেইরূপ যৌথ কারবার করিলে লাভ নামক বস্তুর মিলন জনিত ফল মহাজনেরা পায়, প্রযোজিত কর্ম্মচারীরা পায় না।

এইরূপে দেখা যায় যে, কতকগুলি পদার্থ যদি মিলিত হয়, তবে তাহারা এক অতিরিক্ত শক্তির দ্বারা প্রযোজিত হইয়া মিলিত হয় এবং সেই মিলনের ফল সেই প্রযোক্তার প্রয়োজনসিদ্ধি।

আমাদের চিত্ত (এবং সমস্তকরণ) সংহনন কারী। একটি জ্ঞানবৃত্তি ধর; দেখিবে, তাহা নানা চিত্তাঙ্গের মিলন-ফল। জ্ঞান হইল "ইহা বৃক্ষ", তাহাতে চক্ষুশক্তি এবং স্মৃতি, সংস্কার, বাক্ প্রভৃতি শক্তি সকল এক প্রয়োজনে প্রযোজিত বা মিলিত হইয়া ঐরূপ জ্ঞান উৎপাদন করে। চেষ্টাদি বৃত্তিতেও ঐরূপ নিয়ম। সেই চিত্তাঙ্গ সকলের মিলনের হেতু তদুপরিস্থিত এক শক্তি। ইহারই নাম চিতিশক্তি বা পুরুষ। আর সেই মিলনের ফল যে জ্ঞানাদি, তাহা পুরুষের প্রয়োজন বা অর্থসিদ্ধি (এইরূপে বলা যাইতে পারে, সুখ সুখের জন্য অর্থে নহে, কিন্তু সুখের অনুভাবয়িতার অর্থে) অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানসাধক অংশ সকল বৃক্ষ জানে না, (কারণ বৃক্ষ জানা তাহাদের কাহারও এক অংশের কার্য্য নহে, কিন্তু মিলিত কার্য্যের ফল) কিন্তু তাহাদের অতিরিক্ত আর এক জ্ঞাতাই বৃক্ষ জানে বা শাস্ত্রীয় ভাষায় "পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধ" হয়।

এইরূপে চিত্তের সংহত্যকারিত্ব হেতু চিত্তের অতিরিক্ত এক চেতয়িতা পুরুষ সিদ্ধ হয়।

১৩। দ্বিতীয় যুক্তি ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ। ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে—দৃশ্য ত্রিগুণ অর্থাৎ তাহার এক অংশ তামস বা অপ্রকাশিত, এক অংশ রাজস বা পরিণম্যমান এবং এক অংশ সাত্ত্বিক বা প্রকাশিত। কিন্তু দ্রষ্টা ত্রিগুণ হইতে পারে না। কারণ তাহা সদাই দ্রষ্টা বলিয়া তাহার কোন অপ্রকাশিত অংশ নাই বা তাহার পরিণাম নাই এবং তাহা কোন প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত নহে।

এইরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের স্বাভাবিক ভেদ আছে বলিয়া দ্রষ্টৃপুরুষ দৃশ্য হইতে পৃথক্।

১৪। তৃতীয় অধিষ্ঠানাৎ। দৃশ্য অন্তঃকরণ অচেতন; চিদ্রূপ পুরুষের অধিষ্ঠানেই তাহা চেতনের মত হয়। মনে কর—বীণারধ্বনি। তাহা একদিকে ক্রিয়া বা ইতস্ততঃ প্রচলন। চিদ্রূপ পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু তাহা মধুর শব্দরূপে বিজ্ঞাত হয়। জ্ঞান সকল হইতে চেষ্টা ও স্থিতি। অর্থাৎ শরীর, প্রাণ, মন আদিরা চৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতুই স্ব স্ব ব্যাপারে আরূঢ় থাকিয়া ভোগাপবর্গ সাধন করে। এই জন্য শ্রুতি বলেন "প্রাণস্য প্রাণঃ" ইত্যাদি। যেমন সূর্য্যের আলোকে আমরা দেখিতে পাই, ক্রিয়াশক্তি পাই ও প্রাণধারণের উপাদান অন্ন পাই, সেইরূপ চিত্তের অধিষ্ঠানেই প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি সাধিত হয়। পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত হওয়াতেই ত্রিগুণের একাংশ স্বরূপ আমাদের এই জৈব উপাধি স্থিত বা বিধৃত রহিয়াছে।

১৫। চতুর্থ যুক্তি ভোক্তৃভাবাৎ।

ভোক্তা=ভোগকর্ত্তা। যোগভাষ্যে ভোগের এইরূপ লক্ষণ আছে "দৃশ্যস্য স্বরূপোপলব্ধি-র্ভোগঃ"। "ইষ্টানিষ্ট গুণ স্বরূপাবধারণং ভোগঃ"। এই দুই লক্ষণ মিলাইলে এইরূপ হয়—ইষ্ট ও অনিষ্ট স্বরূপে দৃশ্যের উপলব্ধিই ভোগ। ইষ্ট অর্থে ইচ্ছার অনুকূল বা ইচ্ছার বিষয়; ইষ্টের দিকে করণের প্রবৃত্তি হয় এবং অনিষ্টের বিপরীতে করণের প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং ভোগ অর্থে করণের প্রবৃত্তির উপলব্ধি হইল*।

অতএব ভোক্তা অর্থে প্রবৃত্তির উপলব্ধি কর্ত্তা। নানাকারণের দ্বারা ইষ্টানিষ্ট উপলব্ধি করণে, কেন্দ্রভূত একচেতন অনুভাবয়িতার সত্তা অবিনাভাবী। আর ইষ্টানিষ্ট অবধারণ পূর্ব্বক নানাকরণের একদিকে সমঞ্জস ভাবে প্রবৃত্তির জন্যও উপরিস্থিত সাধারণ এক চেতয়িতার সত্তা স্বীকার্য্য হয়; অতএব ভোক্তৃভাবের জন্যও চিত্তের প্রবৃত্তির মূল হেতু স্বরূপ অতিরিক্ত এক চিদ্রূপ সত্তা স্বীকার্য্য হয়।

পঞ্চম যুক্তি "কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ"। কৈবল্য চিত্তবৃত্তির সম্যক্ (অর্থাৎ নিঃশেষ ও সদাকালীন) নিরোধ। যদি চিত্তের অতিরিক্ত এক চেতয়িতা না থাকিত, তবে চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধে প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। যাহাকে "আমি" বলি, তাহার একাংশ (প্রকৃতাংশ) চিদ্ব্যতিরিক্ত সত্তা বলিয়াই আমি চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া শান্তবৃত্তিক "আমি" হইবার জন্য প্রবৃত্ত হই।

অবশ্য যাহারা কৈবল্যের কিছুই বুঝে না, বা যাহাদের মতে চিত্তবৃত্তিনিরোধ নাই, তাহাদের নিকট এই যুক্তি কার্য্যকরী নহে। এই প্রকরণে কৈবল্য বুঝান অপ্রাসঙ্গিক হইবে। যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি, তাহার নিরোধ, এবং নিরোধের উপায় বৈজ্ঞানিক ন্যায্যপন্থায় প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার অপ্রযুক্ততা বা অসম্ভবতা ন্যায্য প্রথায় প্রদর্শন করা এপর্য্যন্ত কাহারও সাধ্য হয় নাই। তাহা কেহ করিলে তবে এই যুক্তির সারবত্তার লাঘব হইবে।

১৭। পূর্ব্বোক্ত বিচার হইতে "আমি কিসে নির্ম্মিত" এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ হয়—সাধারণতঃ যাহাকে "আমি" বলি, তাহা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের দ্বারা নির্ম্মিত, অর্থাৎ এই দুই পদার্থকে এক করিয়া "আমি" নাম দিই। কিন্তু দ্রষ্টা ও দৃশ্য যখন সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাব, আমি দৃশ্যের দ্রষ্টা, এইরূপ প্রত্যয় যখন হয়, তখন বস্তুতঃ আমি—দ্রষ্টা। "আমির" বাস্তব অর্থ দ্রষ্টা। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের একত্ব খ্যাতির বা "প্রত্যয় বিশেষের" নাম অবিদ্যা বা অনাত্মে আত্মখ্যাতি।

---

* পুরুষ সাংখ্যমতে সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাতা, ভোক্তা ও অধিষ্ঠাতা, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে কর্ত্তা ও ধর্ত্তা নহেন। কারণ পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার নিকট সমস্তই জ্ঞাত বা দৃষ্ট। কার্য্য এবং ধার্য্যও তাঁহার দৃশ্য। সুতরাং তাঁহার নিকট সাক্ষাৎসম্বন্ধে কার্য্য ও ধার্য্য নাই।

তজ্জন্য পুরুষ—জ্ঞানের=জ্ঞাতা।
প্রবৃত্তির প্রকাশয়িতা=ভোক্তা।
স্থিতির প্রকাশয়িতা=অধিষ্ঠাতা।

অতএব তিনিই জ্ঞানের সাক্ষাৎ জ্ঞাতা। কিন্তু প্রবৃত্তি ও স্থিতির সহিত জ্ঞাতৃত্বের দ্বারা সম্বদ্ধ। তন্মধ্যে প্রবৃত্তির সহিত সম্বদ্ধ ভাবের নাম ভোক্তৃত্ব এবং স্থিতির সহিত সম্বদ্ধভাবের নাম অধিষ্ঠাতৃত্ব।

আধুনিক বৈদান্তিকেরা ভোক্তৃত্বের তাৎপর্য্য সম্যক্ না বুঝিয়া প্রাচীন মহর্ষিগণের বাক্যে দোষ দিয়া থাকেন।

'আমি'র স্বরূপ।

১৮। দ্রষ্টার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে প্রধানতঃ দৃশ্য ধর্ম্মের প্রতিষেধ করিয়া করিতে হয়। কারণ, আমাদের ব্যবহার্য্য সমস্তই দৃশ্য, আর দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্; সুতরাং দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম সকল প্রতিষেধ করিয়াই দ্রষ্টার স্বরূপ অবধারণ করিতে হয়।

কিন্তু কেবল নিষেধবাচক শব্দ দিয়া কোন পদার্থের লক্ষণ করিলে তাহা অভাব পদার্থ হয়। অশব্দ, অরূপ, অরস ইত্যাদি কেবল শত শত নিষেধবাচী শব্দের দ্বারা কোন ভাব পদার্থ লক্ষিত হয় না। নিষেধবাচীর সহিত ভাববাচী শব্দও থাকা চাই। সেই ভাববাচী শব্দও আমরা দৃশ্য হইতে পাই। কারণ দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও সম্পূর্ণ বিসদৃশ নহেন।

"স বুদ্ধের্ন স্বরূপো নাত্যন্তং বিরূপ" ইতি
(যোগভাষ্য)।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের "অস্তি" এই পদার্থ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। দ্রষ্টাও অস্তি, দৃশ্যও অস্তি। শ্রুতি বলেন :—

"অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।"
(কঠ)

জ্ঞান ও সত্তা অবিনাভাবী বলিয়া অস্তি বিষয়ে সাদৃশ্য। জ্ঞ (বোধ বা প্রকাশ) পদার্থ বিষয়েও দ্রষ্টা এবং দৃশ্যে সাদৃশ্য আছে। দ্রষ্টার দ্বারা দৃশ্য প্রকাশিত হওয়াতেই এই সাদৃশ্য। দৃশ্যের—প্রকাশভাব জানিয়া প্রকাশককে বুঝা যায়। তন্মধ্যে দ্রষ্টা দৃশি মাত্র (জ্ঞ মাত্র) বা স্ববোধ বা স্বপ্রকাশ এবং দৃশ্য জ্ঞাত বা বুদ্ধ বা প্রকাশিত। অথবা জ্ঞেয় বা বোধ্য বা প্রকাশ্য।

জ্ঞমাত্র, স্ববোধ, স্বপ্রকাশ আদি পদার্থের সাধারণ নাম চিৎ। চিৎ অর্থে যে জানার কোন কারণ বা সাধন বা হেতু ও নিমিত্ত নাই, তাদৃশ জানা মাত্র। অথবা যে জানার সহিত সংযুক্ত বা সংকীর্ণ হইলে অজ্ঞাত অব্যক্ত ভাব জ্ঞাত ব্যক্ত জ্ঞেয় রূপ হয়, তাহাই জ্ঞ মাত্র। এইজন্য ভগবান্ পতঞ্জলি দ্রষ্টাকে "প্রত্যয়ানুপশ্য" এই লক্ষণে লক্ষিত করিয়াছেন। শ্রুতিও বলেন "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"।

পুরুষের সম্পূর্ণ ভাববাচী পদের দ্বারা লক্ষণ এই :—"দ্রষ্টা দৃশিমাত্র শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।" প্রত্যয়ানুপশ্য অর্থে দৃশ্যের দর্শন। শুদ্ধ অর্থে দৃশ্যের সহিত অসংকীর্ণ। শুদ্ধ হইলেও দ্রষ্টা প্রত্যয়ানুপশ্য। শ্রুতির "সাক্ষী চেতা" এই বিশেষণদ্বয় ভাববাচী পুরুষ লক্ষণ এবং যোগসূত্রের সহিত একার্থক।

১৯। যোগভাষ্যকার দ্রষ্টৃ পুরুষের আর একটি গভীর হেতুগর্ভ স্বরূপ লক্ষণ দেন। তাহা যথা—বুদ্ধেঃ প্রতি সম্বেদী পুরুষঃ। অর্থাৎ পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসম্বেদী। বুদ্ধি অধ্যবসায় বা নিশ্চয় স্বরূপ। অধ্যবসায় অর্থে অধিকৃতের অবসায় বা প্রকাশরূপ শেষ অবস্থা। নীল, লাল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ বা জ্ঞানারূপে শেষ হয়। নিশ্চয় অর্থে সত্তা নিশ্চয়। তজ্জন্য জ্ঞান ও সত্তা অবিনাভাবী। যাহা জানি, তাহাই সৎরূপে প্রতীত হয়। আর যাহা জানি না, তাহাতে সত্তা পদ প্রয়োগ অসম্ভব। শাস্ত্রও বলেন :—"যদি চানুভবরূপা সিদ্ধিঃ সত্তেতি কথ্যতে। সত্তা সর্ব্বপদার্থানাং নান্যা সম্বেদনাদৃতে"॥ যদি অনুভবরূপ সিদ্ধিই সত্তা হয়, তবে সর্ব্বপদার্থের সত্তা সম্বেদন ছাড়া অন্য কিছু নহে।

সর্ব্বদা জানা চলিতেছে বলিয়া (নিদ্রাতেও এক প্রকার প্রত্যয় হয়। তাহা তামস অবস্থার প্রত্যয় "অভাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তি নিদ্রা" (যোগ সূত্র) অর্থাৎ সর্ব্বদা "জানিতেছি" বলিয়া "জানিতেছি" এই ভাবটি সৎরূপে ভাসমান আছে। যাহা জানিতেছি, তাহার বিভিন্ন পরিমাণ হইয়া চলিতেছে। কিন্তু "জানিতেছি" নামক ভাবটী সদৃশ প্রবাহে চলিতেছে। তজ্জন্য তাহা অভঙ্গ সত্তারূপে ভাসমান হয়। এইজন্য বুদ্ধির অপর নাম সত্ব। জ্ঞান ও সত্তা অবিনাভাবী বলিয়া "জানিতেছি" ও "আছি" ইহারা একই কথা। অতএব "আমি" আছি বা "অস্মীতি" পদার্থই বুদ্ধি। কিরূপে আমি আছি ? না—প্রকাশশীল বা জ্ঞানবান্ আমি আছি। কিসের প্রকাশ বা জ্ঞান ? না—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের বিষয়ের। অতএব বিষয় জ্ঞানবান্ আমি বা ব্যবহারিক গ্রহীতাই বুদ্ধি।

জানিতেছি এই ক্রিয়া পদার্থ (অর্থাৎ গ্রহণ), এবং জ্ঞানবান্ বা জ্ঞানশীল আমি একই বস্তুর অভিধানভেদ। তজ্জন্য বুদ্ধি গ্রহণের অন্তর্গত। জ্ঞানশীলতা বা জানিতে থাকা বুদ্ধির স্বরূপ বলিয়া বুদ্ধি পরিণামী। সুতরাং তাহা একরূপ সত্তা বলিয়া ভাসমান হইলেও বস্তুতঃ অবিকারী সত্তা নহে। পরিণম্যমান বস্তুর ন্যায় তাহাও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার দৈশিক অবস্থান নাই, সুতরাং তাহা কালিক অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। অর্থাৎ "জানিতেছি" "জানিতেছি" ইত্যাকার সদৃশ ভাবের ধারা কালক্রমে চলিয়া যাইতেছে। সমাধি-নির্ম্মল চিত্তের দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয়।

অতএব সাধারণ "আমি আছি" (শাস্ত্রীয় ভাষায় অস্মীতি) এইরূপ ভাবপ্রবাহই বুদ্ধি হইল। 'আমি আছি' তাহাও 'আমি জানি' এইরূপ জানার নাম বুদ্ধির সম্বেদন। যেমন প্রতিবিম্বে অর্থে বিম্বর অনুরূপ ভাব, তেমনি প্রতিসম্বেদন অর্থে সম্বেদনের অনুরূপ সম্বেদন। আমি আছি, এইরূপ স্বেদনের পর "আমি আছি, তাহা আমি জানি" এই প্রকার অনুরূপ সম্বেদন হয়, তাহাই প্রতিসম্বেদন। বুদ্ধির যাহা প্রতিসম্বেদী বা প্রতিসম্বেদক অর্থাৎ প্রতিসম্বেদনের হেতু, তাহাই পুরুষ বা স্বরূপ দ্রষ্টা। প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি, প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির জন্য এক প্রতিফলক চাই। দর্পণ প্রতিবিম্বের, প্রচীর পর্ব্বতাদির প্রতিধ্বনির প্রতিফলক। শরীরের যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া (reflxaction) হয়, তাহাদেরও প্রতিফলকে প্রতিহত হইয়া প্রতিবিম্বাদি উৎপাদন করে।

অতএব প্রতিসম্বেদনেরও এক প্রতিফলক চাই, যাহার দ্বারা প্রতিদৃষ্ট বা উপদৃষ্ট (জ্ঞানকে প্রতিহত বলা যুক্ত নহে) হইয়া প্রতিসম্বেদন হইবে। বুদ্ধির সেই 'প্রতিফলক' বা প্রতিসম্বেদী পদার্থই পুরুষ। সেইরূপ এক উপরিস্থিত প্রতিসম্বেদী আছে বলিয়াই 'আমি আছি' এইরূপ বুদ্ধিও প্রতিসম্বিদিত হয়।

বুদ্ধি যেমন নানা বিষয়ের জানা, তাহা সেরূপ নহে; তাহা জানামাত্রের জানা অর্থাৎ জ্ঞ বা দৃশিমাত্র বা স্ববোধ। "শ্রুতির জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা বৌদ্ধ প্রত্যয়েরও দ্রষ্টা উক্ত 'জানার জানা'।

জানার বা বুদ্ধির বিষয় নানা বলিয়া বুদ্ধি পরিণামী, কিন্তু যাহা 'জানার জানা' তাহা পরিণামী নহে। তাহার অবস্থান্তর কল্পনীয় নহে। পরিণাম দৈশিক বা কালিক অবস্থান ভেদ, কিন্তু যাহা দেশ ও কালের জ্ঞাতা, দেশ ও কাল যাহার অধিকরণ নহে, তাহার অবস্থা-ভেদ কিরূপে কল্পনা হইতে পারে?

জানা বা প্রখ্যার ভিতর 'আমিকে' অন্তর্গত করা বা 'আমিতে' জানা আরোপ করার নাম বুদ্ধি-পুরুষের সংযোগ। পৃথক্ পদার্থের একত্ব ভানরূপ মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্যা হইতে সংযোগ হইতেছে। সংযোগ হইলে সংযুক্ত পদার্থদ্বয় যে বিকৃত হইবে, ইহা নিয়ম নহে। বিশেষতঃ এই সংযোগ অন্যতর-ক্রিয়াজন্য। বুদ্ধিস্থ অবিদ্যাই সংযোগের হেতু §। বুদ্ধিস্থ বিদ্যা বিয়োগের হেতু। বিয়োগ হইলে পুরুষকে কেবলী বলা যায়। কিন্তু তাহাতে পুরুষের কোন অবস্থান্তর হয় না। বুদ্ধিরই নিবৃত্তি-রূপ অবস্থান্তর হয়। সংযোগ কালে পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তির স্বরূপ বা সদৃশ বোধ হয়, কিন্তু তাদৃশ বোধও বুদ্ধির ধর্ম্ম। পুরুষের বাস্তব অবস্থান্তর তদ্দ্বারা হয় না। 'বিয়োগ কালে পুরুষ স্বপ্রতিষ্ঠ হন ইত্যাকার বোধও বুদ্ধি প্রতিষ্ঠ। তদ্দ্বারাও পুরুষের অবস্থান্তর হয় না। কারণ অস্বপ্রতিষ্ঠা যখন মিথ্যা,

সংযোগের হেতু কি, তাহা বিয়োগ কিরূপে হয়, তাহা বুঝিলে বুঝা যায়। কারণ সংযোগের পূর্ব্বে অসংযুক্ত অবস্থা আমরা পাই না। সুতরাং সংযোগের হেতু সেই দিক্ দিয়া সাধারণ কার্য্য কারণ নির্ণয় করার ন্যায় নির্ণয় করিতে যাওয়া সুকর নহে। বুদ্ধি ও পুরুষের পৃথক্ত্ব খ্যাতির (অর্থাৎ বিবেক-খ্যাতির) দ্বারা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগাদি ক্লেশ সমূলে বিনষ্ট হইলে, বুদ্ধি-পুরুষের বিয়োগ বা পুরুষের কৈবল্য হয়। অতএব বুদ্ধি ও পুরুষের অপৃথগত্ব খ্যাতি বা অবিদ্যাই সংযোগের মূল। যতদিন অবিদ্যামূলক চিত্তবৃত্তি উঠিবে, ততদিন সংযোগ থাকিবে; বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা নাশ হইলে সংযোগ থাকিবে না।

---

§ সংযোগ পদার্থ উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। অজ্ঞ লোকে প্রথমেই বুদ্ধি-পুরুষের সংযোগকে জল ও নৌকা আদি সংযোগের ন্যায় অবিরল দৈশিক অবস্থান মাত্র বুঝিবে। বস্তুতঃ তাহা নহে, কারণ বুদ্ধিও পুরুষ দেশব্যাপী সত্তা নহে। বুদ্ধি কালমাত্রব্যাপী, পুরুষ তাহাও নহে। বিয়োগ যখন পরমার্থ দৃষ্টি, তখন সংযোগ ব্যবহারিক দৃষ্টি। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বুদ্ধির মধ্য দিয়া সংযোগ দেখিলে সংযোগকে কালিক অর্থাৎ যুগপৎ জ্ঞানরূপ (একই ক্ষণে বুদ্ধি ও পুরুষের অবিশেষ প্রত্যয়) সংযোগ বুঝিতে হইবে। ভাষায় বিশ্লেষ করিয়া বলিলে 'নীল যে জানিতেছি, তাহাও আমি জানি' এই উভয় প্রত্যয়ের এক ক্ষণে খ্যাতিই সংযোগ। জানিতেছি বা জাননক্রিয়া প্রবাহ বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধিরও বিজ্ঞাতা পুরুষ। বস্তুতঃ পুরুষ কালাতীত সত্তা। ঐরূপ এককণে যে অভেদ খ্যাতি হয়, তাহার কারণ এই:—একটী জ্ঞান-বৃত্তির অবস্থান কালই ক্ষণ ভিন্ন জ্ঞানবৃত্তি ভিন্ন ক্ষণে থাকিবে, এককণে দুই বৃত্তির সত্তা বিশ্লেষপূর্ব্বক কদাপি লভ্য নহে, কিন্তু প্রত্যেক জ্ঞানবৃত্তির সহিত বিজ্ঞাতার সত্তা অবিনাভাবী, সুতরাং তাহারা অভিন্ন বা বিজড়িতরূপে প্রতীত হয়।

তখন স্বপ্রতিষ্ঠীভূততা ও ভ্রান্তি (বৈদান্তিকের ভাষায় সম্বাদী ভ্রম) বস্তুতঃ স্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষকে স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া জানাই বিদ্যা। ইহাই যোগদর্শনোক্ত পুরুষ সিদ্ধির চূর্ণক।

এতাবতা পুরুষের স্বরূপলক্ষণ বিচারিত হইল। এতদ্ব্যতীত নিষেধবাচী পদের দ্বারাও দ্রষ্টার লক্ষণ কার্য্য। একমাত্র অদৃশ্য বা নির্গুণ এই পদের অন্যতরের দ্বারা সমস্তের নিষেধ বুঝায়। অ-দৃশ্য অর্থে দৃশ্য নহে। দৃশ্য সগুণ, সুতরাং দ্রষ্টা নির্গুণ। নির্গুণ শব্দ উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক।

গুণ বা ধর্ম্ম অর্থে দ্রব্যের বোধ্যভাব (বোধ্য অর্থে সর্ব্বপ্রকার বোধের বিষয়) যাহা জ্ঞায়মান, যাহা জ্ঞায়মান ছিল ও যাহা জ্ঞায়মান হইবে, তাহাই গুণ। "যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তিই" ধর্ম্ম এই লক্ষণেও যোগ্যতাবচ্ছিন্ন অর্থে বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার্য্য বা বোধ্যভাব। ঘটের কম্বুগ্রীবত্বাদি ধর্ম্ম বস্তুতঃ বদ্ধ ভাব বিশেষ। গুণ সকল অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত, এই ত্রিভাগে বিভক্ত হইতে পারে। তন্মধ্যে কতকগুলি বর্ত্তমান এবং অসংখ্য অতীত ও অনাগত। ভাব পদার্থের ধ্বংস ও প্রাগ্‌ভাব নাই বলিয়া অসংখ্য অতীত ও অনাগত ধর্ম্মও আছে। কিন্তু তাহারা সূক্ষ্ম বা উপলব্ধির অযোগ্যরূপে আছে। বর্ত্তমান ধর্ম্মগুলিই জ্ঞায়মান হয়। অতীত ও অনাগত ধর্ম্মের সূক্ষ্মাবস্থা এবং বর্ত্তমান ধর্ম্ম সকলের জ্ঞায়মান অবস্থা যাহাতে মিলিত থাকে, তাহার নাম ধর্ম্মী। ফলে ধর্ম্মের সমষ্টিই ধর্ম্মী। ধর্ম্ম দ্বিবিধ, তাত্ত্বিক (তত্ত্বের ধর্ম্ম) ও অতাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক। রূপ রসাদি তাত্ত্বিক ধর্ম্ম। ঘটত্বাদি ব্যবহারিক ধর্ম্ম। তত্ত্ব সকল অতাত্ত্বিক পদার্থের ধর্ম্মী এবং বিকৃতি সকলের ধর্ম্মী প্রকৃতি সকল।

মূলা প্রকৃতি বা ত্রিগুণ কেবল ধর্ম্ম বা কেবল গুণ নহে এবং কেবল ধর্ম্মী বা কেবল গুণী নহে। তাহারা গুণও বটে (যেহেতু বোধ্য) এবং গুণীও বটে, কারণ তাহারা নিত্য বা মূল শূন্য। সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণের অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ভাব নাই, তাই তাহারা গুণী। কিন্তু তাহাদের ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ অবস্থাভেদ আছে। তাহারা স্থানভেদে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ভাবে সদাই বর্ত্তমান।

অতএব গুণ বলিলেও গুণী আসিবে। গুণী আসিলে অবস্থাভেদ বা কতক প্রকাশ, কতক অপ্রকাশ ভাব আসিবে। চিৎ পদার্থ সেরূপ নহে বলিয়া তাহা নির্গুণ *। তাহার ভিতর রুদ্ধ অরুদ্ধ ভাব নাই। তাহা সম্পূর্ণ বোধ। তাহা চিদেকরস।

এই জন্য সাংখ্যসূত্রে আছে—"নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মা" অর্থাৎ "পুরুষের ধর্ম্ম চৈতন্য" এরূপ বাক্য ঠিক নহে, কিন্তু পুরুষই চিৎ।

এই অদৃশ্য বা নির্গুণ পদার্থকে শ্রুতি

* গুণ বাস্তব হয় এবং বৈকল্পিক বা অবাস্তব শব্দজ্ঞানানুপাতীও হইতে পারে। নীল, পীত আদি বাস্তব গুণ কিন্তু অনন্তত্ব চিন্ময়ত্ব ইত্যাদি অবাস্তব গুণ। ব্যবহারতঃ বৈকল্পিক গুণ আরোপ করিয়া চিৎ পদার্থ বর্ণিত হয়।

বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। "অমনা" "অচক্ষু" "অপাণিপাদঃ" "অপ্রাণ" ইত্যাদি পদের দ্বারা অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রমাণরূপ দৃশ্য পদার্থ (করণ বর্গ) হইতে পৃথক্ দর্শিত হইয়াছে। আর অচিন্ত্য (মনের অগ্রাহ্য) অদৃষ্ট (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য) অব্যবহার্য্য (কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের অবিষয়) ইত্যাদি পদের দ্বারা (করণের) বিষয়রূপ দৃশ্য হইতে পৃথক্ দর্শিত হইয়াছে। এই জন্য চিৎ অব্যপদেশ্য অর্থাৎ দেশ ও কালের দ্বারা ব্যবদেশ করিবার যোগ্য পদার্থ নহে। অর্থাৎ তাহা ছোট, বড়, মোটা, পাতলা বা সর্ব্বদেশব্যাপী ভাব নহে এবং কালব্যাপী ভাবও নহে। সর্ব্বব্যাপী আদি পদার্থ বাহিরের দিক হইতে বলা যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে সর্ব্বও নাই ব্যাপিত্বও নাই। "অনন্ত" ও "নিত্য" শব্দের দ্বারা দেশকালাতীততা প্রধান হয়। অনন্ত ও নিত্য শব্দ দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয়। পরিণামিক ও কৌটস্থ। যাহার অন্ত জানিতে জানিতে শেষ পাওয়া যায় না, বা যাহার অন্তরেখা সদাই সুদূরে সরিয়া যায়, অর্থাৎ যাহাকে যতই জানি না, কখন জানিয়া শেষ করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা পারিণামিক অনন্ততা। যেমন দেশ অনন্ত ইত্যাদি। তেমনি যাহা একরূপ বা একরূপ অবস্থায় সদাই থাকে ও থাকিবে তাহার নিত্যতা পরিণামিক। যেমন ত্রিগুণের নিত্যতা।

দৈশিক বা কালিক পরিচ্ছেদের যাহাতে ব্যপদেশ বা আরোপণ যোগ্যতা নাই, অন্ত পদার্থ বা পরিণাম পদার্থের গন্ধ মাত্রও থাকিলে যাহাতে স্থিতির সম্ভাবনা নাই, যে যে ভাবে পরিচ্ছেদ আসে, যাহা তত্তদ্ভাবের বিরুদ্ধ তাহা কূটস্থ অনন্ত ও নিত্য। চিৎদেশ ও কালের দ্বারা অব্যপদিষ্ট" এস্থলে অব্যপদিষ্ট পদের নঞের অর্থ যে ভাবে দৈশিক ও কালিক পরিচ্ছেদ থাকে তাহা "ছাড়িলে" চিদ্রূপে স্থিতি বা চিতের সাক্ষাৎকার হয়। ফল কথা দৃশ্য সম্বন্ধীয় অনন্ততা ও নিত্যতা হইতে ভিন্ন পদার্থের নাম কূটস্থ অনন্ততা ও নিত্যতা। পরিচ্ছেদের অত্যন্তাভাব কূটস্থ অনন্ততা। "আসীনঃ দূরং ব্রজতি"† ইত্যাদি শ্রুতিতে চৈতন্যের দেশব্যাপিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সমস্ত দৃশ্য সকল বা সাবয়ব অর্থাৎ অংশের সমষ্টি তজ্জন্য চিৎ নিষ্কল বা নিরয়ব।

চিৎ সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিষেধ-পদার্থ আরও উত্তমরূপে পরীক্ষণীয়।

চিৎ সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকাল ব্যাপী এরূপ পদের অর্থ যদি বুঝ যে চিতের আধার দেশ ও কাল, তাহা হইলে চৈতন্য বুঝা হইবে না, কিন্তু চৈতন্য নামক জড় পদার্থ বিশেষ বুঝাইবে। দেশ ও কাল জ্ঞেয় পদার্থ সম্বন্ধীয় ভাব বিশেষ। তাহাদিগকে তাহাদেরই জ্ঞাতার অধিকরণ মনে করা অন্যায্যতার পরাকাষ্ঠা।

লৌকিক মোহে মুগ্ধবুদ্ধি ব্যক্তির শঙ্কা

---

† দূর ও নিকট দেশ ব্যাপী পদার্থ সম্বন্ধীয় ভাব। সুতরাং যাহাতে দূর ও নিকট নাই, তাহা দেশাতীত ভাব।

হয় "চৈতন্য যদি অনন্ত হয়, তবে তাহা সর্ব্বস্থানে থাকিবে। সর্ব্বস্থানে না থাকিলে তাহা সান্ত হইয়া যাইবে।"

চৈতন্যকে জ্ঞেয় বা জড় পদার্থ কল্পনা করিয়াই ঐরূপ শঙ্কা হয়। চৈতন্য জ্ঞাতা। জ্ঞাতার অনন্ততা কিরূপ, তাহা বুঝিতে হইলে এইরূপে বুঝিতে হয়:—আমি যদি কোন বিষয় না জানি, (জানন-শক্তিকে রোধ করিয়া) তাহা হইলে কেবল 'আমা-কেই আমার জানা' মাত্র থাকিবে, অর্থাৎ জ্ঞ-মাত্র থাকিবে। জানার সীমা হয় কিরূপে? কতক জানা—কতক অজানা থাকিলে। কিন্তু যাহা কেবল জানা মাত্র, তাহার সীমাকারক হেতু কিছু নাই। সেই জন্য চিৎ অনন্ত। জ্ঞাতা সর্ব্বব্যাপী বলিলে এরূপ বুঝাইবে না যে, জ্ঞাতা সর্ব্ব জ্ঞেয়ের মধ্যে আছে। কারণ জ্ঞেয় ভাবের মধ্যে কুত্রাপি জ্ঞাতা লভ্য নহেন, আর জ্ঞাতাতেও জ্ঞেয় লভ্য নহে। জ্ঞাতার স্বরূপ অবধারণ করিলে তৎসহ "সর্ব্বও" প্রতীতি হইবে না, যে সর্ব্বে জ্ঞাতা ব্যাপিয়া থাকিবে। অতএব জ্ঞাতাকে সর্ব্বব্যাপী বলিলে, সেস্থলে সর্ব্বব্যাপিত্বের অর্থ সমস্ত দৃশ্যের বা বুদ্ধির পরিণামের জ্ঞাতা। বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপী পদ জ্ঞাতার গৌণ বিশেষণ, মুখ্য বিশেষণ নহে।

চিৎ সর্ব্বদেশকালব্যাপী নহে, কিন্তু ঈশ্বর তাদৃশ। চিৎ ও ঈশ্বর এক নহে, কারণ চিৎ (পুরুষ) ও ঐশ্বরিক উপাধির সমষ্টির নাম ঈশ্বর। অতএব ঈশ্বর মায়ী, কিন্তু চিৎ মায়ী নহে। স্বপ্রকাশ চিতে মিথ্যা মায়ার বা ইচ্ছার অবকাশ নাই। "অঘটনঘটনপটীয়সী" * হইলেও তাহা নির্গুণ চৈতন্যের গুণ বা শক্তি নহে।

ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ, সুতরাং চিন্মাত্ররূপে স্থিত, তাই মহিমাকীর্ত্তন কালে শ্রুতি তাঁহাকে চিন্মাত্র নির্গুণ (ত্রিগুণের সহিত অসম্বন্ধ) ইত্যাদি বলিয়াছেন। আর ঐশ্বরিক উপাধিকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। অনেকে ঈদৃশরূপে স্তুত ঈশ্বরকে চিন্মাত্র আত্মার সহিত অভিন্ন মনে করিয়া আত্ম পদার্থকে বিপর্য্যস্ত করেন। আত্মা শব্দ শ্রুতিতে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। লক্ষণ ও বিবক্ষা দেখিয়া আত্মার অর্থ স্থির করা উচিত।

পরিশেষে চিত্তের একত্ব নিষেধ কার্য্য। আমি যেমন বস্তুতঃ চিন্ময়, সেইরূপ অন্য আমিও চিন্ময়, ইহা প্রমের সত্য। কিন্তু সেই দুই চিন্ময় আমি যে এক, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ব্যবহার দশায় বোধ হয় না যে 'আমি' এবং অন্য "আমি" এক; আর পারমার্থিক দশায়ও তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তৎকালে কেবল "আমিকেই" জানিতে হয়, অন্য আমিকে জানা ছাড়িতে হইবে। সুতরাং অন্য সব আমিতে আমি মিশিয়া এক হইলাম বা সেইরূপ এক আছি, এরূপ

---

* শীকারীদের দ্বারা তাড়িত হইয়া বরাহ যখন একান্ত নিরুপায় হয়, তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বোধ হয় মনে করে, আমাকে আর কেহ দেখিতে পাইতেছে না। "অঘটন-ঘটন-পটীয়সী" আদি শব্দের দ্বারা মায়ার বিচার সাজ করা তদ্রূপ।

জ্ঞান অসম্ভব। তজ্জন্য চিৎকে এক বলিবার কোনও হেতু নাই। §

"বহু পদার্থ থাকিলে সকলেই সান্ত হইবে, সুতরাং বহু চিৎ থাকিলে সকলেই শান্ত হইবে, চিৎ অনন্ত হইবে না" এই যুক্তির খাতিরে চিৎকে এক বলা সঙ্গত, অনেকের মনে আসে। কিন্তু ইহাও দেশব্যাপিত্ব-রূপ জ্ঞেয়ের ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বিচার। দেশব্যাপী পদার্থ এইরূপ বটে, কিন্তু জ্ঞাতা বহু হইলে, সকলে সান্ত হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। জ্ঞাতার অনন্তিত্ব যে জন্য, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাহার ব্যতিক্রম হইলেই জ্ঞাতা সান্ত হইবে, বহু হইলে নহে। পাঁচজন লোক চন্দ্র দেখিলে কি প্রত্যেক চন্দ্রের পঞ্চমাংশ দেখিবে? দর্শন-জ্ঞান পঞ্চ সংখ্যক হইলেও তাহা যেমন বহুত্বের জন্য সান্ত হয় না, জ্ঞাতাও তদ্রূপ। স্ববোধ মাত্র স্বরূপ জ্ঞাতা, তাই তাহা অনন্ত। বহু অনন্ত স্ববোধ থাকিতে পারে। পরস্পরের সহিত তাহাদের কিছু সম্বন্ধ নাই।

পরিশেষে দ্রষ্টা আত্মার লক্ষণ সকল একত্র সজ্জিত করিয়া দেখান হইতেছে :—

(১) ভাবার্থ পদের দ্বারা স্বরূপ লক্ষণ :—

'দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।'

(যোগসূত্র)

বুদ্ধেঃ প্রতিসম্বেদী। (ভাষ্য)।

সাক্ষীচেতা (শ্রুত্যুক্ত)।

(২) নিষেধার্থ পদের দ্বারা অদৃশ্য বা নির্গুণ

(ক) করণ স্বাধর্ম্ম্য নিষেধ—শ্রুত্যুক্ত।

অন্তঃকরণ স্বাধর্ম্মাহীন	অমনা।
জ্ঞানেন্দ্রিয়	অচক্ষু, অকর্ণ ইত্যাদি।
কর্ম্মেন্দ্রিয়	অপাণি পাদ ইত্যাদি।
প্রাণ	অপ্রাণ।

§ আত্মার একত্ব বুঝাইবার জন্য বৈদান্তিকদের একটী প্রিয় দৃষ্টান্ত আছে। তাহা যথা—"ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া একই আকাশ বহুবৎ প্রতীত হয়, সেই রূপ বহু উপাধিযোগে একই আত্মা বহুবৎ প্রতীত হন"। যদিও ইহা দৃষ্টান্ত মাত্র, কিন্তু ইহা প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

যাহা বুঝাইবার জন্য এই দৃষ্টান্ত, তাহা কিন্তু ইহার দ্বারা বুঝিবার নহে। ইহা এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। ইহাতে কল্পনা করা হইয়াছে যে, আকাশ নামে এমন পদার্থ আছে, যাহা ঘটের অন্তরে বাহিরে ও অবয়ব মধ্যে একরূপে রহিয়াছে এবং যে আকাশ ও ঘটাবয়ব একস্থানে থাকিলে পরস্পরকে বাধা দেয় না, কিন্তু বস্তুতঃ তাদৃশ আকাশ কাল্পনিক। শব্দ-লক্ষণ আকাশভূত ঘটের দ্বারা কতক বাধিত হয়। কারণ দেখা যায়, শব্দ ঘটাদি দ্রব্যের দ্বারা রুদ্ধ হয়। আকাশের উপাধি তুমি দেখিতেছ, কিন্তু আত্মার উপাধি দেখে কে?

ফলতঃ ঐ আকাশ দিক্ (space) নামক বৈকল্পিক (অবাস্তব) পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত হয়।

"যদি ঐ ইষ্টক হইতে তৎপরিমাণ অবকাশ লওয়া যায়, তবে ইষ্টক থাকিতে পারে না, অতএব ঐ ইষ্টকই অবকাশ বা শূন্য"। এতাদৃশ ন্যায়ের মত উক্ত দৃষ্টান্ত :কাল্পনিক পদার্থ খাড়া করিয়া বাস্তব পদার্থের প্রমাণ করার চেষ্টা মাত্র।

(খ) বিষয় স্বাধর্ম্ম্য নিষেধ

অন্তঃকরণাবিষয়	অচিন্ত্য।
জ্ঞানেন্দ্রিয়াবিষয়	অদৃষ্ট, অশব্দ, অস্পর্শ ইত্যাদি।
কর্ম্মেন্দ্রিয়া বিষয়	অব্যবহার্য্য ইত্যাদি।
প্রাণাবিষয়	অব্যবহার্য্য ইত্যাদি।

(গ) বিষয় ও করণের অন্যান্য স্বাধর্ম্ম্য নিষেধ।

দেশকালব্যাপিত্বহীন	অব্যপদেশ্য
অবয়বহীন	নিরবয়ব নিষ্কল।
আত্মাদিদ্বৈত পদার্থের সম্পর্কহীন,	নিঃসঙ্গ-শুদ্ধ।
ঐশ্বর্য্যহীন	নপ্রজ্ঞান ঘন ইত্যাদিয়।
ক্রিয়াহীন	অপ্রতিসংক্রম, নিষ্ক্রিয়।
পরিণামানন্ত্যহীন	কুটস্থাননন্ত।
বৃদ্ধি-ক্ষয়হীন	অব্যয়, অবিনাশী ইত্যাদি।

(ঘ) একত্বের প্রমাণাভাবে ও সাবয়বাদি দোষ আসে বলিয়া অনেক।

শ্রীহরিহরানন্দ আরণ্য।

হিন্দুধর্ম্মকে কেন ভালবাসি?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জগন্নাথ দেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে কিম্বা ভুবনেশ্বর আর কপিলেশ্বর মন্দিরে গিয়া যিনি জাতিভেদ বর্জ্জনপূর্ব্বক ছত্রিশ বর্ণের সহিত এক পাত্রে আহার করেন, এমন কি, উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত ভোজন করিতে দ্বিধা করেন না, তিনিও আমাদের যেমন প্রিয়, আর যিনি ত্রিসন্ধ্যাহ্নিক পূজায় শুদ্ধাচারে সতত অবস্থিত এবং কাহারও দেহের বস্ত্রাদি বসিবার আসন, শরীরের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না, তিনিও আমাদের সুপ্রিয়। হিন্দুর ঘরে বিগ্রহসেবা হইলেই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়, কিন্তু হিঙ্গলাজ দেবীর মন্দিরে প্রয়োজন হয় না। সেখানকার নিয়ম মতে যে কোন হিন্দু হইলেই পূজার কার্য্য চলিতে পারে। শিবপূজাতেও ভারতের অনেক স্থানে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। কেবল কি তাহাই? মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের সময়ে অনেক মুসলমান, অনেক হাজী, কাজী, মৌলবী ও মোল্লা আলখাল্লা পরিয়া হিন্দু হইয়াগিয়াছে! অনেক বৌদ্ধ হিন্দুর বিরাট সমাজে প্রবেশ করিতেছে। এখনকার দিনে হিন্দু-সমাজে অনেক 'থিয়সপিষ্ট' আছেন, অনেক 'ফ্রিমেশন' আছেন অনেক উনানীয় ও আর্ম্মেণীয় সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীও আছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, এই বিশ্বজনীন উদার ভাব আর কোন ধর্ম্মে আছে কি? খৃষ্টানেরা হাড়ি, মুচী, ডম, বাউরী, বাগদীকে লইয়া এক করিতে পারে সত্য, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকে এক করিয়া মুড়ী-মিছরীকে মিলাইয়া দিতে পারেন সত্য, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের স্বাধীনতা থাকে কি? যিশুখৃষ্ট ভিন্ন আর পরিত্রাতাঃ নাই, খৃষ্টান ধর্ম্ম ভিন্ন আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, বাইবেল ভিন্ন অভ্রান্ত শাস্ত্র নাই এবং খৃষ্ট ভিন্ন মুক্তি আর কেহ দিতে পারে না, এই যে সঙ্কীর্ণ মত, ইহা মনুষ্যের সাধনের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্তরায়। এই প্রবল অন্তরায়ে মানবের হৃদয়ের স্বাধীনতা নষ্ট হয় এবং অনুদারতা আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

খৃষ্টানেরা কেবল একটা cast বা একটা creed অথবা একটা doctrine শিখাইয়া দেয়, তাহা এই—'যিশু ভিন্ন সমুদয় অসার এবং মুক্তি পথের কণ্টক। খৃষ্টান ধর্ম্ম ভিন্ন মোক্ষের অন্য পথ নাই, কারণ যিশুখৃষ্টই একমাত্র পরিত্রাতা, অন্য মুক্তিদাতা নাই।" এই যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মত, এই যে বিদ্বেষ-পূর্ণ শিক্ষা, এই যে সঙ্কীর্ণ ও অনুদার দীক্ষা, ইহা সাধকের পক্ষে মহাকণ্টক তুল্য। ঐ এক dogma বা doctrineএর নদীতে, খৃষ্টানকে সম্পূর্ণরূপে ঝাঁপ দিতে হইবে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, অনেকে ঝাঁপ দিতে পারে না এবং ঝাঁপ দিবার জন্য তাহাদের মনেও প্রবৃত্তি জন্মে না। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, যিশুখৃষ্ট এতবড় সাধু পুরুষ হইয়াও নিজে এই কুসংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন নাই। বাইবেলের সেণ্টজন্ (জোহান্না) পুস্তকের দশম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে যিশু কহিয়াছেন—"All that came before me are thieves and robbers" অর্থাৎ আমি অবতার হইবার পূর্ব্বে যাহারা অবতার বলিয়া আসিয়া ছিল, তাহারা চোর ও দস্যু। ঐ অধ্যায়ের আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, মুক্তিপথের আমিই দ্বার; এই দ্বার দিয়া যে না আসিয়া অন্য দ্বার দিয়া আসে, সে চোর ও ডাকাইত। জোহান্না নামক খৃষ্টীয় শাস্ত্রকার তাঁহার প্রথম পত্রের ৫ম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে লিখিতেছেন, "He that believeth not on Jesus Christ as the Son of God, God hath made him a liar" অর্থাৎ যিশু-খৃষ্টকে যে ব্যক্তি ঈশ্বর-সন্তান বলিয়া বিশ্বাস না করে, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। জোহান্নার ২য় পত্রের ১ম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে লেখা আছে, "If a man come uuto you and believe not in the doctrine that Christ is the Son of God (and the only saviour of the world) receive him not into your house." অর্থাৎ যদি কেহ তোমার কাছে অতিথি হয় এবং বলে যে সে ব্যক্তি যিশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র ও একমাত্র পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করে না, তাহা হইলে তাহাকে তোমার ঘরে স্থান দিওনা। সভ্য মহোদয়গণ! খৃষ্টান-দিগের মধ্যে কতটা সঙ্কীর্ণতা, কতটা অনুদারতা, কতটা কুসংস্কার, তাহা এখন বুঝিলেন কি? যেখানে এত সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা ও কুসংস্কার বর্ত্তমান, সেখানে হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া কেমনে মানুষে ধর্ম্ম সাধনা করিবার সুবিধা পাইতে পারে? মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বহুদর্শন, চিন্তাশক্তি, উদারতা যদি অন্ধের ন্যায় এইরূপ কুসংস্কারে ঢালিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে মানুষ কি প্রকৃত সাধক হইতে পারে? বাস্তবভাবে মুক্তির পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে অগ্রসর হইতে পারে? কিন্তু হিন্দু এ বিষয়ে কি বলেন দেখুন। হিন্দু বলেন, তুমি রাম মান আর কৃষ্ণ মান, অথবা শিব মান কি দুর্গা মান, সাকারো-পাসক হও অথবা নিরাকারোপাসক হও, কর্ম্মকাণ্ডী হও আর জ্ঞানমার্গী হও, সন্ন্যাসকে অবলম্বন কর অথবা সংসারে থাক, যাঁহাতেই হউক প্রকৃত ভক্তি সহকারে ভজনা কর, তোমার জন্য মুক্তির দ্বার তাহার দ্বারাই উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। কারণ ভগবান "অব্যক্ত

ব্যক্তরূপায় নিগুর্ণায় গুণাত্মনে—অর্থাৎ তিনি ব্যক্ত এবং অব্যক্ত, গুণসংযুক্ত এবং নিগুর্ণ এতদুভয়ই তিনি। হিন্দু বলেন—শুদ্ধি, জ্ঞান ও ভক্তি থাকিলেই মুক্তি, সুতরাং হিন্দু কাহারও মুক্তিপথের কণ্টক নহেন, কাহারও মুক্তিপথে "গণ্ডী" বাঁধিয়া দেন না; হিন্দুর এই উদারতা ও এই সর্ব্বজনপ্রিয়তা এবং নিরপেক্ষতা হিন্দুধর্ম্মের দিকে আমাদের মনপ্রাণকে আকৃষ্ট করে, সুতরাং আমরা এ হেন ধর্ম্মকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। হিন্দুধর্ম্মের এই বিশ্বজনীন উদারতা যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন অথবা যাঁহার বুঝিবার সামর্থ্য জন্মিয়াছে, তিনি হিন্দুধর্ম্মকে ভাল না বাসিয়া কখনই থাকিতে পারেন না। মনুষ্য চিরদিন গুণের পক্ষপাতী। হিন্দুধর্ম্মের এই গুণে আমরা হিন্দুধর্ম্মকে ভালবাসিতে চাই। আপনারা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন, খৃষ্ট কহিয়াছেন, তিনি ছাড়া আর যত অবতার, সে সব তস্কর ও দস্যু, কিন্তু কোন বিশিষ্ট হিন্দু তাহা কি বলিতে পারেন? হিন্দুধর্ম্ম কি বিশ্বাস করেন না যে, সর্ব্বজগজ্জনেরই মুক্তি আছে? খৃষ্টান এবং মুসলমান প্রভৃতিরও মুক্তি আছে? যে মুক্তি চায়, তাহাকে হিন্দুধর্ম্ম অবশ্য মুক্তির অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি মুক্তি চায় না, হিন্দুজাতি তাহাকেও মুক্তির গৌণ অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু খৃষ্টান ও মুসলমান তাহা করেন কি? আপনারা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন, খৃষ্টান শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি খৃষ্টকে ঈশ্বরপুত্র এবং একমাত্র পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস না করে, সে মিথ্যাবাদী। খৃষ্টানশাস্ত্র-মতে মিথ্যাবাদীর এই defination (সংজ্ঞা) কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে মিথ্যাবাদী শব্দের কি সুন্দর অর্থ আছে, তাহা একবার শুনুন দেখি। জ্ঞানার্ণব সমতুল্য শ্রীশ্রীমৎ ভগবৎগীতা শাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান অর্জ্জুনকে কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন!

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ স্মরণ করিয়া থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মা কপটাচারীকে মিথ্যাচারী কহা যায়; অর্থাৎ বাহিরে এক ভাব আর অন্তরে অন্য ভাব যাহার থাকে, সেই প্রকৃত মিথ্যাবাদী বা মিথ্যাচারী। যিশুখৃষ্টকে ভজিলেই মুক্তি পাইব, আর রামকে ভজিলে মুক্তি পাইব না, কিম্বা মহম্মদকে ভজিলেই মোক্ষ হইবে আর শ্রীকৃষ্ণকে ভজিলে মুক্তি হইবেনা, ইহা অনুদার হৃদয়ের কথা এবং সঙ্কীর্ণ চেতা মানবের ভ্রান্তি। হিন্দুধর্ম্মের এই উদারতা হিন্দুধর্ম্মকে ভালবাসিবার এক বিশিষ্ট হেতু। যাহা কিছু উদার তাহাই সুন্দর; যেখানে উদারতা, সেইখানে সৌন্দর্য্য; সুতরাং মানুষ সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী না হইবে কেন? যে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে এমন বিশ্বজনীন মহান উদারতা শিক্ষা দেয়, যে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে এমন বিশুদ্ধ ভাবে উদার হৃদয় সমন্বিত করে, যে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে হৃদয়ের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া আপনাপন বিশ্বাস ও অভ্যাস এবং যোগ্যতানুসারে ধর্ম্ম সাধনের সুবিধা করিয়া দেয়, যে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগের জন্য মুক্তি-পথকে এত সরল করিয়া দেয়, তাহাকে ভাল না বাসিয়া কি থাকা যায়? হিন্দুধর্ম্মের এই বিশ্বজনীন

উদারতা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমাদের অকৃত্রিম ভালবাসার অন্যতম বিশিষ্ট কারণ।

এক্ষণে দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এতক্ষণ আমি হিন্দুর ধর্ম্মভাব ও মুক্তি পথের সরলতা লইয়া আলোচনা করিতেছিলাম, এইবারে কিছুক্ষণ সাংসারিক কথা লইয়া আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। সংসারের নিয়ম এই, যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না; যে যাহাকে ভাল না বাসে, সে তাহার সম্পর্ক ও সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে সহজেই অভিলাষী হয়। আমরা যদি হিন্দু-ধর্ম্মকে ভাল না বাসি, তাহা হইলে হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের সহিত সম্পর্ক ও সংসর্গ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ইচ্ছুক হই; হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের সহিত স্বতন্ত্র হইলে পরিণামফল কি হয়, তাহা অনেকে ভারিয়া দেখিয়াছেন কি? হিন্দুধর্ম্মকে ভাল না বাসিলে, আমাদের সাংসারিক দুর্গতির একশেষ হইয়া যায়। অনেকে বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন নাই, হিন্দু ধর্ম্ম ছাড়িলে আমাদের সামাজিক, মানসিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিন্দু মাত্রও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। ধর্ম্মকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা না হইলেই ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয়, ধর্ম্ম ছাড়িলেই আমাদের ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, বাণিজ্য, ভাকর্য্য, সংগীত জ্যোতিষ, কাব্য, দর্শন, সামাজিক শক্তি, রাজ-নৈতিক শক্তি, প্রাচীন গৌরব ও সৌরভ, বিশুদ্ধতা, সাত্বিকতা প্রভৃতি প্রায় সর্ব্ব প্রকার বিদ্যা ও সর্ব্ব প্রকার গুণ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়; কেবল তাহাই নহে, ক্রমশঃ রক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া পুরুষ পরম্পরায় সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হইবে, স্ত্রীলোকগণ কুল-ভ্রষ্টা হইয়বন এবং পিতৃলোকেরও উদ্ধার হইবে না।

"কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ সঙ্করঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥
উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥"
(গীতা।)

এই প্রয়োজনীয় কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য প্রথমে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, ইহাতে আপনারা সহজেই জানিতে পারিবেন, হিন্দুধর্ম্মকে ভাল না বাসার—অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মকে পরিত্যাগ করার পরিণামফল কিরূপ অকল্যাণ-কর হইয়া থাকে। বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত নীলকণ্ঠ গোরে শাস্ত্রী হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন এবং হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টান-সমাজের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যান। খৃষ্টান হইয়াই তিনি লিখিলেন "যত দিবস পর্য্যন্ত সমুদয় ভারতবর্ষের লোক আপনাপন কৃত্রিম ধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র সত্য ধর্ম্মকে—অর্থাৎ খৃষ্টান ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া যিশুখৃষ্টের শরণাগত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই, ইহা নিশ্চয়; অতএব যাহাতে সমুদয় অপধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম সত্বরে ধ্বংস হইয়া যায়, প্রত্যেক চক্ষুষ্মান

ব্যক্তির তাহাই করা কর্ত্তব্য। হিন্দুর দেবালয় সমূহের আর প্রয়োজন দেখিনা, ইংরাজি না পড়িয়া বা পড়াইয়া কেবল সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চায় মূর্খতা ও কুসংস্কার বাড়ে; সুতরাং তাহার আর বিশেষ প্রয়োজন নাই; হিন্দুর শাস্ত্রসমূহ কল্পিত কাহিনীমালায় পরিপূর্ণ, ইহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অনুদারতা ও কুসংস্কার আসিয়া মানুষকে বুদ্ধিহীন করে এবং জাতিভেদ প্রভৃতি দ্বারা ঘৃণা, বিদ্বেষ, আলস্য, অনৈক্য প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। সমগ্র দেশ মধ্যে পবিত্র যিশুখৃষ্টের একাধিপত্য হওয়া আবশ্যক এবং হিন্দুজাতির যে সকল প্রাচীন কুসংস্কার ও হিন্দুধর্ম্মের যে সকল কুপ্রথা ভারতবর্ষকে অনুন্নত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ফলতঃ সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টত্ব প্রবেশ না করিলে ভারতের মঙ্গল নাই।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই নীলকণ্ঠ রোগে আদিতে একজন বিশিষ্ট হিন্দু ছিলেন, তাঁহার পিতৃকুল ও মাতুলকুলস্থ ব্যক্তিগণ সনাতন হিন্দুয়ানীর পালন জন্য প্রখ্যাত ছিলেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজের বহুপ্রকার কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, হিন্দুর জন্য তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিত এবং হিন্দুসমাজের মঙ্গল জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেন। যে কোন কারণেই হউক, নীলকণ্ঠ নগরে শাস্ত্রী খৃষ্টান হইয়াই দেশীয় পোষাক ছাড়িলেন, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। হিন্দুসমাজকে বিষ চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন এবং যত দিবস জীবিত ছিলেন হিন্দুর সামাজিক প্রথা, রাজনৈতিক উন্নতি, ধর্ম্ম, ভাষা, সাহিত্য, চরিত্র, গৌরব, সৌরভ প্রভৃতির বিরুদ্ধে লেখনী চালাইয়াছিলেন এবং বক্তৃতা করিতেন। যখনই হিন্দু ও অহিন্দুতে বিবাদ ঘটিত, তিনি অমনি অহিন্দুর পক্ষ সমর্থন করিতেন এবং হিন্দু জাতি যাহাতে উৎসন্ন যায়, তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে সুবিধা পাইলে ত্রুটি করিতেন না। ইহা কেবল নীলকণ্ঠ গোরে বলিয়াই নহে, স্বধর্ম্ম ছাড়িলেই এইরূপ প্রবৃত্তি জন্মে, স্বধর্ম্ম ভাল না বাসিলেই এইরূপ হয়। কালাপাহাড় ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই হিন্দুর দেব-দেবীর মন্দির চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বিগ্রহের হাত পা কাটিতে লাগিলেন, হিন্দুর শাস্ত্র অগ্নিতে পোড়াইয়া দিতে লাগিলেন এবং হিন্দুর সঙ্গে সমর ঘোষণা করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বেরাম খাঁ মুসলমান সম্রাটের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন, ইনি আদিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুসলমান হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে যৎপরোনাস্তি শত্রুতা করিয়া গিয়াছেন, ইহার দ্বারা হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঞ্জাবার (Tangore) নগরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেদনায়কম্ শাস্ত্রীয়ার এক সময়ে তাঞ্জরের রাজবাটীর প্রধান সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহার পৌত্র জ্ঞানখানী শাস্ত্রীয়ার এখনও জীবিত আছেন। বেদনায়কম্ শাস্ত্রী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইনি যেমন সংস্কৃতাধ্যাপক, তেমনি কবি। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত বহু সংস্কৃত পাঠশালা, দেবমন্দির, অতিথিশালা, পুস্তকালয় প্রভৃতি দ্বারা অসংখ্য হিন্দুর অগণ্য প্রকারে উপকার হইত। এই বেদনায়কম্ শাস্ত্রীয়ার খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পিতৃপুরুষবর্গের সমুদয় হিন্দুকীর্ত্তি উঠাইয়া দিলেন, হিন্দুর বিরুদ্ধে লেখনী চালাইতে আরম্ভ করিলেন এবং যত দিবস ধরাধামে জীবিত ছিলেন, ততদিবস হিন্দুজাতি, হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম্মকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের নামজাদা প্রফেসর মিষ্টর সত্যনাদন, এম, এ, এম, এল, খৃষ্টান; ইহার পিতা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে ইহারা বিশিষ্ট হিন্দু ছিল। হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পরে, এই দুই পুরুষের মধ্যে ইহার স্বদেশ, স্বদেশীয় ভাষা, ও সাহিত্য, হিন্দুধর্ম্ম ও ভারতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় গবর্ণমেণ্টের কাছে গোয়েন্দাগিরির কার্য্য করিয়াছে এবং যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে খৃষ্টান ভিন্ন আর কাহারও একটি কথাও না চলে তারারই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গিয়াছে। সমস্ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি একথা জানে; ইহা লুকানো কথা নয়। রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিত ও বংশ-বিবরণ পাঠ করিয়া জানিতে পারি, তিনি বিশিষ্ট হিন্দুবংশে ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টান হইয়া তিনি গোমাংস আহারপূর্ব্বক হাড়গুলা ঘরের জানালা বা ছাদ হইতে পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুর ঘরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন! এই সভার উপস্থিত অনেক ভদ্রমহোদয় বোধ হয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া থাকিবেন। আমিও তাঁহাকে বহুবার দেখিয়াছি, বহুবার তাঁহার চৌরাঙ্গীর বাটীতে গিয়া কথোপকথন করিয়াছি এবং অনেকবার তাঁহাকে পত্রও লিখিয়া ছিলাম। এই কৃষ্ণমোহন খৃষ্টান হইবার পরে কখন ধুতী-চাদর পরেন নাই, সমস্ত জীবন ইংরাজী পোষাক পরিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ সাহেবী ধরণে ভোজন করিতেন এবং তাঁহার বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শিখেন নাই। তাঁহার সমুদয় বাঙ্গলা ও ইংরাজি গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত আছে, হিন্দুসমাজের ধ্বংসের ব্যবস্থা আছে এবং হিন্দুজাতির নিন্দাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ আছে। কৃষ্ণমোহন সমস্ত জীবন খৃষ্টানের গোঁড়ামী ও গবর্ণমেণ্টের গোঁড়ামী করিয়াছেন, দেশের জন্য কখনও একটা কথা বলেন নাই বা লেখেন নাই। লর্ড লিটন কর্ত্তৃক ১৮৭৩ অব্দের ১৪ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন বিধি-বদ্ধ হইলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ যখন ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি কতিপয় দেশহিতৈষী ব্যক্তির নিতান্ত অনুরোধে প্রকাশ্য সভায় যোগ দেন এবং মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান আসোসিয়শনের সভাপতির পদ গ্রহণপূর্ব্বক দেশের জন্য কিছু কিছু বলেন, কিন্তু এই অনুরোধের পূর্ব্বে এদেশীয় হিন্দু সমাজের সহিত সহানুভূতি ছিল না, ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া কহিতে পারি।

(ক্রমশঃ)

১৫শ বর্ষ। ফাল্গুন ও চৈত্র। ১১শ ও ১২শ সংখ্যা।
১৮৩০, ১৩১৫।

হিন্দু-পত্রিকা।

(ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮৩০।

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৫শ বর্ষ, ১৫শ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। | ফাল্গুন। | ১৩১৫ সাল, ১৮৩০ শকাব্দা

হিন্দুধর্ম্মকে কেন ভালবাসি ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তিনি দেশীয় তাঁতীর উপকারে আইসেন নাই, দেশীয় মিস্ত্রির উপকারে আইসেন নাই, দেশীয় বাদ্যযন্ত্র-নির্ম্মাণকারীর উপকারে আইসেন নাই, হিন্দু পাচক বা ভৃত্যের উপকারে আইসেন নাই, তাঁহার সমুদয় টাকা বিদেশীয় ধনভাণ্ডারে গিয়াছিল এবং খৃষ্টানের উদর-পূরণেই ব্যয়িত হইয়াছিল। হিন্দুসমাজের তিনি কোন ধার ধারিতেন না। পঞ্জাবের কপূর্রতলার রাজকুমার প্রিন্স্ হরনাম সিংহ কে, সি, এস,, আই মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন কি ? ইনি বাঙ্গালী পাদ্রী গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সুন্দরী ও যুবতী কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গোলোকনাথের কন্যা—অর্থাৎ প্রিন্স্ হরনাম সিংহের রাণী এখনও জীবিতা। হরনামসিংহ এই জন্য কপূর্রতলার গদীতে বসিবার অধিকারী বলিয়া ঘোষিত হয়েন। যাহা হউক, প্রিন্স হরনাম যে বংশ হইতে সমুদ্ভূত, সেই বংশ হিন্দুজাতির পরম সহায় ও আশ্রয়। কিন্তু প্রিন্স হরনাম সিংহ খৃষ্টান হওয়ায় আর হরনামের বংশে হিন্দুর কল্কে পাবার যো নাই। যেন হরনাম আর আমাদের কেহ নয়, যেন বিলাত, খৃষ্টান জাতি, খৃষ্টান সাহিত্য, খৃষ্টানধর্ম্ম, খৃষ্টান সমাজ, ও খৃষ্টান গবর্ণমেণ্টের সহিত তিনি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন! কেবল তাহাই নহে, তিনি দেশের কেহ নহেন; বিলাতী বণিক, বিলাতী সওদাগর, বিলাতী মিস্ত্রী, বিলাতী গ্রহকার,

বিলাতী ওস্তাগর তাঁহার অর্থ খায়, তিনি হিন্দুসমাজের কাহারও নিকট হইতে একটি পয়সা দিয়াও কোন দ্রব্য খরিদ করেন না। সে দিনকার পূর্ব্ববঙ্গের জামালপুর, সেরপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, সেরাজগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের মুসলমানদের কাণ্ডকারখানাটা স্মরণ আছে কি? এই সকল মুসলমানগুলোর আদি পুরুষ হিন্দু ছিল, ইহারাও হিন্দু থাকিলে, সে দিনকার অত্যাচার কি সংঘটিত হইত? ইহারা মুসলমান হইয়া যেন হিন্দুর ঘোরতর শত্রুরূপে পরিণত হইয়াছিল। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সে দিন ইহারা কত শত হিন্দুকুলবধূর প্রকাশ্যভাবে সতীত্ব নষ্ট করিল, কত হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া দিল, কত দেব-দেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিল, কত দেবালয়ে গরুর মাংস টাঙ্গাইয়া দিল, কত হিন্দুর ঘর লুট করিল, কত হিন্দুর মুখে বলপূর্ব্বক গোমাংস দিয়া ধর্ম্ম ও জাতি নষ্ট করিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? এখন বুঝিলেন কি, স্বধর্ম্মকে ভাল না বাসিলে ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয় এবং স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে কি ফল হয়, পূর্ব্ববঙ্গের দুর্বৃত্ত মুসলমান-অত্যাচার তাহার অকাট্য প্রমাণ। একদা আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, প্রান্তপ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ, আসিয়ার বহু দেশ-প্রদেশ হিন্দুরাজত্ব ছিল, ইহা অখণ্ডনীয় সত্য; মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায় ইহা এক্ষণে মুসলমান রাজ্য বলিয়া গণ্য। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ এক সময়ে হিন্দু ছিলেন, এখন তাঁহাদেরই সন্তানবর্গ আমাদিগকে 'কাফের' বলিয়া গালি দেয় ও ঘৃণা করে এবং আমাদিগকে মারিয়া ফেলিলে স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে! মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ২৯ লক্ষ লোক খৃষ্টান, ইহাদের অধিকাংশ একদা হিন্দু ছিল। সমগ্র মালাবার উপকূলের অর্দ্ধাপেক্ষা অধিকাংশ স্থলে এখন একটিও হিন্দু নাই, কেবল রোমানকাথলিক, প্রটেস্‌টাণ্ট ও সিরীয়ান খৃষ্টান বংশে পরিপূর্ণ। ভাবুন দেখি, হিন্দুর সংখ্যাও কত কম হইয়া গিয়াছে! কেবল তাহাই নহে, পর্টুগীজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া এই সকল মালাবারী খৃষ্টানরা একদা বলপ্রকাশ পূর্ব্বক উহাদের সহায়তায় ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, রামনাদ, মাদুরা, কালিকট, জামোরীন প্রভৃতি স্থানের হিন্দু রাজাদিগকে খৃষ্টান করিবার চেষ্টাও করিয়াছিল। দুই একস্থলে কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। এখন ভাবুন, হিন্দুধর্ম্মকে ভাল না বাসিলে পরিণাম ফল কিরূপ বিষময় হইয়া থাকে। তাহাতেই বলিতেছি, স্বধর্ম্মকে ভালবাসা আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। ভাল না বাসিলে ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য, শাস্ত্র, সামাজিক প্রথা, জনবল, বাহুবল, রাজনৈতিক বল, প্রভৃতি একেবারে কমিয়া যায়। তাহার পরে আর একদিক দেখুন। হিন্দুরা মুসলমান হইয়া ভাষাটাকে কেমন বিগড়াইয়া লইয়াছে; উর্দ্দু ও পার্শী ভাষা চালাইবার জন্য ইহাদের যত্ন কেমন; ইহাদের পোষাক পর্য্যন্ত কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হিন্দুর প্রতি অনেকের কেমন একটা বিজাতীয়

বিদ্বেষ জন্মিয়া গিয়াছে। বৎসরের মধ্যে অনেকবার হিন্দু ও মুসলমানে লড়াই ও দাঙ্গার কথা শুনিতে পাই। যাহাতে হিন্দু অধঃপতিত হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়, আর মুসলমানের 'বোল্‌বোলাও' হয়, মুসলমান ভায়ারা গবর্ণমেণ্টকে সে পরামর্শ দিতেও ত্রুটি করেন না, অথচ ইঁহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষ কেহ ভট্টাচার্য্য, কেহ চট্টোপাধ্যায় কেহ লাহিড়ী, কেহ ভাদুড়ী, কেহ ঘোষ, বসু বা সেন গুপ্ত ছিলেন! দেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কাণ্ড কারখানাটা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহাদের গির্জ্জায় ইহারা যে গান গায়, তাহার সুর আমাদের দেশীয় সা, রি, গা, মা প্রভৃতি চিরপ্রচলিত সুরের বাঁধনী নহে, ইহা দেশীয় রাগ-রাগিণী বা তাল-লয় নহে, ইহা বিলাতী লা—লা—লা—লা—লা—লা নামক অদ্ভুত রাগের সহিত বাঁধা; ডোশো মোলো সোলো প্রভৃতি তালের সঙ্গে বাঁধা। বেহালাটা বিলাতী, হার্ম্মোনিয়ম ও পিয়ানো অবশ্য বিলাতী, সুর ও 'লয়' ও বিলাতী, গানের বাঁধুনীও বিলাতী ধরণের। সুতরাং গির্জ্জার মধ্যে বাঙ্গালী খৃষ্টান স্বদেশীয় সংগীত বিদ্যাকে বলি দেন। অবস্থা নিতান্ত হীন না হইলে ধুতী পরেন না, আর দেশী জুতাও ব্যবহার করে না, সুতরাং দেশী তাঁতী বা জোলা কিম্বা মুচীগণ খৃষ্টীয় প্রভুদের কাছ হইতে রিক্ত হস্তে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইহারা দেশীয় সম্বাদপত্রকে একটা বেণের মশলা বাঁধা কাগজ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং ছেলে বেলা হইতেই ইংরাজী ভাষা, বাইবেল, খৃষ্টান ধর্ম্মের নিয়ম, হিন্দুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব প্রভৃতি শিক্ষা করেন। ইঁহাদের ইচ্ছা, সমস্ত দেশটা খৃষ্টান হইয়া যাউক, রাজা ও নবাবগুলো পর্য্যন্ত খৃষ্টান হউক, খৃষ্টান-রাজত্ব যুগযুগান্তর অটুট থাকুক, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী প্রভৃতি চুলায় যাউক, আর ইঁহারা 'বনের ভিতর শেয়াল রাজা' হইয়া সুখে স্ত্রী-পুত্র লইয়া ঘর করুন। আবার যে সকল বাঙ্গালী খৃষ্টান-হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, সাওজী, ইংরেজ প্রভৃতির ঘরে বিবাহ করে, সে স্থলে দেখা যায়, কেবল এক একটা হিন্দু-পরিবার নষ্ট হইল তাহা নহে, পরন্তু এক একটা বাঙ্গালী বংশ একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল, বাঙ্গালীর নাম, চিহ্ন, ভাষা, সমাজ, সাহিত্য, জাতীয় প্রথা একেবারে রসাতলে গেল। দেশীয় খৃষ্টান-সমাজকে যদি ভাল করিয়া দেখেন, সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া যদি হিন্দুর সহিত অহিন্দুকে মিলাইয়া দেখেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, হিন্দু অহিন্দু হইলেই দেশকে ভুলিবে, সমাজকে ভুলিবে, জাতিকে ভুলিবে, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যকে ভুলিবে, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিকে উন্নতির পথে কণ্টক হইবে, দেশের প্রতি সহানুভূতি ছাড়িবে এবং পরিণামে, ঘরের ঢেঁকি কুম্ভীর, কিম্বা 'ঘরভেদী বিভীষণ' হইয়া ভারতের সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বনাশ করিতে সমুদ্যত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

সংক্ষিপ্ত রামায়ণ।

[আদি কবিতার ইতিবৃত্ত সমেত]

("রামায়ণ" সমগ্র হিন্দু ভারতের চির-হৃদয়রত্ন। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই আবাল-বৃদ্ধ হিন্দু নর নারীর কণ্ঠে২ আবমানকাল সুধাময়ী রামায়ণী কথা কীর্ত্তিত হইতেছে। মূল সংস্কৃতের অনুবাদরূপে বা স্থূল ভাবানুসারে নবকল্পনা-পল্লবিতরূপে ভারতের প্রতি প্রাদেশিক ভাষাতেই এই রামায়ণ রচিত, পঠিত, গীত ও অভিনীত হইয়া থাকে। হিন্দু-ভারতের সামাজিক, পারিবারিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় দিক্ই রামায়ণী নীতির ভাব-সংস্কারে শাসিত ও সংস্কৃত হইয়া থাকে। এরূপ অসাধারণ প্রভাবশালী মহাকাব্য জগতে আর দ্বিতীয় নাই। গ্রন্থাকারে হিন্দুর একরূপ পরমবন্ধু ও নিত্যচিত্তসহচর আর নাই। সংক্ষেপতঃ—রামায়ণ যেন হিন্দু-সমাজের সাহিত্যিক সর্ব্বস্বধন।"

এই রামায়ণ মূলতঃ নানাবিধ। তন্মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণই প্রধান, প্রখ্যাত ও প্রামাণিক। সমগ্র রামায়ণের চিরকৌতুহলপ্রদ ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ থাকাতে, সেই সর্ব্ববাদিস্বীকার্য্য মূলপ্রামাণ্য বাল্মীকি-রামায়ণের প্রারম্ভ-বর্ণিত সংক্ষিপ্ত রামায়ণের যথাসাধ্য সরল বঙ্গানুবাদ এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল এবং তৎসংসৃষ্ট আদি কবিতামৃত-প্রবাহের ইতিহাস অতি মনোহর বিধায় এবং উহা আদি ও অদ্বিতীয় মহাকাব্য রামায়ণের মহাকবির অমরকবিত্ব-কীর্ত্তির আদিভিত্তিপত্তন বিধায়, এতৎসহ প্রকাশিত হইল। এইরূপ সময়২ বিভিন্ন প্রয়োজন কল্পনায় ইহার (বা আর্ষগ্রন্থান্তরের) বিভিন্নাংশ প্রকাশিত হইবে।)

—•:•:•—

"রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥"

তপস্যা ও শাস্ত্রতত্ত্বনিরত বাক্যবিশারদগণের প্রধান মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে তপস্বী বাল্মীকি এই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অধুনা ইহলোকে এমন কে আছেন, যিনি গুণবান, বীর্য্যবান, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সচ্চরিত্র, সর্ব্বজীবের হিতকারী, বিদ্বান, সর্ব্ব বিষয়ে সুদক্ষ, অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন, আত্মবান, জিত-ক্রোধ, অসূয়াশূন্য এবং সংগ্রামে কাহার সরোষ-মূর্ত্তি দর্শনে সুরগণও শঙ্কিত হইয়া থাকেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি এবং তদর্থে আমার পরম কৌতুহল জন্মিয়াছে। হে মহর্ষে! আপনিই এতাদৃশ ব্যক্তির বিষয় জানিতে সমর্থ।

ত্রিলোকতত্ত্বজ্ঞ নারদ বাল্মীকির এইরূপ বাক্য শুনিয়া, আনন্দিতচিত্তে "তবে শ্রবণ কর" এইরূপ বাক্যে আমন্ত্রণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে মুনে! তুমি যে সমস্ত গুণের বিষয় বর্ণন করিলে, তাহা অতীব দুর্লভ; কিন্তু আমি বুদ্ধিসংযোগ-সহকারে তাদৃশ গুণশালী এক পুরুষের পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত বহুজনবিশ্রুতনামা রামচন্দ্র। তিনি সংযতাত্ম, মহাবীর্য্যবান, দীপ্তিমান, ধৃতিমান, জিতেন্দ্রিয়, নীতিমান, শ্রীমান, বাগ্মী

ও শত্রুসংহারকারী। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় বিপুল, বাহুযুগল বিশাল, গ্রীবদেশ শঙ্খসদৃশ, হনু সুপ্রশস্ত। তিনি মহাধনুঃশরান্বিত, তাঁহার স্কন্ধসন্ধিদ্বয় সুমিলিত, তিনি বিপক্ষদমনদক্ষ, সুবিস্তৃতবক্ষ, আজানুলম্বিতভুজধারী; তাঁহার মস্তক সুন্দর, ললাট সুপ্রসর; তিনি বিপুল বিক্রমধর। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুমিতি-বিভক্ত, বর্ণ সুস্নিগ্ধ, তিনি প্রবলপ্রতাপান্বিত। পীনবক্ষ, বিশালাক্ষ, লক্ষ্মীবান ও সর্ব্বসুলক্ষণা-কৃতিমান। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, প্রজা-গণের হিতে রত; তিনি কীর্ত্তিমান, জ্ঞান-বান, পরিত্রাত্মা ও সমাধিমান। তিনি সাক্ষাৎ প্রজাপতিতুল্য, শ্রীসম্পন্ন, ধাতা ও রিপু-নিধনকর্ত্তা। তিনি জীবলোকের রক্ষক, স্বধর্ম্মের ও স্বজনসমূহের সুপালক। তিনি বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ, ধনুর্ব্বেদে সুবিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-বিশারদ, স্মৃতিমান ও সুপ্রতিভাশালী। তিনি সর্ব্বলোকপ্রিয়, সাধু, অদীনাত্মা ও বিচক্ষণ। যেরূপ সাগরসমূহ মহাসাগরের অনুগত, সেইরূপ সাধুসমূহও এই সাধুপ্রবরের অনুগত। ইনি সর্ব্বপূজ্য, সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং সর্ব্বদা সুপ্রিয়-দর্শন। সেই সর্ব্বগুণনিকেতন, কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন রাম গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রসম, ধৈর্য্যে হিমা-চলোপম। বীর্য্যে বিষ্ণুতুল্য, সৌন্দর্য্যে সোম-সদৃশ। ক্রোধে কালানলসম, ক্ষমায় পৃথ্বী-প্রতিম। দানে ধনদেবের ন্যায়, সত্যে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের প্রায়।

রাজা দশরথ এতাদৃশ সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন সত্যপরাক্রম, শ্রেষ্ঠ গুণী স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র প্রজা-হিতৈষী শ্রীরামচন্দ্রকে প্রজাবর্গের প্রিয়হিত-কামনায় পরম প্রীতিপূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন।

রাজা দশরথ রাজমহিষী কৈকেয়ীকে পূর্ব্বে দুটি বর দিবেন, অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন; এক্ষণে রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ দেখিয়া, কৈকেয়ী রামের নির্ব্বাসন ও ভরতের রাজ্যাভিষেকরূপ সেই দুই বর প্রার্থনা করিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ দশরথ অঙ্গীকাররূপ ধর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকায়, অগত্যা স্বীয় প্রিয় পুত্র রামকে বনে নির্ব্বাসিত করিলেন। বীরবর রামও পিতৃপ্রতিজ্ঞা পালনার্থ পিত্রাজ্ঞায় ও কৈকেয়ীর প্রিয়সাধনকামনায় বনে গমন করিলেন। তখন সুবিনয়ী ও সুভ্রাতৃবৎসল সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণও ভ্রাতৃ-প্রেমবশে ও সৌভ্রাত্রপ্রদর্শন-আশে বনগামী ভ্রাতা রামচন্দ্রের অনুগামী হইলেন। রামের প্রাণসমা প্রিয়তমা নিত্যপতিহিতরতা দেব-মায়ারূপে নির্ম্মিতা, সর্ব্বসুলক্ষণভূষিতা, ললনা-কুলললামভূতা জনককুলজাতা সূর্য্যকুলবধূ সীতাও শশী-অনুগামিনী রোহিণীর ন্যায় রামচন্দ্রের অনুগমন করিলেন। পিতা দশরথ এবং পুরবাসিগণ অনেক দূর পর্য্যন্ত রামের অনু-গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণসহ গঙ্গাকূলে অবস্থিত শৃঙ্গবের নামক জনপদে উপনীত হইয়া, তথায় স্বীয় প্রিয় মিত্র নিষাদপতি গুহককে প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র গুহ প্রভৃতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণসহ বহুজলপূর্ণা নদী উত্তীর্ণ হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে চিত্রকূট পর্ব্বত প্রাপ্ত হইলেন এবং তথায় ভরদ্বাজ মুনির উপদেশানুসারে রম্য কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক দেব গন্ধর্ব্ব তুল্য সেই তিন জনে সেই বনে আনন্দিত মনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রাম চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলে, এদিকে

পুত্রশোকাতুর রাজা দশরথ পুত্রের জন্য বিলাপ করিতে করিতে স্বর্গধামে গমন করিলেন। রাজা গত হওয়ায়, বসিষ্ঠ প্রমুখ বিপ্রগণ ভরতকে রাজ্যপালনার্থ নিয়োগ করিলেন। কিন্তু মহাবল বীরবর ভরত রাজ্যভার গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া, পূজ্যপাদ শ্রীরামচন্দ্রের প্রসন্নতা-লাভাশায় তদুদ্দেশে বনে গমন করিলেন। তিনি আর্য্যভাবভূষিত সুবিনীতভাবে মহাত্মা সত্যপরাক্রম ভ্রাতা রামের সমীপবর্ত্তী হইয়া, রামের রাজ্যগ্রহণ-সম্মতি প্রার্থনাপূর্ব্বক সানুনয়ে কহিলেন,—"আপনি স্বয়ং ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মানুসারে আপনিই রাজা।" পরমোদার-চরিত, প্রসন্নবদন, মহাবল, মহাযশস্বী রামও পিত্রাদেশ পালনার্থেই রাজ্যভার গ্রহণে অসম্মত হইলেন; কিন্তু ভরতাগ্রজ রাম ভরতের পুনঃ পুনঃ আগ্রহে অবশেষে স্ব-প্রতিনিধিস্বরূপ স্বীয় পাদুকাযুগল প্রদানপূর্ব্বক ভরতকে প্রতিনিবর্ত্তিত করিলেন। ভরত রামের প্রত্যাবর্ত্তন বিষয়ে নিরাশ হইয়া, অগত্যা রামের পদদ্বন্দ্ব বন্দনা করিয়া নন্দিগ্রামে গিয়া, তাঁহার পুনরাগমন প্রতীক্ষায় তথায় রাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভরত চলিয়া গেলে, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয় শ্রীমান রামচন্দ্র, ঐ স্থানে থাকিলে, তথায় পুরবাসিগণের পুনঃ পুনঃ আগমনের সম্ভাবনা অনুমান করিয়া, তথা হইতে একাগ্রচিত্তে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। কমললোচন রাম সেই মহাবনে প্রবেশপূর্ব্বক 'বিরাধ' নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া, তথায় শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য-ভ্রাতা প্রভৃতি মুনিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরে অগস্ত্য ঋষির উপদেশ বাক্যানুসারে রামচন্দ্র ইন্দ্রদত্ত ধনু, অক্ষয় শরপূর্ণ তূণযুগল ও উৎকৃষ্ট খড়্গাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রীতচিত্তে বনবাসী মুনিগণ সহ সেই দণ্ডক বনে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে বহু ঋষি (তপোবিঘ্নকারী) রাক্ষস ও অসুরগণের নিধনসাধন প্রার্থনায় রাম-সন্নিধানে সমাগত হইলেন। রামও সেই দণ্ডককাননবাসী বহ্নিবৎ তেজস্বী ঋষিগণের প্রার্থনানুসারে যুদ্ধ করিয়া রাক্ষসগণের বধার্থ প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর তথায় জনস্থান-বাসিনী কামরূপিণী রাক্ষসী শূর্পণখা তৎকর্ত্তৃক (নাসাচ্ছেদ ফলে) অতি বিরূপা হইল। পরে ঐ শূর্পণখার বাক্যে উত্তেজিত হইয়া খর, দূষণ ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসত্রয় অন্য সমস্ত রাক্ষসসহ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, রাম তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনাশ করিলেন। রাম কর্ত্তৃক উক্ত জনস্থাননিবাসী সানুচর চতুর্দ্দশ সহস্র সংখ্যক সমস্ত রাক্ষস নিহত হইল। অনন্তর জ্ঞাতি বধ বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধ মোহোন্মত্ত রাবণ মারীচ নামক রাক্ষসকে তাহার সহকারীরূপে বরণ করিল; কিন্তু মারীচ—"হে রাবণ! এই মহাবলবান রামের সহিত বিরোধে তুমি অশক্ত, সুতরাং এই বিরোধ তোমার পক্ষে অহিতকর ও অযুক্ত" এইরূপ বাক্যে বহুবার রাবণকে বারণ করিলেও, রাবণ কাল-প্রেরিতের ন্যায় তদ্বাক্য অনাদর করিয়া মারীচকে সঙ্গে লইয়া রামের আশ্রম উদ্দেশে গমন করিল। পরে সে মায়াবী মারীচের মায়াদ্বারা (রাম ও লক্ষ্মণ) রাজপুত্র দ্বয়কে দূরে সরাইয়া ও 'জটায়ু' নামক গৃধ্রকে নিহত করিয়া রাম-ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।

অনন্তর উক্ত জটায়ু নামক গৃধ্রকে নিহত দেখিয়া ও (মৃত্যুকালে তন্মুখে) "মৈথিলী অপহৃতা হইয়াছেন" এই বার্ত্তা শুনিয়া, রাঘব

শোকসন্তপ্ত ও আকুলেন্দ্রিয় হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপর জটায়ু পক্ষীর অগ্নিসৎকার করিয়া, সীতাবিরহ শোক-ব্যাকুল রাম বনে বনে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে "কবন্ধ" নামক এক ঘোরদর্শন বিকটাকার রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন এবং মহাবাহু রাম তাহাকেও নিহত করিয়া দগ্ধ করিলেন। তাহাতে সে স্বর্গগতি-লভ্য দিব্য দেহ ধরিয়া কহিল,—"হে রাঘব! তুমি ধর্ম্মচারিণী ও ধর্ম্মতত্বজ্ঞানধারিণী তপস্বিনী শবরী সমীপে গমন কর।" তদনুসারে শত্রু-সূদন মহাতেজা দশরথাত্মজ রাম শবরী-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পূজিত হইলেন। পরে রাম "পম্পা" নাম্নী প্রবাহিণীর তীরে "হনুমান" নামক বানরের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং হনুমানের কথানুসারে সুগ্রীবের সঙ্গতিলাভ করিয়া, তৎসকাশে স্বীয় আদি বৃত্তান্ত ও বিশেষরূপে সীতার বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। সুগ্রীবও রাম-প্রমুখাৎ তত্তাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া, অগ্নি সাক্ষী করিয়া অতি প্রীতিভরে রামের সহিত সখ্যবন্ধনে সংবদ্ধ হইল।

অনন্তর (রাজ্যভ্রষ্ট ও ভার্য্যাবিরহ শোকাক্লিষ্ট) দুঃখিত বানররাজ সুগ্রীব মৈত্রী-পণয় প্রযুক্ত (সমাবস্থাপন্ন মিত্র)· রামকে সমস্ত অবস্থা বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক স্বীয় শত্রু বালির বধার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইল। রামচন্দ্র বীর্য্যে বালীর সমতুল্য কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত এবং বালীর বিপুল বীর্য্যে নিত্য শঙ্কিত বানররাজ সুগ্রীব বালীর বলবত্তা বর্ণনপূর্ব্বক রামের প্রত্যয়ার্থ বালীকর্ত্তৃক নিহত "দুন্দুভি" নামক দৈত্যের প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার মৃত দেহ রামকে দেখাইল। মহাবাহু রামচন্দ্র সেই দেহ-কঙ্কাল দর্শনপূর্ব্বক মৃদুহাস্যমুখে স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ চালনে উহা অবলীলাক্রমে দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং মহাশর সম্পাতে সপ্ততাল, পাতাল ও পর্ব্বত ভেদ করতঃ (স্বীয় বীর্য্য বিষয়ে) সুগ্রীবের প্রত্যয় জন্মাইলেন।

অনন্তর মহাকপি সুগ্রীব বিশ্বস্ত – আশ্বস্ত— আনন্দিত মনে শ্রীরামকে লইয়া কিষ্কিন্ধ্যানগরীর এক পর্ব্বতগুহায় গমন করিল। তখন স্বর্ণ-পিঙ্গলবর্ণ বানরবর সুগ্রীব মহাগর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেই নিনাদ শ্রবণে বানরেশ্বর বালী তারার অনুমোদন গ্রহণপূর্ব্বক নির্গত হইয়া, সুগ্রীবের সহিত সমরে সংসক্ত হইল। অমনি তখনই রাঘব এক বাণেই বালীকে বধ করিলেন। এইরূপে রঘুকুলতিলক রাম সুগ্রীবের বাক্যানুসারে রণস্থলে বালীর নিধন সাধনপূর্ব্বক তদ্রাজ্যে সুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর কপীশ্বর সুগ্রীব সমস্ত কপিগণকে সমানয়নপূর্ব্বক জনকাত্মজা সীতার উদ্দেশার্থে তাহাদিগকে দিকে দিকে প্রেরণ করিল। মহাবলবান হনুমান "সম্পাতি" পক্ষীর বাক্যানুসারে শত যোজন বিস্তৃত লবণ মহাসাগর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাবণ-রক্ষিতা লঙ্কাপুরীতে উপনীত হইয়া অশোককাননে ধ্যাননিমগ্না সীতা-দেবীকে দর্শন করিল এবং রামের নিদর্শনাঙ্গুরীয় প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্ববৃত্তান্ত ও উদ্দেশ্য নিবেদন সহকারে বৈদেহীকে আশ্বস্তা করিয়া অশোকবন বিমর্দ্দন ও তৎসংলগ্ন তোরণদ্বার ভগ্ন করিল। পরে সে পঞ্চ সেনানী ও সপ্ত মন্ত্রিসুতকে বধ করিয়া এবং রাবণ-নন্দন অক্ষকে নিষ্পেষিত করিয়া, স্বয়ং বিপক্ষ-পক্ষের বন্ধনগ্রস্ত হইল; কিন্তু ব্রহ্মার বরপ্রভাবে আপনাকে

উক্ত পাশাস্ত্র প্রমুক্ত জানিয়া, সেই পাশ পরিচালক রাক্ষসগণকে বীর হনুমান যদৃচ্ছাক্রমে ক্ষমা করিল। পরে সেই মহাকপি, মৈথিলী সীতাদেবীর বাসস্থলী ব্যতীত সমগ্র লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া রাম সমীপে প্রিয়বার্ত্তা প্রদানার্থ পুনরাগত হইল।

বীর হনুমানে রাম সকাশে প্রত্যাগত হইয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নিবেদন করিল যে, সে সীতাদেবীকে প্রকৃত পক্ষেই দর্শন করিয়া আসিয়াছে। অনন্তর রাম সুগ্রীব সহ সমুদ্র-তীরে সমাগত হইয়া, সূর্য্যতেজসন্নিভ শরসমূহ দ্বারা সিন্ধুবক্ষ সংক্ষুব্ধ করিলেন। তখন সরিৎপতি সমুদ্র নিজমূর্ত্তি ধরিয়া সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। পরে রাম সমুদ্রের বর-বাক্যানুসারেই নলকর্ত্তৃক পার-সেতু প্রস্তুত করাইলেন এবং তদ্দ্বারা লঙ্কাপুরে গিয়া, যুদ্ধে রাবণকে বধ করতঃ সীতাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অতীব লজ্জাবোধ করিলেন এবং তজ্জন্য সীতাকে বহুজন সমক্ষে পরুষবাক্য বলাতে, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সীতা সতী জলন্ত অনলে প্রবেশ করিলেন! অনন্তর রাম অগ্নি-বাক্যে সীতাকে শুদ্ধা—অপাপবিদ্ধা জানিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে পুনর্গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা রাঘবের এই মহৎ কর্ম্মে দেবগণ ও মুনিগণসহ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র ত্রৈলোক্যভুবন তুষ্ট হইল এবং রামচন্দ্র সর্ব্বদেব কর্ত্তৃক সম্পূজিত ও সুদীপ্ত হইলেন।

তৎপর রাম রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, কৃতকৃত্য, নিশ্চিন্ত ও প্রমোদিত হইলেন এবং দেব-বরলাভে সমর-শায়িত বানরসমূহকে সঞ্জীবিত—সমুত্থিত করিয়া, সবান্ধবগণে পুষ্পক-রথারোহণে সুখে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সত্যপরাক্রম রাম (অযোধ্যা প্রতিগমন-পথে) ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে হনুমানকে ভরতের সমীপে প্রেরণ করিলেন এবং তৎপর সেই পুষ্পক-স্যন্দনে সুগ্রীবাদি স্বজনবৃন্দসহ সানন্দে অতীত ঘটনাবলী সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে করিতে নন্দীগ্রামে গমন করিলেন। নন্দীগ্রামে অনঘ রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণসহ জটাভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সীতার সহিত স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর অযোধ্যাধিপতি দশরথাত্মজ শ্রীমান রাম প্রমুদিত প্রজাপুঞ্জকে পিতৃবৎ পালন করিতে লাগিলেন। রাম-রাজত্বে সমস্ত প্রজাই প্রমুদিত, প্রহৃষ্ট, তুষ্ট, পুষ্ট, সুধর্ম্মনিষ্ঠ, নীরোগ, নিশ্চিন্ত ও দুর্ভিক্ষনির্ভীত হইবে। ক্বচিৎ কোন পুরুষকেই পুত্রের মরণ দেখিতে হইবে না। কোন নারীই বৈধব্য-দুঃখে পতিত হইবে না; সকল নারীই নিত্য পতিব্রতা সতী রহিবে। কাহারও অগ্নি-দহণ, জলমজ্জন, হিংস্রজন্তুর আক্রমণ, ঘোর পবন-প্রবহণ, জ্বরাদি-ব্যাধি-পীড়ন ইত্যাদি কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় থাকিবে না, তথায় অন্নজলাভাব বা দস্যু-তস্করাদির প্রভাব জনিত ভীতিরও নিরাকৃতি হইবে। নগরসমূহ ও সমগ্র দেশই ধন ধান্যে সুসম্পন্ন হইবে। ফলে রাম-রাজত্বে সত্যযুগের ন্যায় সর্ব্বদা সর্ব্বলোকই প্রমোদ-পর্ব্বে নিত্য পুলকিতচিত্ত থাকিবে। রঘুকুল-রশ্মি মহাযশস্বী রাম ভূরিস্বর্ণদক্ষিণক শতসংখ্যক অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক অযুতকোটি গো ও সাধারণ বিপ্রবৃন্দকে অগণিত ধন দান করিবেন। রাম ইহলোকে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া শতগুণ রাজবংশ স্থাপন করিবেন এবং

একাদশ সহস্র বর্ষ রাজ্যভোগে যাপন করিয়া ব্রহ্ম-লোকে গমন করিবেন। আর যিনি এই পুণ্য-কারক, পাপহারক, বেদবৎ পরমপবিত্র রাম-চরিত্র পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বপাতকমুক্ত হন। যে মনুষ্য এই পরমায়ুষ্য রামায়ণ-আখ্যান পাঠ করেন, তিনি পুত্র, পৌত্র ও স্ববর্গ সহ পরলোকে স্বর্গলাভে সম্মানিত ও সুপ্রীত হয়েন। এই রামায়ণ পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ বাক্‌পতিত্ব, ক্ষত্রিয় রাজত্ব, বৈশ্য বাণিজ্য-সফলত্ব ও শূদ্র মহত্ব লাভ করেন।

বাক্যবিশারদ ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকি মহামুনি নারদের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সশিষ্যে তাঁহাকে পূজা করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ বাল্মীকি কর্তৃক যথাবৎ পূজিত হইয়া ও গমনার্থ অনুমতি গ্রহণ করিয়া বিমানপথে প্রয়াণ করিলেন। নারদমুনির দেবলোকে-গমনের মুহূর্ত্তকাল পরেই বাল্মীকি মুনি জাহ্নবীর অদূরবর্ত্তী তমসানদী-তীরে উপনীত হইলেন এবং তথায় কর্দ্দমবিহীন তমসা তীর্থ দর্শনে স্বপার্শ্বস্থিত শিষ্যকে কহিলেন "—হে ভরদ্বাজ! দেখ, এই অকর্দ্দম প্রসন্নসলিল রমণীয় তীর্থ সাধুজনের মনের ন্যায় সুনির্ম্মল। হে তাত! এইখানে কলস রাখিয়া আমাকে বল্কল দেও; আমি এই উত্তম তমসা তীর্থেই স্নানাবগাহন করিব।" গুরুভক্ত ভরদ্বাজ বাল্মীকি মুনির এই বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিলেন। সেই সংযতেন্দ্রিয় মুনিবর শিষ্যহস্ত হইতে বল্কলগ্রহণপূর্ব্বক, তত্রত্য বিপুল বনভূমির সর্ব্বদিক্ দর্শন করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎ-কালে ভগবান বাল্মীকি—তথায় সর্ব্বাশুভবিমুক্ত সুচারু স্বরযুক্ত চরণশীল এক ক্রৌঞ্চ-মিথুন দর্শন করিলেন। অমনি সেই সময় তদ্দৃষ্ট ক্রৌঞ্চ-মিথুনের পুরুষটিকে এক পাপাশয় বৈরনিলয় ব্যাধ আসিয়া বধ করিল তখন সেই রুধিরাপ্লুত ধরাতলবিলুণ্ঠিত-দেহ ক্রৌঞ্চ-পতিকে নিহত হইতে দেখিয়া, তাহার ভার্য্যা ক্রৌঞ্চী অতি করুণরবে রোদন করিতে লাগিল। অহো! অভাগিনী ক্রৌঞ্চ—কেলি মত্ত, প্রসারিতপক্ষ, তাম্রশীর্ষধর নিত্যসহচর পক্ষীবর প্রিয় পতির চিরবিয়োগবিধুরা হইল। নিষাদ-নিহত ক্রৌঞ্চের তাদৃশ দশা ও ক্রৌঞ্চীকে রোদন-বিবশা দর্শনে ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকি মুনির হৃদয় করুণার্দ্র হইল, এবং ব্যাধের এই কার্য্যকে অতীব পাপকার্য্য জ্ঞানে ব্যাধকে বলিলেন,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

অর্থাৎ—

কাম মুগ্ধ ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একে বধি,
রে ব্যাধ! পাবিনা তুই প্রতিষ্ঠা শাশ্বতী।

অনন্তর এই প্রকার বাক্য বলিবামাত্র তাঁহার অন্তরে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল— "আমি এই পাখীটার শোকে কাতর হইয়া এ কি বলিলাম!" এই মহা-প্রাজ্ঞ মতিমান্ মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি এইরূপ চিন্তাদ্বারা মনে স্থিরনিশ্চয় করতঃ শিষ্যকে কহিলেন—"এই যে চারি চরণে নিবদ্ধ, প্রতিচরণ-সমাক্ষরযুক্ত ও তন্ত্রী-লয়-সমন্বিত বাক্য শোকাবেগে আমার মুখ-নির্গত হইল, ইহা 'শ্লোক' নামেই অভিহিত হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না। বাল্মীকি এইরূপ বলিলে, তাঁহার শিষ্য ভরদ্বাজও সন্তুষ্ট-চিত্তে সেই উত্তমোত্তম বাক্য প্রতিগ্রহণ

করিলেন এবং তাহাতে বাল্মীকিও তৎপ্রতি প্রসন্ন হইলেন।

অনন্তর মুনিবর সেই তীর্থে স্নানাভিষেকাদি সম্পাদনপূর্ব্বক এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে প্রতিনিবর্ত্তিত হইলেন, এবং গুরুর বিনীত শিষ্য বেদজ্ঞ ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। সেই ধর্ম্মবিৎ বাল্মীকি শিষ্যসহ স্বীয় আশ্রমে উপনীত হইলেন, এবং উক্ত বিষয়ে ধ্যানস্থ ভাবে উপবিষ্ট হইয়া পরে অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। তৎকালে লোকস্রষ্টা মহাতেজা চতুরানন প্রভু পিতামহ ব্রহ্মা উক্ত মুনিপ্রবরকে দর্শন করিতে তথায় আগমন করিলেন। বাল্মীকি তাঁহাকে দর্শন মাত্র সহসা উত্থিত ও বাগ্যত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে পরম বিস্ময় ও ভক্তিভরে সেই দেবকে পাদ্যার্ঘ্য-আসন-বন্দনাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিলেন এবং প্রণামপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভগবান ব্রহ্মা পরমার্চ্চিত ও গৃহীতাসন হইয়া, বাল্মীকি ঋষিকে কুশল প্রশ্ন করিয়া আসন গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। এইরূপে সাক্ষাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বাল্মীকিও আসনে বসিলেন এবং সেই বিষয়ে তদগতচিত্ততার ফলে ধ্যানাবিষ্ট হইয়া সেই ক্রৌঞ্চীর শোককারুণ্য-ভাবভরে "সেই পাপাত্মা বৈরবুদ্ধি হিংস্রব্যাধ সেই চারুরবকারী ক্রৌঞ্চকে অকারণ হনন করিয়া কি কষ্টদায়ক কর্ম্মই করিয়াছে!" এইরূপ ভাবাভিনিবেশে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্যপ্রায় হইয়া, ব্রহ্মার সাক্ষাতেই পুনরায় সেই শ্লোক গান করিলেন। চতুর্ম্মুখও সহাস্যমুখে মুনিপ্রবর বাল্মীকিকে কহিলেন,—"হে ব্রহ্মণ! তোমার এই চারিচরণ-বদ্ধ বাক্য শ্লোকই হউক, ইহাতে আর বিচার-বিতর্ক কিছু নাই। আমার ইচ্ছাতেই এই সারস্বতী বাণী তোমার বদন হইতে বিনির্গত হইয়াছে। হে ঋষিসত্তম! এইরূপ ছন্দোবদ্ধ বাক্যেই তুমি ধর্ম্মাত্মবান, ধীশক্তিমান ও গুণবান লোকাভিরাম রামের চারুচরিত-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। তুমি ধীমান দেবর্ষি নারদ-প্রমুখাৎ রহস্য ও প্রকাশ্যরূপে তদ্বার্ত্তা যদ্রূপ শুনিয়াছ, তদ্রূপই যথাবৎ বিবরণ কর। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসগণের যে সমস্ত প্রকাশ্য বা রহস্য তোমার অপরিজ্ঞাত আছে, তাহাও (আমার বরে) পরিজ্ঞাত হইবে। এই কাব্যে কথিতা তোমার একটি কথাও মিথ্যা হইবে না। তুমি পুণ্যতমা মনোরমা রাম-কথা শ্লোকবদ্ধ কর। যাবৎ মহীতলে গিরিগণ ও সরিৎসমূহ সংস্থিত রহিবে, তাবৎকাল তব রচিতা এই রামায়ণী কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে। যাবৎ তৎকৃতা রামের কথা জগতে প্রচারিতা থাকিবে, তাবৎ তুমি ঊর্দ্ধাহধঃ সর্ব্বত্র "অপ্রতিহতগতি" হইয়া আমরই লোকে বাস করিবে।" এই বলিয়া ভগবান ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর সশিষ্য ভগবান বাল্মীকি মুনি এই ঘটনায় বিস্ময়প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাঁহার শিষ্যগণ সকলে মিলিয়া পরমপ্রীতিভরে পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক গান করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় বিস্ময়-সহকারে

মুহুর্ম্মুহুঃ বলিতে লাগিলেন—"মহর্ষি শোকাবেগভরে যে সমাক্ষর ও চতুষ্পদবদ্ধ শোক-গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহা শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অনন্তর ভাবুকাত্মা মহর্ষির এইরূপ ভাববুদ্ধি জন্মিল যে,—"সমগ্র রামায়ণ কাব্য আমি এইরূপই রচনা করিব।"

উদারদর্শন কীর্ত্তিমান বাল্মীকি, উদার ছন্দ, উদার অর্থ, মনোরম পদ ও সমাক্ষর-সংবদ্ধ সুললিত শতশত শ্লোক দ্বারা সেই যশোধাম শ্রীরামচন্দ্রের যশস্করী কাব্য-কথা-লহরী রচনা করিলেন।

শব্দশাস্ত্রানুমোদিত সন্ধি-সমাস-প্রকৃতি-প্রত্যয়-সমন্বিত, প্রতিপদে সমাক্ষর, সুমধুর ও সরলার্থ সুবাক্যাবলী-সংবদ্ধ মুনিবর-প্রণীত রঘুবর-চরিত ও দশশিরবধরূপ মহাকাব্য অশ্রু-শ্রাব্য।

বাল্মীকি মুনি ধীমান রামচন্দ্রের ধর্ম্মার্থ-সহিতা পরমার্থহিতকরী চারুচরিত-কথা সমগ্র শুনিয়া, পুনরায় তাহা বিস্পষ্ট ও বিশিষ্টরূপে হৃদিসন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টিত হইলেন। তিনি প্রাচীনাগ্র-কুশাসনে উপবেশনপূর্ব্বক উদক স্পর্শনাদি আচমন পুরঃসর, কৃতাঞ্জলি-মুদ্রায় আসনস্থ হইয়া যোগধর্ম্ম-বলে তদ্বৃত্তান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি ধর্ম্ম-বীর্য্য-প্রভাবে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাজা দশরথ, তাঁহার ভার্য্যাগণ, রাজ্যাধিবাসিগণ, তাঁহাদের হাস্য, ভাষা, কার্য্য, চেষ্টা, গমন-আচরণাদি ও প্রাপ্ত সুখ-দুঃখাদি সমস্তই ধ্যান-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। সত্যসন্ধ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, এই তিনজন বনে অবস্থিত হইয়া যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও যে যে আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইল। ধর্ম্মাত্মা মুনিবর যোগস্থ হইয়া, তদ্বিষয়ক সমস্ত ভূত ও ভাবী বৃত্তান্ত করস্থ আমলকবৎ দেখিতে পাইলেন। মহামতি বাল্মীকি ধর্ম্মবলে লোকাভিরাম রামচন্দ্রের সর্ব্বকর্ম্ম-বিবরণ সুন্দররূপে সন্দর্শন করিয়া, তৎসমুদয় সহযোগে কামার্থগুণযুক্ত ও ধর্ম্মার্থগুণ-বিস্তৃত সর্ব্বশ্রুতি-মনোহর, রত্নময় রত্নাকরবৎ কাব্য-করণে কৃতোদ্যম হইলেন।

মহাত্মা নারদ কর্ত্তৃক রঘুবংশাবতংস রামের যেরূপ চরিত্র কথিত হইয়াছিল, ভগবান মুনিবর তদনুরূপই রচনা করিলেন। রামের জন্মবার্ত্তা, সুমহৎবীর্য্যবত্তা, সর্ব্বানুকূলতা, সর্ব্বলোকপ্রিয়তা, সত্যশীলতা, ক্ষান্তিবহুলতা, শান্তি-সৌম্যতা প্রভৃতি ও তচ্চরিত্রের বিবিধ বিচিত্র কথন, বিশ্বামিত্র-সহায়ে জনকপুর-গমন, তথায় হরধনুভঞ্জন, জানকীর পাণিগ্রহণ, ও সেই দাশরথি রামের সহিত পরশুরামের বিবাদ ও দাশরথির বহুগুণসংবাদ ইত্যাদি বর্ণণ করিলেন। তৎপর রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ, কৈকেয়ীর দুর্ব্বুদ্ধি-প্রয়োগ, রামাভিষেক-বিঘটন, রাম-নির্ব্বাসন, রাজার শোক-বিলাপ-রোদন, পরলোক-গমন, প্রজাপুঞ্জের বিষাদ এবং রামের প্রজাবর্গ-বিবর্জ্জন ও বনগমন বর্ণন করিলেন। পরে নিষাদপতি গুহক-সম্মিলন, সুমন্ত্র সারথীর পুর-প্রত্যাবর্ত্তন, গঙ্গাউত্তরণ, ভরদ্বাজ-দর্শন, ভরদ্বাজাদেশে চিত্রকূট দর্শন, চিত্রকূটে বাস-কুটীরনিবেশন, তথায় ভরতের আগমন,

রাম-প্রসাদন ও পিতৃ উদ্দেশে রামের সলিল-তর্পণ ইত্যাদি বর্ণন করিলেন। পরে রাম-পাদুকার অভিষেক সম্পাদন, নন্দীগ্রাম-নিবাসন, রামের দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধ রাক্ষস-হনন, শরভঙ্গদর্শন, সুতীক্ষ্ণ সমাগম, অনুসূয়া-সম্মিলন, অঙ্গরাগ-অর্পণ, অগস্ত্য-দর্শন, ধনুর্গ্রহণ, শূর্পণখার সহিত কথোপকথন, নাসাচ্ছেদনে তাহার বিরূপকরণ ও খর-ত্রিশির প্রভৃতি রাক্ষস-বধ বর্ণন করিলেন।

তদনন্তর রাবণের সীতা-হরণায়োজন, মারীচ-হনন ও পরে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণ বিবরণ বিরচন করিলেন। পরে রামের বিলাপ, গৃধ্ররাজ জটায়ুর সৎকার, কবন্ধ, পম্পা-সরসী ও শবরী-দর্শন ও ফলমূলাশন, পম্পা-তীরে বিলাপ, হনুমান সমাগম, ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে গমন, সুগ্রীব-সম্মিলন ও তৎসহ সখ্যবন্ধন, সুগ্রীবের প্রত্যয়োৎপাদন, বালি-সুগ্রীবের রণ, (রাম কর্ত্তৃক) বালি-হনন, (বালি-বণিতা) তারার বিলাপ-রোদন ও সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক বর্ণন করিলেন। (শরৎকালে সীতান্বেষণ নিয়-মাবধারণপূর্ব্বক) বর্ষাকাল অতিবাহন; (ঐ নিয়মাতিরেকে ও কালাত্যয়ে) রঘু-কুল-সিংহ রামচন্দ্রের কোপ-বর্ণন এবং সুগ্রীবের সৈন্য-সঙ্কলন ও সর্ব্বদিকে সৈন্য-প্রেরণ ও তদুপলক্ষে পৃথিবীর ভৌগোলিক সংস্থিতি-বিবরণ বর্ণন করিলেন। পরে (রামের) অঙ্গুরীয় দান, (কপিগণের) ঋক্ষ-গহ্বর-দর্শন, প্রায়োপবেশন, সম্পাতি-সন্দর্শন, হনুমানের পর্ব্বতারোহণ, সাগর-লঙ্ঘন, সমুদ্রবচনে মৈনাক-দর্শন, রাক্ষসী-তর্জ্জন, ছায়া-গ্রাহিনী দর্শন, সিংহিকা-নিধন, লঙ্কা ও মলয় দর্শন, রাত্রিযোগে লঙ্কাপুর-প্রবেশন, নিজের একাকীত্ব-চিন্তন, সুরাপান-সভায় গমন; রাবণ ও রাবণের অন্তঃপুরদর্শন, পুষ্পকরথ-দর্শন, পরে অশোক বনে গমন ও তথা সীতা-সন্দর্শন বর্ণন করিলেন। পরে হনুমান কর্ত্তৃক সীতাকে রামের অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় প্রদর্শন, হনু-মানের প্রতি সীতার সম্ভাষণ, রাক্ষসীগণের সীতার প্রতি তর্জ্জন, ত্রিজটারাক্ষসীর স্বপ্নদর্শন, হনুমানকে সীতার মণিপ্রদান, হনুমান কর্ত্তৃক অশোকবন-ভঞ্জন, রাক্ষসী-বিতাড়ন, কিঙ্কর রাক্ষসগণের নিধন, পরে পবননন্দন হনুমানের বন্ধন-গ্রহণ ও তৎ-কর্ত্তৃক লঙ্কাপুরী-দাহন, অভিগর্জ্জন, মধু-হরণ ও তৎপরে পুনরায় সাগর উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক রাম-সমীপে প্রতিগমন ও রাম-আশ্বাসন এবং রামকে সীতার মণিপ্র-দান বর্ণন করিলেন।

তদনন্তর রামের সমুদ্র-সমাগম, নল কর্ত্তৃক সেতুবন্ধন, সমুদ্র-সমুত্তরণ, নিশা-কালে লঙ্কাবরোধন, বিভীষণ-সম্মিলন ও বিভীষণ কর্ত্তৃক রাম-সমীপে রাবণবধোপায়-নিবেদন বর্ণন করিলেন। অনন্তর কুম্ভ-কর্ণ—নিধন, মেঘনাদবধ, রাবণ-নিপাতন ও শত্রুপুরে সীতাপ্রাপ্তি বর্ণণ করিলেন। পরে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পকরথ দর্শন, অযোধ্যা-যাত্রা, পথে ভরদ্বাজ-সমা-গম, ভরত-সমীপে হনুমানকে প্রেরণ, ভরত-সমাগম, রামের রাজ্যাভিষেক-মহোৎ-সব বর্ণণ করিলেন। পরে সর্ব্বসৈন্য-বর্জ্জন, স্বরাজ্য-রঞ্জন এবং বৈদেহী সীতাদেবীকে

বনে বিসর্জ্জন বর্ণন করিলেন। অবশেষে ভগবান বাল্মীকি ঋষি এই বসুধাতলে রামের অনাগত সমস্ত কথা উত্তর-কাব্যে বর্ণন করিলেন।

শ্রীশঃ—

নব চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

(১ম খণ্ড).

১ম পরিচ্ছেদ।

নবচিকিৎসাবিজ্ঞান আবিষ্কারের হেতু।

(একটী অভিভাষণ)

মানব চরিত্রের একটী এই লক্ষণ যে, কোন ব্যক্তি নিজে কিছু নূতন ও অপূর্ব্ব আবিষ্কার করিয়াছেন বুঝিলে, তিনি সমাজে তাহার প্রচারের জন্ত চেষ্টা করেন।

উচ্চ আশা ও গর্ব্ব এই বাসনার মূলে আছে, তাহার সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহা প্রশংসনীয়। আমি এক্ষণে ত্রিংশৎ বর্ষাধিক কালব্যাপী অবিশ্রান্ত শ্রমফল আপনাদিগের গোচর করিতেছি। সত্য বটে, আমার আবিষ্কার কেবল পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়া ভাবী বংশের অভিমত অপেক্ষা করা অধিকতর বিজ্ঞতার কাজ হইত, কিন্তু আমার জীবন যে কাজে উৎসর্গ করিয়াছি, উহা কেবল জ্ঞানতত্ত্ব নহে, উহাতে ঐ জ্ঞানের উৎপন্ন ক্রিয়াও মিশ্রিত আছে—অর্থাৎ ঐ অর্জ্জিত জ্ঞানের প্রক্রিয়া-সাধনাও আছে।

সুতরাং যদি আমি আমার গবেষণা সমাজে বিবৃত দেখিতে চাহি এবং ভাবী বংশের হস্তে উহা দিতে চাই এবং যদি আমি "হাতুড়ে বৈদ্য" স্বরূপে মরিতে না চাই, তবে আমি অধ্যাপনা ও প্রচার দ্বারা মদাবিষ্কৃত সত্য অপরের নিকট প্রদর্শন ও প্রমাণগোচর করিতে বাধ্য।

আমার সম্মুখস্থ বিশাললোকসঙ্ঘ-সমীপে রোগী উপস্থিত করা অসম্ভব। সুতরাং আমি যথাসাধ্য আমার মতামত ব্যক্ত করিয়াই সন্তুষ্ট হইব। প্রথমে আমি আমার আরাম বিধির জল্পনার কারণ সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

চিরকালই প্রকৃতি আমার প্রিয়। ক্ষেত্রে ও অরণ্যে জীবন পরিদর্শন, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীগণ যে ঘটনায় জীবনধারণ ও জীবন পরিবর্দ্ধন করে, পৃথিবীতে ও আকাশে জগৎজননী প্রকৃতির ক্রিয়ার সূত্রানুসন্ধান করা এবং তাহার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম হৃদ্‌বোধ ও সপ্রমাণ করা আমার বিশেষ আনন্দজনক ছিল।

অধ্যাপক রসমসনর প্রভৃতি বিজ্ঞতত্ত্বামেধিগণের আবিষ্ক্রিয়া শুনিতে একান্ত ইচ্ছুক ছিলাম। এবং আমি চিকিৎসাবিদ্যা আমার জীবন ব্রত করিব, এ সংকল্পের বহু পূর্ব্ব হইতে ছিল।

আমার বিংশতি বৎসর বয়সে দেখিলাম যে, আমার দেহ তাহার কর্ত্তব্য সমাধানে বিমুখ। আমার মস্তকে ও ফুসফুসে গুরুতর বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রথমে আমি ব্যবসায়িগণের সাহায্য লইলাম, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। তাহাদের উপর আমার ভরসাও ছিল না, আমার মাতা অনেক বৎসর

পীড়িত ও ক্লিষ্ট ছিলেন তিনি বারম্বার তাঁহার সন্তানদিগকে ডাক্তারের ভয় দেখাইয়া সতর্ক করিতেন এবং বলিতেন, তাহারাই তাঁহার ক্লেশের মূল। আমার পিতাও উদর-ক্ষত রোগে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকিয়া মারা পড়েন।

এই সময়ে ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে 'প্রকৃতি-ভিষক্‌বাদীগণের সভার খবর পাইলাম, এই সম্প্রদায় স্বাভাবিক উপায়ে রোগ চিকিৎসা পদ্ধতির পক্ষপাতী। এই ব্যাপার আমার মন আকর্ষণ করিল। এবং ঐ সভার অধিবেশন-বিজ্ঞাপন দ্বিতীয়বার পড়িয়া, আমি ঐ সভায় উপস্থিত হইলাম। চিরস্মরণীয় মেণ্টজারকে ঘিরিয়া এক দল হৃদয়বান লোক দেখিলাম। একজন সভ্যকে আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ফুসফুসীতে বেদনা হওয়ায় আমি বড় ভুগিতেছি, আমার কি করা উচিত? আস্তে আস্তে বলিলাম, কারণ অত লোকের সাক্ষাতে বড় কথা বলা আমার ক্ষমতা ছিল না। ধমনীর চির চঞ্চলতায় আমি এইরূপ দুর্ব্বল ছিলাম। তিনি পট্টির ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে আমি সদ্য উপকার পাইলাম। তদবধি আমি নিত্যই, ঐ সভায় যাইতাম। কয়েক বৎসর পরে ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে আমার ভ্রাতা অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। প্রকৃতিভিষক-প্রণালী—তখন পরিবর্দ্ধনের সুবিধা ছিল না। সুতরাং তাঁহার সাহায্য করিতে পারিলাম না। আমরা মিঃ ডর হহনের সুচিকিৎসার বিষয় শুনিলাম। আমার ভ্রাতা তাঁহার চিকিৎসাধীন হইতে চাহিলেন এবং কয়েক সপ্তাহ পরে অনেক সুস্থ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্বাভাবিক চিকিৎসা-প্রণালীর সুবিধা আমিও দেখিতে লাগিলাম এবং ঐ প্রণালীর মূল সত্যও আমি হৃদ্‌বোধ করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে আমার পীড়াও চুপ করিয়া ছিল না। পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত রোগটী বাড়িতে ছিল। আবার ডাক্তারি চিকিৎসার ফলে রোগের নূতন কারণ হইল। আমার অবস্থা ক্রমে মন্দতর হইতে লাগিল; পরে অসহনীয় হইল।

পৈতৃক ক্ষতরোগ উদরে দেখা দিল। ফুসফুসী কতকটা বিনষ্ট হইল। মস্তকের ধমনী এত খিটখিটে ছিল যে, বাহিরের খোলা বাতাসেই মাত্র আমি শান্তি পাইতাম। নিদ্রা হইবারই কথা নহে। আমি অদ্য স্বীকার করিতে পারি যে, আমাকে তৎকালে দেখিতে সুস্থ দেখাইলেও আমি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম। আমি তৎকালিক প্রকৃতি-প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিতাম। স্নান, পট্টি, এনিমা, ডুস ইত্যাদি সব আমি ব্যবহার করিতাম, কিন্তু যন্ত্রণা নিবারণ বই—তাহাতে অন্য ফল পাই নাই। এই সময়ে স্বাধীন প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণে আমি ঐ সকল নিয়ম আবিষ্কার করিলাম। যাহার উপর মৎ প্রণীত চিকিৎসা-বিধি স্থাপিত হইয়াছে, আমি আমার নিজের উপর সেই চিকিৎসা পরীক্ষা স্বরূপ খাটাইতে লাগিলাম এবং তজ্জন্য যথাসাধ্য যথোপযুক্ত যন্ত্রাদি গড়িতে লাগিলাম। অনুশীলন সফল হইল। আমার অবস্থা দিন দিন ভাল হইতে লাগিল। অপরেও আমার পরামর্শ মত চলিল এবং সেই পথে চলিয়া সন্তোষলাভ করিল। মৎনির্ম্মিত যন্ত্রাদিতেও তাহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইল।

উপস্থিত রোগের নিদান নির্ব্বাচন এবং

রোগীর অজ্ঞাতপূর্ব্ব পীড়ার নিদান প্রকাশ সর্ব্বথাই খাটিতে লাগিল। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, আমার অবিষ্কার—আত্মবঞ্চনা নহে। তথাচ যখন আমি তাহা প্রকাশ করিলাম, আমার মত প্রত্যয়শূন্য বিস্ময়ের সহিত বা হৃদয় শূণ্য অন্যমনস্কতার সহিত লোকে শুনিতে লাগিল—এই লোক সকল কেবল প্রাচীনপন্থী ডাক্তারগণ এবং ঔষধগুণপক্ষপাতী সকল নহে; প্রত্যুত স্বাভাবিক চিকিৎসা-প্রণালীর শিষ্যগণ এবং এমন কি, ঐ প্রণালীর খ্যাতনামা প্রতিনিধিগণও যোগদান করিয়াছিলেন। লোকের হিতার্থ আমি মৎকৃত আসন-বসনগুলি এই সকল ব্যবসায়ীর হস্তে বিনামূল্যে ন্যস্ত করিয়াছিলাম। তাহারা পরীক্ষা করিয়া তৎসমস্ত অকর্ম্মণ্য বোধে আবর্জ্জনা মধ্যে ফেলিলেন।

আমি তখন বেশ বুঝিলাম যে, রোগের হেতু ও গতি এবং ইহার চিকিৎসার পদ্ধতি স্থাপন করা বা নিদান ও পূর্ব্বনিদানের নূতন ও অমোঘ পদ্ধতি মানবযন্ত্রের প্রকৃতি-ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া আবিষ্কার করাই যথেষ্ট নহে। এবং আমার নিজের ও স্বজনগণের ও বন্ধুবান্ধবদিগের দেহের উপর এই নব চিকিৎসা বিধানের সুফল প্রদর্শন যথেষ্ট নহে। প্রত্যুত আমি দেখিলাম যে, লোকসাধারণের সমীপে আমাকে আবেদন করিতে হইবে এবং বহু-সংখ্যক আশ্চর্য্য আরোগ্য দেখিয়া এলোপেথী, হোমিওপ্যেথী ও প্রাচীন স্বাস্থ্যবিধির উপর আমার বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিতে হইবে। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের এই প্রত্যয় উৎপাদন করিতে হইবে যে আমার বিধানই সত্য, এবং প্রকৃতির নিয়মোপরি স্থাপিত।

এই তীব্র ইচ্ছা হইতে তুমুল চেষ্টার উদয় হইল। যদি আমি এই চিকিৎসার নব বিধানে জীবন উৎসর্গ করি—ঘৃণা, নিন্দা ও অর্থক্ষয় ভিন্ন নিতান্ত পক্ষে প্রথমে আর কিছু লভ্য হইবে না।

১০। ১০। ১৮৮৩ তারিখে আমি আমার ছত্র খুলিলাম। বিবেকের জয় হইল। যাহা আমি দূরদর্শনে দেখিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়া গেল। প্রথম কয়েক বৎসর যাবৎ আমার ছত্রে রোগী জুটিত না। সফলতা দৃষ্টে ক্রমে রোগী জুটিতে লাগিল। প্রথমে কেবল স্নানের জন্য, পরে চিকিৎসার জন্য রোগীরা আসিত সময়ে রোগী বাড়িতে লাগিল। কারণ যাহাকেই আমি আরাম করি, তিনিই প্রচারক ও প্রতিনিধি হইতে লাগিলেন। হাজার হাজার রোগী আমার চিকিৎসা বিধানে এবং আমার অভিনব নিদানবিধি (মুখব্যক্তি বিজ্ঞান) Science of Facial Expression আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। ব্যাধি গণনা করিয়া আমি অনেককে বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার করিলাম। ইহা হইতে ভবিষ্যতে বংশকে ব্যাধি হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। প্রত্যেক স্থলে আমার আবিষ্কার যথার্থতা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। আমার অভিজ্ঞতা গত আট বৎসরে অনেক ব্যাপিয়াছে। আমার নিজের স্বাস্থ্য যাহা পূর্ব্বে—পুনর্লাভাতীত বলিয়া বোধ ছিল, নব বিধানের অনুশীলনে এত উন্নত হইয়াছে যে, আমার এই সুবিস্তৃত ব্যবসা চালাইবার সমর্থ হইয়াছে। ইহা সম্ভবপর হইবার একমাত্র উপায় আমার উদ্ভাবিত অঙ্গস্নানের নূতন বিধি মাত্র। উহা এত ফলোপধায়ক যে, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সকল ব্যাধিই নিশ্চয়ই সাধ্য

সকল রোগ সাধ্য হইলেও প্রত্যেক রোগীই সাধ্য নহে। কারণ যে স্থলে দেহ একেবারে মূলশূন্য হইয়াছে, বিশেষতঃ যখন দেহ ডাক্তারি ঔষধ বিষে পরিব্যপ্ত হইয়াছে, আমার বিধান নিশ্চয় কষ্টের লাঘব করিবে, কিন্তু সকলকে পরিত্রাণ বা সম্পূর্ণ নিরাময় করিতে পারিবে না। পাঠকগণ অদ্য আমি আপনাদিগের নিকটে অত্যন্ত আনন্দের সহিত উপস্থিত হইলাম। বহুকাল দেহনাশের সহিত দন্দ্ব করিয়া, আমি আত্মরক্ষা করিয়াছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ্যের হিতার্থে রোগের প্রকৃত চিকিৎসা আবিষ্কার করিতে পারগ হইয়াছি। অনেক খ্যাত পুরুষ ইহা বাহির করিতে বৃথা উদ্যম করিয়াছিলেন। অনুশীলনে সপ্রমাণ হইয়াছে, যদিও সকল স্থলে জীবন রক্ষা হয় নাই, কিন্তু আমার প্রণালী নিখুঁত।

যদিও আমাকে 'হাতুড়ে বৈদ্য' বলা হয় এবং রীতিমত ব্যবসা শিক্ষাধীনও আমার বর্ত্তমান ব্যবসা চালাইবার অনুপযুক্ত বলিয়া আমাকে গালি দেওয়া হয়, কিন্তু এ সব আমি অনির্ব্বেদে ও শান্তভাবে সহ্য করিতে পারি; এমন কি, মানবজাতির মহোপকারকগণ এবং মহাবিকারকগণ ও মহা মহা নব মত প্রচারকগণ তাহার সকলেই হাতুড়ে ও অব্যবসায়ী ছিলেন। কৃষক প্রিকনিট্জ, ভারবাহক স্ক্রক, ধর্ম্মবিজ্ঞানবিৎ পরে বন্যাধ্যক্ষ ফ্রুর (জেঃ এইচ রস) ঔষধ মিশ্রক হইল ইহাদের কথাত ভুলিবার নহে, কিন্তু ইহাদের বিশদ মন ও বলবৎ ইচ্ছা হইতে নূতন চিকিৎসাবিধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

নব চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহিত প্রচলিত এলোপেথী, হোমিওপেথী ও প্রাচীন স্বাভাবিক বিধির কি সম্বন্ধ?

ঐ সকল আরাম বিধির সমালোচনা করিতে ও তাহাদের দোষ ও খুঁত (যাহা মানবকৃত সকল বিধয়ে বিদ্যমান আছে) আলোকে বসাইতে আমি মনস্থ করিয়াছি। কিন্তু সাধারণের হিতের জন্য এবং আমার ব্যাখ্যার সুবোধ জন্য যতটুকু দরকার, তাহই বলিব। ব্যক্তি মাত্রেই যাহা ভাল বলিয়া বুঝে, তাহাই গ্রহণ ও অনুপালন করিতে তাহার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আমার সমালোচন বুঝিতে হইলে ইহা জানা দরকার যে এযাবৎ যে সকল পদ্ধতির অনুসরণ করা হইতেছে তাহাদের সহিত ইহার কত দূর সৌসাদৃশ্য ও কতদূর বিভিন্নতা আছে। তাহা হইলেই আমরা নিরূপণ করিতে পারিব সে ইহার প্রাথমিকতা কোথায়? এবং ইহার স্বকীয় ও পরকীয় কিম্মৎ কি?

এলোপেথীর সহিত এই ঔষধও অপ্রকরণহীন নবচিকিৎসা প্রণালীর একবিন্দুতে সমত্ব আছে। যথা—উভয়েরই বিষয় মানব দেহ। অন্য সম্বন্ধে, তাহাদের লক্ষ্য ও উপায় আশমান জমিন ফারাক। বস্তুতঃ আমি জ্ঞান করিবে ঔষধ দ্বারা রোগীকে বিষাক্ত করায়, চিররোগের ভয়ঙ্কর দ্রুত বৃদ্ধির ও পূর্ণ স্বরলোকাভাবের একটী কারণ। এলোপ্যাথি নব চিকিৎসা পদ্ধতির হিতকর মধ্যস্থতার অস্ত্রবিদ্যার প্রয়োজন থাকিবে না। কাজিল হইয়া দাড়াইবে।

হোমিওপেথীকে আমি প্রণালক

ঔষধ ভক্তির উচ্ছেদ—সময়ের সহগামী বলিয়া স্বাগত জ্ঞান করি।

ইহার সূক্ষ্ম মাত্রা, যাহাতে রাসায়নিক ঔষধের চিহ্নও নাই, এবং সুপথ্যের নির্ব্বাচন প্রতি ইহার আগ্রহ বশতঃ ইহাকে নব চিকিৎসা প্রণালীর সোপান বলা যায়। পথ্য সম্বন্ধে এই প্রণালী কোন স্থির পরিষ্কার বিধান কল্পনা করে না এবং আমার অভিজ্ঞতা বলে বলিতে চাই যে, ইহার ঔষধের সূক্ষ্ম মাত্রাও একেবারে অনিষ্টবর্জিত নহে। প্রচলিত স্বাভাবিক বিধি, যাহা অন্য সকল বিধিকে গুণে অতিক্রম করিয়াছে, তাহাই ঔষধ ও শল্য তন্ত্রবর্জিত ঐ সব চিকিৎসা বিধির ভিত্তি বলিয়া বলা যায়। আমি ইহার মহা আবিষ্কারকগণকে এবং মহাপ্রবর্ত্তকগণকে—যথা প্রিস্‌নিটস, স্রথ, রস্ এবথিথ্ ডোবকে অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু ইহারা পরবর্ত্তী প্রতিনিধিগণকে অনুসরণ করি নাই। কারণ তাহারা বাহাদুরি দেখাইতে গিয়াছেন তাহাতে সরল প্রকৃতি পথ ত্যাগের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হয়। প্রাচীন স্বভাব বিধি অবান্তর পদার্থের প্রকৃতি ও চরিত্রে অনুলোকনবর্জিত। এবং ঐ সব পদার্থ দেহে যে নৈসর্গিক নিয়মানুসারে স্থান পরিবর্ত্তন করে বা অঙ্গবিশেষে উপনিবেশ করে এটি ঐ জ্ঞান বর্জিত। বাক্যান্তরে, ইহা সাধারণতঃ ব্যাধির প্রকৃত স্বভাবে অনুলোকনবর্জিত সুতরাং ব্যাধিবিশেষেরও তদ্রূপ। যে নৈসর্গিক নিয়মের উপর আমার সমস্ত আবিষ্ক্রিয়া স্থাপিত; যাহা অনশ্বর কিন্তু যাহা অদ্যাবধি অপরিজ্ঞাত ছিল—তাহার জ্ঞানেও ইহা বর্জিত। আরও ইহা রোগ লক্ষণের প্রাচীন পদ্ধতির ব্যবহার করেন যদিচ জানেন যে ঐরূপ খাটী লক্ষণ জ্ঞানের কোন আবশ্যকতা নাই। ইহাকে কেবল প্রাচীন কুসংস্কারে লিপ্ত থাকা হয় মাত্র; নব চিকিৎসা বিজ্ঞান, পক্ষান্তরে, রোগ নির্ণয়ের সম্পূর্ণ পৃথক্ ভূত পদ্ধতি শিক্ষা দেয় এই পদ্ধতি রোগের প্রকৃতি সাপেক্ষ; এবং ইহা কেবল মাথা ও গলদেশের সম্যক্ পরীক্ষা—মুখব্যক্তি বিজ্ঞান স্বভাব পদ্ধতি জলপ্রয়োগের নানা আকার কল্পনা করিয়াছেন। ভিজাবাষ্প, এনিমা, ডুস, সিঞ্চনস্নান, অর্দ্ধস্নান, পূর্ণস্নান, উপবেশনস্নান, নানাপ্রকারের বাষ্পস্নান। এত অধিক উপকরণ অংশত কাজিল এবং সাধাজনক। রোগের যথার্থ প্রকৃতি উত্তরে অনুলোকন লাভ করিলেই তাহা উপলব্ধি হয়। নব চিকিৎসা বিজ্ঞান যথাসম্ভব জলপ্রয়োগ সরল করিয়াছে।

স্বভাব—আরাম পদ্ধতিতে সর্ব্বাবস্থাতেই পথ্য সম্পূর্ণ অনির্ব্বাচিত রহিয়াছে অথবা চিরাগত মিশ্রিত পথ্যের যথেচ্ছ স্থানদান করা হইয়াছে। নব চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনুত্তেজক পথ্যপদ্ধতি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা স্বভাব নিয়মে স্থাপিত এবং যথাযথ রূপেও বিশদপক্ষে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

স্বভাব আরাম-পদ্ধতি, যাহা আমি বার বার বলিতেছি, চমৎকার কাজ দেখাইয়াছে, তাহা হইতে এত পৃথক গতি যে আমি আমার অনুধাবনা ও আচরণাকে নূতন নামে "ঔষধ ও অস্ত্রকরণ বিনা নব চিকিৎসা

বিজ্ঞান" নামে অভিষিক্ত করিতে আমি অধিকারী আমার পদ্ধতি বিকাশিত হইবার পূর্ব্বে, সে সকল অনুশীলন আমি খাটাইয়াছি তাহা সবিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে আমি পারি না, যদিচ তাহাতে অনেকের ক্ষমতা নিঃসন্দেহ আছে কিন্তু তাহার কোন কার্য্যকর মূল্য নাই। ঠিক পথ ধরিবার আগে যে বহু ভুল পথ অতিক্রম করিতে হয় তাহা বর্জন করিয়া একেবারে সোজাসুজি লক্ষ্য স্থানে যদি উপনীত হওয়া যায় তাহা বিশেষ সুবিধার কথা বটে।

এই উপক্রমণিকার পর মূল বিষয়ে মন দিবে।

মূলাধার পূর্ব্বপক্ষ প্রথমে পরীক্ষা করিতে হইবে, কারণ তাহার উপর সমগ্র আরাম বিধি স্থাপিত আছে তাহা এই—কোন্ দেহ সুস্থ বা অসুস্থ! চলিত মত গুলি বড় অনৈক্য। ইহা কে না জানে? কেহ বলিতেছেন "আমি বেশ আছি তবে সামান্য বাতে কিছু ক্লেশ পাই "অপরে কেবল ধমনীদুর্ব্বলতার ক্লেশ পান নতুবা তিনি মূর্ত্তিমান স্বাস্থ্য। ঠিক যেন দেহটা পৃথক্ পৃথক অঙ্গের সমষ্টি মাত্র, এক হইতে অপর সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট এবং একের সহিত অন্যের কোন সংস্রব নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চিরপ্রচলিত আরাম বিধি এই মতের পৃষ্ঠ পোষক। কারণ অনেক স্থলে ঐ বিধি কেবল একটী যন্ত্রের উপর লক্ষ্য করেন এবং পার্শ্বস্থ গুলির খবর লয়েন না। তত্রাচ ইহা নিঃসন্দেহ যে সমগ্র মানব দেহ একটী যুক্ত সমবায়। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ পরস্পরের সহিত নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ সুতরাং এক অঙ্গ পীড়িত হইলে অন্য অঙ্গ সকল আক্রান্ত হয়। নিত্য পরীক্ষা দ্বারা তুমি দেখিবে যে এই কথাই ঠিক। যদি তোমার দন্তরোগ থাকে তুমি কোন কাজই করিতে পারিবে না। এবং আহারে বা পানে তোমার রুচি থাকিবে না। কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ভাঙ্গিলেও ঐরূপ ফল হয় উদরে বেদনা হইলে শারীরিক বা মানসিক কোন কর্ম্মেই ইচ্ছা থাকেন। প্রথমতঃ এসব ধমনী প্রেরিত সাক্ষাৎ উত্তেজনা মাত্র। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে কিরূপে এক ব্যাধি অন্যকে ডাকিয়া আনে। যদি ব্যধি স্থায়ী হয় তবে তাহার ফলও স্থায়ী তবে আমরা দেখি বা না দেখি। একটী দেহকে সুস্থ বলা যায় যদি তাহার প্রত্যেক অঙ্গ নৈসর্গিক অবস্থায় থাকে এবং বিনাক্লেশে বিনাচাপে বিনাটানাটানিতে তাহার প্রক্রিয়া করে। এবং প্রত্যেক অঙ্গ তাহার প্রক্রিয়োপযোগী আকার সম্পন্ন হইবে তাহা হইলে মানব চক্ষে বেশী সুশ্রীও হইবে।

যখন কোন অঙ্গের বাহ্য আকার অনৈসর্গিক হয় তখনই বুঝিবে যে ইহা নির্দ্দিষ্ট উত্তেজনার কাজ। দূরব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন জানা যায় না যে ঠিক নৈসর্গিক আকার কিরূপ। প্রথমতঃ পূর্ণ সুস্থকায় ব্যক্তির পরীক্ষা দ্বারা জানিতে হয় যে কোন্ আকার নৈসর্গিক। কিন্তু আজ কাল তাহা মেলা ভার, ঠিক্ বটে আমরা বলবান্ সুস্থকায় ব্যক্তিদিগের গল্প করি এবং অনেকে প্রকাশ করেন যে তাঁহারা তাহাই

কিন্তু জেরা করিলে প্রত্যেকের একটু না একটু ছুতনেতা আছে—যথা যৎসামান্য বেদনা, কদাচিৎ শিরঃপীড়া, কখনও দন্ত শূল—যাহাতে দেখা যায় যে খাটী স্বাস্থ্য অপ্রাপ্য। এ জন্য বহু অধ্যয়ন ভিন্ন দেহের নৈসর্গিক আকার জানা যায় না। তত্রাচ পীড়িত ও কতক সুস্থ ব্যক্তি দ্বয় তুলনা করিয়া কতক জানা যায় এবং পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাপাঠে বুঝিবেন যে কিরূপে ইহা সম্ভব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখপাধ্যায়।

ভবের পাশা-খেলা।

(১)

কায়, মন, বাক্য তিন পাশা,
জীব-গুঁটি করি জয়-আশা,
বিচিত্র সংসার-কোটে
শত্রু-মিত্র এক যোটে
খেলিতেছে বিচিত্র তামসা!

(২)

চতুরংশ কোটে খেলে নর,
পরমায়ু যেমন সুন্দর,
শৈশব, যৌবন আগে,
প্রৌঢ় প্রাচীনতা ভাগে
বিভক্ত, কেমন পর পর!

(৩)

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চারি
একজন চতুর্গুটিধারী।
একের অভাবে যদি
খেলার দুস্তর নদী
নহে কেহ পার অধিকারী।

(৪)

ধর্ম্ম আর মোক্ষ গুঁটিদ্বয়,
রহে, ব্যূহ সম নিজালয়,
রণজয় অনুরাগে,
পিছে অর্থ—কাম আগে,
পর-ঘরে, (আরম্ভ সময়)।

(৫)

শৈশবান্তে যৌবনে প্রয়াণ,
কাম অর্থ অগ্রে আগুয়ান
পর ঘর দ্বারদেশে,
শিয়রে শমন বেশে,
আক্রমিতে বসি—সাবধান।

(৬)

কর্ম্মভূমে সহায় সুজন
পরস্পর হয় প্রয়োজন,
তেমনি খেলায় দেখি
সম্মুখে সুমিত্র রাখি
খেলে লোক মিলিয়া দুজন।

(৭)

ছ-তিন সতর যোল দান
আছে যথা পাশার বিধান,
উন্মত্তা, বুদ্ধি, বলে
রিক্তহস্ত হ'তে হ'লে
ভবে জন্ম জড়ের সমান।

(৮)

প্রকৃতির গর্ভ পরিহরি,
কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে অবতরি
দানে দানে জীব-গুঁটি
চলি যায় গুটি গুটি,
প্রকৃতির 'দুর্গা' নাম স্মরি।

(৯)
সহিষ্ণুতা বর্ম্ম দিয়া অঙ্গে,
মত্ত হয় মহারণরঙ্গে,
বিনাশিয়া বিঘ্নরাশি,
পরব্রহ্মঅভিলাষী
দ্বন্দ্ব সদা প্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্গে।

(১০)
চা'ল ভ্রমে * অথবা কু-দানে †
গুঁটি যথা মরিয়া পরাণে,
দৃঢ়াধ্যবসায় বলে
পুন রণভূমে চলে,
আশা-সুখে শত সাবধানে।

(১১)
তেমনি স্বকীয় কর্ম্মফলে
কিম্বা ঘোর দৈব অমঙ্গলে
অকালে জীবন নাশি,
প্রকৃতির কোলে আসি,
পুনঃ জন্ম লয় ভূমিতলে।

(১২)
বয়সে প্রাচীন অতিশয়,
কিন্তু বাকী কর্ম্ম কতিপয়,
গুঁটি তথা পাকি ঘরে
কাঁচিয়া সুনাত্রা করে
বারম্বার জন্ম বিনিময়।

(১৩)
অনলে অনলে পড়ি পরে
সুবর্ণ সুবর্ণ-বিভা ধরে,
তেমনি এ কর্ম্ম স্থলে
গমনাগমন-ফলে
কৃতকার্য্য হয় তবে নরে।

(১৪)
চতুর্ব্বর্গ-গুঁটি চতুষ্টয়,
জীবের গুটান যবে হয়,
ধীরে ধীরে পরিণামে,
প্রবেশিলে নিত্যধামে,
ভাঙ্গে খেলা, ব্রহ্মে লীন হয়।

শ্রীদ্বিজবর বিশ্বাস।

* স্বকর্ম্মজনিত ফল বা পুরুষকার।
† দৈব।

মন্ত্রার্থ।

১। মন্ত্রপাঠ।

মন্ত্রপাঠই ধর্ম্মক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ। শব্দ-ব্রহ্মরূপী বেদ ও আগমশাস্ত্র সনাতন মন্ত্রযোগে যজমানের ফলকামনা বা ঈশ্বরকামনা সিদ্ধ করেন। মন্ত্রের অলৌকিক প্রভাব। বিধি-বিহিত যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে তাহার পাঠমাত্রই ফলপ্রদ। মন্ত্রের অর্থ অন্বেষণ করা নিষ্ফল। ব্যুৎপত্তি-বলে তাহার অর্থ সম্ভব হইলেও, তাদৃশ অর্থজ্ঞান ক্রিয়াবিধিকর্তৃক বাধিত আছে। ক্রিয়াতে ক্রমবিহিতরূপে বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পদ্ধতি সমাপ্ত করাই প্রয়োজন। মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা বা চিন্তা করা প্রয়োজনও নহে, সম্ভবও নহে, বিহিতও নহে। কেহ তাহা করে না। করিতে গেলে ক্রিয়ার কালোত্তীর্ণ হইবে, অনেক পুরোহিত তাহাতে অক্ষম হইবেন, যজমান ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিবেন না এবং ক্রিয়াতে বিভ্রাট উপস্থিত হইবে। এরূপ আচরণে মন্ত্রের স্বাভাবিক অলৌকিক শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ক্রিয়ানুষ্ঠানার্থ বিধিবিহিত যত মন্ত্র আছে, তাহার অর্থ করিতে ব্যস্ত হওয়া বাতুলতা মাত্র। সেই সকল মন্ত্রের

সহজ বোধ্য-বোধক অর্থ নাই, এইরূপ অবধারণ করাই কর্ত্তব্য।*

কাশী প্রভৃতি স্থানে যেখানে যেখানে প্রাচীন রীতিমত বেদপাঠের ব্যবস্থা আছে তাহার কোন স্থানে বেদমন্ত্রের অর্থ পড়ান হয় না। অধিকাংশ বেদমন্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রয়োজন; এবং শিষ্যেরা ক্রিয়ানিষ্পাদক ঋত্বিক্ হইবার নিমিত্তে তাহা শিক্ষা করেন। এই প্রকার পুরোহিতদিগকে কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে "বৈদিক" কহে। কেননা তাঁহারা বেদমন্ত্র দ্বারা যাজকতা করিতে পারেন। তাঁহারা মন্ত্রব্রাহ্মণ-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি এবং মন্ত্রপাঠের উচ্চারণ ও স্বর উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। স্বর ও উচ্চারণাদির জ্ঞানার্থ যে পরিমাণ অর্থ ও ব্যাকরণ বোধের প্রয়োজন, অবশ্য তাহাও শিক্ষা করেন। তদ্ভিন্ন চণ্ডীপাঠাদিও অবগত থাকেন, কেননা তাহা অনেক ক্রিয়ার অঙ্গ। কিন্তু অনেকে মন্ত্রার্থ জানেন না, জানার প্রয়োজনও নাই। এই সমস্ত মন্ত্রের কেবল ক্রিয়াতেই সার্থকতা আছে। নতুবা শব্দার্থজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যাপক্ষে তাহাদের অর্থবত্তা কখনই দৃষ্ট ও উপপন্ন হয় না। দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশীয় অনেক ব্রাহ্মণ এখনও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেই সব যজ্ঞেতে তাঁহারা স্ব স্ব শাখানুযায়ী বেদপাঠ করেন এবং অনেক শ্রেষ্ঠব্যক্তিদিগের ভবনে যজ্ঞবিশেষে তিন চারিজন মিলিয়া সমস্বরে শাখাবিহিত উপনিষৎ মুখস্থ পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা তাহার অর্থ জানেন না। কেননা কর্ম্মাধিকারে উপনিষৎও মন্ত্র মাত্র, এবং তাহার অর্থনাই, কিন্তু জ্ঞানাধিকারে উপনিষৎও অনেক মন্ত্রবর্ণীয় শ্রুতিবিশেষের অধ্যয়নকে আর বেদপাঠ বলা যায় না। তাহাকে বেদান্ত কহে। তাহা মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত 'কর্ম্মমীমাংসা' নামক বেদান্তদর্শনের সীমান্তর্গত। ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারে এই সকল বেদ-ভাগের মন্ত্রত্ব নাই, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক অর্থ আছে। ফলে বৈদিক ও পুরোহিতগণের ব্যবহৃত যজ্ঞীয় মন্ত্র সকল কেবল অর্থ নিরপেক্ষ মন্ত্র মাত্র এবং জ্ঞানপক্ষে প্রায়ই তাহাদের তাৎপর্য্য নাই ও বলপূর্ব্বক তাদৃশ তাৎপর্য্য গ্রহণ করার প্রয়োজনও নাই।

দেবার্চ্চনাতে যে উপনিষৎ পাঠের উল্লেখ করা গেল তাহা এই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের আশ্রমের এবং প্রধান প্রধান রাজভবনের সনাতন ব্যবস্থা। গৃহস্বামিরা ও তাঁহাদিগের গুরু-পুরোহিতগণ ইহা জ্ঞাত আছেন যে, উপনিষৎ শাস্ত্র ব্রহ্ম জ্ঞানের শাস্ত্র। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহা "মন্ত্র-ব্রহ্মাকারেও" তাঁহাদের যজ্ঞাদি ক্রিয়াকে পবিত্র করিয়া আসিয়াছে। অতএব সেভাবে উপনিষৎ সকল কর্ম্মীগণের পরমাদরের ধন। যজ্ঞাধিকারে তাহার অর্থ না থাকিলেও, অলৌকিক ফল আছে। ভারতের ধর্ম্মের ভাব বুঝিয়া উঠা যায় না। এখানে কর্ম্ম-ব্রহ্মরূপ যুগল-ধর্ম্মটি কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত, তাপস ও যোগী সকলকে, যথাধিকার, উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

* কেবল সন্ধ্যাবন্দনাতে মন্ত্রার্থ ও মন্ত্র-চৈতন্য ভাবনার আবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে। গুরুদেব তাহা শিষ্যকে বুঝাইয়া দিবেন এবং শিষ্য তাহা গোপনে রাখিবেন।
"মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং কৃত্বা গুরুঃ প্রযত্নতঃ।
শিষ্যং প্রকাশয়েদ্বিদ্বান্ মন্ত্রং যত্নেন গোপয়েৎ ॥"
(ইতি বিশ্বসারে)

অতঃপর ইহা জ্ঞাত হওয়া উচিত যে, বৈদান্তিকেরা উপনিষদের যে সকল বচন ধরিয়া ক্রিয়া নিরপেক্ষ বস্তুতন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞান স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন ক্রিয়ানিষ্ঠগণ তৎসমস্তকে কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে "ব্রহ্ম" শব্দ কেবল বেদ, হিরণ্যগর্ভ, বিষ্ণুতেজঃস্বরূপ সূর্য্য, মন্ত্রযজ্ঞীয় হবির্লক্ষণ-অন্ন এবং সামগানকে বুঝায়; তদ্ভিন্ন ক্রিয়ার অবিষয় জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে বুঝায় না। এই-রূপ তাৎপর্য্যবিশিষ্ট দেবগণের মন্ত্র অন্ন ও ক্রিয়াবতী অর্চ্চনাই ব্রহ্মোপসনা। তাঁহারা বলেন—সমগ্র উপনিষৎ শাস্ত্রই ক্রিয়া নির্ব্বাহক মন্ত্রে এবং ক্রিয়াবিধায়ক অনুশাসনে পূর্ণ, এইজন্য তাহা মন্ত্র ব্রাহ্মণের ন্যায় কর্ম্মাঙ্গরূপে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

২। পুরাণ-শ্রবণ।

অধিক দূর যাইতে হইবে না। এই ভারতবর্ষে পুরাণশ্রবণ একটী পুণ্যজনক অনুষ্ঠানরূপে দীর্ঘকালাবধি প্রচলিত আছে। পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ এবং হরিবংশের পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে যেমন ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের, সেইরূপ স্ত্রী, শূদ্র এবং পতিত দ্বিজগণেরও অধিকার আছে। কিন্তু অধিকার থাকিলেও, তাহা ক্রিয়াবিধিদ্বারা সীমাবদ্ধ। গৃহস্থের বাটীতে যতদিন ধরিয়া ঐ সকল শাস্ত্রের মধ্যে কোন পৌরাণিকী কথার 'পারায়ণ' অনুষ্ঠান হয়, তাহার প্রতিদিন নিয়মিত দেবার্চনা হইয়া থাকে। পূর্ব্বাহ্নে পাঠক ঠাকুরকর্তৃক মূল সংস্কৃত শ্লোকের পাঠ হয়। এই পাঠ ক্রিয়াকালে অন্য দুইজন ব্রাহ্মণ, গৃহপতিদ্বারা ব্রতী হন। তন্মধ্যে একজন ধারক। পাঠ্য গ্রন্থের একখানি তাঁহার হস্তে থাকে। তিনি পাঠক ঠাকুরের পাঠের দোষ সংঘটিত হইলে, তাহা সংশোধন করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি পাঠ শ্রবণ করেন মাত্র। তিনি কথাদাতা গৃহ-পতির পক্ষে কথা শ্রবণের প্রতিনিধি। পৌরাণিক কথার এই পূর্ব্বাহ্নিক অনুষ্ঠানই বিশেষ পুণ্যজনক। কিন্তু বেশ বুঝিয়া দেখ এইরূপ পৌরাণিকী কথার অনুষ্ঠান আদ্যো-পান্ত মন্ত্রময় ক্রিয়া মাত্র। সংস্কৃতমূলগুলি মন্ত্রের ন্যায় 'পাঠ হয়। যিনি ধারক, তিনি মন্ত্রই দৃষ্টি করেন এবং শ্রোতা কেবল মন্ত্রই শ্রবণ করেন।' মন্ত্রার্থের সঙ্গে কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। টীকা যাহার যাহা আছে, তাহা পড়িয়া রহিল। এইরূপ ভাগবতী কথার অনুষ্ঠান মন্ত্রযজ্ঞস্বরূপ। স্বর্গাদি কামনায় অথবা শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামনায় তাহা আচরিত হয়। এইরূপ পারায়ণ যজ্ঞের অপরাহ্নিক অনুষ্ঠান আছে। সে সময় কথকঠাকুর পাঠ্যপুরাণের এক একটী পালা এক এক দিন বিবিধ অলঙ্কারের সহিত পর্য্যায় ক্রমে কথকতা করিয়া শ্রোতাগণের মনোরঞ্জন করেন। এই ভাষা কথকতা সামান্যতঃ পুণ্যজনক হইলেও, পূর্ব্বা-হ্নিক পাঠের ন্যায় অভ্যুদয়-ফলপ্রদ নহে। অধিকন্তু কথকঠাকুর, আবশ্যকীয় দুই চারিটী শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন মাত্র। যে সকল শ্লোকে পারমার্থিক সূক্ষ্ম ও গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, তাহা প্রায়ই পরিত্যাগ করেন।*

শ্রীচণ্ডী ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও অর্থ-নিরপেক্ষ পারায়ণ দৃষ্ট হয়। এদেশে তাহা, অথবা

* এইরূপ পারায়ণ যজ্ঞ, এই বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এদেশের ন্যায় চমৎকার অলঙ্কারযুক্ত কথকতাও ভারতের অন্য দেশে নাই।

মহাভারতীয় বিরাট পর্ব্ব, আদ্য শ্রাদ্ধে পাঠ হয়। ভারতবর্ষের অন্যত্র গৃহস্থ এবং সাধুগণ প্রতিদিন সন্ধ্যা উপাসনা কালে গীতার দুই তিন অধ্যায় আবৃত্তি করেন। এবং অর্থ না বুঝিয়াও কেবল পাঠ মাত্রে পুণ্যসঞ্চয় হয়, এমন বিশ্বাস রাখেন। একজন সাধু আমাকে কহিয়াছিলেন যে যাঁহারা গীতার ভাষ্য ও টিকা পড়িয়া তর্কবিদ্যাতে মগ্ন, গীতাতে তাঁহাদের অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস নাই। তাঁহারা নাস্তিক বিশেষ। ভদ্র সমাজ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন, ভারতের ধর্ম্মরাজ্যে গীতা প্রভৃতি মহামহা শাস্ত্রের কি আশ্চর্য্য মন্ত্রময় প্রভাব। তাঁহাদের মতে সন্ধ্যা, পূজা ও মন্ত্রপাঠই হিন্দুধর্ম্ম। মন্ত্রার্থ হিন্দুধর্ম্ম নহে।

৩। অনুবাদ।

কিছুদিন হইতে এই ভারতবর্ষে বঙ্গভাষায় ও ইংরাজিতে ঋক্ যজু ও সামবেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের বিস্তর অনুবাদ হইয়া আসিতেছে। দুর্গোৎসবাদি যজ্ঞেতে এবং গৃহস্থের আপদুদ্ধরণার্থে যে চণ্ডীপাঠ হয়, সেই চণ্ডীর পুঁথিরও অনুবাদ হইয়াছে। এই সকল কার্য্য ইওরোপীয় লেখকদিগের অনুকরণ মাত্র। এতদ্দ্বারা হিন্দুসমাজের কোন উপকার হয় নাই। কেননা বৈদিক ও পুরোহিতগণ সে সমস্ত অনুবাদ হইতে কোন সাহায্য পান নাই। কর্ম্মানুষ্ঠান কালে তাঁহারা স্ব স্ব পুঁথী ও শাস্ত্রীয় প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। হিন্দুসমাজের বহিষ্কৃত ক্রিয়াবর্জ্জিত কোন ভদ্রসন্তানের তৎপাঠে বা আলোচনায় যদি কিছু উপকার হইয়া থাকে, তাহা মিথ্যা বিদ্যাভিমান মাত্র।

সত্যবটে, প্রাচীন আচার্য্যগণ বেদাদি শাস্ত্রের অনেক ভাষ্যাদি করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা যাজ্ঞিকদিগের ক্রিয়া অনুষ্ঠানের উপায় সুগম করা, মন্ত্রাদি সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধ মীমাংসা করা, যজ্ঞবিশেষে মন্ত্রাদির সঙ্গতি, প্রয়োজন ও প্রয়োগ নিরূপণ করা ইত্যাদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা সাধারণ অযাজ্ঞিক লোকের প্রাকৃত পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে তাহা করেন নাই।

প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মসেবী সাধুপুরুষেরা যেন মনে না করেন যে, বেদমন্ত্রাদির অনুবাদ দ্বারা ভারতের কল্যাণ হইয়াছে। কেননা মন্ত্রাদির অর্থজ্ঞান দ্বারা কাহারো মঙ্গল হইবে; শাস্ত্রের সে উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু কেবল মন্ত্রের সাধন, মন্ত্রসমবায়ী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা নরনারীগণের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়, ইহাই শাস্ত্রের মহদুদ্দেশ্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

রাম ও কাম।

"যাঁহা রাম তাঁহা কাম নহি;
যাঁহা কাম তাঁহা নহি রাম।
দোনো এক কভি না মিলে,
রবি রজনী এক ঠাম্॥"
(তুলসীদাস)

রাম কোথায়? কাম নাই যথায়। সে কেমন কথা? ত্রেতাযুগের ভগবদবতার রাম ব্যক্তিধর্ম্মী বটেন, কিন্তু ব্রহ্মরূপ ঐশধর্ম্মে রাম ত সর্ব্বময়; তবে রামহইতে কামকে পৃথক্ করিলে, কাম বেচারী দাঁড়ায় কোথায়? গীতায় ভগবদুক্তি—'বিষ্টভ্যাহমিদংকৃৎস্নমেকাংশেনস্থিতো জগৎ।'

ঈশ্বরের একাংশেই সমগ্র জগৎ স্থিত, তবে আর জগজ্জীবের হৃদিস্থিত কাম জগদীশ্বরের সংস্রবশূন্য কিরূপে? মায়া হইতেই জীবের কামের উদ্ভব; সেই মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি; তবে আর কাম কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিরহিত?

অবশ্য জ্ঞান-মার্গের দার্শনিকতায় প্রেমেও রাম, কামেও রাম। ভোগেও রাম, যোগেও রাম। ইহার্থেও রাম, পরমার্থেও রাম। রাম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বময় বিদ্যমান। কিন্তু ভক্তিমার্গে ভজন-ভাবুকতায় ভক্তের আরাধ্য ও আস্বাদ্য ভগবত্তত্ত্ব কামগন্ধহীন—পরম প্রেমরসলীন। ঐশ্বর্য্যে রাম বিশ্বব্যাপারী, মাধুর্য্যে কেবল ভক্তহৃদ্‌বিহারী। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে দ্বিতীয়োক্ত রামতত্ত্বই লক্ষ্য। অদ্বৈত, উপাসনাতীত, 'অবাঙ্‌মনসোঽগোচরম্' ব্রহ্ম রাম এই 'রাম-কাম' আলোচনার অবিষয়। দ্বৈততত্ত্ববোধ্য, উপাস্য, ভক্তচিত্তৈকধাম ভক্ত-হৃদয়-রমণ ভগবান রামই ইহার বিষয়। তাই প্রবন্ধ-ভালভূষণ (Motto) তুলসী দাসী দোঁহায় রাম ও কাম রবি-রজনীবৎ প্রভিন্নরূপে প্রতীয়মান।

যোগীর রামে ও ভোগীর কামে যেন বহ্নি-বারিবৎ বিসদৃশ সম্বন্ধ। উভয়ের অবাধ মিলন ভাবটাই স্বভাবের অভাব স্বরূপ। সলিল-সঙ্গম আগুন নিবায়; অগ্নির আলিঙ্গনে জল শুকায়। যে যখন প্রবল হয়, তারই জয়, সেই রয়; যে দুর্ব্বল, সেই পরাজিত, তারই লয়। দুই বিরুদ্ধধর্ম্মী পদার্থের সংযোগফল এইরূপেই একের বিয়োগে বা বিলয়ে পর্য্যবসিত হয়।

বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি এক "বাড়বানল" পদার্থটি ব্যতীত বারি-বহ্নির একত্রতায় বিরোধাভাব কুত্রাপি নিসর্গ-নিয়মসূত্রে নিযন্ত্রিত নহে। ফলে সামুদ্রিক বাড়বানলে দাহিকাশক্তি নাই; কেবল প্রভাশক্তি আছে। শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ তীর্থের "বাড়বকুণ্ড"ও তদ্রূপ প্রাকৃতিক বিভূতিবিশেষ। প্রকৃত পক্ষে অনলের জ্বলনে জলের অবিরুদ্ধ মিলন সাধারণতঃ স্বভাবসিদ্ধ নহে। রাম-কাম-সম্মিলনও সেইরূপ অস্বাভাবিকতায় অসম্ভব। যদি তেজোময় রামকে "পাবনং পাবনানাং" স্বরূপে পাবক বল, তবে তিনি ক্লেদকারী অপ্‌ধর্ম্মী কামের স্পর্শ সহিবেন না। আর যদি সেই শ্রুতি-বিশ্রুত "রসো বৈ সঃ" রামকে রসস্বরূপ জল বল, তবে তিনি সাধু-সন্তাপন 'কৃষ্ণবর্ত্ম' কামাগ্নি-সঙ্গে রহিবেন না।

রাম—অর্থাৎ ভগবান, কাম—অর্থাৎ কামনা বা বিষয়বাসনা। বিষয়বাসনা ভগবানকে চায়ও না, পায়ও না। সে শুধু বিষয়কেই চায়; কভু পায়, কভু না পায়, তবু বিষয়কেই চায়। সে সর্ব্বৈশ্বর্য্যেশ্বর ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুবর বিশ্বেশ্বর ভগবানের কাছেও অকিঞ্চিৎকর বিনশ্বর বিষয়কেই চায়! শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! চারিপ্রকার সুকৃতিমান লোক আমাকে ভজনা করে,

যথা—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। অর্থাৎ ভগবানই সার, আর সব অসার, যিনি এই সার বুঝিয়াছেন এবং ভগবদ্-ভজনে মজিয়াছেন, তিনিই জ্ঞানী ভক্ত। সুতরাং এই 'জ্ঞানী' ভক্তই প্রকৃত নিষ্কাম; অপর ত্রিবিধই সকাম। আর্ত্ত—অর্থাৎ আধি-ব্যাধি-আপদ-বিপদে কাতর যে, সে ভগবানকে ডাকে দায়ে ঠেকিয়া। নিরুপদ্রবতাই তাহার কামনার বিষয়; সুতরাং সে সকাম। "জিজ্ঞাসু" তাঁহার তত্ত্ব জানিতে তাঁকে ডাকে। জ্ঞানেচ্ছার স্বার্থটি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং অজড় হইলেও, তাহাও সকামতা। এমন কি, অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি-রাজ্যের এলাকায় মুমুক্ষুতাও (মুক্তি-বাঞ্ছাও) সকামতা! নিজের জন্য কিছু—এই ভাবটা যতক্ষণ, ততক্ষণই অহঙ্কারের গন্ধ, ততক্ষণই সকামতা ও বিষয়-ভাবানুরতা; আর ঈশ্বরের জন্যই সমস্ত, তাঁরই উদ্দিষ্ট, তাঁতেই উৎসৃষ্ট, এই ভাবটিই জীব-পক্ষে নির্ব্বিষয় ও নিষ্কামতা। এই জন্যই অহংগন্ধীবাসনা-বিজয়ী তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তই যথার্থ নিষ্কাম ও প্রকৃত ভক্ত।

তবে জড়াত্মিকা কামনা না বলিয়া, ঐশতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুত্ব এবং মুমুক্ষুত্বকে চিদাত্মিকা কামনা বলা যাইতে পারে মাত্র। আর "অর্থার্থী"ত পরিষ্কার স্থূল সকাম,—সাধারণ-জড়াত্মিকা-কামনাবান। কেবল 'জ্ঞানী' অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া যে তাঁহার ভজনকারী ভক্ত হয়, সেই ঐহিক স্বার্থশূন্য, নিষ্কাম অহৈতুক ভক্তগণ্য। মহীতলে মানবকুলে সেই ধন্য। তত্ত্বজ্ঞানে ভগবানকেই সারাৎসার বুঝিয়া, ভগবানের প্রেমে মজিয়াই সে ভগবানকে ভজে, সুতরাং সেই যথার্থ কৃতার্থম্মন্য।

তথাপি অপর ত্রিবিধ সকাম ভক্তকেও ভগবান "সুকৃতী" অর্থাৎ পুণ্যবান বলিয়াছেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসই যে বহু পুণ্যের ফল। সর্ব্বনাশিনী নাস্তিকতার হাতে নিস্তার পাওয়াও যে বহু ভাগ্যের কথা। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু বা অর্থার্থী ভক্তেরাও ত—তিনি আছেন, তিনি অন্তর্যামী, দয়াবান, সর্ব্বশক্তিমান, ভক্তবাঞ্ছা-সম্পূরণে পূর্ণ সামর্থ্যবান, ইত্যাদি আস্তিকতামূলক বিশ্বাসে বলীয়ান্; এবং সেই জন্যই তাহারা স্ব স্ব সকাম সাধন সুসম্পন্ন করিবার জন্যই তাঁহার কাছে প্রপন্ন হয়। অতএব ঈশ্বরবিশ্বাসী মাত্রেই যে সুকৃতিমান, তাহাতে সন্দেহ কি? বিশ্বাস আসিতে আসিতেই যে অনেকের নিশ্বাস নিঃশেষিত হয়! পরমার্থপ্রদ এই দুর্লভ নরজন্ম ব্যর্থ হয়; সুতরাং এই জন্মে—এই সাধন-শরীরে থাকিতে থাকিতে ঈশ্বরে বিশ্বাসলাভ কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়।

"নেই-মামা চেয়ে কাণা-মামা" ভাল, ইহাত অস্মদ্দেশের নিত্যপ্রচলিত প্রবাদ-বাক্য। অতএব একেবারে অবিশ্বাসী অভক্ত অপেক্ষা বিশ্বাসী সকামভক্তও সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। বিশ্বাসই ধর্ম্মসাধন-কারবারের মূলধন। মূলধন অব্যাহত থাকিয়া ক্রম-পরিবর্দ্ধিত হইলে, কালে চরম লাভ-রূপ পরম পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেম অবশ্যই পাওয়া যাইবে। ভগবান সর্ব্বতত্ত্বসার গীতাশাস্ত্রের বহুস্থানে স্পষ্টাক্ষরে সে আশ্বাস দিয়াছেন। অতএব এই মূলধন—ঈশ্বর-বিশ্বাসরূপ অমূল্যধনে যে ধনী, সে সকামভক্ত

হইলেও, তাহাকে ভাগ্যবান, পুণ্যবান বা সুকৃতিমান কেন না বলা যাইবে?

বিশ্বাসের গাঢ়ত্ব-পরিণামই ভক্তি, ভক্তির গাঢ়ত্ব-পরিণাম বা পরিপাকই প্রেম। সকামতার মালিন্য 'ভক্তি' সংজ্ঞা পর্য্যন্ত কিছু থাকিতে পারে। তাহাই বৈধী, গৌণী বা হৈতুকী ভক্তি। কিন্তু রাগানুগা, মুখ্যা বা অহৈতুকী ভক্তি সংপূর্ণ কামমল-পরিশূন্যা হইয়া 'প্রেম' রূপে পূর্ণ পরিণত হয়। যেমন গুড়ের ক্রমোত্তর-পরিণামে খাঁড়-চিনি-মিশ্রী হওয়ার পর অবশেষে সুনির্ম্মল ওলা হয়, বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার চরম ও পরম পরিণাম প্রেমতত্ত্বও তদ্বৎ।

যেমন কেহ উদরাময়, বাত বা কাস প্রভৃতি রোগের উপশম-কামনায় হৈতুকী অহিফেন-সেবা আরম্ভ করে, কিন্তু রোগ তাহাকে ছাড়িয়া গেলেও, ঔষধ তাহাকে ছাড়ে না!

আফিংখোরেরা কেহ কেহ সকৌতুকে নাদরবাক্যে আফিংকে "কালচাঁদ" বলেন। সেই কালাচাঁদের প্রেমে একবার পড়িলে আর ছাড়ানো কঠিন। রোগারোগ্যের সকামতায় যে কালাচাঁদে হৈতুক প্রেম হয়, রোগারোগ্যান্তে সেই কালাচাঁদেই নিষ্কাম অহৈতুক প্রেম জন্মে। তখন আফিঙ্গের জন্যই আফিঙ্গ খাইতে হয়।

ভক্তের হৃদয়গগনের কালাচাঁদের প্রতিও প্রেমের প্রকৃতি-পদ্ধতি তদ্রূপ। সকামতা বা হৈতুকতায় উহার প্রবৃত্তি এবং নিষ্কামতা বা অহৈতুকতায় তাহার চরম ও পরম পরিণতি। একছের অহৈতুক ভগবৎপ্রেমের উদাহরণ জগতে অতীব দুর্লভ! ব্রজধামের কৃষ্ণপ্রেম,—বিশেষতঃ ব্রজগোপীর কৃষ্ণপ্রেম তাহার সর্ব্বোৎকর্ষময় পূর্ণতম আদর্শ। প্রহ্লাদ, হনুমান, অম্বরীশ, বিপশ্চিৎ, শুকদেব, উদ্ধব, ভীষ্ম প্রভৃতিও স্ব স্ব ভাবাধিকার-ভেদে উহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অপার-পুরাণ-পারাবার অনুসন্ধান করিলে, ওরূপ আরও অনেক রত্ন উদ্ধৃত হইতে পারে; কিন্তু তাহাও অবশ্য খুব বেশি নহে। কলি-কণ্ঠ-বিলম্বিত শ্রীগৌর-হরির লীলারত্ন-হারেও ওরূপ অনেকগুলি রত্ন গ্রথিত হইয়াছিল। ফলে হৈতুকতার সোপান বাহিয়া অহৈতুকতার উচ্চতম প্রাসাদে আরোহণ করিয়া, অনেক ভাগ্যবান ভারত-বক্ষে অতুল্য ও অটল ভগবদ্ভক্তি-গৌরবস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্বয়ং ভক্তচূড়ামণি ধ্রুব তাহার এক উজ্জ্বলতম অনুপম উদাহরণ।

স্বীয় পিতা অপেক্ষা অধিকতর রাজৈশ্বর্য্য লাভাশায় ধ্রুব হরিভজন-তপস্যায় নিরত হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন সংপূর্ণ বাহ্যবিলয় ও তন্ময়ভাব লাভে ভগবদ্দর্শন পাইলেন, এবং ভগবানও সাক্ষাৎ কল্পতরুর ন্যায় যথেচ্ছা বর দিতে চাহিলেন, তখন কি আর ধ্রুবের হৈতুকতা বা সকামতার নাম-গন্ধও ছিল? তখন তাঁহার সেই রাজৈশ্বর্য্য-কামনার হৈতুকতা অহৈতুক হরি-প্রেমামৃত-প্রবাহে কোথায় তুচ্ছাদপি-তুচ্ছ তৃণ-গুচ্ছবৎ ভাসিয়া গিয়াছে! বর-প্রার্থনার্থ ভগবদাদিষ্ট হইয়া ভক্তপ্রবর তখন ভাব-গদ্গদ বাক্যে বলিলেন,—

'স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহম্,
ত্বাং প্রাপ্তবান দেব মুনীন্দ্রগুহ্যম্।

কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নম্,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥"
অর্থাৎ—
স্থানাশায় তপস্যায় স্থিত হয়ে, তায়,—
হে মুনীন্দ্রগুহ্য দেব! পেলাম তোমায়!
পেলাম পরমরত্ন অন্বেষিতে কাচ।
কৃতার্থ হলাম প্রভো! বরে নাহি কাজ ॥

ইহাত কত যুগ-যুগান্তরের কথা! এই যে সে দিনও যশোহর জেলার কালীয়া—বেন্দা গ্রামনিবাসী শাক্তগুরুবংশের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীমৎ সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য যোগবিভূতি—অষ্টসিদ্ধি লাভাশায় শবসাধনায় শক্তি-সাক্ষাৎকার পাইয়া, মহাদেবী কর্ত্তৃক যেই যথেষ্ট বর প্রার্থনার্থ আদিষ্ট হইলেন, অমনি অহৈতুকী শক্তি-ভক্তির প্রবল প্রবাহোচ্ছ্বাস-ভরে গদ্গদস্বরে বলিলেন,—

"মাতঃ কিং বরমপরং যাচে,
সর্ব্বং সম্পাদিতমিতি সত্যম্।
যত্তচ্চরণাম্বুজমতি গুহ্যং
দৃষ্টং বিধি-হর-মুরহর-জুষ্টম্ ॥"
অর্থাৎ—
কি অপর বর চাব মা! আবার?
সকলি যে মোর সফল সত্য!
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-পূজিত তোমার
দুর্লভ চরণ হেরিয়া অদ্য ॥

সেই সত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত চিরকালই সেই প্রেমসিন্ধুর প্রেমালিঙ্গন-প্রয়াস-রঙ্গিণী ভগবদ্ভজনরসতরঙ্গিণীর এই গতি—এই পরিণতি!

সাধে কি বলিতে হয়—কামে প্রেমে প্রকৃষ্ট প্রভেদ! কামে—রামে বিস্পষ্ট বিচ্ছেদ! যে রামকে চায়, কাম তার কোথায়! সেই ধ্রুব হইতে—এই সর্ব্বানন্দ পর্য্যন্ত, যাহারও বা প্রারম্ভে কিছু কাম-গন্ধ রয়, তাহারও পরিণামে তাহার সংপূর্ণ বিলয় হয়; নতুবা কি তারে দর্শন দেন সেই শুদ্ধ নিষ্কাম-প্রেমবাধ্য প্রেমময়? তবেই যে কেবল প্রেমময়কেই চায়, কাম-লক্ষ্যের মোক্ষ-সাম্রাজ্যলক্ষ্মীও তার চরণে গড়াগড়ি যায়!

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা।
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষ-সাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ ॥"
অর্থাৎ—
শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মে ঘনানন্দা ভক্তি যার,
মহামোক্ষরাজলক্ষ্মী লোঠে পাদপদ্মে তার ॥

শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে দেবর্ষি নারদকে বলিতেছেন,—

"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মাহেন্দ্রধিষ্ণ্যং,
ন রসাধিপত্যং ন সার্ব্বভৌমম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা,
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥"
অর্থাৎ—
কিবা সে ব্রহ্মত্ব, কিবা সে ইন্দ্রত্ব,
কি রসাধিপত্য, কি সার্ব্বভৌমত্ব,
কি যোগসিদ্ধি, কি পুনর্জন্মনাশ,
(কিছুতেই কিছু নাহি অভিলাষ)
আমাতে অর্পিত চিত সদা যার,
আমা বিনা কিছু চাহেনা সে আর ॥

কাজেই "যাঁহা রাম, তাঁহা কাম নহি।"

শ্রীগৌরহরি স্বীয় সুবিখ্যাত শিক্ষাষ্টক শ্লোকে গাইয়াছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে—
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

অর্থাৎ—

নাহি চাহি ধন, জন, না চাই সুন্দরী;
না চাই কবিত্ব, ওহে জগদীশ হরি!
জনমে জনমে যেন জনমে আমার—
অহৈতুকী ভক্তি অই চরণে তোমার॥

তথা—(অন্যত্র)।

"নাস্থা স্বর্গে ন বসুনিচয়ে,
নৈব কামোপভোগে।
ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে
ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।"

অর্থাৎ—

সাধ নাই স্বর্গে, কিম্বা ধনভাগ্যে,
কাম-উপভোগ্যে কামনা নাই।
জন্ম জন্ম ধরি এ হৃদয় ভরি
তোমারেই হরি! ভাবিতে চাই॥

রামানুরাগী কামবিরাগী প্রেমযোগীর ইহাই প্রাণের কথা। ভক্ত তুলসীদাস গাহিয়াছেন,—

"কাহুকো ধন-ধাম হ্যায়,
কাহুকো পরিবার।
তুলসী অ্যাসা দীনকো
সীতা-রাম আধার॥"

(তথা—)

একটুক্‌ধা কৌপীন্ লেক্‌রা,
ভাজি বিন্ লোণ।
রাম রঘুবর বৈঠে উর্ পর্
ইন্দ্রপুর বা কোন্?

অর্থাৎ—

কারু আছে ধনধাম, কারু পরিবার।
তুলসী দীনের শুধু সীতারাম সার॥
এক টুক্‌রা কপ্নী-কাচা,
আলুনী দুটো ভুজোভাজা,
রামরঘুবর হৃদে থাকে,
স্বর্গ তবে কোথা লাগে?

রামে রমে চিত্ত যার, স্বর্গ-মোক্ষও তুচ্ছ তার; সুতরাং তার কাছে এই নগণ্য জঘন্য ঐহিক ভোগ-কামনা ত অতি ছার! অতএব এ ভাবে রামে কামে আলো আঁধার, স্বর্গ নরক বা অমৃত-বিষবৎ বিসদৃশ সম্বন্ধ।

রামই শান্তিধাম, কাম নিখিল অশান্তি নিদান। গীতায় গীত হইয়াছে,—

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে,
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"

অর্থাৎ—

অচলপ্রতিষ্ঠ পূর্ণ সমুদ্রে যেরূপ
বর্ষিত হইলে বারি, কোথা মিশে যায়!
যাহাতে কামনাবলি বিলীন সেরূপ,
সেই শান্তি পায়, কিন্তু কামী কভু নয়।

তৃপ্তি বা নিবৃত্তি ভিন্ন শান্তি কোথায়? আর কামোপভোগে তৃপ্তি বা নিবৃত্তি কোথায়? উহা যে বিকারের পিপাসার ন্যায় ক্রমে বেড়েই যায়, কিন্তু কখনও ছেড়ে যায় না।

মনু বলেন,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে॥"

অর্থাৎ—

বাড়ে বৈ কমেনা কাম কভু কাম-উপভোগে।
দ্বিগুণ আগুন যথা জ্বলে ঘৃতাহুতিযোগে॥

গীতায়ও কামকে দুর্দ্দমনীয় অনল বলা হইয়াছে, যথা—

"কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।"

এই কামানল শিখা ভোগের আহুতিযোগে

ক্রম বৃদ্ধি পরম্পরায় মানবের আত্মশুদ্ধির অমোঘ উপায় বিবেকবুদ্ধি পর্য্যন্ত নাশ করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে। গীতায় ইহার ক্রম কথিত হইয়াছে, যথা—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎসংজায়তেকামঃকামাৎক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ—

বিষয়-চিন্তনে চিত্তে আসক্তি উৎপন্ন হয়,
আসক্তি হইতে কাম, কাম হতে ক্রোধোদয়;
ক্রোধে জন্মে সংমোহ, সংমোহে হয় স্মৃতিনাশ,
স্মৃতিনাশে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশে সর্ব্বনাশ॥

এই সর্ব্বনাশক কামের আদি বীজ বিষয়-চিন্তা। তাহা পুষ্টি পাইলে, তাহা হইতে আসক্তির অঙ্কুর উদ্গত হয়, উহাই ক্রমে কাম-রূপ বিশাল বিষবৃক্ষে পরিণত হয়। ঐ বৃক্ষ হইতে ক্রোধরূপ মহোদ্ধত শাখা জন্মে, তাহা হইতে সম্মোহরূপ ঘোর ছায়ান্ধকারকারী ঘনকৃষ্ণ পত্রাবলী ওঠে এবং তদগ্রে রজস্তমের উগ্র-গন্ধী রক্ত-কৃষ্ণ ফুল ফোটে এবং সেই ফুলেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিনাশরূপ বিষফল।— অথবা বিষফল সেবনের অবশ্যম্ভাবী ফলই বিনাশ।

এই কামই মোক্ষার্থী মানবের চির বৈরি।
"আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।"
জ্ঞানীর এই নিত্যশত্রু কামই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সংসার-সমরাঙ্গণে এই মহাশত্রুকে জয় না করিতে পারিলে আর আত্মরক্ষার আশা নাই। গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে তারস্বরে বলিয়াছেন—

"জহি শত্রুং মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদম্।"

হে মহাবীর পার্থ! ঐ (সর্ব্বার্থসংহারক) দুর্দ্ধর্ষ মহাশত্রু কামকে জয় কর। সংসার-সমরে কাম-জয়ই প্রকৃত জয়। এই মহাবাহুত্ব বা বীরত্বই প্রকৃত বীরত্ব।

মনই কামের দুর্গ; সুতরাং মন-জয় না করিলে কাম-জয় অসম্ভব। জয়ীর শ্রেষ্ঠই মনজয়ী। তুলসীদাস গাইয়াছেন,—

"রাজা করে রাজ্যবশ যোধা করে রণজয়ি।
আপ্‌না মনকো বশ করে সো সবমে সেরা ওই॥"

গীতাতেও মনকে কামের দুর্গ বলা হইয়াছে।
"ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।"

ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধিই "অস্য (কামস্য) অধিষ্ঠানং"—অর্থাৎ এই কামের আশ্রয় দুর্গ। ইন্দ্রিয় সকল মনেরই একান্ত অধীন, মনই ইন্দ্রিয়রাজ অন্তরিন্দ্রিয়। বুদ্ধিও মনেরই নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তি মাত্র; কেবল দার্শনিক বিচারের সূক্ষ্ম ভেদে স্বতন্ত্র তত্ত্ববৎ কল্পিত। ফলে মোটামুটি মনই সব; সুতরাং মনই মানবের মহাশত্রু কামের দুর্জ্জয় দুর্গ। এই মনকে আয়ত্ত করা সুদুষ্কর হইলেও, তাহা না করিতে পারিলেও মানুষের নিস্তার নাই। কেননা "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।" মনুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষ, এ উভয়ের কারণই মন। গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন,—

"যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥"

অর্থাৎ—

যে যে হেতু ছুটে যায় চঞ্চল মন অধীর,
সে সে হতে ফিরাইয়ে আত্মায় করিবে স্থির।

কিন্তু ব্যাপার ত সহজ নয়। নিরঙ্কুষ মদমত্ত মাতঙ্গবৎ মনকে বাধ্য করা ত যার

তার সাধ্য নয়। স্বয়ং ভগবৎসখা অর্জ্জুনও যে হতাশস্বরে বলিলেন,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"

অর্থাৎ—

হে কৃষ্ণ! চঞ্চল প্রমত্ত প্রবল
মন দৃঢ় অতিশয়।
বায়ুবৎ তার নিগ্রহ আমার
সুদুষ্কর জ্ঞান হয়॥

অর্জ্জুনেরই যখন এই কথা, তখন আর "অন্যে পরে কা কথা!" কিন্তু তাহাই বলিয়া নিরাশ হইবারও কথা নয়। অর্জ্জুনের উপলক্ষ্যে জগজ্জনকে তত্ত্বোপদেশ শিক্ষা দানই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-লক্ষ্য। অতএব মন-দমন রূপ আসল (অথচ অতি কঠিন) কাজটার কৌশল-নির্দ্দেশ তিনিই সংক্ষিপ্ত সরল উক্তিতে ব্যক্ত করিলেন, যথা—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥"

অর্থাৎ—

সত্য বটে বীরবর! মনোজয় সুদুষ্কর,
কিন্তু কুন্তীসুত!
অভ্যাসে—বৈরাগ্যে আর মনের সংযম সার
হইবে নিশ্চিত॥

শ্রীভগবান মনকে পোষ মানাইবার—অভ্যাস ও বৈরাগ্য, এই দুটি উপায়ের উপদেশ করিলেন। এই দুটির অব্যাহত সাধনে ক্রমেই মন 'মনের মতন' হইয়া আসিবে। ফলে মনটি 'মনের মতন' না হইলে আর সেই মনমোহনের পায় মনের সাধে মন দেওয়ার উপায় হয় না। মন ঠিক করাই মানবের প্রধান সাধন। এ মানব-জীবন-ব্যবসায়ে মনই মানুষের মূলধন। মানুষের শুভাশুভ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, স্বর্গ-নরক, বন্ধ-মোক্ষ, কাম-প্রেম—কাম-রাম, সবই মনের দোষাদোষের ফলভেদ মাত্র। দুষ্ট মন মোহে মজায়, শিষ্ট মন কৃষ্ণ ভজায়। তাই মনের এই কৃষ্ণভজনানুকূল শিষ্টতা সাধনের উপায় কৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন,—অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ সাধন) ভিন্ন সিদ্ধি অসম্ভব। সংসারে সামান্য শিক্ষাও অভ্যাস-সাপেক্ষ, আর মানুষের পক্ষে অসামান্য এবং অবশ্য আবশ্যকীয় ঈশ্বরোপাসনা-উপলক্ষিত এই মনঃসংযম-শিক্ষা অভ্যাস ব্যতীত কিরূপে সম্পন্ন হইবে? যদি কাহারো হইতে দেখা যায় বা পুরাণেতিহাসে উদাহরণ পাওয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সেই সহসা-শুদ্ধ ও অনায়াস-সিদ্ধের পূর্ব্বজন্মে 'অভ্যাস' পূর্ণ ও প্রস্তুত হইয়াছিল। এইরূপ স্থলেই শাস্ত্রোক্ত "কৃপাসিদ্ধ" শব্দ ব্যবহৃত। কারণ এ জন্মে সেই ঐশী কৃপায় প্রভা সহসাই প্রকটিত হয়। আর জন্মে যে প্রপন্ন হয়ে থেকেছে, এ জন্মে সেই কৃপালাভের যোগ্য হয়। "তিনি অধমকে কৃপা করেন"—এ কথার অর্থ এমন নয় যে, অধমের অধমত্ব থাকা সত্ত্বেও কৃপা করেন। তিনি অধমকে সাধনাধিকার দিয়া, অধমতা ছাড়াইয়া, তবে সিদ্ধিদানরূপ কৃপা করেন। আবার অধমকে সেই সাধনাধিকারও কৃপা করিয়াই দিয়া থাকেন। তাঁহার আগাগোড়াই যে কৃপা। দুষ্কৃতের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কারও তাঁর কৃপা-উপহার। তাঁহার শাস্তিরূপ যেরূপ জীবের শান্তির জন্য, শাস্তারূপও সেইরূপ নিস্তারের

জন্য। তাঁহার নিগ্রহ-অনুগ্রহ—দুইই অনুগ্রহ; উভয়থাই তিনি বিমল কৃপা-বিগ্রহ!

"করুণা-বরুণালয়ে করুণা স্বভাব।
কৃপা-সিন্ধু-মাঝে বিন্দু অকৃপা-অভাব॥"

কৃপাময় কৃপা করিয়াই জীবের সাধন-সম্বল মনকে সেই কৃপালাভের অনুকূল করিবার উপায় উপদেশ করিয়াছেন,—অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

এখন কথা এই যে, শাস্ত্রোক্ত সর্ব্ববিধ সাধনাভ্যাসের মধ্যে কলিতে ভগবন্নাম-সাধনই অব্যর্থ সর্ব্বার্থসাধন। এই সাধনাভ্যাসই এই যুগে সেই "সাধনের ধন" লাভের একমাত্র বাধক দুর্দ্দম্য মনের দমনের এবং কাম ছাড়িয়া রাম-রমণের অমোঘ উপায়।

অভ্যাসদ্বারা কামের দুর্গম দুর্গ মনকে জয় করা যায়। এই অভ্যাস সাধারণতঃ টীকা-ব্যাখ্যায় যোগাভ্যাস বলিয়াই উক্ত। কিন্তু যোগ বহুবিধ; তন্মধ্যে ভক্তিযোগই সর্ব্বযোগ-শিরোমণি। গীতাবক্তাই গীতায় বলিয়াছেন,—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবানভজতেযোমাংসমেযুক্ততমোমতঃ॥"

অর্থাৎ—

সর্ব্বযোগী মধ্যে যেবা হইয়া মদ্গতমন,
ভক্তিভরে ভজে মোরে,যোগীশ্রেষ্ঠ সেই জন।

অতএব স্পষ্টই দেখাযাইতেছে যে, সর্ব্বতত্ত্বসংশয়চ্ছেদে অমোঘাস্ত্র মহাযোগ-শাস্ত্র গীতায় ভক্তিযোগকেই উচ্চতম আসন প্রদত্ত হইয়াছে। আবার এই ভক্তিযোগ-উপাসনা ভগবৎকীর্ত্তন দ্বারাই সুদৃঢ় ও সুসিদ্ধ হয়। সে সত্যও গীতায়ই সুগীত, যথা—

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥"

অর্থাৎ—

সদা মৎকীর্ত্তন করি দৃঢ়ব্রত যত্নভরে।
নমি মোরে ভক্তিযোগে নিত্য উপাসনা করে॥

ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি—স্তুতি-মন্ত্রাদি দ্বারা সতত সযত্নে সুদৃঢ়ব্রত হইয়া কীর্ত্তন করতঃ, তাঁহাকে প্রণতিপূর্ব্বক ভক্তিযোগিগণ নিত্য তাঁহার উপাসনা করে। অতএব ভগবৎকীর্ত্তনই সর্ব্বযোগশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগ-উপাসনার প্রধান সাধন। বিশেষতঃ এই কলিযুগে হরিকীর্ত্তনই অনন্য—অব্যর্থ সাধন। কলি ধর্ম্ম-কল্পতরু তন্ত্রে মন্ত্র-স্তোত্রাদি বাহুল্যে এবং কলি-কলুষহর ভক্তি-সুধা-সাগর-পুরাণে নাম-রূপ-লীলা-প্রাবল্যে এই ভগবৎকীর্ত্তনেরই বিশদ বিধান বিঘোষিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-প্রবৃদ্ধির নিবৃত্তি জন্য উদ্ধৃতি অনাবশ্যক। শাস্ত্রসেবী ভগবৎ-ভজনরসলোভী পাঠক যত্র তত্র সর্ব্বত্র এই সিদ্ধান্তের বহু সুপ্রমাণ সংপ্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইবেন, সন্দেহ নাই। কলিযুগে অন্তিমের অনন্য বন্ধু তারকমন্ত্রই যে মহানামসংকীর্ত্তন।—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এতাবতা প্রমাণিত হইল যে, রাম-ভজন অর্থাৎ ভবব্রহ্মভজনবিরোধী কামের দুর্জ্জয় দুর্গ মনকে জয় করিতে যোগাভ্যাসই প্রধান উপায় এবং যোগসমূহের মধ্যে ভক্তি-যোগই প্রধান; আর ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভের উপায় কলিতে হরিকীর্ত্তনই প্রধান।

অতএব হরি-কীর্ত্তনাভ্যাসই মনদমনের ও মনোজ কামদমনে—সুতরাং রাম ভজনের—অর্থাৎ ভগবদ্‌ভজনের অনন্ত, অব্যর্থ ও অনায়ন্ত সাধন।

কামাধিষ্ঠান মনের দমনের দ্বিতীয় উপায় বৈরাগ্য। বিষয়ভোগের অনিত্যতা, অকিঞ্চিৎকরতা ও দৃষ্টাদৃষ্ট-দোষদুষ্টতা চিন্তাই বৈরাগ্যের প্রসূতি। ঐরূপ চিন্তা চর্চ্চা, অনুকূল শাস্ত্রাদি-প্রসঙ্গ ও বিষয়বিরক্ত সাধুসঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা অসার বিষয়ভোগে যে বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি, তাহাই বৈরাগ্য। এখন দেখুন, গীতোক্ত সেই—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ" ইত্যাদি বচন হইতে জানা যায় যে, বিষয়ের চিন্তা হইতে রাগ—অর্থাৎ বিষয় ভাল লাগা জন্মে, এবং যাহা ভাল লাগে, তাহাই লাভের জন্য কামনা জাগে। ঐ কামনাই কাম। অতএব কামের কারণ বিষয়-ভাললাগা এবং তাহার কারণ বিষয়চিন্তা। এখন সেই প্রথম চিন্তাক্ষেত্রেই বৈরাগ্যের বীজ বপন করার জন্য—অর্থাৎ বিষয়কে অনিত্য, অসার, পরন্তু অনিষ্ট-ফল-সার বুঝিবার জন্য তদনুকূলচিন্তা-চর্চ্চাদির ফলেই ঐ উপ্ত বৈরাগ্যের ক্রমবিকাশ হইবার কথা।

বিষয়েতে যদি আসক্তি শিথিল হইল, তবে আর তল্লাভার্থ কামের উদয় হইবে কেন? যাহা অহৃদ্য ও অপ্রিয়, তাহা স্বভাবতই অকাম্য। যে বিষয়ের প্রিয়তাবুদ্ধি যত হৃদয়-রমণীয়া, তল্লাভ-লোলুপ কাম তত দুর্দ্দমনীয়। কামের এই দুর্দ্দমনীয়তা মনের দুর্দ্দমনীয়তারই ফল। উহা মন হইতেই উদ্ভূত হইয়া কামের দ্বারা বিষয়ে বিকাশিত ও বিস্তারিত হয়। কামের এক নামই মনোজ; এই জন্য দুর্দ্দম মনের অপত্য বলিয়া, কামের দুর্দ্দমতা মনেরই বিষয়াসক্তি-মত্ততার ক্রমোত্তর-অভিব্যক্তি মাত্র। কামের ঐ স্বভাব বা প্রভাব পৈত্রিক প্রণেতা (Hereditory tendency) মাত্র। অতএব বৈরাগ্য দ্বারা মনের প্রবৃত্তি পবণতা প্রশমিত হইলে, কামের উদ্ধত উচ্ছ্বাস স্বতয়েব অসম্ভাবিত। ফলে বৈরাগ্য-বৃদ্ধিই মন-শুদ্ধি ও নিষ্কামতা-সিদ্ধির অভ্যাস-সহকারিণী অব্যর্থশক্তি।

এমন লোক দেখা যায়, যিনি স্বভাবতই অনেকটা নিস্পৃহপ্রকৃতিমান বা বিষয়বৈরাগ্যবান, কিন্তু ভগবৎসাধনার্থক যোগাভ্যাসে অযত্নশীল বা উদাসীন। আবার কেহ বা ঈশ্বরারাধনার আবশ্যকতা বোধে যোগাভ্যাসে যত্নবান হইয়াও, মনের বিষয়প্রিয়তাজনিত দৌর্ব্বল্যে—সুতরাং কামের প্রাবল্যে ও প্রাতিকূল্যে তাহাতে ব্যর্থস্বার্থ। ফলে মানবজন্মের সার্থক্যসাধনে উভয়বিধ ব্যক্তিই অকৃতার্থ। এই জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্য, দুয়েরই প্রয়োজন। আবার এ দুইই পরস্পর সাপেক্ষ। সাধনার্থী হইয়া যে ব্যক্তি এ দুয়েরই আবশ্যকতা অন্তরের সহিত অনুভব করে, তাহার অভ্যাস বৈরাগ্যবর্দ্ধনের সহায় হয়, এবং বৈরাগ্য তাহার অভ্যাসে মিষ্টতা ও একনিষ্ঠতা প্রদান করে। অতএব (আবার বলি) অভ্যাস ও বৈরাগ্যই কামাধিষ্ঠান মন ও মনোজ কাম-দমনের এবং রাম-রমণের অনন্ত উপায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।
(যশোহর)

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা



১৫শ বর্ষ, ১৫শ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩১৫ সাল, ১৮৩০ শকাব্দা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ সম্বন্ধে চিন্তা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে :—"উষাই যজ্ঞীয় অশ্বের শির, সূর্য্য উহার চক্ষু, বৈশ্বানর অগ্নি উহার বিবৃত মুখ, সম্বৎসর উহার শরীর, আকাশ উহার পৃষ্ঠদেশ, বায়ুমণ্ডল উহার উদর, পৃথিবী উহার পাদপীঠ, দিক্‌সমূহ উহার পার্শ্বদেশ, অবান্তর দিক্‌সমূহ উহার পার্শ্ব-অস্থি, ঋতুসমূহ উহার অঙ্গ, মাস ও অর্দ্ধমাস উহার পর্ব্ব (সন্ধিস্থান) দিবারাত্র উহার পাদস্থান, নক্ষত্র উহার অস্থি, নভোমণ্ডল উহার মাংস। বালু উহার অর্দ্ধজীর্ণ খাদ্য, নদীসমূহ উহার নাড়ী, পর্ব্বত উহার যকৃৎ ও প্লীহা, ওষধি ও বনস্পতি উহার লোম ও কেশ, ঊর্দ্ধগামী সূর্য্য শরীরের সম্মুখ ভাগ, নিম্নগামী সূর্য্য শরীরের পশ্চাদ্ভাগ, বিদ্যুত উহার বিজৃম্ভণ, মেঘগর্জ্জন উহার শরীরের কম্পন, বৃষ্টি উহার (মূত্র), শব্দ ঐ অশ্বের বাক্য, দিবা অশ্বের সম্মুখস্থিত মহিমা, পূর্ব্ব সমুদ্র উহার জন্মস্থান, রাত্রি উহার পশ্চাদ্‌স্থিত মহিমা, পশ্চিম সমুদ্র উহার জন্মস্থান— ঐ মহিমাদ্বয় অশ্বকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। এই অশ্ব হয় নামে দেবতাদিগকে বহন করিয়াছিলেন, বাজী নামে গন্ধর্ব্বদিগকে বহন করিয়াছিলেন, অর্ব্ব নামে অসুরদিগকে বহন করিয়াছিলেন, অশ্ব নামে মনুষ্যদিগকে বহন করিয়াছিলেন। সমুদ্র ইহার বন্ধু, সমুদ্র ইহার জন্মস্থান।"

মূল শ্লোকগুলি নিম্নে দেওয়া গেল ;—

ওঁম্ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য-শিরঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্নি বৈশ্বানরঃ সংবৎসর আত্ম-হশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরীক্ষমুদ-রম্ পৃথিবী পাজস্যং দিশঃপার্শ্বে

অবান্তরঃদিশ পর্শবঃ ঋতবোহঙ্গানি মাসাশ্চার্দ্ধমাসাশ্চ পর্ব্বান্যহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রান্যস্থীনি নভোঃ মাংসানি। উধধ্যং সিকতাঃ সিন্ধবঃ গুদা যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্ব্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ লোমান্যুদ্যন্ পূর্ব্বার্দ্ধো নিম্লোচঞ্জঘনার্দ্ধ যদ্বিজৃম্ভতে তদ্বিদোদতে যদ্বিধুনুতে তৎস্তনয়তি যন্মেহতি তদ্বর্ষতি বাগেবাস্যবাক্॥ অহর্বা অশ্বং পুরস্তান্মহিমাহম্বজায়ত তস্য পূর্ব্বে সমুদ্রেযোণী রাত্রিরেনং পশ্চান্মহিমাহম্বজায়ত তস্যাপরে সমুদ্রে যোণিরেতৌ বা অশ্বং মহিমানাবঙ্গিতঃ সংবভূবতু। হয়ো ভূত্বা দেবানবহদ্বাজী গন্ধর্বানর্বা হসুরানশ্বো মনুষ্যান্সমুদ্র এবাস্যবন্ধু সমুদ্রো যোনিঃ।

ইতি প্রথমাধ্যয়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণঃ সমাপ্তম্।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইলে, কয়েকটী কথা স্মরণ রাখা উচিত। বেদের সংহিতা অংশ কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। উপনিষদ্ অংশ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। যাহার দ্বারা নিশ্চয়রূপে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়, তাহাই উপনিষদ। অশ্বমেধ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব এবং বহুবিধ পশু-পক্ষী বলি দিতে হইত। যজ্ঞীয় অশ্বে বিরাট পুরুষের কল্পনা করা হইত। প্রথম ব্রাহ্মণে অশ্বমেধের অশ্ব বস্তুতঃ কি, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। যজ্ঞীয় অশ্বকে যদি বিরাট পুরুষ মনে করা যায়, তাহা হইলে প্রথম ব্রাহ্মণের অর্থ সহজে স্ফুট হইবে। বৃহদারণ্যকের নামান্তর বাজসনেয়ী ব্রহ্মোপণিষদ্। যাহারা সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্য এই ব্রহ্মোপনিষদ্। এই উপনিষদ্ অরণ্যেরচিত হয় বলিয়া ইহার নাম আরণ্যক এবং সকল উপনিষদ্ অপেক্ষা ইহা বৃহৎ বলিয়া ইহার নাম বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।

প্রথম ব্রাহ্মণে এই বলা হইতেছে যে, কর্থকাণ্ডে যেরূপ অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিতে হয়, জ্ঞানকাণ্ডে সেরূপ করিতে হইবে না। এই বিশ্বকেই বিরাট পুরুষের শরীর বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। কর্ম্মকাণ্ডে অশ্বের শরীরকে বিরাট পুরুষের শরীর বলিয়া কেন কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, সমুদ্র-পার হইতে ভারতবর্ষে অশ্ব আনা হইত। সমুদ্রকেই অশ্বের জন্মস্থান বলা হইয়াছে। অশ্ব সুন্দর, দ্রুতগামী, বলবান এবং যোদ্ধৃবর্গের সহায় স্বরূপ। যেরূপেই হউক, অশ্বের সহিত বলবীর্য্যাদির ধারণা ক্রমে সংযোজিত হইয়াছিল। পবিত্রতা হেতু শিলাদিতে বিষ্ণুর পূজা হয়—অশ্ব পবিত্র বিবেচিত হওয়ায়, উহাতে প্রজাপতির অধ্যারোপ হইয়াছে। কাল, লোক এবং দেবতায় সমষ্টিই

প্রজাপতি। কালের মধ্যে উষাই প্রধান, এই জন্য উষাকে মস্তক রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শরীরের মধ্যেও মস্তকই প্রধান অঙ্গ। তেজোময় সূর্য্যই চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, এই জন্য সূর্য্যকেই চক্ষু বলা হইয়াছে। ঐরূপ বৈশ্বানর অগ্নি মুখের দেবতা। মুখের কার্য্য যে খাদ্য গ্রহণ, তাহার 'বৈশ্বানর' অগ্নিদ্বারাই সিদ্ধি হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে—"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্।" সংবৎসরই কালের শরীর স্বরূপ। এইরূপে বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ প্রজাপতির ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ বা কার্য্য কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপ বর্ণনার মূল কথা হইতেছে যে—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বই প্রজাপতির শরীর। কর্ম্মীরা অশ্ব উপলক্ষ করিয়া প্রজাপতির ধ্যান করেন, অরণ্যবাসীরা প্রকৃতি উপলক্ষ করিয়া প্রজাপতির ধ্যান করেন। হয়, বাজী, অর্ব্ব, অশ্ব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের অশ্ব।

(ক্রমশঃ)

পরেশনাথ তীর্থ।

বিন্ধ্যাচলে পরেশনাথ নামে উচ্চ গিরি উর্দ্ধে প্রায় পঞ্চ সহস্র ফুটে। এই পাহাড়টি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত থাকিয়া অগস্ত্য মুনিবরকে প্রণাম করিতেছে। ইহার অপর নাম সুমেত শেখর। তীর্থঙ্করসেবী জৈনগণ এই অচলকে অতি পবিত্র চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। এই পবিত্র অচলের দর্শন কামনায় গুজরাত, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রাজপুতভূমি ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানস্থ জৈনধর্ম্মাবলম্বীগণ প্রভূত ধনব্যয় স্বীকার করিতে অকুণ্ঠিত হন এবং এই অচলের উপরিস্থ তীর্থস্থান সমূহের দর্শন লাভ ঘটিলে তাঁহারা আপনাদিগকে পরম সুকৃতি-সৌভাগ্যযুক্ত ও গৌরবান্বিত বলিয়া বিবেচনা করেন।

সুমেত শেখরে কুড়ি জন তীর্থঙ্কর নির্ব্বাণ পদলাভ করেন। তীর্থঙ্কর বা জিনগণ মহাপুরুষ বা অবতার স্বরূপ। জৈনগণের মতে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জন্ম গ্রহণ করেন। ঋষভদেব সর্ব্ব প্রথমে তীর্থঙ্কর পদটী লাভ করেন। পরে (২) অজিত (৩) শম্ভব (৪) অভিনন্দন (৫) সুমতি (৬) পদ্মপ্রভু (৭) সুপার্শ্ব (৮) চান্দ্রপ্রভু (৯) সুবিধি (১০) শীতল (১১) শ্রেয়াংস (১২) বাসুপূজ্য (১৩) বিমল (১৪) অনন্ত (১৫) ধর্ম্মনাথ (১৬) শান্তিনাথ (১৭) কুন্থনাথ (১৮) অরনাথ (১৯) মল্লিনাথ (২০) মুনিসুব্রত (২১) নমীনাথ (২২) নেমীনাথ (২৩) পার্শ্বনাথ (২৪) মহাবীর। ক্রমান্বয়ে তীর্থ পদবী লাভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে ঋষভ, বাসপূজ্য, নেমিনাথ ও মহাবীর এই চারিজন তীর্থঙ্কর ভিন্ন অপর কুড়ি জন তীর্থঙ্কর পবিত্র সুমেত শেখরে নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত এবং ইহারই সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে পার্শ্বনাথ দেব মোক্ষ পদবী লাভ করেন। এই কারণেই ইহা জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণের পরম তীর্থ স্থান। সুমেত শেখরের পাদদেশে মধুবন নামে এক স্থান আছে। মধুবনে ধর্ম্মশালা আছে। পরেশনাথ-যাত্রীদিগের ইহাই বিশ্রাম-ভূমি। মধুবন হইতে তিন ক্রোশ উর্দ্ধে আরোহণ করিলে, পার্শ্বনাথ দেব ও অন্যান্য তীর্থঙ্করগণের সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এই মধুবন স্বভাবতঃই শান্তরসাস্পদ।

ইহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলে বিচিত্র বনভূমি, পক্ষীর সুমধুর কূজন ও গ্রামবাসীগণের সরলতাব্যঞ্জক প্রীতিপদ মুখশ্রী, কিছুরই অভাব দৃষ্ট হয় না। এই ধর্ম্মশালা হইতে পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে অবলোকন করিলে, এক বিরাট পর্ব্বত বৃক্ষরাজিমণ্ডিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে, বোধ হইবে।

মধুবন নামক স্থান গিরিধি হইতে প্রায় বিশ মাইল। গিরিধি হইতে হাজারিবাগ অভিমুখে যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া নয় ক্রোশ পথ গমন করিলে দুইটি রাস্তা পাওয়া যায়। ইহার একটি রাস্তা বরাবর হাজারিবাগ অভিমুখে গিয়াছে। আর একটি রাস্তা মধুবন অভিমুখে গিয়াছে। রাস্তা দুইটির সন্ধিস্থল হইতে মধুবন এক ক্রোশের অধিক দূর নহে। পরেশনাথ পাহাড় গিরিধির উত্তরদিকে অবস্থিত। মধুবন বা পরেশনাথ যাইতে হইলে, গিরিধি হইতে পুস্‌পুস্ বা গোযানে আরোহণ করিতে হয়। গোযানের ভাড়া সাধারণতঃ দুই টাকার অধিক নহে। গিরিধি হইতে পরেশনাথের রাস্তায় আট মাইল গমন করিলে বরাকর নামে এক নদী পাওয়া যায়। স্থানের নামও বরাকর বা পালগঞ্জ। বরাকর নদী স্বল্পতোয়া নদী বটে, কিন্তু স্বচ্ছসলিলা। নদীর মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর। তখন বোধ হয় মধ্যে এক হাতও জল ছিল না। পুস্‌পুস্ ও গোযান সহজেই জলের উপর দিয়া পার হইয়া গেলে, আমরা পালগঞ্জে উপস্থিত হইলে, দুই তিনটি ব্রাহ্মণ দর্শন করিয়াছিলাম। তাহারা পরেশনাথ পাহাড়ের পাণ্ডা বলিয়া পরিচয় দিল। এবং সুললিত স্বরে স্তোত্র গাহিয়া পয়সা ভিক্ষা করিতে লাগিল। এই স্থানে করুণাউদ্দীপক আরও কয়েকটি দরিদ্র-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম। তাহাদের দীনভাব সততই অন্তরের নিকট এই তত্ত্ব নিবেদন করে যে, জীবের সেবাই পরম ধর্ম্ম।

বরাকর নামক নদী হইতে স্থানের নামও বরাকর হইয়াছে। বরাকরে একজন রাজা আছেন। তাঁহাকে একজন বড় ভূস্বামী বলা যায়। রাজার উদ্যোগে প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে বরাকরে একটি মেলা হইয়া থাকে। বরাকর বা পালগঞ্জ হইতে মধুবন নয় মাইল দূরবর্ত্তী। রাস্তার দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ, অরণ্য, ও মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। রাস্তা হইতে দূরে পল্লী-সমূহ মধ্যে প্রাচীন অধিবাসীদিগের বাসস্থান।

মধুবন নামক স্থানে জৈনধর্ম্মাবলম্বীগণের তিনটি ধর্ম্মশালা আছে। এই ধর্ম্মশালাগুলি বর্ণনা করিতে হইলে জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক দুই একটি কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। জৈনগণ দুই শ্রেণী বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায় ও দিগম্বরী সম্প্রদায়। দিগম্বরীগণ আবার দুই পন্থীতে বিভক্ত; তেরপন্থী ও বিশপন্থী। মধুবনে শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের একটি ও দিগম্বরী সম্প্রদায়ের তেরপন্থী ও বিশপন্থীগণের এক একটি, সমুদায়ে তিনটি ধর্ম্মশালা আছে।

বিদ্যাসাগর শান্তিমুনি বিজয়জী মহারাজ নামে একজন জৈনধর্ম্মাবলম্বী শ্রাবক "শান্তি-সুধা" বা "মানবধর্ম্মসিংহিতা" নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি স্ব পুস্তকে লিখিয়াছেন—জৈনধর্ম্ম অতিপ্রাচীন। তাঁহাদের মতে শেষ জিনদেবই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা

সিদ্ধার্থের গুরু। অনেকে বলেন বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈন-ধর্ম্ম একরূপ। শান্তিমুনি মহারাজ বলেন—জৈনগণের বিশ্বাস তাহা নহে। তাঁহাদের মতে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মে পার্থক্য আছে। জৈন-গণের পঞ্চচত্বারিংশ সংখ্যক আগম (দর্শন ও সংহিতাগ্রন্থ) আছে। এই সমস্ত পুস্তক বৌদ্ধদর্শন ও সংহিতা গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক্। বৌদ্ধদিগের পূজা-প্রণালী জৈনদিগের পূজা-পদ্ধতি হইতে পৃথক্। জৈনগণ চব্বিশজন তীর্থঙ্করকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। এইরূপ সকল ও অন্যান্য কারণে জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম যে এক বা এক-রূপ, তীর্থঙ্করসেবীগণ তাহা স্বীকার করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করেন না।

বিজয়ন্দী স্বামী বলেন—জৈন ধর্ম্ম অতি-পুরাতন বলিয়া ইহা পূর্ব্বে কোন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল না। সম্প্রদায়-বিভাগ আধুনিক। শিবভূতি সহস্রমল্ল নামে একজন সাধক দিগ-ম্বর সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। যাঁহারা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন, তাঁহারাই দিগম্বর আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। বস্ত্রত্যাগের উপর বিশিষ্টতা থাকায় দিগম্বর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। (দিক্ শূন্য—নগ্নভাব; অম্বর বস্ত্র)। দিগম্বরগণ তাঁহাদের উপাস্য দেবগণের মূর্ত্তি বস্ত্রভূষণাদিদ্বারা অলংকৃত করেন না। শ্বেতা-ম্বরীগণ পবিত্রতাই (শ্বেত—শুভ্রতা—পবিত্রতা) দেবতার বস্ত্র বলিয়া তাঁহাদের উপাস্য মূর্ত্তিকে বস্ত্র ও নানারূপ অলঙ্কারে ভূষিত করেন। দিগম্বরদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কথিত

রথবীরপুরনগরে দীপক উদ্যানে শ্রীআচার্য্য কৃষ্ণ নামে একজন আচার্য্য বিহার করিতেন। সেই নগরে শিবভূতি সহস্র মল্ল নামে এক প্রসিদ্ধ গৃহস্থ বাস করিতেন। তিনি প্রতি রাত্রিতেই বাড়ী ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করিতেন বলিয়া তাঁহার স্ত্রী শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে বলিয়া দেন। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী পুত্রবধূকে অর্গল বদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতে ও দ্বার খুলিয়া না দিতে আদেশ দিয়া নিজে জাগিয়া থাকেন। পুত্র আসিয়া ডাকাডাকি করিলে মাতা রুক্ষ স্বরে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর বাক্যে বলিলেন—'যেখানে এত রাত্রে দ্বার খোলা আছে, সেখানে প্রবেশ কর।' মাতার বাক্যে পুত্রের মনে অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল এবং শিবভূতি সহস্র মল্ল সেই গভীর রাত্রিতেই বাটী পরিত্যাগ করিলেন। রাত্রিতে ঘুরিতে ঘুরিতে সাধু আচার্য্য কৃষ্ণের আশ্রমের দ্বারদেশ খোলা দেখিতে পাইয়া সেই আশ্রম প্রবেশ করেন এবং সাধু হইবার জন্য আচার্য্যের নিকট অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আচার্য্য অবশেষে তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া কিছুদিন পরে সেই নগর পরিত্যাগ করেন। কিছুকাল পরে আচার্য্য আবার সেই নগরে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া শিবভূতি রাজপ্রদত্ত একখানি উত্তম কম্বল উপহার দিবার জন্য আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হন। আচার্য্য তখন শিবভূতিকে বলেন 'এইরূপ বহুমূল্যবান্ বস্ত্রের প্রয়োজন কি?' ইহা রাখা উচিত নহে। এই বলিয়া উক্ত রত্ন-কম্বলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। ইহাতে শিবভূতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কিছুদিন পরে আচার্য্য জিনকল্পী মুনি-দিগের অধিকার সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ছিলেন। উক্ত উপদেশের মধ্যে জিনেশ্বরদিগের বস্ত্র পরিত্যাগের কথা উল্লেখ থাকায়, শিবভূতি

আচার্য্যকে বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। আচার্য্য উত্তর করেন যে, যদিও জিনেশ্বরদিগের বস্ত্র পরিত্যাগের কথা উল্লেখ আছে, তথাপি আমাদের পক্ষে এখন সম্পূর্ণ নগ্ন থাকা অসম্ভব। আর তা ছাড়া জিনদিগের কেহই একেবারে বস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। শিবভূতি কিন্তু আপনার বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি সমস্ত বস্ত্র ও পাত্র পরিত্যাগ করিয়া নগ্নভাবে উদ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। তাহার পরে ক্রমে তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। শেষে তাঁহার মত জৈনধর্ম্ম মধ্যে একটি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও পদ্ধতি সৃষ্টি করিল।

এইরূপে দিগম্বর সম্প্রদায় উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। (বিদ্যাসাগর)

শান্তিমুনি বিজয়জী মহারাজ "শান্তিসুধা" নামক তৎপ্রণীত মানবধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিয়াছেন—শ্বেতাম্বরী মতই প্রাচীন। তাঁহার মতে তীর্থঙ্কর ও আর্হতগণের জন্মগ্রহণের পরে দিগম্বরী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পাওয়াপুরী নগরীতে চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর নির্ব্বাণ-পদ লাভ করিবার ছয় শত নয় বৎসর পরে এই মত প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মধ্যে প্রধানতঃ মত-পার্থক্য এইরূপ ;—

(১) দিগম্বরগণ বস্ত্র ত্যাগ স্বীকার করেন।

(২) দিগম্বর জৈনগণের মতে স্ত্রীলোকদিগের মোক্ষ নাই।

(৩) শ্বেতাম্বর জৈনগণের মতে বন্দনা দ্বারা 'ধর্ম্মলাভ' আর দিগম্বর জৈনগণের মতে 'ধর্ম্মবৃদ্ধি' ঘটে।

(৪) শ্বেতাম্বরী জৈনগণের মধ্যে যাঁহারা মুনিব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক প্রকার 'জিনকল্পী' ও অপর 'স্থবিরকল্পী' জম্বুস্বামী নির্ব্বাণ লাভ করিলে পর জিনকল্পী মুনি আর দেখা যায় না। এখন যাঁহারা মুনিব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই স্থবিরকল্পী। দিগম্বর সংসারত্যাগীগণের মধ্যে এরূপ কোন বিভাগ নাই।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কতকগুলি মত-পার্থক্য আছে। দিগম্বরীগণ আপনাদের উপাস্য দেবতাকে কোনরূপ অলঙ্কারে ভূষিত করেন না। এমন কি, ফুল-চন্দন প্রভৃতি পাদ্যার্ঘ্যও প্রদান করেন না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেশর দ্বারা তাঁহাদের উপাস্য-দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিশপন্থী নামে অভিহিত। আর যাঁহারা তাহাও করেন না, তাঁহারা তেরপন্থী নামে অভিহিত। ইঁহারা বলেন, পুষ্প-বিল্বপত্র চয়নে বহুপ্রাণী হিংসার সম্ভাবনা আছে; সুতরাং এইরূপ না করাই ভাল।

দিগম্বরীগণের মতে স্ত্রীলোকদিগের মোক্ষ নাই। কিন্তু শ্বেতাম্বরীগণ ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন, সাধনা দ্বারা কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ, সকলেই নির্ব্বাণ পদ লাভ করিতে পারেন। মল্লিনাথ (উনবিংশ তীর্থঙ্কর) স্ত্রীলোক ছিলেন, ইহা শ্বেতাম্বরীগণ বলিয়া থাকেন। উভয়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে কোন কিম্বদন্তী প্রচলিত থাকুক না কেন, শিক্ষা, সাধুতা ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায় যে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আরও সুখের বিষয় এই যে, একজন স্ত্রীলোক সাধনাদ্বারা সিদ্ধমনোরথ হইয়া "তীর্থঙ্কর"

পদবীতে আরূঢ় হইয়াছিলেন ও জৈনধর্ম্মের পথ প্রদর্শিকা হইয়াছিলেন বলিয়া বুঝা যায় যে, জৈনধর্ম্মে আত্মার শান্তিপ্রদা ও শিবদাত্রী শক্তিসমূহ সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্ব পাত্রে ভারতের স্বাধীন যুগে কিছু কালের জন্য দিব্য স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল।

জৈন ধর্ম্মীগণ সকলেই ধূপ, দীপ, পুষ্প, আতপ তণ্ডুল, হরিদ্রা; চন্দন, আমলক প্রভৃতি দিয়া পূজা করিয়া থাকেন। পূজা-প্রণালী আমাদের নারায়ণ শিবাদি পূজারই অনুরূপ; তবে সংক্ষিপ্ত। সেই 'ওঁ, হ্রীং, স্বাহা' প্রভৃতি বীজমন্ত্র তাঁহাদের দেবতার পার্শ্বে গিয়া বসিয়াছে। তীর্থঙ্করগণের পূজাপ্রণালী প্রায় একরূপ, তবে স্তব ভিন্ন ভিন্ন। রত্নসাগর, আরাধন-প্রকরণমালা প্রভৃতি পুস্তকে পূজা-পদ্ধতি সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। মধুবনে আমরা দিগম্বর তের পন্থী সমাজভুক্ত কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পূজা-প্রণালী দেখিয়াছিলাম। পূজা-পদ্ধতিতে একটু বিশেষত্ব দেখা গিয়াছিল। দেখিলাম—একজন একচক্ষুহীনা অল্পবয়স্কা তেজস্বিনী বিধবা সমধিক অনুরাগের সহিত মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, অপরাপর পুরুষ ও স্ত্রীলোকগুলিও সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন এবং 'ওঁ হ্রীং পার্শ্বনাথায় স্বাহা,' ইত্যাদি বলিয়া পূজার দ্রব্য উৎসর্গ করিতেছেন।

স্ব স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণ তাঁহাদের নিজ ব্যয়ে ধর্ম্মশালাগুলি র্নিমাণ করাইয়া দিয়াছেন। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশালা জগৎশেঠ ধনপতি সিংহ বাহাদুর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। প্রত্যেক ধর্ম্মশালার চত্বরভূমি তিন ভাগে বিভক্ত। (১) অতিথি নিবাস (২) কাছারি-বাড়ী (৩) উপাসনা-প্রাঙ্গণ। শ্বেতাম্বরী জৈনদিগের ধর্ম্মশালানির্ম্মাণ গৌরবে সমধিক প্রশংসনীয়। ইহাঁদের ধর্ম্মশালাটি মধ্যভাগে অবস্থিত। উভয় পার্শ্বে তেরপন্থী ও বিশ্-পন্থীদিগের ধর্ম্মশালা বিরাজিত রহিয়াছে। বিশ্‌পন্থীগণের মন্দিরের হেমখচিত অগ্রভাগ সমূহে রক্তপতাকা এবং শ্বেতাম্বরীগণের মন্দিরের সুবর্ণমণ্ডিত শিখরে অর্দ্ধরঞ্জিত পতাকা বিরাজ করিতেছে।

ধর্ম্মশালায় যাত্রীদিগের আবাস স্থানের ব্যবস্থা পরিপাটী অতি সুন্দর। দ্বারদেশে প্রবেশ করিলেই দুই শত হাত প্রশস্ত ও পাঁচশত হাত দীর্ঘ এক ভূমিখণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে অতিথিদিগের থাকিবার জন্য বহু প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতিথিশালার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তিনটি মন্দির দৃষ্ট হয়। অতিথি-শালা অতিক্রম করিয়া কাছারীবাড়ী প্রবেশ করিতে হয়। অতিথি সেবালয় চতুর্দ্দিকেই হয় গৃহ ভিত্তি না হয় উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অতিথি-সেবালয় অতিক্রন করিয়া কাছারি বাড়ী প্রবেশ করিতে হয়। কাছারি বাড়ী প্রবেশ করিতে হয়। কাছারি বাড়ীর মধ্যস্থলে ফুলের বাগান। উত্তর দিকে কাছারি বাড়ী। পূর্ব্বদিকে নূতন আর একটি অতিথ্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। কাছারিবাড়ীতে দেওয়ান, মুন্‌সি, খাজাঞ্চি, জমাদ্দার, বর্কন্দাজ, পাইক ও বহু ভৃত্য আছে। প্রহরে প্রহরে নহবৎ বাজিয়া থাকে। রাত্রিতে তিন ঘণ্টা অন্তর এক একজন লোক বন্দুক হস্তে ঠাকুর-বাড়ী পাহারা দিয়া থাকে। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে স্নানাগার। এখানে একটি ইন্দারা আছে। স্নানের নিমিত্ত গরম জল, ঠাণ্ডা

জল প্রভৃতি যোগাইবার জন্য পরিচায়ক নিযুক্ত আছে। কাছারি বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া একটি সুরঙ্গ পথে কিছু দূর গমন করিলেই স্নানাগার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাছারি বাড়ীর অপর আর এক পার্শ্বে ধর্ম্মশালার গোসমূহ রক্ষিত থাকে।

কাছারি বাড়ীতে যে নূতন অতিথিশালা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার একটি ঘরে প্রায় ত্রিশখানি চেয়ার, একটি টেবিলও কয়েকখানি পুস্তকসহ একটি আলমারি আছে। ইহাই লাইব্রেরী বা পুস্তকাগার। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, পুস্তকগুলি ষষ্ঠী সংখ্যকের অধিক হইবে না। ইহাদের মধ্যে—১। মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বা শান্তিসুধা, ২। (শ্রীধর শিব লালজি) জ্ঞান-জ্যোতিষশাস্ত্র, ৩। পঞ্চাঙ্গ (ধর্ম্মসভা) জ্যোতিষ, ৪। শ্রীঅষ্টোত্তর শত কাশিক পঞ্চাঙ্গ চিহ্নম্ জ্যোতিষ, ৫। জৈন পঞ্চাঙ্গ, ৬। আরাধন প্রকরণ মালা, ৭। শ্রীজীন-গুণগাহির সংগ্রহ, ৮ শ্রীজৈনরত্নমণি, ৯। শ্রীচতুর্বিশতি জিনস্তবনাবলী, ১০। অর্হন্নীতি, ১১। বৈরাগ্য-তরঙ্গ ভক্তিমালা, ১২ ষট্ পুরুষ চরিত্র, ১৩। নিত্যপূজা সংস্কৃত রত্নাবলী, ১৪। জম্বুস্বামী চরিত্র, ১৫। শ্রীপূর্ব্বদেশ তীর্থ স্তবনাবলী * * * ১৮। বৈরাগ্য তরঙ্গ ভেদমালা, ১৯। আত্মভিক্ষাভাবনা, ২০। জৈন নিত্যপাঠ সংগ্রহ, ২১। জীনস্তোত্র সংগ্রহ, ২২। সুখপ্রাপ্তিনাং সাধন, ২৩। শ্রীপঞ্জাবদেশ তীর্থস্তবনাবলী, ইত্যাদি পুস্তকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রে বা শান্তিসুধা বিত্তাসাগর শান্তি মুনি বিজয়জি প্রণয়ন করেন। শ্বেতাম্বরী জৈনগণ ইহার ছবি পটাঙ্কনে রক্ষিত করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করেন। পুস্তকখানি দেখিলে বোধ হয়—যেন মনুসংহিতার অনুকরণেই লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উল্লেখযোগ্য আরও কতকগুলি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে, যথা :—

১। প্রমাণ নয় তত্ত্বালোকালঙ্কার, (শ্রীদেবসুরি)।

২। হৈমলিঙ্গানু শাসন—অবচুরী সহিত (হেমচন্দ্রাচার্য্য)।

৩। সিদ্ধ হেম ব্যাকরণ লঘু বৃত্তি, (বিগেরে সহিত)।

৪। গুর্বাবলী।

৫। রত্নাকরাবতারিকা যে পরিচ্ছেদ (টি, প, সহিত) শ্রীরত্ন প্রভাচার্য্য।

৬। শ্রীজৈনস্তোত্র সংগ্রহ ১ম ও ২য় ভাগ।

এই সকল গ্রন্থ প্রণেতৃগণের মধ্যে বহু বহু পণ্ডিত ছিলেন। দেবসুন্দর সুরি, জ্ঞান সাগর সুরি, সোমসুন্দর সুরি, মুনিসুন্দর সুরি প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম শ্রদ্ধা সহকারে জৈনগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন।

জৈন ধর্ম্মে তত্ত্বদর্শনের অনুকূল পঞ্চচত্বারিংশৎ সংখ্যক অগম আছে। যোগী ও অর্হৎগণ এই সমস্ত গ্রন্থে দর্শন ও সাধনাতত্ত্বসমূহ বিচার করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত বিচার কথা শ্রবণ করিলে মন অনুরাগপূর্ণ ও পবিত্র ভাবরসে আপ্লুত হয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত পুস্তকগুলির মধ্যে "জিনজাহিরগুণ সংগ্রহ" নামক পুস্তকে বিশ্বকোষ প্রণেতা হেমচন্দ্রের নাম পাওয়া গেল।

শ্লোকটি এই :—

"শ্রীহেমচন্দ্র গুরু সিদ্ধ গুণৈঃ পরং স
শ্রীসোমসুন্দর গুরু প্রভবোহুকুর্য্যুঃ।
কিং ত্বদীয় নববিধ মহাপ্রতিষ্ঠা

পুস্তকাগারে সারণী দৃষ্টে জানা গেল যে, "সিদ্ধ হেম ব্যাকরণ" নামে হেমচন্দ্র প্রণীত একখানি ব্যাকরণ আছে। "হৈমলিঙ্গানুশাসন" নামক পুস্তকও আচার্য্য হেমচন্দ্র-প্রণীত। এই সমস্ত গ্রন্থের বৃত্তি, পঞ্জী, টীকা, বিগেরে, অবচুরী আদি বর্ত্তমান আছে।

গ্রন্থ-প্রকোষ্ঠে "শ্রীশুদ্ধোপযোগ" (বা সহজ সমাধি) নামে আর একখানি (সংস্কৃত ভাষায় লিখিত) পুস্তক দেখিলাম। ইহা একখানি পরমাত্মা দর্শনগ্রন্থ। জৈনাচার্য্য শুভ চন্দ্র কর্তৃক ইহা বিরচিত। গ্রন্থখানিতে শতাধিক শ্লোক দৃষ্ট হয়। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে বোধ হয় গ্রন্থকার সভাষ্য পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শন সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধন, ভক্তি ও জ্ঞান একাধারে বর্ণনা করিতেছেন। গ্রন্থখানি হিন্দু দার্শনিকের ও সাধকের অতি আদরের জিনিষ। ইচ্ছা করে সমস্ত শ্লোকগুলি উদ্ধার করিয়া পাঠকবর্গের গোচর করি। কিন্তু তাহা অসম্ভব বোধে অন্ততঃ একটি শ্লোকের উদ্ধার বাসনা পরিহার করিতে পারিলাম না।—

"অতীন্দ্রিয়মনির্দিশ্যমমূর্ত্তং কল্পনাচ্যুতম্।
চিদানন্দময়ং বিদ্ধি স্বস্মিন্নাত্মানমাত্মনা॥
মুচ্যেতাধীত শাস্ত্রোঽপি নাত্মেতি কলয়ন্ বপুঃ।
আত্মন্যাত্মান মন্বিষন্ শ্রুত শূন্যোঽপি মুচ্যতে॥"

কাছারিবাড়ীর অতিথিসেবালয়ে গঙ্গা ঋষি নামে এক সংসারত্যাগী পুরুষ সাময়িক ভাবে অবস্থান করিতেছেন। ইনি সুবেবিহার ও মির্জ্জাপুরে বেশীর ভাগ কালযাপন করেন। কিশোর বয়সে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কিছুকাল তত্ত্বগ্রন্থ অধ্যয়নে ও বহুকাল তীর্থ সমূহ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। সংসারত্যাগী জৈনগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যতি ও সম্বুদ্ধ। ইনি যতিসম্প্রদায় ভুক্ত। যতি-সম্প্রদায়ীগণ যদিও বিবাহ প্রভৃতি সংসারধর্ম্ম গ্রহণ করেন না, তথাপি অনেকের ধনরত্ন ও সংসারের প্রতি একটু আধটু আসক্তি থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু সম্বুদ্ধ সম্প্রদায়ী সংসারত্যাগীগণ স্বভাবতঃ বিষয়-বিরক্ত ও সতত মননশীল।

কাছারিবাড়ী অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মশালার তৃতীয় বিভাগে উপস্থিত হইতে হয়। এই তৃতীয় বিভাগেই দেবালয় বা ঠাকুরবাড়ী অবস্থিত। দুই শত হস্তেরও অধিক চতুষ্কোণাকৃতি সুবেষ্টিত উচ্চ ভূখণ্ডে দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। পরিষ্কৃত সুবিস্তৃত শুভ্র অঙ্গনে দশটি উদ্ধ শিখর বর্ত্তমান। মন্দিরগুলি সুবর্ণচূড় এবং উহার পতাকাসমূহ অর্দ্ধশুভ্র ও অর্দ্ধরঞ্জিত। মন্দিরগুলি তিন পার্শ্বে তিনটি তিনটি করিয়া নয়টি ও আর এক পার্শ্বে একটি, এইরূপ ভাবে সুশোভন এই দশ সংখ্যক মন্দিরে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের সুন্দরালঙ্কৃত মূল্যবান প্রস্তরময় মূর্ত্তি আছে। বিশেষত্ব এই, সকল মন্দিরেই পার্শ্বনাথ দেবের মূর্ত্তি বর্ত্তমান।

শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশালার কথা উল্লিখিত হইল। দিগম্বরী সম্প্রদায়েরও ঐরূপ দুইটি ধর্ম্মশালা আছে। তবে দিগম্বরী সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্য্য ও দেববৈভব শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায় অপেক্ষা অল্প বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু দিগম্বরী সম্প্রদায় ধর্ম্মশালায় তীর্থযাত্রী অনেক দেখিয়াছিলাম। ইঁহাদের মন্দির-সংখ্যা পাঁচ ছয়টির অধিক না হইলেও, প্রত্যেক মন্দিরের পুরোভাগে

অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে মালা লইয়া জপ করিতে দেখিয়াছিলাম।

শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের মন্দিরগাত্রে কোন পৌরাণিক ছবি দেখিতে পাইলাম না। কাছারী ঘরে একখানি পৌরাণিক ছবি দেখিতে পাইয়াছিলাম। পাঁচটি সাধুশীলা তপস্বিনী মূর্ত্তি আকুল ভাবে ভগবানের প্রার্থনাপরায়ণা। কিন্তু দিগম্বরী সম্প্রদায়ের মন্দিরগুলির পুরোগাত্রে অনেকগুলি ছবি দেখিলাম। ছবিগুলি কাগজে আঁকাইয়া কাচাধারে বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। কোনখানি আবুপাহাড়স্থ গির্ণার পাহাড়ের ছবি। এখানে তীর্থঙ্কর নেমিনাথ দেব নির্ব্বাণ পদ লাভ করেন। কোন খানি পরেশনাথ পাহাড়ের ছবি। কোনখানি গজকুমারের ছবি। একখানি ছবিতে নীলরঙ্গে রঞ্জিত একটি সুবৃহৎ (সংসার) বৃক্ষ। বৃক্ষ হইতে একটি সুপুরুষ (কাম) কলসে করিয়া মদিরা বর্ষণ করিতেছে। কতকগুলি নরনারী একান্ত উৎসুক নেত্রে ঊর্দ্ধমুখে তৎপানাশায় বৃক্ষমূলে সমবেত হইয়াছে। কতকগুলি ছবি দেখিলাম তাহার নীচে ইংরাজীতে লেখা আছে। 1 A Grand Temple of Tarangajee Hill. 2. The view Shatranryce River 3. The Temple of Shree Kesharinathgl 4. The first Tank of the girnar Hills 5. The foot of the Shatrnjaya Hill. এই সমস্ত পৌরাণিক ছবিগুলির সহিত তীর্থঙ্করগণের স্মৃতি বিশেষরূপে জড়িত আছে।

—×—

পরেশনাথ-আরোহণ।

পরেশনাথ পাহাড়ের অপর নাম সুমেত শেখর। এই পাহাড় উর্দ্ধে পঞ্চসহস্র ফুট। ইহারই সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে পার্শ্বনাথ দেব নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হন। এই পাহাড়ের অন্যান্য শিখর দেশে আরও উনিশ জন তীর্থঙ্কর মোক্ষলাভ করেন। চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব অষ্টাপদ পর্ব্বতে (কৈলাসে) মোক্ষলাভ করেন। সর্ব্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর পাওয়া পুরীতে নির্ব্বাণলাভ করেন। দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ রাজপুতনার আবু পাহাড়স্থ গির্ণাবে নির্ব্বাণ লাভ করেন এবং তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্য যম্পাপুরীতে, নির্ব্বাণ লাভ করেন। যম্পাপুরী বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকট অবস্থিত।

নেমিনাথের পরবর্ত্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ দেব। ইনি নেমিনাথের সহস্র বৎসর পরে জন্মগহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে জৈনদিগের আচার-পদ্ধতি, দর্শনজ্ঞান অবিশুদ্ধ ও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। পার্শ্বনাথ দেব জন্মগ্রহণ করিয়া চরিত্রবলে জৈনদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দেন। পার্শ্বনাথ দেব ইক্ষাকু বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বারাণসী নগরের সন্নিকটস্থ ভেলুপুরা ইহাঁর জন্মস্থান। গুরু ইহাকে অহিংসা, তপস্যা, দান, শীল ও ভাবনা দ্বারা দিনাতিপাত করিতে ও কঠোর তপশ্চরণ করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার তপশ্চরণ কালে মায়া তাঁহাকে একাগ্রভূতি হইতে পাতিত করিবার জন্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করেন। অবিরাম বারিপাতে বিকটাকার

শিখরাংশ সমূহ স্থানচ্যুত হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিজলীলেখা—মূহুর্ম্মুহু অশনিসম্পাত। সমস্ত পর্ব্বত যেন বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। যোগী কিন্তু অচল অটল! জিনজাতকে কথিত আছে যে, পার্শ্বনাথ দেবের তপশ্চরণে মুগ্ধ হইয়া অনন্তশক্তি বাসুকী স্বীয় মস্তকরাজি তাঁহার শিরোভাগে ছত্ররূপে বিরাজিত করতঃ তাঁহাকে প্রবল বারিপাত হইতে রক্ষা করেন। সেই জন্য আজও পার্শ্বনাথ দেবের মস্তোকপরি ফনাচিহ্ন বিরাজ করিয়া থাকে।

পরেশনাথ পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে নির্ম্মিত পার্শ্বনাথ দেবের মন্দির পাদদেশে অবস্থিত মধুবন নামক স্থান হইতে তিন ক্রোশ ব্যবধান হইবে। পাহাড়ের উপর অন্যান্য স্থানে কুড়ি জন তীর্থঙ্করের সমাধি-স্থান আছে। কেবল চারজন তীর্থঙ্কর এখানে সমাধি লাভ করেন নাই। তাহা না হইলেও তাঁহাদের স্মৃতিচৈত্য স্থাপিত আছে। তীর্থঙ্করগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পরেশনাথ পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত চৈত্য-সংখ্যা সমুদায়ে পঞ্চবিংশতি। পাহাড়ের উপর এই চৈত্যগুলি দর্শন করিতে হইলে তিন ক্রোশ পথ পরিভ্রমণ করিতে হয়। এই নয় ক্রোশ পথের ভ্রমণ ক্লেশ পরিহারের জন্য ডুলি পাওয়া যাইতে পারে, এবং সমগ্র পাহাড় পরিভ্রমণের জন্য ডুলির ভাড়া তিন টাকার অধিক হইবে না। প্রত্যূষে যাত্রা করিলে, এই নয় ক্রোশ পথ পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে নয় দশ ঘণ্টা সময় লাগে। যাঁহারা ভ্রমণ-পটু নহেন, তাঁহারা যেন এই দুরারোহ যড়াই উৎরাই পদব্রজে ভ্রমণ করিতে সাহস না করেন। বৎসরের মধ্যে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন, এই চারি মাস পর্ব্বতারোহণের প্রশস্ত সময় এবং অধিকাংশ যাত্রীই এই সময়ে পরেশনাথ দর্শনে গমন করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

গিরিধিপ্রবাসী—
সতীশ ব্রহ্মচারী।

কর্ম্মের* সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ।

১। শব্দ ব্রহ্ম।

১। "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ। "ব্রহ্ম" এই শব্দটী বৈদিক। শাস্ত্রানুসারে পণ্ডিতগণ ইহার ত্রিবিধ অর্থ গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ "শব্দ-ব্রহ্ম"। "শব্দব্রহ্ম" বেদকে বুঝায়। বেদশাস্ত্র ভারতীয় নিখিল কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের কল্পদ্রুম। ইহা বলা বাহুল্য যে, "শব্দব্রহ্ম", অক্ষর অব্যয় অবিনাশী অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রধান মূর্ত্তি। এই অনির্ব্বচনীয় রূপটী বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত স্মৃতি আগম এবং পুরাণময়। উহা বেদাগমাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মসমবায়ী মন্ত্র, মন্ত্রাধিপতি-দেবতা, ক্রিয়ার উপকরণদ্রব্য স্বরূপ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি, দান, ধ্যান, মঙ্গলবাদ্য, মঙ্গলগান আদি অনুষ্ঠানে তদাত্মক। এই "শব্দব্রহ্ম"

* "কর্ম্ম" শব্দের অর্থ বেদস্মৃত্যাদি বিহিত "ধর্ম্মকর্ম্ম"। তাহা প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি।

রূপী বেদশাস্ত্রকে যাঁহারা জানেন এবং তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা অথবা যজন যাজন করেন, কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারে তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। বেদান্তশাস্ত্রে অক্ষর পরব্রহ্মকে বেদের যোনি—অর্থাৎ জন্মস্থান কহেন। তাঁহার মতে সেই পরব্রহ্ম হইতে বেদশাস্ত্র বিনাপ্রযত্নে নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় উৎপন্ন হয়েন। তদুৎপত্তিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ও প্রযত্ন না থাকায়, বেদশাস্ত্রকে অপৌরুষেয় কহে। বেদের নিত্যতা প্রবাহরূপী। তিনি প্রতিকল্পে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় সমান ভাবে প্রকটিত হন। প্রত্যেক প্রলয়কালে তিনি সূক্ষ্মরূপে পরমাত্মাতে স্থিতি করেন এবং প্রত্যেক সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার যোগে অবতীর্ণ হন।

—x—

২। অপরব্রহ্ম।

২। "ব্রহ্ম" শব্দের দ্বিতীয় অর্থ "অপরব্রহ্ম"। সেই অপরব্রহ্মের নামান্তর কার্য্যব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, ঈশ্বর, আদি-পুরুষ, পিতামহ প্রভৃতি। মন্ত্র-বর্ণে এবং উপনিষৎশাস্ত্রে পরমাত্মা হইতে ইহার জন্ম শ্রুত হয়। ইনি পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র দেবতা নহেন। কিন্তু জগৎ ও আত্মনিহিত বেদ প্রকটনার্থ তাঁহার অংশাবতার স্বরূপ। অতএব তিনি পরমাত্মার দ্বিতীয় মূর্ত্তি। এই রূপটী সন্ধ্যোপাসনা, তপস্যা, যোগাচার প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অতঃপর পিতামহপদে তিনি প্রজাপতিগণের জন্মদাতা ও আদি পুরুষ। একভাবে পরমাত্মা হইতে তাঁহার জন্ম কথন এবং অন্যভাবে তাঁহাকে পরমাত্মার রূপবিশেষ বলিয়া প্রতিপাদন, এই দুইটী কথা পরস্পর বিরোধ-জ্ঞাপক নহে। ইহা ঔপচারিক ভেদমাত্র।

—x—

৩। আদিপুরুষ।

৩। স্থূলকথা এই যে, সৃষ্টিতে প্রবেশ উপলক্ষে পরব্রহ্মের নাম হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, বিরাট প্রভৃতি হইয়াছে। এই প্রবেশটী জন্মসূচক। কিন্তু উহার মধ্যে একটী বিশেষ কথা আছে। খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মপুস্তক যেমন আদম ও ইবকে মানবের আদি পিতামাতা বলিয়া স্বীকার করেন, হিন্দুশাস্ত্রের মতে সেরূপ আদি পিতা কেহ ছিলেন কিনা? এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মা যখন জগতে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনিই সকলের আদিপুরুষরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহাতে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র উভয় ধাতু নিহিত ছিল। মরীচাদি ব্রাহ্মণ প্রজাপতিগণ তাঁহার ব্রহ্ম ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মাজ বা ব্রহ্ম-মূর্ত্তিবিশেষ বিবস্বান সূর্য্য ক্ষত্রধাতুর বীজ। বৈবস্বতমনু সূর্য্যতেজের অবতারস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মমানস সম্পন্ন আদি ক্ষত্রিয় বংশ-ধর। যেমন বসুর পুত্র বসু হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপুত্র মরীচাদিও মনু এক এক ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা যখন ব্রহ্ম, তখন তাঁহারাও ব্রহ্ম। সেই মনুই আবার সূর্য্য ও চন্দ্র উভয় ধাতু সম্পন্ন। তাঁহার ইক্ষাকু প্রভৃতি দশপুত্র সূর্য্যধাতুনিঃসৃত এবং ইলা নাম্নী

কন্যা চন্দ্রধাতু হইতে নির্গতা। সেই জন্য পুত্রগণের বংশ সূর্য্যবংশ এবং কন্যার বংশ চন্দ্রবংশ হইয়াছে। প্রাগুক্ত বিবস্বান্ সূর্য্য ক্ষত্রিয় বংশের আদি বীজস্থান। ভগবান আদিতে সেই মূল সৌর ধাতুতে যোগধর্ম্ম নিহিত করিয়াছিলেন। তথা হইতে তাহা বংশপরম্পরা অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবযান ও পিতৃযান মার্গবিষয়ক পারলৌকিক বিদ্যা আদিতে রাজন্য মণ্ডলে স্থান পাইয়াছিল। (ছান্দোগ্য ৫ম প্রপা ৩য় খঃ ১—৭ প্রবাহণ জৈবলি ও শ্বেতকেতুসম্বাদে)

৪। এইরূপে শাস্ত্র ব্রহ্মাকে ভগবানের আদি অবতার বলিয়াও তাঁহাকেই মানবের আদি জনক কহিয়াছেন। যদি যুক্তি অবলম্বন কর—তবে অবশ্যই বলিবে, আদিতে সকল মনুষ্যের এক পিতা ও এক মাতা ছিলেন অথবা নর, দানব রক্ষ প্রভৃতি বংশভেদে কতিপয় বীজপিতামাতা ছিলেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহাদের পিতা মাতা কে ছিল? এ কথার উত্তরে পরম্পরা ঊর্দ্ধস্রোতবাহী হইতে হইবে। অবশেষে এক আদি কারণে উপস্থিত হইতে পারিলে শান্তি। কিন্তু ব্রহ্মদৃষ্টি ব্যতীত তাহা সম্ভবে না। তাহাই সাধু ও সার দৃষ্টি। আর যদি ক্রমে অধম পশ্বাদি-কুলবাহী হইয়া মানবকে নীচকুলোদ্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত কর, তবে তোমার দৃষ্টি অশাস্ত্র ও অসমীচীন। ভারতধর্ম্মতত্ত্ব আমাদের আদিপুরুষকে ঈশ্বরের অবতাররূপে দর্শন করিয়া তাঁহাকে আমাদের পিতামহরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহাতে হিন্দুদিগের সংসার দেব-সংসার স্বরূপে শোভা পাইতেছে। সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম যেমন আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা, সেইরূপ আমাদের সংসার মধ্যে তিনি পরমপিতা। শুদ্ধ জ্ঞানযোগের ও ভক্তিযোগের পিতা নহেন; কিন্তু বাস্তবিক পুরুষপরম্পরা দেহাদির জন্মদাতা-পিতা। অতএব যিনি জগৎ-সবিতা—জগৎপ্রসবিতা আদিপুরুষ হিরণ্যগর্ভ, তিনিই আমাদের আদিপিতা। এই অবতারতত্ত্ব ব্রতকথার ন্যায় শ্রবণীয় নহে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু বালক যেমন স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের সংবাদ লয়, তাহার ন্যায় গূঢ়জিজ্ঞাস্য বিষয়। তাহার তত্ত্বলাভে জন্ম সার্থক হয়।

—×—

৪। অণ্ড।

৫। সৃষ্টিরূপ কার্য্যের প্রারম্ভে ব্রহ্মা অবতীর্ণ হয়েন, এইহেতু তিনি কার্য্য-ব্রহ্ম অভিধানে উক্ত হন। গীতাশাস্ত্রে শঙ্করাচার্য্যের উপক্রমণিকায় আছে যে, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে অণ্ড সম্ভূত হইয়াছে। আনন্দগিরি কহেন যে, অব্যক্ত অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতাত্মক যে মূলভৌতিক তত্ত্ব, তাহাই প্রকৃতির প্রথম বিকাশ এবং হৈরণ্যগর্ভরূপ বিড়ারাত্মক্ অণ্ডের উদ্ভবস্থান। এই অণ্ডই মহত্তত্ত্বস্থানীয়। তন্মধ্যে 'ভূরাদয়' লোক (ক্রমপরম্পরা প্রকটনশীল প্রকৃতি সম্পাদ্য-অনাদিউপাধিলিঙ্গ ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের সহিত জীবগণকে লইয়া) অব্যক্ত বা অপরিস্ফুটভাবে বিসৃষ্ট হইল। ভগবান মনু কহেন, ঐ মূলঅণ্ড সহস্রাংশু

প্রভাযুক্ত হিরণ্যবর্ণ ছিল। তাহাই মূল-সূর্য্য এবং প্রভু হিরণ্যগর্ভ তাহার অধি-দেবতা। তাহা হইতে, জগতের ক্রমপরি-ণতির সঙ্গে সঙ্গে প্রভু হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, ব্রাহ্মণ প্রজাপতি-গণের সহিত বিবস্বান নামক বর্ত্তমান সূর্য্যের ও তদুৎপন্ন মনুবংশের জনক হই-লেন। তিনি যেমন হিরণ্যগর্ভাদিরূপে পরব্রহ্মের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় অবতার, সেইরূপ মানবকুলের আদি পিতা এবং তাহার সহযোগিনী, আদিত্যাদি দেবতাময়ী অদিতি, মাতা। তাঁহাদের দেহ ও মনে নৃবীজস্বরূপ শুক্র ও সোম অথবা আদিত্য ও চন্দ্রমারূপ যে মিথুনধর্ম্মীধাতু নিহিত ছিল, তাহা হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ পুরুষ-পরম্পরা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

— × —

৫। কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ।

৬। "ব্রহ্ম" শব্দের এই দুইটী তাৎপর্য্য হইতে কর্ম্মের সহিত ব্রহ্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ অনেক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হইবেক। বিভিন্ন অধিকারী মানবের অনন্ত মঙ্গল জন্য তিনি শব্দ ব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ। শ্রুতিতে কহেন যে, সমস্ত বেদ, সমস্ত তপস্যা এবং ব্রহ্মচর্য্য অবিভাগে সেই একমাত্র ব্রহ্ম-পদকে কীর্ত্তন করেন। অতএব শব্দব্রহ্ম-রূপী বেদ, সমস্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডদ্বারা কেবল তাঁহাকেই কহেন। তপস্যা ও ব্রহ্ম-চর্য্যাদি অনুষ্ঠান সমস্তই বেদমূলক। অতএব বেদের সহিত সমস্বরে সে সকল ক্রিয়াও সেই পরম পদকেই বরণ করেন। গীতাতে কহেন—যজ্ঞদানতপস্যাদি কর্ম্ম সমস্ত শব্দ ব্রহ্মা-ভিধেয় বেদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেই পরম পদ অক্ষর পরমাত্মা হইতে শব্দ ব্রহ্ম সমুদ্ভূত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বগত পরব্রহ্ম নিত্যকাল যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে সর্ব্বতো-ভাবে প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা ঐহিক ও স্বর্গাদি ফলকামী এবং জ্ঞান ও প্রেমযোগদ্বারা তাঁহার তত্ত্ব গ্রহণে অক্ষম, তাঁহারা কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় এই ভবসাগরে ঘূর্ণ্যমান না হন, এই হেতু বেদশাস্ত্রে তাঁহাদের কামনা সকলের নিমিত্তে বিধিবদ্ধরূপে যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড ব্যব-স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বগত পরব্রহ্ম কর্ম্মানুষ্ঠান কালে স্বয়ং মন্ত্র, দেবতা অধিদৈবত, যজ্ঞেশ্বর এবং বাস্তু পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত হয়েন। সকামী যজমান এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে তিনি মন্ত্রশক্তি ও দেবতারূপে তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও যোগাচারেরও এই ভাব। সে পরমাত্মা অপর ব্রহ্মরূপে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার অন্তর্যামি হইয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম-জ্ঞানানুকূল চিত্তশুদ্ধিরূপ ফলদান করেন।

পরব্রহ্মের এই অপর ব্রহ্মরূপটী পূর্ব্বোক্ত কার্য্য ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন রূপই উপাস্য ব্রহ্ম ও সুব্যক্ত ঈশ্বর। তাঁহাদের সহযোগিনী—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা এবং ব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্রা মহামায়া দেবীও সুব্যক্তা পরমেশ্বরী। পরব্রহ্ম, মন্ত্রোপ-হিত ও বেদাগমময় শব্দ ব্রহ্মরূপী হইয়াও; কারণ-শরীরাদিতে উপহিত অব্যক্তিমাপন্ন ঈশ্বর চৈতন্য হইয়াও; সৃষ্টিরূপ বিকারের অতিক্রান্ত তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য ও বিজ্ঞেয় এবং অনুপহিত পরমাত্মা হইয়াও, উপরি উক্ত প্রকারে

ব্যক্তিধর্ম্মী ঈশ্বর ও ঈশ্বরী হয়েন। তৎসমস্তই তাঁহার মন্ত্রময় উপাস্যরূপ। শব্দব্রহ্মাভিধানে তিনি মন্ত্রসমবায়ী যজ্ঞমূর্ত্তি। কারণ দেহাদিতে উপহিতরূপে তিনি অব্যক্তধর্ম্মী অথচ ওঙ্কারের ত্রিমাত্রারূপী ব্রহ্মোপসনার অবলম্বন, এবং ওঙ্কারের অমাত্ররূপ অনুপহিত তুরীয় আত্মারূপে তিনি মোক্ষ-নিকেতন। যাহা হউক, একমাত্র পরব্রহ্মেরই ব্যক্তাব্যক্তাত্মক ঐ সমস্ত রূপ। কর্ম্মাধিকার, কর্ম্মযোগরূপ উপাসনাদির অধিকার এবং মহামোক্ষাধিকারে এই সকল রূপ বিভাজ্যমান। এই সমগ্র ব্রহ্মতত্ত্বই হিন্দুধর্ম্ম। ইহার তিলার্দ্ধও পরিবর্ত্তনযোগ্য নহে। যাঁহারা প্রকৃতি-প্রেরিত হইয়া ইহাতে সংযোগ বিয়োগ এবং বিজাতীয় ধর্ম্মসমূহের সহিত ইহার সামঞ্জস্য ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে এই সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদক এবং বোধ হয় যেন আর একটা নূতন ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপনেচ্ছুক।

৬। মন্ত্র।

৭। ভারতধর্ম্মের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কর্ম্মাধিকারে মন্ত্রশক্তি ও দেবতা এবং ফলশ্রুতিরূপ অর্থবাদ স্বয়ং ব্রহ্ম। মানবের কামনার অন্ত নাই। তন্মধ্যে অনেক অযোগ্য কামনাও আছে। কিন্তু ফল ঈশ্বরের হস্তে। তিনি যজমানের উদ্দেশ্য, মনের ব্যথা ও যোগ্যতা সকলই জানেন এবং তদনুসারে যাহা যোগ্য ফল, তাহাই প্রদান করেন। মন্ত্রের শক্তি ও ফলশ্রুতির গুহার্থ সাধারণ নরবুদ্ধির অগম্য। তাহা হইতে অনেক অবান্তর শুভ উৎপন্ন হইতে পারে ; কিন্তু কর্ম্মের ফল অবশ্যই ফলিবে এবং ভোগবিনা "প্রারব্ধ কর্ম্ম" শত-কোটিকল্পকালেও ক্ষয় হইবে না।

৮। যে কিঞ্চিৎ বলা হইল, তদ্দ্বারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড, যজ্ঞীয় দেবগণ, এবং ক্রিয়াসাধক মন্ত্রের সহিত পরব্রহ্মের প্রাগুক্ত রূপদ্বয়ের সূক্ষ্ম ও গুহ্যতম সম্বন্ধ, অর্থাৎ পরব্রহ্মেরই যজ্ঞাধিপতিত্ব সম্বন্ধ, বুঝিতে পারা যাইবে। ক্রিয়ানিষ্ঠ যজমান যদি এই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তবে অচিরে তাঁহার কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে আত্মজ্ঞানরূপ মোক্ষ লাভ হয়।

— x —

৭। পরব্রহ্ম।

৯। "ব্রহ্ম" শব্দের তৃতীয় অর্থ পরব্রহ্ম। তিনি মহামোক্ষস্বরূপ ; সুতরাং কর্ম্মকাণ্ড, তৎকারক ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ফল, প্রকৃতি, সংসার এবং কালের অতীত তুরীয়তত্ত্ব। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পশ্চাৎ বলা যাইবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

বৌদ্ধ গল্প।

ভূমিকা।

ধর্ম্মপদ আদি মূল বৌদ্ধ গ্রন্থের গাথা এবং উপদেশের মূলে এক একটি 'বত্থু' বা গল্প আছে বলিয়া বৌদ্ধদের বিশ্বাস। "অর্থকথা"য় সেই সকল গল্প নিবদ্ধ আছে। গল্পগুলি প্রায়ই এক একটি সুন্দর নীতির উদাহরণ স্বরূপ। বৌদ্ধ গল্পসমূহ অশ্লীলতা, পরদ্রোহ প্রভৃতি দোষবর্জ্জিত। তবে

কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক অন্ধতা প্রভৃতি দোষ তাহাতে যথেষ্ট আছে। প্রাচীন ভারতের অনেক সামাজিক অবস্থার বিবরণ ঐ গল্প হইতে পাওয়া যায়। কয়েকটি গল্প এই প্রবন্ধে অনূদিত হইল।

—×—

ভাগিনেয় সংঘরক্ষিতের বস্ত্র।

(ধর্ম্মপদের চিত্তবর্গের ৫ সংখ্যকগাথা)

শ্রাবস্তিনগরবাসী কোন কুলপুত্র শাস্তার (বুদ্ধের) ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ করিয়া সংঘরক্ষিত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কতিপয় দিবসের মধ্যেই অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর এক পুত্র হইলে, সে তাহার ভ্রাতা সংঘরক্ষিত স্থবিরের নামানুসারে পুত্রের নামও সংঘরক্ষিত রাখিয়াছিল। ভাগনের সংঘরক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতুলের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। সে কোন এক গ্রামের আরামে বর্ষাবাসকরণ কালে একখানি সপ্তহস্ত ও একখানি অষ্টহস্ত এই দুইখানি বস্ত্র ভিক্ষালাভ করিয়াছিল। বস্ত্রদ্বয় পাইয়া সে মনে ভাবিল—অষ্টহস্ত বস্ত্রখানি আমার উপাধ্যায়ের হইবে, আর সপ্তহস্তখানি আমার হইবে। পরে বর্ষাশেষে সে উপাধ্যায় সংঘরক্ষিত স্থবিরের জন্য বস্ত্রখানি লইয়া তাঁহার নিকট যাইল।

যখন স্থবির ভিক্ষার্থে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন সে স্থবিরের বিহারে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার দিবা-বাসের স্থান সংমার্জ্জিত করিয়া পাদোদক ও আসনস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার আগমনমার্গের দিকে চাহিয়া উপবেশন করিয়া রহিল। পরে স্থবিরকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহার পাত্র ও চীবর গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে তালবৃন্তের দ্বারা বীজন করিয়া ও পানীয় দান করিয়া 'প্রভো বসুন' বলিয়া বসাইল। পরে নিজের আনীত সেই শাটকখানি তাঁহার পাদমূলে রাখিয়া 'প্রভো! ইহা পরিভোগ করুন' বলিয়া তাঁহাকে বীজন করিতে করিতে দণ্ডায়মান রহিল!

স্থবির তাহাকে বলিলেন 'সঙ্ঘরক্ষিত! আমার চীবর পরিপূর্ণ আছে, অতএব তুমিই ইহা ব্যবহার কর।

ভাগিনেয় বলিল 'প্রভো! পাইবার কাল হইতে ইহা আপনাকে মনে করিয়া রাখিয়া দিয়াছি; অতএব ইহা আপনিই ব্যবহার করুন'।

স্থবির বলিলেন "তাহা হউক; আমার চীবর যখন পরিপূর্ণ আছে, তখন ব্যবহার কর।

ভাগিনেয় বলিল, 'প্রভো! এরূপ করিবেন না; আপনিই ব্যবহার করুন; তাহাতে আমার মহাফল হইবে।'

এইরূপে পুনঃ পুনঃ বলিলেও, স্থবির তাহা লইতে ইচ্ছা করিলেন না। তাহাতে সে বীজন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল—আমি গৃহী-কালে স্থবিরের ভাগিনা ছিলাম, আর প্রব্রজ্যায় তাঁহার সঙ্গবিহারী হইয়াছি, কিন্তু তথাপি স্থবির আমার দ্রব্য পরিভোগ করিলেন না, অতএব আমার এই শ্রমণ ভাবে আর কি হইবে?

এইরূপে সে চিন্তা করিতে লাগিল যে—"আমি তবে গৃহী হইব। কিন্তু গৃহী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা বড় দুষ্কর; অতএব কি করিয়া আমি চালাইব? ঠিক হইয়াছে—এই অষ্ট হাত শাটকখানি বিক্রয় করিব। তল্লব্ধ অর্থের দ্বারা এক মেষী ক্রয় করিব। মেষীরা শীঘ্র২ বিয়ায়, অতএব মেষশাবক বিক্রয় করিয়া কিছু মূলধন করিব। পরে তদ্দ্বারা এক প্রজাবতী (স্ত্রী) আনিব। তাহার সন্তান হইলে, মাতুলের নামেই তাহার নাম রাখিব। পরে তাহাকে ছোট গাড়িতে চড়াইয়া, মাতুলকে বন্দনা করিবার জন্য সভার্য্য বিহারে আসিব। পথের মাঝে ভার্য্যাকে বলিব—নিয়ে এস ছেলেকে; আমি উহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইব। তাহাতে ভার্য্যা বলিবে—তোমার বহন করিয়া কাজ নাই, তুমি এই গাড়ি টেনে নিয়ে চল; আর আমি ছেলে নিয়া যাই। এই বলিয়া সে ছেলেকে লইবে, কিন্তু তাহাকে ধারণ করিতে না পারিয়া চাকার নীচে ফেলিয়া দিবে। তাহাতে গাড়ীর চাকা ছেলের শরীরের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে। তখন আমি বলিব "তুই আমার পুত্রকে আমার নিকট দিলি না, আর তাহাকে ধারণ করিতেও পারিলি না।" এই বলিয়া প্রতোদের দ্বারা তাহার পিঠে প্রহার করিব।

সে এইরূপে বীজন কালে চিন্তা করিতে২ স্থবিরের মাথায় তালবৃন্তের দ্বারায় প্রহার করিয়া ফেলিল! স্থবির ভাবিলেন, সংঘরক্ষিত আমাকে কেন প্রহার করিল? এইরূপ মনে করিয়া, তিনি তাহার মনের ভাব অবগত হইয়া বলিলেন—সংঘরক্ষিত! তুমি স্ত্রীকে প্রহার করিতে পারিলে না, কিন্তু আমাকে প্রহার করিলে, এ বৃদ্ধ স্থবিরের দোষ কি?

তাহাতে সংঘরক্ষিত মনে করিল অহো! 'নষ্টোঽস্মি'। আমার উপাধ্যায় সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন; অতএব আমার শ্রমণ ভাবে আর ফল কি?' এই ভাবিয়া সে তালবৃন্ত ফেলিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর বালক শ্রমণের গণ (বৌদ্ধ ব্রহ্মচারী) তাহার পশ্চাৎধাবনপূর্ব্বক তাহাকে ধৃত করিয়া শাস্তার সম্মুখে উপস্থাপিত করিল। শাস্তা বলিলেন—কি ভিক্ষুগণ, তোমরা একজন ভিক্ষুকে লইয়া এখানে আসিয়াছ? তাহারা বলিল—হাঁ প্রভো! এই দহর, উৎকণ্ঠিত হইয়া পলায়মান ভিক্ষুকে ধরিয়া আপনার নিকট আনিয়াছি। শাস্তা সংঘরক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভিক্ষু! ইহা সত্য? সংঘরক্ষিত বলিলেন—হাঁ প্রভো!

শাস্তা। কেন তুমি এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ? তুমি আরব্ধবীর্য্য এক বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া, আত্মাকে দমনপূর্ব্বক স্রোতআপত্তি বা সকৃদাগামী বা অনাগামী বা অর্হত্বপদ প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে সক্ষম হইলে না, কিন্তু কেন এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিলে?

সংঘ। প্রভো! আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া ছিলাম।

শাস্তা। কি কারণে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলে?

ইহাতে সংঘরক্ষিত বর্ষাবাস হইতে আরম্ভ করিয়া স্থবিরকে প্রহার পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ বলিয়া বলিল,—এই কারণেই প্রভো আমি পলাইতেছিলাম।

শাস্তা বলিলেন—ভিক্ষু! তুমি চিন্তা করিও না। চিত্ত দূরে থাকিলেও, এইরূপে বিষ

গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। রাগ, দ্বেষ ও মোহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য উদ্যম করা উচিত। এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী বলিয়াছিলেন :—

"দূরঙ্গমং একচরং অশরীরং গুহাশয়ং।
যে চিত্তং সঞ্ঞমেস্সন্তি মোক্খন্তি মারবন্ধনাৎ।

অর্থাৎ যাঁহারা দূরঙ্গম, একচর, অশরীর (অর্থাৎ অস্পৃশ্য) ও গুহাশয় (গূঢ়) চিত্তকে সংযত করেন, তাঁহারা মারের বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

বুদ্ধের উপদেশ শেষ হইলে, ভাগিনেয় সংঘরক্ষিত স্রোতআপত্তি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আর অন্য অনেকেরও স্রোত আপত্তি প্রভৃতি ফললাভ হইয়াছিল।

'মচ্ছরিয় কোসিয়' শ্রেষ্ঠির বস্তু।

(ধর্ম্মপদ। পুষ্পবর্গ। ৬ ষ্ঠ গাথা)

রাজগৃহ নগরের অবিদূরে সক্কর নামে গ্রাম ছিল। তাহাতে অশীতি কোটি বিভব "মাৎসর্য্য কোষীয়" নামে এক শ্রেষ্ঠি বাস করিত। সে অপরকে কখনও তৃণাগ্রে করিয়া তৈলবিন্দুও দান করিত না; আর স্বয়ংও কিছু ভোগ করিত না। রাক্ষস-পরিগৃহীত পুষ্করিণীর ন্যায় তাহার সেই বিভবজাত তাহার পুত্রদারাদির বা শ্রমণ ব্রাহ্মণের কোন পরিভোগের হেতু হয় নাই।

এক দিবস শাস্তা প্রত্যুষকালে মহাকারুণিক সমাপত্তি হইতে উঠিয়া বোধনযোগ্য ব্যক্তিদের দেখিবার জন্য সমস্ত লোকধাতু দর্শন করিতে করিতে পঞ্চচত্বারিংশ যোজন দূরে (শ্রাবস্তি হইতে), সভার্য্যা সেই শ্রেষ্ঠির স্রোত আপত্তি ফল সেইদিন লাভ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া জানিলেন।

তাহার পূর্ব্বে একদিন সেই শ্রেষ্ঠি রাজদর্শনার্থ রাজগৃহে গিয়াছিল। রাজদর্শন করিয়া গৃহে আসিবার কালে পথে এক গ্রামীমনুষ্যকে কুল্মাষপূর্ণ 'কপল্ল' পিষ্টক ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাহাতে স্পৃহালু হইয়াছিল। সে ঘরে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল—যদি আমি বলি যে—আমি কপল্লক পিঠা খাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমার সঙ্গে আরও অনেকে খাইতে ইচ্ছা করিবে। তাহাতে অনেক তিল, তণ্ডুল, সর্পি, ফাণিত আদির পরিক্ষয় হইবে। অতএব কিছু বলিব না।

এইরূপে সে তৃষ্ণাভিভূত হইয়া কৃশ হইতে হইতে শেষে ধমনীব্যাপ্তগাত্র (অস্থিচর্ম্মসার) হইল। তখনও পিষ্টকলোভ ত্যাগ করিতে না পারিয়া, শেষে দুর্ব্বল হইয়া স্বপকোষ্ঠে মঞ্চক (খাটিয়া শয্যা) গ্রহণ করিল। এইরূপ হইলেও ধনহানি ভয়ে সে কাহাকেও পিষ্টক খাইবার কথা বলিল না।

অনন্তর তাহার ভার্য্যা তাহার নিকট যাইয়া পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামিন্! তোমার কি অসুখ হইয়াছে?"

শ্রেষ্ঠি। না অসুখ হয় নাই।

ভার্য্যা। তবে কি রাজা তোমার উপর কুপিত হইয়াছেন?

শ্রেষ্ঠি। না তাহাও নহে।

ভার্য্যা। তবে কি তোমার পুত্র দুহিতা দাস আদির সহিত কোন অপ্রিয় কথা ঘটিয়াছে?

শ্রেষ্ঠি। না তাহা কিছু হয় নাই।

ভার্য্যা। তবে কি কোন বিষয়ে তোমার তৃষ্ণা হইয়াছে?

এরূপে পৃষ্ট হইয়াও, ধনহানি-ভয়ে শ্রেষ্ঠি

কিছু না বলিয়া নিঃশব্দ হইয়া পড়িয়া রহিল। ভার্য্যা বলিল "বল স্বামিন্! কিসে তোমর

যেন কথা গিলিতে গিলিতে শেষে বলিল "হাঁ আমার তৃষ্ণা আছে"। "স্বামিন্! কিসে তৃষ্ণা?" "কপল্লক অপূপ খাইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে"।

ভার্য্যা বলিল—তা আমাকে বল নাই কেন? তুমিত দরিদ্র নও। আমি এখনি সমস্ত গ্রামবাসীর যাহাতে কুলায়, এত কপল্লক অপূপ প্রস্তুত করিব।

শ্রেষ্ঠি। তোমার এত করিয়া কাজ কি? তাহারা সব আপনারা পিঠা করিয়া খাইতে পারে না?

ভার্য্যা। তবে পাড়ার লোকের মত করিয়া প্রস্তুত করিব।

শ্রেষ্ঠি। হাঁ জানি—তোমার অনেক টাকা।

ভার্য্যা। তবে না হয় আমাদের বাড়ীর সকলের মত করিয়া প্রস্তুত করিব।

শ্রেষ্ঠি। জানি তুমি খুব মহাশয়া।

ভার্য্যা। তবে তোমার পুত্রদারার মত না হয় বানাইব।

শ্রেষ্ঠি। এততেই বা তোমার কি কায?

ভার্য্যা। তবে তোমারি ও আমার মত বানাই?

শ্রেষ্ঠি। তুমি পিঠা কি করিবে?

ভার্য্যা। আচ্ছা তবে তোমার একলার মতই প্রস্তুত করিব।

শ্রেষ্ঠি মনে করিল, এখানে পিঠা করিলে অনেকে চাহিবে। অতএব অল্প তণ্ডুল, ঘৃত, মধু, ফাণিত লইয়া তাহার সপ্তভৌমিক প্রাসাদের উপরিতলে যাইয়া পিঠা পাক করিতে বলিল। আর বলিল—তথায় আমি একাকী বসিয়া খাইব।

ভার্য্যা তদনুসারে দাসীদের দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাসাদের উপরে আনিয়া, দাসীদের বিদায় দিয়া শ্রেষ্ঠিকে ডাকিল। শ্রেষ্ঠি আসিয়া সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া, খিল দিয়া, তথায় বসিয়া রহিল; আর ভার্য্যা অপূপ পাক করিতে লাগিল।

এদিকে শাস্তা সেই দিন সকালেই মহা-মৌদ্গলায়নকে * ডাকিয়া বলিলেন—'রাজগৃহের নিকট সক্কর গ্রামে মাৎসর্য্য শ্রেষ্ঠি অন্যের দর্শন ভয়ে অস্ত প্রাসাদের উপরি তলে যাইয়া নিজে খাইবে বলিয়া কপল্লক পিঠা প্রস্তুত করাইতেছে। তুমি তাহাকে দমন করিয়া (অর্থাৎ ধর্ম্মমার্গস্থ করিয়া) স্বীয় শক্তি বলে তাহার পিষ্টকাদিসহ ভার্য্যাকে ও তাহাকে জেত বনে আনয়ন কর। আমি শত ভিক্ষু-সহ অদ্য তাহার কপল্লক পিঠার দ্বারা ভক্ত-কৃত্য (অন্নাহার) করিব।

মৌদ্গলায়ন স্থবির 'সাধু, প্রভো' বলিয়া ঋদ্ধি বলে তৎক্ষণাৎ সেই গ্রামে যাইয়া সেই প্রাসাদের সিংহপঞ্জর-দ্বারে আবির্ভূত হইয়া আকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

স্থবিরকে দেখিয়াই মহাশ্রেষ্ঠির হৃদয় কম্পিত হইল। সে মনে করিল 'হায়! আমি ইহা-দেরই ভয়ে এখানে আসিয়াছি, আর এ এখানেও আসিয়া 'বাতপানের' (বাতায়নের) কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অগ্নিক্ষিপ্ত লবণ শর্করার (দানার) ন্যায় সে ক্রোধে তট্‌তট্ (গরগর) করিতে করিতে

---

* ইনি অলৌকিক কার্য্যে নিপুণ ছিলেন বলিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

বলিল, 'শ্রমণ! তুমি আকাশে দাঁড়াইয়া থেকে কি পাবে? যদি আকাশে পথ করিয়া তাহাতে ভ্রমণ কর, তাহা হইলেও কিছু পাবে না।'

স্থবির তাহাতে আকাশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন!

শ্রেষ্ঠি বলিল—আকাশে ভ্রমণ করিয়া কি পাবে? আসন করিয়া বসিলেও কিছু পাবে না।

স্থবির তখন আকাশে অসন করিয়া বসিলেন।

শেষে শ্রেষ্ঠি বলিল—যদি তুমি ধূপিত কর, তাহা হইলেও কিছু পাইবে না।

স্থবির তখন ধূপিত করিয়া সমস্ত প্রাসাদকে ধূমে আচ্ছন্ন করিলেন। তাহাতে শ্রেষ্ঠির চক্ষে সূচীবেধবৎ বেদন হইতে লাগিল। পাছে অগ্নিতে সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেই ভয়ে সে আর বলিল না যে "যদি গৃহ প্রজ্জ্বলিত কর, তবেও কিছু পাইবে না।"

পরে মনে করিল—এই শ্রমণ ছাড়িবার পাত্র নহে; কিছু না পাইলে এ যাইবে না, অতএব ইহাকে এই কটা ছোট পিঠা দিয়া বিদায় করি, স্ত্রীকে বলিল—'ভদ্রে! একখানি খুব ছোট পিঠা করিয়া এই শ্রমণকে দিয়া বিদায় কর।' তাহার স্ত্রী খুব অল্প করিয়া পিঠালি খোলায় দিতে লাগিল, কিন্তু হায় তাহা হইতে খুব বৃহৎ পিঠা হইতে লাগিল। শেষে শ্রেষ্ঠি স্বয়ং হাতা লইয়া হাতার কাণা দিয়া অতি অল্প মাত্র পিঠালি দিল, কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর পিঠা হইল।

এইরূপে যাহা পাক করে, তাহাই বড় বড় হওয়াতে শেষে নির্ব্বিণ্ন হইয়া ভার্য্যাকে বলিল 'ভদ্রে! ইহাকে একখান পিঠা দাও।'

স্ত্রী ধামা হইতে একখানি পিঠা উঠাইতে যাইয়া দেখিল সমস্ত পিঠা একত্র যুড়িয়া রহিয়াছে! স্বামীকে বলিল—সব পিঠা যুড়িয়া গিয়াছে; আমি বিযুক্ত করিতে পারিতেছি না। শ্রেষ্ঠি তখন নিজেই বিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন উভয়ে দুই দিক্ ধরিয়া পিঠার তালকে টানাটানি করিতে লাগিল ও পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত, কায় ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু কিছুতেই পিঠা বিযুক্ত করিতে পারিল না।

শেষে শ্রেষ্ঠি ভার্য্যাকে বলিল 'ভদ্রে আমার আর পিঠায় কায নাই, ঝোড়া শুদ্ধ শ্রমণকে দাও'। স্ত্রী স্থবিরকে পিঠা দিতে যাইল।

তখন স্থবির তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ) গুণাবলী ব্যাখ্যা করিলেন। আকাশতলে চন্দ্রকে দেখানর ন্যায় দানের দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি দান-ফল সকল বুঝাইয়া দিলেন। তখন শ্রেষ্ঠি প্রসন্ন হইয়া বলিল 'প্রভো! ভিতরে আসিয়া পালঙ্কে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করুন। স্থবির বলিলেন, 'মহাশ্রেষ্ঠি, সম্যক্ সম্বুদ্ধ বলিয়াছেন আজ বিহারে বসিয়া পঞ্চ শত ভিক্ষুর সহিত অপূপ খাইব; অতএব তোমার যদি রুচি হয়, তবে ভার্য্যার দ্বারা ক্ষীরাদি উপকরণ গ্রহণ করাও ও চল—শাস্তার নিকট যাই।

শ্রেষ্ঠি বলিল 'কোথায়—শাস্তা কোথায়?' স্থবির। এখান হইতে পঁয়তাল্লিশ যোজন দূরে জেতবন-বিহারে শাস্তা আছেন।

"প্রভো! অত পথ আজই কিরূপে

যাইব?” স্থবির। মহাশ্রেষ্ঠি, তোমার অভি-রুচি হইলে আমি ঋদ্ধি-বলে লইয়া যাইব। তোমার প্রসাদের সোপানের অগ্রভাগ যথা স্থানে থাকিবে, কিন্তু তাহার মূলদেশ জেতবনের দ্বারে যাইয়া লাগিবে। প্রসাদের উপর হইতে নীচে নামিতে যে সময় লাগে, সেই কালে যাইয়া জেতবনে পঁহুছিবে।

শ্রেষ্ঠি তাহাতে স্বীকৃত হইলে স্থবির সেইরূপে উভয়কে জেতবন বিহারে শীঘ্র লইয়া যাইলেন। তাহারা তথায় শাস্তার নিকট উপসংক্রমণ পূর্ব্বক ভিক্ষাভোজন কালে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া নিবেদন করিল। শাস্তা বুদ্ধাসনে বসিলেন, পঞ্চশত ভিক্ষুও যথাস্থানে বসিলেন। শ্রেষ্ঠি দক্ষিণোদক দিল। ভার্য্যা বুদ্ধের পাত্র অপূপে পূর্ণ করিয়া দিল। বুদ্ধ ও অন্যান্য ভিক্ষুরা আপনাদের মত অপূপ লইলেন এবং সকলে ভক্তকৃত্য নিষ্পন্ন করিলেন।

শ্রেষ্ঠি এবং তাহার ভার্য্যাও যথেষ্ট পিষ্ঠক ভক্ষণ করিল; কিন্তু কিছুতেই সেই পিঠা কম হইল না। তাহাতে সকলে ভগবানকে নিবেদন করিল যে “অপূপের পরিক্ষয় হইতেছে না”। ভগবান্ তাহা জেতবনের দ্বারে ফেলিয়া দিতে বলিলেন। তাহাতে তথায় এক পিষ্ঠকের ঢিপি বা প্রাকার হইল। অদ্যাপিও তাহা বর্ত্তমান আছে ও তাহাকে ‘কপল্লক পিঠার ঢিপি’ বলা যায়।

তদনন্তর ভার্য্যাসহ শ্রেষ্ঠি ভগবানের নিকট যাইয়া এক অন্তে উপবেশন করিল। ভগবান্ তখন অনুমোদন (আহারান্তে ধর্ম্মোপদেশের নাম অনুমোদন) করিলেন। অনুমোদনের অবসানে উভয়ে শ্রোত আপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপে জেতবনের দ্বার হইতে সোপানে আরোহণ করিয়া স্বীয় প্রাসাদোপরি উপস্থিত হইল। তাহার পর হইতে সেই শ্রেষ্ঠি অশীতি কোটি ধন বুদ্ধশাসনের জন্য বিতরণ করিয়াছিল *

ভিক্ষুদের ভিতর এবিষয় লইয়া এক দিন কথা উঠিয়াছিল যে মৌদ্গল্যায়নের কি অনুভাব যে, মাৎসর্য্য শ্রেষ্ঠি শ্রদ্ধা বা ভোগ কিছুই উপহত না করিয়া তাহাকে দমিত করিয়াছিলেন। তাহা জানিয়া ভগবান্ ভিক্ষুদের বলিলেন—

যথাপি ভ্রমরঃ পুষ্পং বর্ণ গন্ধাবহেঠয়ন্।
রসমাদায় পলেতি এবং গ্রামে মুনিশ্চরেৎ॥

—×—

ভেরিবাদ জাতক।

(৫৯ সংখ্যক জাতক)

জেতবনে বিহারকালে অন্যতর দুর্ব্বচ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা এই জাতক বলিয়াছিলেন। সেই ভিক্ষুকে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “ইহা কি সত্য যে তুমি দুর্ব্বচ”। ভিক্ষু বলিল “হাঁ ভগবন্! ইহা সত্য”, তাহাতে ভগবান্ বলিলেন “ভিক্ষু, তুমি ইহজন্মে যে দুর্ব্বচ, তাহা নহে, পূর্ব্বেও দুর্ব্বচ ছিলে”, এই

* ধর্ম্মপদের গাথাটির সহিত এই গল্পের বিশেষ সম্পর্ক নাই। পরন্তু তাহা অন্য অর্থে সুসঙ্গত হয়। ব্যাখ্যাকার কষ্টকল্পনা করিয়া ইহা গাথার অর্থের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন।

বলিয়া তিনি অতীতের কথা বলিতে লাগিলেন। "অতীত কালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত যখন রাজ্য করিতেন, তখন বোধিসত্ব একগ্রামে ভেরিবাদক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে বারাণসীতে নক্ষত্রঘুষ্ট § হইলে, সেই ভেরীবাদক তাহা শ্রবণ করিয়া মনে করিল বারাণসীতে যাইয়া ভেরীবাদনপূর্ব্বক ধন আহরণ করিব। তদনন্তর সে পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে গমন পূর্ব্বক ভেরীবাদন করিয়া বহু ধনলাভ করিয়াছিল। সেই ধন লইয়া আপনার গ্রামে প্রত্যাগমন কালে চোরের দ্বারা উপদ্রুত এক বন প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকে নিরন্তর ভেরী বাজাইতে নিষেধ করিয়া বলিল, "তাত, এখন নিরন্তর ভেরীবাজান বন্ধ কর, পথে চলিবার সময় বড়লোকেরা যেরূপ সময়ে সময়ে ভেরী বাজাইয়া চলে, সেইরূপ বাজাইতে থাক"। তাহার পুত্র পিতার দ্বারা সতর্কীকৃত হইলেও বলিল, "আমি ভেরী শব্দ দ্বারা চোরদিগকে তাড়াইয়া দিব" এই বলিয়া সে নিরন্তর ভেরী বাজাইতে আরম্ভ করিল। চোরেরা প্রথমে ইহা কোনও বড় লোকের ভেরী শব্দ হইবে ভাবিয়া পলাইয়াছিল। পরে নিরন্তর ভেরী শব্দ শ্রবণ করিয়া মনে করিল ইহা কোন বড়লোকের ভেরী নহে। পরে তাহারা আগমন করিয়া দুইজনকে দেখিয়া তাহাদিগকে প্রহারপূর্ব্বক সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লইল।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন "কষ্টের দ্বারা আমরা যে ধনলাভ করিয়াছিলাম, তাহা তুমি নিরন্তর বাদ্য করিয়া নাশ করিলে।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গথাটী বলিয়াছিলেন—

"ধমে ধমে নাতি ধমে অতিধন্তংহি পাপকম্
ধন্তে নাপি শতম্ লদ্ধম্ অতিধন্তেন নাশিতম্॥

বাদ্য করিবে, কিন্তু অতি বাদ্য করিবে না। কারণ অতি বাদ্য দুর্দ্দশাজনক। বাদ্য বাজাইয়া আমরা শতধন লাভ করিয়াছিলাম, অতি বাদ্যের দ্বারা আমরা তাহা নষ্ট করিলাম। শাস্তা এই জাতক বলিয়া বলিলেন যে তৎকালে আমি পিতা ছিলাম, আর এই দুর্ব্বচ (অশিষ্ট) ভিক্ষু পুত্র ছিল।

শ্রীহরিহরানন্দ আরণ্য।

ম্যালেরিয়ার মহৌষধ।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, জনৈক পরমহংস সাধু চাতুর্মাস্য উপলক্ষে বঙ্গের একটী পল্লীগ্রামে আসিয়াছিলেন। বর্ষাকালীন গ্রাম্য জল বায়ুর বিকৃতি বশতঃ তিনি গ্রামস্থ স্ত্রী-পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, যুবা ও প্রৌঢ়, অনেকেরই রুগ্নদেহ ও ভগ্নমন দেখিতে পাইলেন। প্রায় সকলেরই মন স্ফূর্ত্তিহীন, উপযোগী আহারের অভাবে শরীর শীর্ণ ও বিজাতীয় ঔষধ সেবায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; অসুস্থ দেহের ধারণ, ভার হইয়া পড়িয়াছে—সৎকার্য্যে উৎসাহ মাত্র নাই। সাধু একটী দেবালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রত্যহই কেহ কেহ সাধুদর্শন ও

§ অধুনাকালের "অর্দ্ধোদয়" আদি যোগকে পূর্ব্বে নক্ষত্রঘোষ বলিত।

চিকিৎসার জন্য তথায় আসিত এবং কেহবা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষার অন্য উপায় না পাইয়া হতাশ হৃদয়ে কোনও অবধৌতিক ঔষধের আশায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। গ্রাম্য লোকের দুরবস্থা দেখিয়া সাধু কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের শরীর, স্বাস্থ্য ও মনের শান্তি রক্ষার জন্য সময়ে সময়ে যে উপদেশ দিতেন, তাহাই সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

"তোমরা যদি নিজে নিজে আত্মরক্ষার জন্য তৎপর না হও, তবে শত ঔষধ সেবনেও শরীর সুস্থ হইবে না। রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়া অনুগ্রহ পাইবার চেষ্টা কর, তবে কেবল মাত্র তাহারই উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। যাহা নিজ নিজ সাধ্যায়ত্ত, তাহার জন্য মনুষ্যোচিত উপায় অবলম্বন কর। ভগবান্ যে বিবেকশক্তি সকলকে দিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে তাহারই সদ্ব্যবহার কর। ঔষধ সেবনই পীড়ারোগ্যের একমাত্র উপায় নহে; কিন্তু যে উপায় অবলম্বন করিলে পীড়ার প্রকোপ কমিয়া যায়, তাহাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। পীড়া হইয়া পড়িলে অগত্যা ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা হয়; তখন বিদেশীয় ঔষধ না খাইয়া দেশীয় পাচনাদিই ব্যবহার করিবে; কেননা উহা গ্রামেই পাইবে, এবং উহাতে প্রথমতঃ পীড়ারোগ্য কিছু বিলম্বে হইলেও, উহার ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে এবং দেশীয় ঔষধ ব্যবহারে শরীর স্থানীয় জল বায়ুর দোষ সহ্য করিতে অধিক সমর্থ হয়, অল্প অনিয়মেই সর্দ্দি বা জ্বর হইতে পায় না। অধিকন্তু ফলের সহিত তুলনা করিলে—স্বদেশীয় ঔষধ অল্পব্যয়সাপেক্ষ। শরীর দীর্ঘকাল সুস্থ ও সুদৃঢ় রাখিতে পারিলেই রোগের আক্রমণ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। এই জন্য সংযম অভ্যাস সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। স্ত্রী, পুরুষ, প্রৌঢ় ও যুবা, সকলেরই হিতোপদেশের এই মহাবাক্য মনে রাখা উচিত—"আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ", ইন্দ্রিয়ের অসংযম হইতেই সর্ব্বপ্রকার বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং প্রথম বয়সেই বালক বালিকা সকলকেই এই সদুপদেশ শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং মধ্য বয়সে সকলেরই ইহা অবশ্য পালনীয়, তবেই শেষ বয়স পর্য্যন্ত ইহার শুভফল জীবনে সুখ দিতে সমর্থ হইবে। ইন্দ্রিয়সংযম অপেক্ষা রোগ নিবারণের মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই। মহর্ষি চরক স্পষ্টই বলিয়াছেন,—ব্রহ্মচর্য্যমায়ুষ্যকরাণাম্" বীর্য্যধারণরূপ ব্রহ্মচর্য্যই দীর্ঘায়ুলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। অসংযত হইয়া শত শত শিশি টনিক্ খাইলেও স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবে না। যতিদিগের ব্রহ্মচর্য্য বোতল বোতল টনিক্ অপেক্ষাও অধিক বলকারক। এই মহৌষধ সেবন সকলেরই আয়ত্তাধীন, ইহাতে অর্থব্যয় নাই, অথচ ইহা অমোঘ ও অমূল্য; কিন্তু শিক্ষা ও অভ্যাসসাপেক্ষ; এই জন্য ইহার উপকারিতা সকলেরই সংস্কারগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। চাতুর্ম্মাস্যকাল (শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক) ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিলে ইহার উপকারিতা অবশ্যই উপলব্ধি হইবে এবং এক বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিলে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনর্লাভ হইবে। ঋতুরক্ষা করা অপেক্ষা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের শরীর রক্ষা করাই যে প্রধান আবশ্যক, ইহা বিবেকবিচারে নিশ্চয় করা উচিত।

অসংযত ও রুগ্ন পিতা-মাতার দোষে আজন্ম রোগী ও অল্পায়ু পুত্র কন্যায় পল্লীর প্রতিগৃহ পূর্ণ হইতেছে এবং লোকে চিরদিন রোগসেবায় বিব্রত ও অকালমৃত্যুজনিত শোকে চিরজীবন ক্লেশ পাইতেছে। যে বংশলোপ ও পিণ্ডলোপকে লোকে এত ভয় করে, রুগ্নদেহে ইন্দ্রিয়ভোগেও তাহারই পথ পরিষ্কার হইতেছে। সংযত ও সুস্থ পিতা-মাতারই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা। আজকালকার অধিকাংশ সন্তানই কেবল ভুগিবার জন্য ও সকলকে ভোগাইয়া মারিবার জন্যই জন্মিতেছে। ব্রহ্মচর্য্যের অপালনই কি এই অত্যধিক শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণ নহে? একটু সংযত হইতে শিখিলেই সকলেই স্বীয় স্বাস্থ্য লাভে ও অনর্থক শোকনাশ নিবারণে সমর্থ হইতে পারে। সংযম অভ্যস্ত হইলেই আর বৃথা ভোগলালসায় ও বিলাস-বাসনায় প্রবৃত্তি হইবে না; আলস্য, অতিনিদ্রা ও বৃথামোদে রুচি হইবে না; শরীর শ্রমশীল ও শীতাতপসহিষ্ণু, স্নায়ু সমস্ত সুদৃঢ় এবং সতেজ রক্তকণা রোগাঙ্কুর নাশে অনায়াসে সমর্থ হইবে। অত্যাচার ও অত্যাহার উভর দোষই সংযম-সাধন বলে বিদুরিত হইয়া যায়। মানব শরীরের উপাঙ্গ মাত্র কয়েক অঙ্গুলি পরিমিত মাংসময় জিহ্বোপস্থ নিয়মিত করিতে পারিলেই শরীর-মনের স্বাস্থ্য-সুখ সকলেই লাভ করিতে পারে। সুতরাং দীর্ঘকাল অমূল্য সুখ ও স্বাস্থ্য ভোগের জন্য ইতর প্রাণী-সুলভ কিঞ্চিৎ স্নায়বিক সুখে যতদূর সম্ভব বিরত হওয়াই ঐহিক পারলৌকিক উভয় বিধ কল্যাণপ্রদ। অসংযত শরীরের মলিন মনের জন্যই বৃথা বিবাদাদির উৎপত্তি হইয়া আদালতে প্রতিনিয়ত অজস্র অর্থব্যয় হইতেছে, মদিরাদি সেবায় অপব্যয় হইতেছে। সংযত হইতে পারিলে, এই সমস্ত অর্থই শরীর রক্ষার্থ, সুখাদ্য জন্য ও মানব মনের উন্নতিকল্পে, সৎশিক্ষা ও সদনুষ্ঠানে ব্যয় হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সংযম সাধনই শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষায় এবং মনের বলবিধানে পরম ঔষধ। পীড়িত পল্লীবাসীগণ ইচ্ছা করিলে বিনা মূল্যে এই মহৌষধ পাইতে পারে। সংযমের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া অব্যর্থ; মনের তেজস্বিতা, পবিত্রতা, সত্যবাদিতা, পরহিতেচ্ছা, দয়া, সরলতা, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও কার্য্যতৎপরতাদিতে এই মহৌষধের সৌরভ ও সদ্গুণে দশদিক্ পূর্ণ হইয়া যাইবে। নিজের ঘরে এত সুলভ মূল্যের * অমৃতরসায়ন থাকিতে কি জন্য অর্থ দিয়া ঔষধ ক্রয় করিবে? স্বদেহজ এই রসায়ন স্বদেশী মকরধ্বজ অপেক্ষাও উপকারক। তোমরা সাবধান হইয়া এই মহৌষধ ব্যবহার কর, অচিরেই সুস্থ হইবে। বৃথা আহার, বিহার, বিলাস ও ব্যসনত্যাগ পূর্ব্বক অহিংসা সত্য, শৌচ, সন্তোষ, সরলতা ও ভগবদ্ভক্তি আদি সুপথ্যসেবী হইলে, নিয়মিত পরিশ্রম ও সৎসঙ্গ করিলে, সংযম সেবনের ফল স্থায়ী হয় এবং রোগ শোক উভয়কেই নাশ করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যের ফল নিজ শরীরের আরোগিতায় এবং পুত্র কন্যাদির স্বাস্থ্যে স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বরোগেরই অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। তোমরা এই

* সুখ দুঃখের বিচারপূর্ব্বক সাময়িক স্নায়বিক উত্তেজনার দমনকে সংযমের মূল বলা যাইতে পারে, (জিহ্বোপস্থ দমনের বিচার একইরূপ)।

চাতুর্ম্মাস্য কালেই একাহারী বা মিতাহারী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করিলেই আরোগ্য লাভ করিবে। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে ক্রমশই রুগ্ন, দুর্ব্বলচিত্ত, অসংযত ও অল্লায়ু জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এরূপ অধার্ম্মিক জীবের জন্ম হইতে পিতৃ-পুরুষদিগের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইতেছে না। সংযমের ফলে দুই একটী সুসন্তান হইলেও দেশ ও বংশের শোভা বৃদ্ধি হইবে, আর এরূপ অল্লায়ু. চিররোগী, বির্ষয়ের কৃমিব অপবিত্র নরাকার শূকর-কুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধিতে কি লাভ হইতেছে? তোমাদের যদি নিজ নজি কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ বংশাবলীর হিতাকাঙ্ক্ষ থাকে, তবে এই অবধৌতিক ঔষধ ধারণ কর। এ অমূল্য ঔষধ প্রত্যেকেরই নিকট রহিয়াছে. পবিত্র ভাবে ইহার ব্যবহার কর।

অসংযমের ফলে ঘরে ঘরে কতকগুলি চিররোগী শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এইরূপ অস্বাভাবিক জন্মাধিক্য হেতু অনেক শিশুই বলকর আহার ও দুগ্ধাদি পাইতেছে না। অসংযমের প্রভাবে আহারার্থীর আধিক্য হওয়ায় অন্নোৎপাদনের জন্য গোচরভূমি পর্য্যন্ত শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আহারাভাবে গোজাতি ক্রমশঃ বিনষ্ট হইতেছে। ঘৃত, দুগ্ধাদি বলকর আহারের অভাবে কাহারও শরীর পূর্ব্ববৎ সবল ও সুস্থ থাকিতেছে না। ইহা মনুষ্যচরিত্রের দুর্ব্বলতার বিষময় ফলই বলিতে হইবে। আয়ানুরূপ সংযম সাধন না করায় অনেক গৃহস্থই ক্ষুধার অন্ন ও রোগের ঔষধ সংগ্রহেই সমর্থ হইতেছে না; সুতরাং গৃহস্থাশ্রমের শোভা গো সেবা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে—ফলও হাতে—হাতে ফলিতেছে।

অবাধ বাণিজ্যের ফলে দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইয়াছে স্বীকার করিলেও, কালের গতিকে গৃহস্থের কতক বিলাস-বাসনার দোষেও যে ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রপ্তানী রোধ করিবার সামর্থ্য নাই সত্য; কিন্তু বেশ-বিলাসাদিতে সংযত হওয়াত তোমাদের সাধ্যায়ত্ত। তোমরা যদি প্রকৃত গৃহস্থ হইতে না পারিলে. তবে কেবল কতকগুলি অল্লায়ু পশুপালের বৃদ্ধি সাধনেই কি শাস্ত্রীয় নিয়ম রক্ষিত হইবে? এই জন্য বিশেষ সংযত হইয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশকরা উচিত; দেশকালের আবশ্যকতানুসারে গৃহীর কর্ত্তব্যপালনে অসমর্থ হইলে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করাই কর্ত্তব্য। গৃহস্থগণ নরাকার নরপশুপালের বৃদ্ধি জন্য ব্যস্ত না হইয়া, গো জাতির বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হইলে অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্য-রক্ষা ও দুর্ভিক্ষ দূর হইতে পারে। অল্লায়ু রুগ্ন শিশুপালনে যে ব্যয় পড়ে, তাহাতে অন্ততঃ দুইটী গো সু প্রতিপালিত হইতে পারে। পল্লবাসীগণ গো-সেবায় যত্নবান হইলে অন্নকষ্ট আপনিই নষ্ট হইবে। গোজাতির সাহায্যেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাবতীয় আহার্য্য অন্ন উৎপন্ন হইতেছে। সেই গোসকলকে অযত্ন করিলে ও শেষ অবস্থায় সামান্য লাভের আশায় হত্যা-কারীর হস্তে দিতে থাকিলে কিরূপে ভগবৎ-কৃপাদৃষ্টি হইবে? কৃষকদিগের এই পাপ প্রত্যেক অন্নাহারীকেই স্পর্শ করিতেছে। গোজাতির প্রতি এই অত্যাচারের ফলে অতিবৃষ্টি অনা-বৃষ্টি ও অসময়ে বৃষ্টি হইয়া অন্নের হানি হইতেছে। তোমরা উদরান্নের আশায় গোচর-ভূমি পর্য্যন্ত লইয়া শস্যোৎপানের জন্য যতই যত্ন করনা কেন, বৃষ্টিপাত তোমাদের ইচ্ছাধীন নহে। অকৃতজ্ঞ মানব! তুমি তোমার পরম হিতকারী নিরীহ পশুকুলকে ঘাতক-হস্তে

দিয়া কিরূপে কল্যাণের আশা করিতে পার? তোমার অধর্ম্মে উপার্জ্জিত অর্থ রোগে ও বৃথা বাদবিবাদে ব্যয় হইয়া যাইবে, তোমাদের কাহারও ভোগে আসিবে না। বিবেক বুদ্ধি পাইয়াও তুমি সামান্য লোভে কৃতঘ্ন হইয়া কসাই হস্তে গো বিক্রয় করিতেছ, গোজাতির শ্রমজাত অন্নে প্রাণ ধারণ করিয়াও গোরক্ষার জন্য যত্ন করিতেছ না, এ পাপের জন্য রোগ ভোগ ও পুত্রাদি প্রিয়বিয়োগ ক্লেশ ও তোমার জীবনে অবশ্যম্ভাবী।

গো গৃহস্থের লক্ষ্মীস্বরূপ। গোপালনে পুণ্য-সঞ্চয় হয় এবং ঘৃত, দুগ্ধ আহারে স্বাস্থ্য রক্ষা, বলবৃদ্ধি ও শিশুশরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক সন্তানোৎপত্তির সংখ্যা হ্রাস করিয়া গো সেবায় অর্থব্যয় করা উচিত, উহাতে ঐহিকপারলৌকিক উপকার সাধিত হইবে। গোময়াদি ম্যালেরিয়া নাশক বলিয়া চিকিৎসকেরা স্থির করিয়াছেন; বিশেষতঃ গোদুগ্ধ শরীরের বলবান করিয়া রোগাক্রমণে বাধা দিয়া থাকে। ঘৃত, দুগ্ধ বয়ঃস্থাপক ও জরানাশক। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার প্রত্যক্ষ ফল দুগ্ধাহারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্য কোন ঔষধ বা আহারে এরূপ সাত্বিক বলবীর্য্যের বৃদ্ধি হইতে পারে না। এইজন্য গো সেবা গৃহস্থের ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সংযমের পরে গো সেবাই ম্যালেরিয়া নাশের মহৌষধ। কেন না স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রাত্যহিক আহার মাত্রেই গোজাতির উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং গোজাতির রক্ষায় যত্ন না করিয়া অন্নাহার করা গোমাংস আহারের তুল্য। এইজন্য হিন্দুমাত্রকেই গোরক্ষা ও গো-সেবার জন্য যত্নপর হওয়া উচিত। গৃহস্থ বিক্রেতাকে অর্থ বা উপদেশ দ্বারা একটি বৃদ্ধ ও বন্ধ্যা গো বা বৎসকে রক্ষা করিলেও পরম পুণ্য হইবে। শরীরের বাহ্য বেশ-বিলাসের ব্যয় সংক্ষেপ করিলে, পল্লীগ্রামে গো সেবা করাও আয়ত্তাধীন। ইহাতে ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই বর্ত্তমান। স্বাস্থ্যেসুখের তুলনায় অন্য সমস্তই তুচ্ছ এবং সুস্থদেহের সৌন্দর্য্যের সমক্ষে অন্য বেশভূষা অকিঞ্চিৎকর।

সংযমের অভাবে অতিরিক্ত সন্তান-পালন জন্য ও রোগাদিতে বিব্রত হইয়া যেমন লোকে সাধারণতঃ গো সেবা ত্যাগ করায় লক্ষ্মীশ্রী ও ধর্ম্মভাব নষ্ট হইয়াছে এবং দুগ্ধাদি পুষ্টিকর আহারাভাবে ক্ষীণবল, অল্পায়ু ও চিররোগী হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ অনেক জিহ্বার পরিতৃপ্তি লালসায় বা সামান্য লাভের আশায় গৃহ-পার্শ্বেই পূতিগন্ধপূর্ণ ও আবর্জ্জনাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পঙ্কিল জলকুণ্ডে মৎস্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া ম্যালেরিয়া গ্যাস ও মশকবংশের বৃদ্ধি হইতেছে। জলস্রোতাদি বন্ধ হওয়ায় যে অসীম রোগের উৎপত্তি হইতেছে, তাহা সহজে নিবারণ করা সমবেত চেষ্টা ব্যতীত সম্ভব নহে; কিন্তু ক্ষুদ্র জিহ্বার সুখ সংযম করা প্রত্যেকেরই সাধ্যায়ত্ত। এই মৎস্য লোভে যে রোগবীজের বৃদ্ধি হইতেছে লাভের সহিত তুলনা করিলে রোগভোগে দুঃখ, আয়ুক্ষয়, ও প্রাণহানি এবং ঔষধাদিতে ব্যয় অতীব অধিক হইয়া থাকে। বিবেচনার দোষে লোকে রসনা শাসন না করিয়া ইন্দ্রিয় ভোগের মোহে গৃহে গৃহে ম্যালেরিয়া রোগের আকর প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্ত পূতিগন্ধময় স্থান অপেয় জলে পূর্ণ। মৎস্য লোভ ত্যাগপূর্ব্বক স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশে এই দুষ্ট জলাশয়গুলি মৃত্তিকাপূর্ণ করাই উচিত। মৎস্যাপেক্ষা পুষ্টিকর

উদ্ভিজ্জাহারেই শরীর বেশ সুস্থ থাকিতে পারে। রসনার ক্ষণিক স্বাদবোধ সুখই এই রোগভোগের অন্যতম কারণ নহে কি?

ধর্ম্মভাব লোপ হওয়ায় ও শৌচাচারের অভাবে পল্লীগ্রামবাসী জলের পবিত্রতা ভুলিয়া গিয়াছে। গ্রামের অর্দ্ধাধিক অধিবাসীরা পানীয় জলে শৌচক্রিয়া ও প্রস্রাব পরিত্যাগ করিয়া উহা কিরূপ অপবিত্র ও গ্লানিকর বিবিধ রোগের বীজে পূর্ণ করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও রোমাঞ্চ হইবে। যে জল পূজায় ও পানের জন্য ব্যবহৃত হইবে, তাহাতে প্রস্রাব ত্যাগ কিরূপ পাশবিক আচার, তাহা প্রত্যেকেরই একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি? অযথা উপায়ে পোষ্য বৃদ্ধি করিয়া অর্থাভাবে উদারান্নের জ্বালায় অস্থির—পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সামর্থ্য নাই, অথচ সামান্য বিবেচনার দোষে স্ত্রীলোক মাত্রেই প্রতিদিন পানীয় জলে প্রস্রাব করিয়া তাহাই আবার পূজার জন্য, গুরুজন ও স্বীয় স্বামী ও সন্তানাদির পানীয়রূপে লইয়া যায়! ইহা কি প্রত্যক্ষ নরকভোগ নহে? ইহাতে সত্য সত্যই দূষিত প্রস্রাব পান করা হইতেছে কি না, একবার তাহা গৃহে গৃহে আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। এইরূপে পুত্রবধূ শ্বশুরের মুখে, স্ত্রী স্বামীর মুখে, কন্যা পিতৃমাতৃ মুখে, মাতা সন্তানের মুখে, পানীয়রূপে বিমূত্র দিতেছে না কি?

শুনিতেও লজ্জা ও গ্লানিকর, তাহা সত্য সত্যই বঙ্গের পল্লীগ্রামে প্রতিদিন ঘটিতেছে কি না, ইহাই বিচার্য্য। প্রত্যহ এইরূপ বিষাক্ত জলপানে রোগ না হইবে কেন? এই বীভৎস কদাচার ত্যাগকরা কি প্রত্যেকের সাধ্যায়ত্ত নহে? জলে মলমূত্র ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ যে মহাধর্ম্মহানিকর—অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর ও মনের মলিনতাকারক, এ জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহারা এই পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ প্রত্যক্ষ রোগ ভোগ না করিবে কেন? স্নান-পানের জল মলিন করিলে কিরূপে শৌচাচার রক্ষা হইতে পারে? পল্লীগ্রামবাসীর এই কদভ্যাস যতদিন না যাইবে ততদিন তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক পবিত্রতা লাভের আশা কোথায়?

বায়ুর দোষ দূর করিবার জন্য যজ্ঞ হোমাদির প্রথা গোক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোপ হইয়াছে। অন্নের সহিতও হবিঃ আর উদরস্থ হইতেছে না, হোম করিবার ত কথাই নাই। ঘোর তামসিক ভাবাপন্ন হইয়া দিবানিদ্রা, বৃথা বিবাদ ও বিবিধ ব্যসনে দিন ব্যয়িত হইতেছে, অথচ শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ গৃহ প্রাঙ্গণ ও পার্শ্ব প্রদেশ পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিতে যত্ন নাই। ফলের আশায় গ্রামের আবাস বাটীগুলি অতিরিক্ত বৃক্ষাদিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে, ভূমির আর্দ্রতা দূর করিবার কোনই চেষ্টা নাই, আবার জানিয়া শুনিয়া লোকে পানীয় জলও বিষাক্ত করিতেছে; সুতরাং কিরূপে জলবায়ুর দোষ দূর হইবে? জলবায়ুর সংশোধনের সহজ সাধ্য উপায়গুলি আলস্যে ও ঔদাস্যে উপেক্ষিত হইতেছে। অন্তর ও বাহ্য শৌচের অভাবে শরীর ও মন দিন দিন মলিনই হইতেছে। সংযত ও সদাচারী না হইলে কেবল ঔষধ সেবনে রোগের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় নাই।

ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, গোসেবায় অমনোযোগ ও জলের অশুদ্ধতা জন্য স্বাস্থ্যহানি ও রোগোৎপত্তির মূলে বিচারহীনতাই প্রধান

কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। বিবেকবান হইলে কেহই উপরোক্ত ত্রিদোষজ ব্যাধিগ্রস্ত হইত না। এক্ষণে মূল কারণ নির্ণয় করাই আবশ্যক এবং মৌলিক দোষ দূর হইলেই সকল রোগের শান্তি হইতে পারে, ইহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব লাগিবেনা যে, সুশিক্ষার অভাবেই উপরোক্ত সমস্ত দোষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যথাসময়ে চরিত্রবান্ ব্যাক্তির নিকটশিক্ষা পাইলে অনেকেরই শরীর ও মনের উন্নতি হওয়া সম্ভব। একমাত্র অর্থাভাব এই সুশিক্ষা লাভের অন্তরায় নহে। সন্তানদিগকে সুশিক্ষিত করিবার ইচ্ছা ও আবশ্যকতা বোধের অভাবই ইহার মধ্যে প্রধান। সুশিক্ষা বলিলেই ইংরাজী বা সংস্কৃত বুঝিতে হইবেনা, উহা উচ্চ শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু চরিত্রশিক্ষা নাহইলে ইংরাজী ও সংস্কৃতের জ্ঞানও অনর্থক মাত্র। দেশভাষার ভিতর দিয়াই যথেষ্ট সুশিক্ষা হইতে পারে। পুস্তক পড়িলেই শিক্ষা হয়না, পুস্তকের উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। পুস্তকে সদুপদেশ সংগৃহীত আছে বলিয়াই উহা পঠিত হয়। চরিত্রবান্ ব্যক্তির আচরণ ও মৌলিক উপদেশই বিশেষ আবশ্যক, পুস্তক অবলম্বন মাত্র। লিখিতে ও পড়িতে শিখিলে বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা সহজসাধ্য হয় বলিয়াই উহা আবশ্যক। শরীর রক্ষার জন্য পাণাহারাদির নিয়ম ও ব্রহ্মচর্য্যাদির বিধি পালন এবং মনের শক্তি ও শান্তি বিধানের জন্য নীতি ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই প্রকৃত শিক্ষা। শরীর ও মনের উন্নতি জন্য আবশ্যকীয় অনুষ্ঠানগুলি অভ্যাসগত না হইলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। এইজন্য অভিভাবক ও শিক্ষাদাতার সদনুষ্ঠান পরায়ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। শরীর ও মনকে সংযত ও সুদৃঢ় করিবার জন্যই শিক্ষার আবশ্যকতা। যত প্রকার শিক্ষা প্রচলিত আছে, সকলের মূলেই এই লক্ষ্য নিহিত। শিক্ষায় লক্ষ্যহীন হওয়াতেই প্রকৃত ফললাভ হইতেছে না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, রসায়ন, রাজনীতি, অর্থনীতি আদি সকল বিদ্যাই শরীর ও মনের সুখবিধানে নিয়োজিত; কিন্তু মনকে পবিত্রভাবে উন্নত এবং তদনুকূল শারীরিক শিক্ষা না হওয়াতে, এই সকল শিক্ষা হইতে লোকে প্রকৃত সুখ অল্পই পাইতেছে। মনকে ইন্দ্রিয়াতীত সুখাস্বাদে বঞ্চিত করিয়া, ইন্দ্রিয়ভোগে রত রাখিবার উপায় অবলম্বনে নানারূপ বিলাস বাসনা, অর্থাভাব ও অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইতেছে। মনুষ্যত্ব লাভে যত্ন না করিয়া পশুভাবের প্রশ্রয় দেওয়ায় মানুষের দুঃখ দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছে।

বিদেশীয় বিলাস দ্রব্য স্বদেশে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে দেশের উন্নতি হইবে না; বরং শরীর রক্ষার অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ভোগের পদার্থ বৃদ্ধি না করাই প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতা। ইন্দ্রিয়ভোগ চরিতার্থ জন্য যতই বাহ্য পদার্থের অধিক আয়োজন করিবে, ততই মণের সংযম ও পবিত্র অতীন্দ্রিয় সুখের হানি হইবে। নির্ম্মল জলের পরিবর্ত্তে অপেয় মদিরা সেবন, মাঠের নির্ম্মল বায়ু সেবন না করিয়া তামাক ও বীড়ির ব্যবহার, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যাভাষণ ও বিবাদ বিসম্বাদ, বীর্য্য ধারণের পবিত্র বললাভের পরিবর্ত্তে অখাদ্যাহারে উদর ভরণ, সাত্বিকাহার দুগ্ধাদিতে শরীরের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য

বৃদ্ধি না করিয়া বেশ-বিন্যাসে বহু ব্যয় করা কুশিক্ষার উদাহরণের স্থলমাত্র বলিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে সংযমানুকূল শিক্ষা পাইলে ও সৎদৃষ্টান্ত দেখিলে যৌবনে ঐ সমস্ত চঞ্চলতা আসিতে পারে না *। কথিত আছে :—

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রতাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাৎ ধর্ম্মং ততঃ সুখম্ ॥"

বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা বিনয়াদি গুণ ও ক্রমে সৎস্বভাব লাভ হয়, এবং সুশীল পুরুষই সদুপায়ে ধনলাভপূর্ব্বক সদনুষ্ঠানরূপ ধর্ম্মসাধন ও শান্তি সুখ ভোগ করিতে পারেন; কিন্তু এই উদ্দেশ্যে কয়জন বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়? এক্ষণে ত উদরান্নের জন্য বিদ্যাশিক্ষা ও ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে লোকে লালায়িত। বিদ্যার্জ্জন মনোমার্জ্জনের অমোঘ অস্ত্র, এ কথা কয় জনের মনে জাগরুক থাকে? বিদ্যাবান্‌দিগের অযোগ্য ব্যবহার ও অর্থ-লালসা দেখিয়া অপর কে আর বিদ্যার্জ্জনে শ্রম করিতে চায়? সুতরাং আজীবন উদর সেবায় রত থাকিয়া গ্রামবাসিগণ মূর্খতা ও অজ্ঞানতার দাস হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহার ফলস্বরূপ দুঃখ ও দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থ থাকিলেই দুঃখ দূর হয় না, অর্থের অপ-ব্যবহারে অনেক প্রকার দুঃখ বাড়িয়া যায়, আবার সংযম ও সাবধানতার ফলে অর্থ না থাকিলেও অনেক অভাবের আদৌ উদয়ই হইতে পারে না। এই জন্য বিচার বুদ্ধি বাড়াইয়া বৃথা দুঃখ ভোগের বাধা দেওয়া আবশ্যক। প্রকৃত মহৎসঙ্গ সর্ব্বদা সুলভ নহে; কিন্তু সৎগ্রন্থ পড়িবার সামর্থ্য থাকিলে সৎ-সঙ্গ বা সদুপদেশ লাভের অভাব হয় না। এইজন্য অন্ততঃ মাতৃভাষা শিক্ষা করা স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকলেরই উচিত। যেমন সংক্রামক রোগ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কেবল মাত্র আপনাকে সাবধান করিলে চলিবে না; কিন্তু বাড়ীর সকলকে এবং প্রতিবেশী ও গ্রামবাসী সকলকেই স্বাস্থ্যানুকূল নিয়ম পালনের জন্য উপদেশ ও উৎসাহ দিতে হইবে; নতুবা দূষিত বায়ু হইতে রক্ষা পাইবার উপায়ান্তর নাই; সেইরূপ কেবল নিজে শিক্ষিত হইলেই শান্তি নাই; সকলকে মনুষ্যোচিত সুশিক্ষা দিবার চেষ্টা না করিলে অশান্তি যাইবে না। অশিক্ষিত দুষ্টলোক-পরিবৃত হইয়া সুশিক্ষিত জন কিরূপে সুখ পাইতে পারেন? দরিদ্রকে সাবধান হইবার শিক্ষা না দিলে দরিদ্রের কুটীরজাত বিষাক্ত বায়ু ধনীর প্রাসাদেও প্রবিষ্ট হইবে; সিংহ-দ্বার রুদ্ধ করিয়াও তাহা হইতে অব্যাহতির উপায় নাই। অশিক্ষিত ও দুঃশীল সহবাস-দোষে ধনাঢ্য-সন্তানদিগের মূর্খতাও অনিবার্য্য, এই জন্য আত্মহিতেচ্ছু মাত্রেরই পরকল্যাণ-কামী হওয়া আবশ্যক।

শিক্ষিত গ্রামবাসিগণ যদি অবকাশ কাল কেবলমাত্র দিবানিদ্রা, তাস পাশায় ও মৎস্যাদি ধারণের ব্যসনে থাকিয়া মনুষ্য-জীবন বৃথা ব্যয় না করিয়া অশিক্ষিত দরিদ্র সন্তানগণকে প্রত্যহ ২।১ ঘণ্টা কাল মাতৃভাষা শিক্ষা

* সংযমের সুখাস্বাদ না করায় আজকাল অনেকে বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সেনসাস রিপোর্টে প্রকাশ ব্রহ্ম-চর্য্যবশতঃই হিন্দু বিধবাদের দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। দৈবভাবময় দীর্ঘ জীবন ও অপবিত্র পূতিগন্ধযুক্ত ভোগজীবনের মধ্যে কোনটী বাঞ্ছনীয় ইহাই বিবেচ্য।

দেন, তবে অল্পকাল মধ্যেই তাহার শুভ ফল পরিদৃষ্ট হইতে পারে। তাঁহাদের আদর্শ সকলকেই অনেক ধর্ম্ম মত নিজ নিজ কর্ত্তব্য অবধারণে অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান করিয়া, সন্দেহ নাই। অভিভাবকগণ একটু ক্লেশ করিয়া নিজ নিজ গৃহের বিধবাদিগকে এরূপ মাতৃভাষা শিক্ষা দিলে বিধবাদিগের শাস্ত্রানুকূল ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণ মাতৃভাষায় শাস্ত্রোপদেশ পাঠ করিতে পাইলে অনেক শান্তিলাভ করিতে পারেন এবং গৃহে গৃহ মুর্ত্তিমতী দেবীর আবির্ভাব হইতে পারে। শরীরসংযম, সৎকার্য্যানুষ্ঠান ও বিবেক বৈরাগ্যাদির অভ্যাস দ্বারা মনোনিরোধবশতঃ বিধবাদিগের পক্ষে যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সহজ সাধ্য, তাহা আর পুনঃ পুনঃ বলিবার আবশ্যকতা নাই। বিধবাগণ মাতৃভাষায় শিক্ষিতা হইলে প্রতিবেশিনী বালিকাদিগের শিক্ষা অতি সহজ হইয়া পড়িবে এবং সুশিক্ষা বীজ অতি সত্বরে গৃহে গৃহে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। সুশিক্ষা দ্বারা মনের মলিনতা রূপ মানস-ম্যালেরিয়া দুর করিতে না পারিলে কেবল শরীর রক্ষার জন্য আড়ম্বর করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। যেমন দুষিত আহারে উদর পূর্ণ করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও রোগভোগ অনিবার্য্য, সেইরূপ মনের মলিনতা দুর করিতে না পারিলে, শরীরের স্বাস্থ্য মাত্র রক্ষায় মনুষ্য-প্রকৃতির বিকৃতি না হইবে কেন? শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আহার ও ঔষধ চাই; কেবল পরিষ্কার পোষাকে গা ঢাকিলেই রোগ যাইবে না, সেইরূপ মনের ম্যালেরিয়া দুর করিবার জন্য সুশিক্ষা—শাস্ত্রানুকূল বিদ্যা শিক্ষা চাই; নতুবা কেবল পুস্তক পাঠ করিলেই মনুষ্যোচিত স্বভাব ও শান্তি স্বাস্থ্যলাভ হইবে না। বর্ত্তমানকালীন একদেশী শিক্ষার দোষে লোকের শরীর মনের কোন মলিনতাই প্রকৃতরূপে দুর হইতেছে না—যে শিক্ষায় ভোগ লালসা দুঃখ বিষাদ, অভাব ও অসংযমের বৃদ্ধি হয়, তাহা কখনই সুশিক্ষা হইতে পারে না। মনুষ্যোচিত সুখলাভ করিতে হইলে—শরীর ও মণের ম্যালেরিয়া (মলিননতা) দুর করিতে হইলে যথোচিতরূপে ব্রহ্মচর্য্যাদি শাস্ত্রীয় সংযমের অভ্যাসদ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা ও মাতৃভাষা শিক্ষাদ্বারা সাধুভাব লাভ করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। সংযম ও শিক্ষা বিনা শারীরিক ও মানসিক উন্নতির আশা করা কবি কল্পনা মাত্র। এই জন্যই বিচার-পূর্ব্বক জিহ্বোপস্থাদি ইন্দ্রিয়সংযমের অভ্যাস ও বিচারবুদ্ধির বিকাশ জন্য বিদ্যাশিক্ষাই ম্যালেরিয়ার মহৌষধরূপে নির্ণীত হইল, এবং ইহাই মানবজীবনে অমরত্ব লাভের একমাত্র অমূল্য ও অমোঘ রসায়ন *।

শ্রীঃ—

(কাশী—যোগাশ্রম।)

* এ দেশে শতকরা ৯০ জন লোকের বাসভূমি পল্লীগ্রামে। সুতরাং পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপরই সাধারণতঃ লোকের শরীর ও মনের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এই বিষয়টী স্মরণ রাখিয়া প্রত্যেকেরই যথা-সাধ্য যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। স্বার্থপর হইয়া নগরের ভোগবিলাসে মোহিত থাকিলে মুর্খতা-জনিত দুঃখ-দরিদ্রতা অকালে সকলেরই সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিবে।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা।

হিরণ্যস্তূপ ঋষি।

১

ইন্দ্রের বীরত্ব-কথা কহিব এখন,—
প্রথমে যে কর্ম্ম বজ্রু করেন সাধন ;—
অহিকে হনন, পরে বৃষ্টি বরিষণ,
পার্ব্বতীয় প্রবাহিণী পথ উদ্ঘাটন,—

২

পর্ব্বত-আশ্রিত অহি করেন হনন,—
এর তরে দিব্য বজ্র ত্বষ্টার নির্ম্মাণ,—
বৎস পানে ধেনু যথা করয়ে গমন,—
প্রবাহিত বারি ধয়ে সমুদ্রে তেমন।

৩

বৃষ সম ধেয়ে সোম করেন গ্রহণ,
করেন ত্রিবিধ যজ্ঞে সুত সোম পান ;
মঘবা সায়ক বজ্র করেন গ্রহণ,
প্রথমজ অহি তাহে করেন নিধন।

৪

প্রথমজ অহি-সবে করেন হনন,
মায়ীদের মায়া সব করেন দমন ;
সূর্য্য উষা আকাশের করেন সৃজন,
কোন শত্রু আর নাহি থাকিল তখন।

৫

অতি আবরক বৃত্রে ছিন্নবাহু করি,
মহাবজ্র দ্বারা ইন্দ্র! করিলে নিধন,
শায়িত হইল অহি পৃথ্বী স্পর্শ করি,
কুঠার-বিচ্ছিন্ন বৃক্ষস্কন্ধের মতন।

৬

মহাবীর বহুনাশী শত্রু জয়ী তাঁরে
আহ্বানে দুর্ম্মদ,—যোদ্ধা নাহিক ভাবিয়া,
তাঁর বধকার্য্য হতে রক্ষা পেতে নারে
ইন্দ্র শত্রু নদী সব ফেলিল পিষিয়া।

৭

হস্তপদহীন হয়ে ইন্দ্রেরে আহ্বানে,
ইন্দ্র সানুদেশে তার বজ্র আঘাতিল,
পুরুষত্ব ইচ্ছে যথা পুরুষত্ব হীনে,—
বহুখণ্ড হয়ে বৃত্র ভূতলে পড়িল।

৮

ভগ্ন কূল অতিক্রমি নদী যথা ধায়,
শায়িত ইহারে তথা অতিক্রমি চলে
নদী মনোহর; ছিল বৃত্র মহিমায়-
বদ্ধ বারি ; অহি এবে তার পদতলে।

৯

নীচ ভাবে পড়িল সে বৃত্র পুত্র সহ,
ইন্দ্র তার নিম্নে অস্ত্র করিল ক্ষেপণ ;
উপরেতে মাতা আর নিম্নে পুত্র তার,
বৎস সহ গাভী যথা, দানুর শয়ন।

১০

স্থিতি বা বিশ্রামহীন জলের ভিতরে,
নামহীন বৃত্র দেহ রয়েছে নিহিত
তাহার উপরে বারি বিচরণ করে,
ইন্দ্র-শত্রু দীর্ঘ ঘুমে কাছরে শায়িত।

১১

দাস-পত্নীগণ ছিল অহির রক্ষিত ;
নিরুদ্ধ আছিল বারি; ছিল পাণিগণ
পাণিঃ দ্বারা বদ্ধ যথা ; ছিল আবরিত
বারিপথ, বৃত্র-বধে তার উন্মোচন।

১২

তব বজ্র প্রতি সেই দেব একা যবে
প্রহারে হে ইন্দ্র! হলে অশ্ব-পুচ্ছ সম,
কর তুমি জয় সোম আর গাভী সবে
শত্রু সিন্ধু প্রবাহের করহ সৃজন।

১৩

ইন্দ্র আর অহি যবে প্রবৃত্ত সমরে
সে বিদ্যুত, যে গর্জ্জন, বৃষ্টি, বজ্র আর
ক্ষেপে অহি ইন্দ্রে তারা পরশিতে নারে
মঘবা করেন জয় অন্য মায়া আর।

১৪

অহি হন্তাকারে ইন্দ্র! হেরেছিলে? তব
জন্মে সবে বৃত্র বধে ভয়ের সঞ্চার?
তাই সে নবনবতী নদী-জল সব
শ্যেন পক্ষীমত ভীত হয়ে হলে পার।

১৫

বজ্রবাহু ইন্দ্র রাজা হয়েন সবার,
স্থাবর জঙ্গম আর শান্ত শৃঙ্গী যত,
মানুষের রাজা হ'য়ে নিবাস তাঁহার,
ধারণ করেন সব চক্র-নেমী মত।

তৃতীয় অধ্যায়।

৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা,।

হিরণ্যস্তূপ ঋষি।

১

এস মোরা গাভী আশে, ইন্দ্রের সমীপে চাহি
হিংসাহীন হন তিনি ; করেন বর্দ্ধন
মোদের প্রকৃষ্ট মতি গোধন বিষয়ে, যার
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আমাদের করেন প্রদান।

২

ধনদ অপ্রতিহত ইন্দ্রের সমীপে চাহি
শ্যেন যথা ধায় পূর্ব্ব নীড়েতে তাহার,—
উত্তমার যোগ্য স্তোত্রে করি তাঁরে নমস্কার
তিনিই সমর কালে আরাধ্য স্তোতার।

৩

সর্ব্ব সেনা নেতা ওই ধরেছে তূণীর পৃষ্ঠে,
যাঁরে ইচ্ছা আর্য্য ; তাঁরে দাও গাভীগণ,
হে প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র ! দাও মোদেরে বহু গোধন,
হ'য়োনা মোদের কাছে ব্যাপারী যেমন।

৪

শক্তিমান মরুৎগণ ছিল কাছে, কিন্তু গিয়া
একা বজ্রে ধনবান দস্যুকে নাশিলে ;
ধনুর সমীপে যবে আসিল বিনষ্ট হ'তে,
হত হল যজ্ঞনাশী সনক সকলে।

৫

যারা যজ্ঞহীন যজ্ঞকারী প্রতি স্পর্দ্ধাবান,
শির ফিরাইয়া ইন্দ্র ! করে পলায়ন,
হবির্যুক্ত, স্থির, উগ্র—তুমি যজ্ঞহীনগণে
দ্যাবা পৃথ্বী দিব হতে কর বিতরণ।

৬

দোষহীন ইন্দ্র-সেনা সহ তারা মাগে রণ
প্রশংসিত ক্ষিতিবাসী উৎসাহে ইন্দ্রেরে;
নিরস্কৃত ইন্দ্র হ'তে—জানায়ে অশক্তি নিজ
ক্লীব যথা বৃষ কাছে ;—পলাইলা দূরে।

৭

কাঁদে আর হাসে এরা—ইহাদের সনে ইন্দ্র !
অন্তরীক্ষ পারে রণভূমি করে ছিলে.
স্বর্গ হ'তে করি চ্যুত দস্যুকে করিলে দগ্ধ,
সোম-সোতা স্তোতাদের স্তুতিকের ক্ষিলে।

৮

পৃথিবীকে আচ্ছাদন করি ছিল তারা সবে,
হিরণ্য মণিতে তারা সাজিল শোভিত ;
এত বৃদ্ধি ছিল তবু নারিল জিনিতে ইন্দ্রে,
বাধকেরা সূর্য্য দ্বারা হল অপসৃত।

৯

হে ইন্দ্র ! স্বমহিমায় দ্যুলোক ভূলোক উভে
ব্যাপী কর ভোগ সর্ব্বরূপে সমুদয় ;—
অথ লাহি বুঝে চেষ্ট তারেও রক্ষা প্রয়াসী
হেন বজ্রে নিঃসারিত কর দস্যু চয়.

১০

সেই চারি স্বর্গ হ'তে না আসে পৃথিবী অন্তে
করেনা ধনদা পৃথ্বী পূর্ণ মায়া দ্বারা,—
বৃষ্টিকারী ইন্দ্র :—যাঁর বজ্র করে তেজ দ্বারা
করেন দোহন বৎস হতে বারিধারা।

১১

এঁর স্বধা অনুসরি হল বারি প্রবাহিত
নৌকাগম্য বারি মাঝে বৃত্র সম্বর্দ্ধিত,—
সুদৃঢ় সংকল্প করি ইন্দ্র তারে কিছু দিনে
বধে বজ্রে সংহারক অতি বলান্বিত।

১২

ভূমেতে শায়িত বৃত্রসেনা সমুদয় তুমি
কর বিদ্ধ ; নাশ শৃঙ্গধারী সে শোষকে ;
হে মঘবা ! বল আর বেগ তব যতদূর,
তাহে বজ্র দ্বারা নাশ যুদ্ধার্থী শত্রুকে।

১৩

ইঁহার সাধক অস্ত্র ধায় অরি লক্ষ্য করি,
তীক্ষ্ণ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র এঁর ভেদে বৃত্রপুর ;
পরে ইন্দ্র বৃত্রপ্রতি করেন বজ্র প্রয়োগ ;
তাহারে বধিয়া তাঁর আনন্দ প্রচুর।

১৪

কুৎসে রক্ষা কর ইন্দ্র ! যার স্তবে তুষ্ট তুমি,
রক্ষ শ্রেষ্ঠ যুদ্ধে রত দশদ্যুকে আর,
দ্যুলোক-পরশে তব অশ্ব-ক্ষুর-চ্যুত ধূলি
শৈত্রে উঠায়েছ হ'তে শক্তিমান নর ;

১৫

মঘবা ! সে জলমগ্ন শান্ত শ্রেষ্ঠ শৈত্রে তুমি
করে ছিলে রক্ষা ক্ষেত্র প্রাপ্তির কারণ,
চিরদিন হেথা থাকি শত্রুতা করেছে যারা,
সে শত্রুরে কর ঘোর বেদনা প্রদান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু এম এ বি এল্।